তপোভূমি নর্মদা

অখণ্ড
উত্তরতট

॥ হর নর্মদে হর ॥

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ।।

ঋষি-পিতার আশীর্বাণী

সর্বত্রৈব স্বদেহে নিয়ত নিবসতিং বিভ্রতং নর্মদেশং
গূঢ়ং পুণ্যঞ্চ শৈলেন্দ্রবিরচিতং পঠেৎ হি গ্রন্থমেতৎ।
দধ্যাদ্ যোহর্থঞ্চ চিত্তেসুবিমলবিশদে প্রাপ্নুয়াৎ স হ্যমৃত্বা।
কাশীমৃত্যোঃ সুরম্যং ফলমবিচলিতং যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্।।

যিনি জগতের সর্বত্র এবং প্রতি জীবের দেহে নিত্যকাল বিরাজমান, সেই ভগবান নর্মদেশ্বর এবং নর্মদার আধ্যাত্মিক মহিমাপূর্ণ শৈলেন্দ্র-বিরচিত এই গভীর অর্থবহ গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। যিনি শুদ্ধ ও প্রসন্নচিত্তে এই গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য হৃদয়ে অবধারণ করতে পারবেন, তিনি যে দেশেই বাস করুন বা যেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটুক না কেন, অন্তকালে তিনি কাশীমৃত্যুর সমান পরমকাম্য নিত্যফল অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করতে পারবেন।।

যাই হোক, আপনি একটু ধৈর্য ধরে বইটি পড়ুন। এতে আপনার ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। কারণ আমার হাতের গুণে —

'গ' — গতের্বাচকো বর্ণো রেফশ্চোর্ধ্বায়নার্থকঃ।
অতোহত্র গর্হিতঞ্চাপি হিতায় পরিকল্প্যতে।।

আপনারা কেউ যদি সরিদ্বরা নর্মদা দর্শনে যান এবং দৈবাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের দ্যুতি যদি চকিত চমকের মত আপনাদের চোখে ঝলসে ওঠে, তবে আমি শিবসাক্ষী করে বলতে পারি, এই মর্ত্যজীবনেই আপনারা অমৃতের স্বাদ পাবেন।

আর যদি তা' না ঘটে তাহলে বুঝতে হবে, সূর্যের কিরণ সর্বত্র সমভাবে পড়লেও মাটি-কাঠ পাথরে কি তার প্রতিফলন ঘটে ?

অলমিতি বাগ্‌পল্লবেন।

ভবদীয়
শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

নিবেদন

শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ন ঘোষাল শাস্ত্রী লিখিত 'তপোভূমি নর্মদা' বইটি পরবার পর সনাতন ধর্ম বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারলাম এবং বর্তমানে ধর্মের নামে যেভাবে নানা প্রকারে মানুষ ঠকানোর অপপ্রচেষ্টা চলছে যার ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের ধর্ম বিষয়ে অনিহা জন্ম নিচ্ছে। যারা এভাবে ধর্মের নামে মানুষ্য জন্ম বিফল করে নিজেদের আখের গোছাবার চেস্টা করছেন, তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না সামান্য অর্থ / খ্যাতির লোভে নিজের ও জাতির সর্বোপরি মানুষের কি সর্বনাশ করছেন যাই হোক আমি নিজে অল্পবিদ্যা হয়ে ফাঁপা ঢোলের মত শব্দ করতে চাইনা। শুধু এটুকুই সান্ত্বনা যে, লেখকের এই নিরলস অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসেবে এই বই নিঃসন্দেহে বাংলার চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টি গুলোর অন্যতম হয়ে সমাদর পাবে।

বর্তমানে Computer & Internet (কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের) যুগে নুতন প্রজন্ম সোসাল ওয়েব সাইট নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত সেভাবে আর বই-এর দিকে তাদের আকর্ষন নেই। এছাড়াও প্রতিদিন লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি কাগজের বই কে করে তুলেছে মহার্ঘ, তাই সাহস করে কেউ পরখ না করে বেশি দামের বই কিনে গাটের পয়সা খরচের প্রয়জন বোধ করেন না। যদিও কারও কারও মোটা বই কিনে বসবার ঘরের বই-এর সংগ্রহ সবাইকে দেখিয়ে বাহবা নেবার প্রবনতা লক্ষ করা যায়, এবং প্রধানত এই -ধরনের সংগ্রাহকের সংখ্যাই বেশি, যারা প্রকৃত পুস্তক প্রেমি তারা বেশিরভাগই খুব সাধারন মানুষ হন, কারন অসাধারন পয়সাওয়ালারা তো পয়সার নেশা থেকে অব্যহতি পান না তাই তারা বই-এর নেশা কখন করবেন। যদি আমার এই বই কোনভাবে বইপ্রেমি সাধারন পাঠক এর হাত এ পড়ে তবেই আমার কস্ট সার্থক বলে মনে হবে। এইসব কারনেই এই অমূল্য বইটিকে আমুল তুলে দিলাম ইন্টারনেট এর দুনিয়াতে।

জানি সমালোচকরা বলবেন, আমি এই কাজ করে লেখকের প্রচেস্টা নষ্ট করে দিতে চেয়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন এরকম কোন উদ্দেশ্য আমার মনে স্থানও পায়নি। আমি নিজের পক্ষে কোন যুক্তি দেবার জন্য লিখতে বসিনি, শুধু আমার এই কাজের উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে উত্থাপন করার জন্যই ক্ষমা চেয়ে এই কথাগুলি লিখলাম। আমার অনুমান ভুল কি ঠিক তা সময়ই বলবে।

আমি শুধু চাই -

যদি কোন পাঠক এই বইটি Internet (ইন্টারনেট) থেকে নামিয়ে পড়েন এবং তিনি যদি সত্যই Adventure ভালবাসেন তবে এই বইটি পরবার পর ভাল না বলে পারবেন না। আর মন যখন চাইবে তখন মুল্যটা কোন বাধা হয়ে থাকবেনা, আর তখন পাঠক বইটি কিনে নিজের সংগ্রহে রাখতেই চাইবেন, তখনই আমার কস্ট সার্থক মনে করব, যদিও Adventure ছাড়াও আরও অনেক কিছুই শেখার, জানার আছে এই বইটিতে। আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তবে প্রকাশক অচিরেই অনুধাবন করবেন আমার যুক্তির সত্যাসত্য।

আমি এই বইটি Computer (কম্পিউটার) এর Scan (স্ক্যান) এর সাহায্য নিয়ে আমার নিজস্ব সময় বাচিয়ে মহান হতে চাইনি, পুরো বইটি নিজেই টাইপ করে দিয়েছি। এছাড়াও মূল বইতে উল্লেখিত

'শিলাচক্রার্থবোধিনী'

এবং

'মহর্ষি তণ্ডি কর্তৃক প্রকটিত শিব সহস্রনাম'

অংশ দুটি এই কম্পিউটার বইতে আবদ্ধ করলাম না। যদি কারও বিশেষভাবে ওই দুটি অংশের প্রয়জন হয় তবে 'তপোভূমি নর্মদা' বইটি সংগ্রহ করতেই হবে।

যদি অজান্তে কোন অন্যায় কাজ করে থাকি যেন মা নর্মদা আমাকে ক্ষমা করেন।

অকিঞ্চন

-আমি-

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

।। হর নর্মদে হর ।।

প্রথম পর্যায়

ঋষি সেবিত দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এখানকার ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিদের ধ্যানদৃষ্টিতেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছিল একটি পরম তত্ত্ব -- সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম -- অর্থাৎ যৎ যৎ বস্তু চোখে পড়ে তৎ তৎ বস্তু ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিকাশ।

কৃমি কীট হতে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ, পশুপাখী কীটপতঙ্গ এমনকি মানুষ, তিনি পাপিষ্ঠ বা পুণ্যাত্মা যাই হোন না কেন সকলের মধ্যে একই চিৎশক্তির খেলা চলছে। কাজেই ধ্যানী পুরুষের ধ্যানদৃষ্টিতে নদীর জলপ্রবাহের মধ্যেও একটা অতীন্দ্রীয় সত্ত্বা উদঘাটিত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তাই তো দেখি হিন্দু ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে এমন একজনও নেই যাঁকে একবার না একবার জীবনে উচ্চারণ করতে হয় --

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ।।

আপনারা প্রায় সকলেই জানেন, এইটি প্রসিদ্ধ জলশুদ্ধির মন্ত্র। যাঁরা পূজার্চনা 'তর্পণ ও হবনাদি ' করে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই আচমন ও আসনশুদ্ধির পর ঐ মন্ত্রে জলশুদ্ধি করতে হয়। গঙ্গা. যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা ও সিন্ধু -- এই সাতটি নদীকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে পবিত্রতম নদী বলে মান্য করা হয় এবং আমাদের প্রায় সকলেরই সংস্কার এবং বিশ্বাস যে, এই নদীদেরকে স্মরন করলেই এইসব নদীর আবির্ভাব ঘটে।

সরস্বতী নদী বর্তমানে অবলুপ্ত। সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলিকে আমি পবিত্র জ্ঞান করলেও তাদের অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা সম্বন্ধে আমি কোন পরীক্ষা করে দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গে শপথ করে বলতে পারি, গঙ্গার দিব্যসত্ত্বা আছ, নর্মদারও দিব্যসত্ত্বা আছে।

বাবা আমাকে বলেছিলেন - তুই বিশ্বাস কর গঙ্গাস্নানে পরম পূণ্য। গঙ্গার ভেতরে অনেক স্ফটিকশিলা, রত্নশিলা আছে, ভেষজগুণসম্পন্ন ও রোগঘ্ন অনেক লতাপাতা শিকড় গঙ্গার জলে মিশে আছে। ত্রিকুটী-কুম্ভক বলে একরকম কুম্ভক আছে। মহাযোগী যোগেশ্বররা সেই কুম্ভক করে গঙ্গার মধ্যে আছেন। এই উচ্চতম কোটির যোগপ্রণালী মহাযোগেশ্বররা ছাড়া কেউ জানেন না। তাঁদের সেই পবিত্র মহাচৈতন্যময় দেহের উপর দিয়ে গঙ্গার জলপ্রবাহ বয়ে এসেছে, তার ফলে গঙ্গাজলে পোকা হয় না।

আমরা হিন্দু ভারতবর্ষের লোকেরা মৃত্যুকালেও মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল দেই। গঙ্গা গোবিন্দ গায়ত্রী গীতা - এই হচ্ছে আমাদের শেষ সম্বল পারের কড়ি। নর্মদা সম্বন্ধেও একই কথা।

এখানে যাঁরা আমার মুখ থেকে সরাসরি কথা শুনছেন, তাঁরা মনে রেখে দেবেন যে,

পুণ্যতোয়া-নদ্যশ্চ দ্বিরূপং চ স্বভাবতঃ।
তয়োরূপঃ একস্তু দিব্যরূপা তথা পরে ।।

নদীর দুটি রূপ মানে এই যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্মদা প্রভৃতি নদীর একটি রূপ হচ্ছে তোয় অর্থাৎ জলরূপে প্রবাহরূপে বয়ে গেছে। এই রূপ আমরা সর্বদাই খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। এই স্থূলরূপেও তার মৃতসঞ্জিবনী ধারার পরিচয় পাই। জীবকুলকে বাচিয়ে রেখেছে এই জল, বিশাল বিশাল ভূখণ্ডকে সুফলা ও শস্যশ্যমলা করে সকলের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন অন্নদারূপে, এছাড়া আর একটি দিব্যরূপও আছে। ধ্যানে একমাত্র তা বোঝা যায়, ধরা যায়, দর্শন হয়। গঙ্গা বা নর্মদাকে যে 'মোক্ষদা' বলা হয়, এ ভক্তরা ভক্তির আতিশয্যে বাড়াবাড়ি করে বলে তা নয়। যাদের চোখে নর্মদার বা গঙ্গার দিব্যরূপ উদ্ভাসিত হয়নি তারাও বলে।

গঙ্গার সিদ্ধ বীজমন্ত্র আছে, ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র আছে। নর্মদারও সিদ্ধ বীজ ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্রাদি আছে। জলরূপে গঙ্গা ও নর্মদার একটি শরীর সত্ত্বা আর একটি পরাংগতি দিব্যসত্ত্বা।

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে ভগীরথ মর্তলোকে এনেছিলেন। গঙ্গাধর শিব তাঁকে জটায় ধারন করেছিলেন। এসব পুরাণের কথা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঋষিবাণী কি? যে কোন স্তব স্তোত্রের বইতে শংকরাচার্যকৃত গঙ্গাস্তোত্র পড়লে দেখবেন তিনি উচ্ছসিত স্তব করেছেন ত্রিভুবন তারিনি তরল তরঙ্গে। গঙ্গা শুধু নদী নয়, গঙ্গা আমাদের মা চিন্ময়ী পতিতপাবনী।

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞান গঙ্গা।

মহর্ষি বেদব্যাসের গঙ্গা সম্বন্ধে উপলব্ধিটি শুনুন -

বিধুতপাপাঃ যে মর্ত্যাঃ পরংজ্যোতিরূপিনীং।
সহস্রসূর্যপ্রতিমাং গঙ্গা পশ্যন্তি তে ভুবি॥

সংসারে যাঁরা নিষ্পাপ তাঁরা গঙ্গাকে সহস্র সূর্যতুল্য পরমজ্যোতিরূপে দর্শন করে থাকেন।

নর্মদা, গঙ্গার মত বিষ্ণুপদী নন, তিনি রুদ্রকন্যা, স্বয়ম্ভু মহাদেবের তেজ হতে তাঁর জন্ম। গঙ্গার অপার মহিমার কথা স্মরনে রেখেও মহর্ষি ভৃগু, কর্দম, কপিল, দুর্বাসা, অণীমাণ্ডব্য প্রভৃতি বৈদিক ঋষিরা ঘোষণা করেছেন-

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রতেজাৎ বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরানি চরানি চ॥

নর্মদা সমস্ত নদীকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; রুদ্রের তেজ হতে সমুৎপন্না; স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুতেই তিনি ত্রাণ করেন। সর্বসিদ্ধিমেবাপ্নোতি তস্যা তটপরিক্রমাৎ। শুদ্ধচিত্তে তাঁর তট পরিক্রমা করলে সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

খেয়াল রাখবেন গঙ্গা বা নর্মদা সম্বন্ধে ঐসব কথা যাঁরা ঘোষনা করে গেছেন, তাঁরা বর্তমান যুগের লুণ্ঠনানন্দ, রমণানন্দ, ঝোতারাম, রমনীশ বা বটকেষ্ট-মার্কা কোন অভিসন্ধিপরায়ন সাধু সন্ন্যাসী নন। তাঁরা প্রকৃত ঋষি, ঋষ্ ধাতু দর্শনে। দ্রষ্টা তাঁরা, ক্রান্তদর্শী সত্যসন্ধ জিতব্রত তপোসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর সবাই। তাঁরা কোনভাবেই অতিশয়োক্তি বা মিথ্যা ফলশ্রুতির বর্ণনা করেন নি। তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিলনা। তাঁদের আহারে বিহারে, চিন্তায় ভাবনায় ধ্যান-ধারনা বা মননে মিথ্যার কোন কালিমা ছিলনা। তাঁরা যা চোখে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাই বলে গেছেন। দ্রষ্টা বলেই তাঁদের উপলব্ধিজাত সত্যকে জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন,

সাধারণাম্ভসাপূর্ণাং সাধারনদীমিবঃ
পশ্যন্তি নাস্তিকা রেবাং পাপোপহৃতলোচনাঃ।

যাদের চোখ পাপক্লিষ্ট, সেই সমস্ত নাস্তিকই রেবা অর্থাৎ নর্মদাকে সাধারণ জলে পূর্ণ সাধারন নদী হিসেবে দেখে।

মহাভারতের বনপর্ব পড়লে দেখতে পাবেন, যুধিষ্ঠির যাচ্ছেন তীর্থভ্রমণে, মনে শান্তি নেই, কপট দ্যূতক্রীড়ায় তিনি তখন রাজ্যভ্রষ্ট। অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁদের কাল কাটছে। পুরহিত ধৌম্যমুনি তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন কর। মনের বিষাদযোগ কেটে যাবে, অচ্যুত বিশ্বাসের ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে, যাবতীয় সঙ্কটের অবসান ঘটবে। সহসা সেখানে আবির্ভূত হলেন পুলস্ত্য মুনি। যুধিষ্ঠিরের পরিব্রাজনের সংকল্প জেনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন - দেখ যুধিষ্ঠির, তুমি অন্যান্য তীর্থেতো যাবেই, বিশেষ করে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ নর্মদাকে অতি অবশ্যই দর্শন করে আসবে। নর্মদাতে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পুজা ও তর্পন করলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় -

নর্মদান্তু সমাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
তর্পয়িত্বা পিতৃণ দেবান্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

এখানে লক্ষ করুন, পুলস্ত্য মুনি বলেছেন, নর্মদা ত্রিলোকবিশ্রুতা। বেদব্যাস মহাভারত লিখেছেন অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তাহলে পাঁচ হাজার বছরের অধিককালে হতেই নর্মদার পাবনী শক্তির মহিমার কথা মুনি ঋষিরা জানতেন। বৈদিক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বহু ব্যয়সাধ্য; বেদজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ ক্রিয়াবান ছাড়া এই যজ্ঞের কেউ হোতা, ঋত্বিক বা আচার্য হতে পারেন না। স্বয়ং বেদব্যাস পুলস্ত্য মুনির মুখ দিয়ে জানাচ্ছেন যে দুশ্চর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, নর্মদাতটে পূজার্চনা করলেও সেই একই ফল।

প্রশ্ন - একটি বিশেষ নদীতে স্নান দান পূজার্চর্চা করলে বা তীর্থজ্ঞানে তার তীরে তীরে পরিব্রাজন করলে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, যুক্তিবাদী মন এতে সায় দেয় না। এ হচ্ছে যে যার সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা।

উত্তর - হ্যাঁ, সেদিন এক কবীরপন্থী সাধু এসে কবীর বাণী উদ্ধৃত করে শুনিয়েছেন বটে - 'তীর্থ মে শুধু পানি হ্যায়, উসমে হোবে নেহি কছু '। কিছু-না-মানার গোঁসাইদের মুখে ঐ কথাই তো মানায় ভাল। কেন না, কিছু মানতে গেলেই তো তাতে পরিশ্রম আছে। গৃহসুখ পরিত্যাগ করে রোদ জল ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাহাড় পর্বত নদীতীরে ঘুরে বেড়াতে কি আরামপ্রিয় মানুষের ভাল লাগে? অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা এবং বিশ্বপ্রকৃতির উদার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের অন্তরালে যে বহু বিচিত্র রহস্য লুকিয়ে আছে, তাকে জানার জন্য মানবমনের এই যে চিরন্তন কৌতূহল ও বিজিগীষা, তা যদি সংস্কার হয়, সেই সংস্কার সযত্নে লালন করাকে আমি শ্রেয় বলে মনে করি।

'যে যার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের' উত্তরে আমি আপনাদেরকে কবিগুরুর একটি কথা স্মরন করাতে চাই। তিনি বলেছেন - আমাদের ধর্মসাধনায় দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক - একটা রসের দিক। ঈশ্বর আছেন, এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটা অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে - আপনাকে সে কোন অবস্থায় নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় মনে করে না। (শান্তিনিকেতন)

আপনারা ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন যদি কোন একটি বিশ্বাস ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ সমস্যাকণ্টকিত এই চিরচঞ্চল জীবনে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, বলিষ্ঠ ও জীবন্ত আশ্বাসে যদি তার হৃদয়মন 'চরৈবেতি' মহামন্ত্রের প্রেরনায় নিরন্তর এগিয়ে চলার নির্দেশ পায় এবং তাতে যদি সে কৃতকৃত্য হয়েছে, এ কথাটি সমগ্র সত্বায় উপলব্ধি করতে পারে তবে এই 'বিশ্বাসে' আপত্তি কেন? 'বিশ্বাস' বলতে আপনারা বোধহয় ইংরাজীতে যাকে Traditional faith বলে তাই বুঝে বসে আছেন। Experience creates faith. যুগ যুগ ধরে শ্রেষ্ঠ তপস্বীবৃন্দ নর্মদাতটে তপশ্চরন করে যে প্রত্যভিজ্ঞা লাভ করেছেন, সেই প্রত্যভিজ্ঞাই প্রকৃত বিশ্বাস। বিশ্বাস শব্দটির অর্থও তাই। বি(বিগত হয়েছে) শ্বাস যখন। শ্বাস চাঞ্চল্যের প্রতীক। চাঞ্চল্যরহিত অবস্থা যোগদর্শনে যার নাম - লব্ধ ভূমিকত্ব তারই নাম বিশ্বাস।

এই কথাই বলেছিলেন বৈদিক ঋষি অণীমাণ্ডব্য। দীর্ঘকাল নর্মদাতটে তপস্যা করে তিনি তাঁর প্রত্যভিজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন -

সন্তি তীর্থন্যনেকানি পাপত্রাণকরাণি চ।
ন শক্তান্যধিকং ধাতুং কৃতেনঃ পরিশুদ্ধিতঃ ॥

- পাপত্রাণকারী অনেক তীর্থই আছে, কিন্তু সেগুলি পাপ হতে পরিশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল প্রদান করতে পারে না।

সাধয়েৎ মোহভিলযন্মোক্ষং কামানন্যান্ বিহায় চ।
সোহপি মোক্ষমেবাপ্নোতি নর্মদায়াঃ প্রসাদতঃ ॥

- কিন্তু কামনাবাসনা পরিত্যাগ করে নর্মদাতটে যে তপস্যা করে, নর্মদার প্রসাদে সে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করতে পারে।

আমি বাবাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, নর্মদাকে 'সরিতাং শ্রেষ্ঠা' বললে, প্রকারান্তরে গঙ্গার চেয়ে তাঁর মহিমা বেশী একথাই বলা হয়। কিসে বেশী? গঙ্গারই তো মহিমা অপার। স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁকে 'পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে' বলে বন্দনা করেছেন। মানুষের মৃত্যুকালে পবিত্র গঙ্গার জলই মুখে দেয়া হয়। মুমূর্ষুর মুখে কেউ তো নর্মদার জল দেয় না।

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন - কারন নর্মদার জল তো আমাদের কাছে সহজলভ্য নয়। হিমালয়ের দুর্গমস্থান গঙ্গোত্রী হতে গঙ্গার উৎপত্তি হলেও গঙ্গা সমগ্র উত্তরভারত এমনকি আমাদের বাংলাদেশের ভিতর দিয়েও বয়ে গেছে। তাই আমরা গঙ্গার জল মুখে দেই। নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক - বিন্ধ্যাপর্বতের একটি শৃঙ্গ। আটশ তের মাইল দীর্ঘ নর্মদা নদী অমরকন্টক হতে বেরিয়ে কাম্বে উপসাগরে সুরাটের কাছাকাছি বারোচ বা ভারোচ নামক স্থানে গিয়ে মিলিত হয়েছে। যাঁরা গঙ্গা থেকে দূরে আছেন অথচ নর্মদার কাছাকাছি তাঁরা নর্মদার জলই পরম পবিত্রজ্ঞানে মুমূর্ষুর মুখে দিয়ে থাকেন। শুধু গঙ্গা বা নর্মদার জল নয়, কৃষ্ণা কাবেরী যমুনা গোদাবরী, যাঁরা যে নদীর কাছে থাকেন, সেই নদীর পুণ্যজল মুখে দেয়াই শাস্ত্রবিধি। তুই বাবা বিশ্বাস কর, নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা, রুদ্রের তেজ হতে সমুৎপন্না, নর্মদা শিবের মানসকন্যা। গঙ্গায় যে নিত্য পাপীতাপী অনাচারী ব্যভিচারী লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে তাদের মত ক্লেদ, গ্লানি, কলঙ্ক তাতো গঙ্গা আত্মতেজে মুক্ত করে দেন; কিন্তু সেই গঙ্গাও মাঝে মাঝে বাঞ্ছা করেন নর্মদাতে স্নান করতে। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর।

আপনারা কেউ কি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী পড়েছেন? মহা তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি। তার জন্ম হয়েছিল চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া নামক গ্রামে। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল লোকনাথ ঘোষাল। গুরু ভাগবান গাঙ্গুলী উপনয়নের পরেই তাঁকে এবং বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায় নামক অপর এক ব্রাহ্মন বালককে সঙ্গে নিয়ে যান তপস্যার জন্য। পরে গুরু ভাগবান গাঙ্গুলী মৃত্যুর পূর্বে অশ্রুপুর্ণনেত্রে এই দুই বালকের ভার অর্পন করেন হিতলাল মিশ্রের ওপর। এই হিতলাল মিশ্রই জগত প্রসিদ্ধ ত্রৈলঙ্গস্বামী। হিমালয়ে তপস্যার পর বেণীমাধব হন উমানন্দ ভৈরব। আসমে কামাক্ষা মন্দিরের নিকটবর্তী উমাচল পাহাড় ছিল তাঁর সিদ্ধ তপস্থলী। আর লোকনাথ ঘোষাল, লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি শেষ সময়ে ঢাকার নিকটে বারদীতে থাকতেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তিনি বহুবার দাবানল ও অন্যান্য দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করেছিলেন বারদীতে বসেই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এঁর সম্বন্ধে বলতেন - হিমালয়ের নিচে এত বড় মহাযোগী কেউ নেই। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বয়স হয়েছিল একশো ষাট বৎসর।

তার দেহে বরফের আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই শৈবদেহে চোখের পলক পড়ত না। তিনি পূর্ব থেকেই নশ্বরদেহ ছেড়ে দেবার দিনক্ষন ও তিথি ঘোষনা করে বলেছিলেন - "আমার চোখের পলক পড়লেই তোরা বুঝবি আমি সূর্যমন্ডল ভেদ করে চলে গেছি"। তাঁর শিষ্যরা দেখেছিলেন, মহাপুরুষের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলেছিলেন, তিনি যখন নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন তখন দেখেছিলেন, একটি কৃষ্ণা গাভী সূর্যাস্তের পূর্বে নর্মদার একটি বিশেষ ঘাটে নেমে স্নান করে; তারপর সাদা হয়ে ফিরে যায়। এর রহস্য জানবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হন এবং বুঝতে পারেন ঐ কৃষ্ণা গাভী স্বয়ং গঙ্গামাতা।

আপনারা যাঁরা সর্বজ্ঞ খোকাখুকুর দল, তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী দয়া করে অনুধাবন করুন, শৈবদেহধারী মহাতপস্বী যোগেশ্বর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর ধ্যান মানে সেটা কি বস্তু। *

আর একজনের কথা বলছি - তাঁর নাম গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়। নামকরা ব্যারিষ্টার - প্রসারও খুব জমজমাট। তিনি একবার অমরকন্টক হতে চৌদ্দ মাইল দুরে পেন্ড্রা রোডের স্যানিটরিয়মে তাঁর এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন, ত্র্যম্বক বাবা নামে এক শক্তিধর সিদ্ধযোগীর পরিচালনায় হাজার হাজার সাধুর জমায়েৎ অমরকন্টক হতে নর্মদা পরিক্রমায় যাবার উদ্যোগ করছে। কতকটা মজা দেখার জন্য সাহেবী স্যুট পরা, মুখে বাঁকা করে ধরা টোব্যাকো পাইপধারী ব্যারিষ্টার গঙ্গাধর অমরকন্টকে পৌঁছে সাধুদের জমায়েৎ কৌতুকভরে দেখতে লাগলেন। নর্মদা মায়ী ও মহাদেবের পূজা করে যাত্রা করার পূর্বে নাঙ্গা সাধুর দল উদ্দাত কন্ঠে জয়ধ্বনি দিলেন - জয় নর্মদা মায়ীকি জয়। হর নর্মদে হর। সহসা গঙ্গাধরের মনে কোথা থেকে কী ঘটে গেল। নর্মদা মায়ীর দুর্বার টানে গঙ্গাধর সাহেব সাধুদের সঙ্গেই হাটতে লাগলেন। সাধুরা জখন নর্মদাতে স্নান করেন, তিনিও তখন স্নান করতে লাগলেন সাহেবি পোশাক পরেই। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পরিচ্ছদে ঘটল অদ্ভুত রূপান্তর।

*ব্রহ্মানন্দ ভারতী কৃত 'সিদ্ধ জীবনী' শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুরবাবু কর্তৃক প্রকাশিত একমাত্র প্রামান্য জীবনীগ্রন্থ।

হাতের টোবাকো পাউচ করেই 'দুত্তোর' বলে জলে বিসর্জন দিয়েছেন। গলায় বিলম্বিত নেকটাই কখন পড়েছে খসে। গায়ের দামী কোট জলস্রোতে পড়ে কোথায় ভেসে গিয়েছে - শতচ্ছিন্ন ট্রাউজার পরেই নর্মদার তটে তটে ঘুরে বেড়িয়েছেন গঙ্গাধর। ধনীর ঘরের দুলাল, আজন্ম ঐশ্বর্যের কোলে লালিত, তাঁর সারা জীবনেও সে ঐ পাদ-পরিক্রমার সমান পথ হাঁটেন নি। কিন্তু সমুদ্র সঙ্গম থেকে যখন ফিরে এলেন, তখন দেহে মনে দেখা গেল অপূর্ব ভাবের উদ্দীপনা! চোখে-মুখে খুশীর ভাব উছলে পড়ছে। উস্কোখুস্কো চুল, একগাল দাড়ি। পরণে একমাত্র সম্বল ট্রাউজার, তাও জলে পচে হয়েছে শতচ্ছিন্ন। একেবারে উলঙ্গ - দলাগলা অবস্থা। সাধুরা নাম দিলেন দিগম্বরজী। তাঁর গুরু ত্র্যম্বক বাবার মতে দিগম্বরজী দিব্য আনন্দলাভ করেছেন - জ্যায়সা আনন্দ গঙ্গাধরজীকো জীবনমে আ রহা, উহ্ কিসিকো মিলনা বড়া কঠিন হ্যায়। সব হমারা নর্মদা মায়ীকি কৃপা ঔর লীলা। পবিত্র ধারামেঁ আস্নান করতে করতে হি - মিল্ গিয়া দেবীকো কৃপা।

এইভাবেই নর্মদা পরিক্রমা করতে করতে জীব-জীবন হতে শিব্-জীবনে উত্তরন ঘটে, শুধু বারদীর ব্রহ্মচারী বা দিগম্বরজীর নয়, যুগযুগ ধরে সহস্র সহস্র পরিক্রমাকারীর জীবনে নর্মদা মায়ীর আশীর্বাদ এইভাবেই নেমে এসেছে। তাই মহর্ষি মার্কন্ডেয় ভৃগু কপিল দুর্বাসা থেকে আরম্ভ করে এ যুগের কমলভারতীজী, গৌরীশঙ্করজী প্রভৃতির দিব্যজীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা স্মরনে রেখেই শাস্ত্রকার-রা বলেছেন -

নর্মদায়াঃ জলং পীত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং
দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্যা তীর্থপ্রভাবতঃ॥

-অর্থাৎ, নর্মদার নিত্য জলপান, নিত্য স্নান এবং তাঁর তটে তটে যেসব শিবলিঙ্গ তাঁর অর্চনা করতে করতেই জীবের দুর্গতি নাশ হয়। মর্তজীবনেই অমর্তজীবনের সন্ধান মেলে।

নর্মদা - মধুনিস্যন্দিনী সংস্কৃত ভাষায় ঋষিদের অত্যন্ত তাৎপর্যময় এই শব্দটি মূর্তিমতী 'গায়ত্রী'র মতই ব্রাহ্মরা। নর্মন ধাতু হতে শব্দটি নিষ্পন্ন, নর্মন হচ্ছে নৃ ধাতুর উত্তর মন্ ও কর্তৃবাচ্যে। নর্ম মানে হচ্ছে ক্রিয়া, নর্ম মানে হচ্ছে খেলা, প্রিয়ত্ব বা বিহার। নর্ম - দা + ড = নর্মদা। নর্মন দদাতি অর্থাৎ আনন্দ-বিলাস যিনি দান করেন। ব্রহ্মের যে আনন্দ-বিলাস, জগৎ জুড়ে যে আনন্দের লীলা চলছে, উপনিষৎ যে বলছে - আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি - আনন্দ থেকে জাত, আনন্দের বুকেই সবাই আছে। অন্তে এই আনন্দেই সব লয় পাবে - আনন্দ ব্রহ্মের সেই অলৌকিক আনন্দ-বিলাস দেখবার বুঝবার এবং অনুভব করার ক্ষমতা যিনি দান করেন তিনিই নর্মদা।

আমি দুবার নর্মদা দর্শন করেছি, তার মধ্যে একবার ত শাস্ত্রীয় নিয়মেই পরিক্রমা করেছি। যেমন দেখেছি যেমন বুঝেছি পরিক্রমাকালে যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছে, সকল কথাই একে একে বলব।

সর্বপাপহরা নিত্যা সর্বদেব নমস্কৃতা।
সংস্তুতা দেবগন্ধর্বৈঃ ঋষিগণৈশ্চ সেবিতা॥

সর্বপাপহারিণী নর্মদাকে শুধু সকল দেবতা গন্ধর্ব এবং ঋষিগণই পূজা করেন না, দেবাদিদেব মহাদেবেরও তিনি পরম স্নেহের পাত্রী। নর্মদার উৎপত্তিস্থল অমরকন্টকের চূড়ায় একবার ধ্যানমগ্ন ছিলেন ধূর্জটি। সহসা মহাদেবের নীলকণ্ঠ হতে আবির্ভূত হলেন নর্মদা। নির্গতা হয়েই তিনি মহাদেবের দক্ষিণ চরণের উপরে দাঁড়িয়ে শিব তপস্যায় রত হলেন। এইভাবে কতকাল যে কেটে গেল তার কোন ইয়ত্তা নেই।

যথাকালে স্বয়ম্ভু ব্যুত্থিত হলেন তাঁর সমাধি হতে। দৃষ্টি উন্মীলন করেই তিনি দেখতে পেলেন এই অপরূপা কন্যাকে; মাথায় সুপিঙ্গল জটাভার। সারা অঙ্গকে ঘিরে বিকীর্ণ হচ্ছে উর্জ্জস্বল দীপ্তির ছটা। দিব্য লাবণ্য ও তপশ্চর্যাজনিত জ্যোতির বিচ্ছুরণে সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ অপূর্ব প্রভায় আলোকিত। বাম হস্তের সুডৌল কব্জিতে একটি কমণ্ডলু গলানো আছে। দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলিতে একটি অক্ষমালা দুলছে। ঠিক যেন একটি নিথর নিষ্কম্প উজ্জ্বল দীপশিখা।

কুমারীর ধ্যানভঙ্গ করে শিবসুন্দর জিজ্ঞাসা করলেন - কে তুমি মা? তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি - বরং বৃণীষভদ্রে ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। সেই মহাকন্যা উত্তর দিলেন - কি আর বর চাইব প্রভু! সমুদ্রমন্থনের গরল পান করে হে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর। আপনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন, আমার উদ্ভব সেই নীলকণ্ঠ হতে, কেবল প্রার্থনা করি আমি যেন ঠিক এই রকম চিরকাল আপনার সঙ্গে নিত্যযুক্তা হয়ে থাকতে পারি।

- তথাস্তু। নীলকন্ঠ হতে জাত বলে ক্ষোভ রেখো না বৎসে। তুমি আমার তপস্যার তেজ হতে উদ্ভূত হয়েছ। তুমি শুধু আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়েই থাকবে না, তুমি হবে মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কাং। একাধারে মোক্ষদাত্রী এবং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

বর দিয়েই মূহুর্তে অন্তর্হিত হলেন মহেশ্বর। সেই অমরকন্টক পর্বতে পুনরায় তপস্যায় বসলেন মহাকন্যা। দেবতাদের টনক নড়ল। তপস্যার পরীক্ষা আছে, মহাসিদ্ধি লাভের পূর্বক্ষনেও আছে অগ্নিপরীক্ষা। মহাদেব যেন পরীক্ষা করতে চাইলেন আত্মজা কন্যাকে। নতুবা মর্তমানুষের মত দেবতারা কেন কুমারীর অপরূপ সৌন্দর্যে চঞ্চল হবেন। পতঙ্গের মতন তাঁরা ছুটে এলেন নর্মদার কাছে। অনেক আবেদন নিবেদন করলেন মর্তচারিণী কান্তার কন্যাকে অনেক প্রলোভন দেখালেন স্বর্গের দেবতারা। কিন্তু কিছুতেই ঐ কন্যা টললেন না, বিচলিত হলেন না।

সহস্র প্রেম প্রার্থনা যখন বিফল হল, তখন দেবতারা স্থির করলেন শক্তির দ্বারা তাঁরা জয় করবেন কুমারীকে।

দেবতাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে চকিতে নদীরূপ ধারণ করে, গহণ কান্তারের মধ্য দিয়ে পর্বতগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চললেন কুমারী। শেষ পর্যন্ত দর্পচূর্ণ হল দেবতাদের, কুমারী শক্তির কাছে তাঁরা পরাজয় স্বীকার করলেন।

মহাদেব দর্শন দিয়ে বললেন - কন্যা বড়ই আনন্দলাভ করলাম তোমার কান্ড দেখে। আজ থেকে তুমি আমার আনন্দ - বিলাসের ক্ষেত্র হলে। তোমার নাম দিলাম নর্মদা। নর্ম-দা + ড। নর্ম অর্থাৎ পরিতৃপ্ত বিধায়িনী পরম সুখ ও আনন্দদায়িনী মহাকুমারী শক্তির প্রতীক তুমি।

- আরও বর দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি আমার জলময় রূপ হলে। হে শিবাত্মজে, তুমি জলময়ী শিবা, তোমার পুত্র হয়ে তোমার কোলে নিত্যকাল ধরে আমি বিরাজ করব -

গর্ভে তব বসিস্যামি পুত্রোভূত্বা শিবাত্মজে
মম ত্বম্ অপরামূর্ত্তিঃ খ্যাতা জলময়ী শিবা।

নর্মদার তপঃশক্তি ও দিব্য তেজ দেখে খুবই আনন্দলাভ করেছেন শিবশংকর। প্রাণঢালা আশীর্বাদ ও বর দিয়েও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। তিনি যেন কল্পতরু সেজেছেন আজ।

পুনরায় বললেন আমি আরও একটি বর দিচ্ছি। মহাতেজস্বিনী কন্যা, এই দেখ আমি এখন থেকেই তোমার কোলে, তোমার জলে চিন্ময়শক্তি সম্পন্ন শিবলিঙ্গরূপে চিরকাল ভেসে বেড়াব -

অপরং বরং দাস্যামি পশ্য দেবি মহৎতেজা।
লিঙ্গরূপেন সুচিরং প্লবয়ামি তব ক্রোড়ে ॥

শংকর প্রিয় মহাতীর্থ অমরকন্টক। অপর নাম মেকল বা ঋষ্য। নর্মদার উৎসস্থল। বিন্ধপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে নর্মদা পশ্চিমগামিনী হয়ে আরব সাগরে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত ভারোচ বা ব্রোচে গিয়ে মিলিত হয়েছে, এই স্থানের নাম ভৃগুকচ্ছ। নর্মদার উত্তরে বিন্ধপর্বত ও দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালা।

আটশ তের মাইল দীর্ঘ নর্মদার তিন চতুর্থাংশ মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের শাডোল, মান্দালা, নরসিংহপুর, হোসেঙ্গাবাদ, খান্ডোয়া খরগোন জেলা অতিক্রম করে নর্মদা গুজরাট প্রদেশে গিয়ে পৌচেছে। গুজরাটের ব্রোচ বা ভারোচই হচ্ছে নর্মদার সাগর সংগম। অমরকন্টক মধ্যপ্রদেশের শাডোল জেলার অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে শাডোল, দক্ষিন-পশ্চিমে মান্দালা, দক্ষিন-পূর্বে বিলাসপুর এই তিন জেলার মাঝামাঝি স্থানে অমরকন্টক। উত্তরে অনুপপুর পূর্বে পেন্ড্রা ও পশ্চিমে ডিনডোরী থেকে সরাসরি অমরকন্টক পৌছানো যায়।

বিলাসপুর - কাটনি রেলপথে দুটি কাছাকাছি স্টেশন অনুপপুর ও পেন্ড্রা রোড, এখান থেকেই অমরকন্টকের দুরত্ব কম হবার কারনে অধিকাংশ যাত্রী পেন্ড্রা থেকেই রওনা হত।

অমরকণ্টক পর্বতের চারদিকেই পাহাড় আর ঘনঘোর অরণ্যানি। সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াত হিংস্র শ্বাপদ। পাকদণ্ডী বেয়ে ঘন কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল ভেদ করে এই অগম্য মহাতীর্থে প্রাণ হাতে নিয়ে তীর্থযাত্রীদেরকে যেতে হত।

পথে খাদ্য মিলত না, জল মিলত না। ক্বচিৎ মিলত বনবাসীর আস্তানা, তপস্বীর পর্ণকুটির। নিবিড় জঙ্গলে দিনের বেলাতেও আলো ঢুকতো কদাচিৎ। সেই আবছা আলো আঁধারীর মধ্যে বন্যজন্তুরা ঘুরে বেড়াত যত্র তত্র। মানুষ দেখলেই তারা নিঃশঙ্ক উৎসাহে থাবা বাড়াত।

মানুষ ছিল কিছু কিছু, তারা বন্য আদিবাসী, কোল ভীল মুণ্ডা ও গোঁড় প্রভৃতি উপজাতির লোকজন, যুগ যুগ ধরে তারা ছিল সভ্যতার বাইরে, সভ্য মানুষও তাদের ভুলে ছিল। আদিম উলঙ্গতা ছিল তাদের ভূষন, জান্তব নখ-দংষ্ট্রার অভাবে তাদের হাতে থাকত আদিম তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সেই অস্ত্রে তারা আত্মরক্ষা করত, পশু শিকার করত - পশুদের পাশাপাশি আরণ্যক জীবনে তারাও ছিল অভ্যস্ত।

এই পার্বত্যভূমির বন্ধুরতা, গ্রীষ্মকালে উগ্র গরম, শীতকালে হিমশীতল শৈত্য, ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্যের তমসা, ততোধিক ভয়ঙ্কর শ্বাপদগোষ্ঠী এবং দুর্দান্ত অরণ্যবাসীদের উপদ্রব সহ্য করে কয়জন তীর্থযাত্রী যেতে সাহস করতে পারতেন অমরকণ্টকে ? কয়জনের ভাগ্যেই বা জুটত নর্মদেশ্বর এবং তৎকন্যা নর্মদার দর্শন লাভ ? যাঁদের হ'ত, ভয়ঙ্করের প্রসাদে পদে পদে বরাভয় লাভ করে তাঁদের ইশ্বর বিশ্বাসটি পাকা হয়ে যেত।

তাও এত প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও নর্মদা তীর্থদর্শনে যাত্রীর অভাব কোনদিন ঘটেনি। মহর্ষি ভৃগু দুর্বাসা মার্কণ্ডেয় থেকে আরম্ভ করে সাধারন পুণ্যার্থি বা মহাসাধকরা বারবার ছুটে গেছেন অমরকণ্টকে, নর্মদার তটে তটে তপস্যা করে হয়েছেন সিদ্ধকাম। পৃথিবীতে যত মধুগন্ধবহ ফুল ফোটে তাদের অধিকার আছে হেলেদুলে এ-মুখো হবার ও-মুখো হবার। শুধু এই অধিকার নেই সূর্যমুখীর, কি সূর্যোদয়ে কিংবা সূর্যাস্তে। কারণ সূর্যমুখী কেবল সেই, যে সূর্যোন্মুখ ! কাজেই মনে প্রাণে যাঁরা শিবোন্মুখ, তাঁরা প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে এই প্রত্যক্ষ শিবতীর্থে বারবার ছুটে গিয়েছেন, এখনও যান।

তাঁরা নিজেরা পান করেছেন গরল, কিন্তু অন্তর তাঁদের সুধায় ভরে গেছে। সেই সুধা তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছেন বসুধাকে। পরম আরাধ্য দেবাদিদেব মহেশ্বর যিনি অমৃত বিলান কিন্তু নিজে পান করেছেন মহা কালকূট বিষ, হয়েছেন নীলকণ্ঠ। সেই নীলকণ্ঠ হতে উদ্ভূত হলেন যে মোক্ষদাত্রী নর্মদা, তাঁকে তিনি অমৃতময়ী করে দিলেন। তাঁর ঘরণী অন্নপূর্ণা, কিন্তু নিজে তিনি ভিক্ষা করে ফেরেন দ্বারে দ্বারে, জীবের ঘাটে ঘাটে। যিনি চোখের পলকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ত্রিভুবনে প্রলয় ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন, তিনি নিজে বাস করেন শ্মশানে। যাঁর কণ্ঠে স্বয়ং উমা দিয়েছেন বরমাল্য, তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে কালসর্প - কঠিনে-কোমলে, ভীষণে-মধুরে অলৌকিক রহস্যের ঘণীভূত বিগ্রহ এই শিবসুন্দরের প্রত্যক্ষ তীর্থ নর্মদা, এই তীর্থে না গেলে তাঁর মহিমা বোঝা যায়না।

নর্মদার উভয় তটে, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের কোলে শত শত জাগ্রত শিবতীর্থ আছে। সারা ভারতবর্ষই শিবময়, তার মধ্যে নর্মদা হলেন জীবন্ত শংকর ভাষ্য - যে ভাষ্যের প্রথম অধ্যায় অমরকণ্টকে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছে বিমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গে; নদীর বলয় যেখানে, সাগর-সংগমে।

ঐ মহাতীর্থ দর্শনে বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে। ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ সকাল আটটায় আমি বিলাসপুর হয়ে পেণ্ড্রা রোড এ পৌছই। ট্রেন থেকে নেমেই আমি পেণ্ড্রা রোডের বাজারে নর্মদাতে সমর্পণের জন্য নারকেল এবং আরতির জন্য কর্পূর কিনতে যাই। দেখলাম আর একজন সাধুও নারকেল কিনছেন।

আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, আপ অমরকণ্টক যাওগে ?

বললাম - জী হাঁ। আপকা শুভনাম ক্যা হ্যায় ?

- ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, হমারা গুরুনে নাম দিয়া সুমেরদাস। ম্যয়ভি অমরকণ্টক যাউঙ্গা। ঔর ভি কয়দফে ঘুম চুকা। চলিয়ে হম্ আপকো সাথ মেঁ লে যাউঙ্গা। বঙ্গালকা বোলি হম্ সমঝাতে হৈ - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু.........

- যাওয়ার উপায় কি আছে ? চরণযুগলকে আশ্রয় করেই যেতে হবে, না আর কোন ব্যবস্থা আছে ?

তিনি বললেন - এখনও কোন পাকা রাস্তা হয়নি, বাস নিয়মিত হয়নি। তবে ঐযে পাশের মহল্লা দেখছেন, নাম গৌরেলা - ঐখান থেকে কেঁওচি পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল রাস্তা মোটর যাবার উপযোগী, এবরো খেবরো পাথর কেটে একটা রাস্তা হয়েছে। শিবরাত্রির মেলার সময় দেখে এসেছি কনট্রাকটরের মজুররা দ্রুত কাজ করছে যাতে বাকি চৌদ্দ মাইল রাস্তাও অগামী দশেরার মেলার সময় শেষ হয়ে যায়। হয়তো এতদিনে হয়ে গেছে। একটু তত্ত্বতালাস করে দেখি কোন বাস ধরতে পারি কিনা। মাত্র দুটি বাস যাতায়াত করে তাও যাত্রী ভর্তি হলে তবেই। তবে যাতায়াতের কোন বাঁধাধরা সময় নেই। বাস ভর্তি হলে যাবে নতুবা যাবেনা।

- আর যদি বাস না পান ?
- ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, তব্ তো ইধারই রহনা পড়েগা। কাল জরুর মিল্ জাবেগা।
আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম হেঁটে যাবার জন্য।
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - হাঁটা পথে কি এমন কোন রাস্তা নেই, যাতে তারাতারি অমরকন্টকে পৌছানো যায় ? - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, ভোটেঙ্গা হোকর যানেসে সিরফ্ চৌদা মিল রাস্তা পড়েগা, লেকিন ভোটেঙ্গাকা জঙ্গলমেঁ চুরৈল হ্যায়, ভূত হ্যায়, উহলোগ সামকা বখত বাশিঁ ফুকারতা হ্যায়।
লোকটা বলে কি ভূত পেত্নি বাশি বাজায়, একথা শুনে আমার তীব্র কৌতুহল জন্মাল। ষ্টেশনের ধারেই একটা বড় পুষ্করিণী, কাকচক্ষু জল। সেখানেই স্নান আহারাদি সেরে বেলা ১১ টার সময় যাত্রা করলাম শিব ও নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে। সুমেরদাসজী পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।
রাস্তা কাচা, এবড়ো খেবড়ো, দুপাশে কুশের জঙ্গল। লম্বা লম্বা কুশ গাছে গা-হাত কেটে যেতে লাগল, মাঝে মাঝে হোঁচট্ খাচ্ছি। সংকীর্ণ পথ ভয়ানক উঁচু-নীচু, অনবরত চরাই উৎরাই। আধমাইলটাক যাবার পর রাস্তার ওপর অনেকগুলো কবর। সেখান থেকে কবীর চবুতরা, সুমেরদাসজীর ভাষায় 'কবীর চৌৎরা' যাবার রাস্তা। দুটি গরুর গাড়ির দেখা পেলাম, সেগুলি আমাদের অঞ্চলের গরুর গাড়ির মতন নয়, যথেষ্ট মজবুত করে তৈরি। পাহাড়ী পথে উঠবার ও নামবার উপযুক্ত। শুনলাম ঐ গাড়ি নাকি জঙ্গল থেকে বার্ড কোম্পানির কাঠ বয়ে আনছে। আর একটি দেখলাম সম্বর হরিণের শিং বোঝাই করে চলেছে। পথে তিন চারটি ঝরণাও অতিক্রম করলাম। জল বেশী না থাকায় সহজেই পার হতে পারলাম। ঝরণার কাছে পথের ওপর চতুর্দিকে বাঘের পদচিহ্ন, পথের দুধারে ঝরণার কাছাকাছি অনেক শিকারী বীরগণের মাচান চোখে পড়ল। সুমেরদাসজীর কাছে শুনলাম, 'আংরেজ লোগ' শিকার করতে এসে বাঘের আক্রমনে প্রাণ দিয়েছেন, মাচার ওপর হয়ত বন্দুক তাগ করে তারা শিকারের আশায় বসে আছেন, পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘই তাদের শিকার করে নিয়ে গেছে।

নীল মেঘের মধ্যে দুরের পর্বতশ্রেণী অপূর্ব দৃশ্য রচনা করেছে। পথ চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি, দু-পাশে লাল ও সাজা গাছের বন, মধ্যে মধ্যে আমলকী, ভেলা, লেবু প্রভৃতি নানা জাতের গাছ। গাছগুলি ছবির মতন সাজানো গোড়াগুলি এমন পরিষ্কার যে মনে হয় আজই কেউ যেন পরিস্কার করে রেখে গেছে। অথচ দীর্ঘকাল হয়ত এপথে কোন পথিকই আসেনি।

মাঝে মাঝে কুল ঝোপ, নাম না জানা রকমারি বনফুল ফুটে আছে, আমলকীর ডালগুলি ফলভারে নত হয়ে রাস্তার দুধারে নুয়ে পড়েছে।

কুপথ্যং বদরী ফলং, আমলকী রসায়নং - এই বচনটি বলে সুমেরদাসজী কতকগুলি আমলকী সংগ্রহ করে নিজের ঝোলায় রাখলেন। এই সময় সামান্য শব্দে একটি চিতল হরিণকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখলাম।

প্রায় ছয় মাইল এভাবে চরাই উৎরাই করে পৌছলাম পাকরিয়া গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখলাম ব্যাঘ্র দেবতার মাটির মূর্তি, সুমেরদাসজী বললেন গ্রামের লোকেরা এই দেবতার মূর্তির গায়ে কেরোসিন ঢেলে পূজা করে; যেমন দেবতা তেমনই তার পূজার উপকরণ। গ্রামে যে দু-পাঁচ ঘর পাহাড়িয়া লোকের বাস, তাদের বলিষ্ঠ নিটোল স্বাস্থ্য চেয়ে দেখবার মত। যেন কষ্টিপাথরে খোদাই কোন নামকরা কারিগরের সৃষ্টি। এমনই জলবায়ুর গুণ তাদের গরু গুলিও চেয়ে দেখবার মতন। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোথাও সরিষার ক্ষেতও চোখে পড়ল। এছাড়াও অমরকন্টক যাত্রীদের জন্য কয়েকটি চালাঘরও দেখা গেল, তার না আছে দেয়াল, না আছে দরজা। ব্যাঘ্র দেবতার কৃপাদৃষ্টি পড়লে পছন্দমত যে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার উপায় নেই। এছাড়াও এখানে একটি সরকারি গোসালা আছে, দুধ-ঘি প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় এবং তা অত্যন্ত সস্তা।

রেওয়া-রাজের ডাকবাংলোতে কিছুক্ষন বিশ্রাম করে আবার হাঁটতে সুরু করলাম। সমতলভূমির উপর জঙ্গল পথে হাঁটতে হাঁটতে চড়াই শুরু হল। এইভাবে পেনড্রা থেকে প্রায় সাড়ে ছয় মাইল পথ আসার পর চড়াই এর পথে এমন এক স্থানে এসে পৌছলাম যেখান থেকে নিচের দিকে দৃষ্টি দিতেই পেনড্রা রোড শহরটিকে ছবির মতন দেখা গেল। আর মাইল খানেক উঠে যেতেই বনের আড়ালে পেনড্রা শহর অদৃশ্য হয়ে গেল।

উৎরাই-এর পথে কিছুক্ষন হাঁটার পর সুমেরদাসজীকে দেখলাম বিড়বিড় করে রাম-রাম, শিব-শিব, রেবা-রেবা জপ করতে লাগলেন। আমি তাকাতেই বললেন - সামনেই ভোটেঙ্গার জঙ্গল, বহুত বড়া জঙ্গল হ্যায় লেকিন করীব তিন মিল্ যানেকা বাদ্ হমারা এক চেলা উহ্ গোঁড় হৈ। জঙ্গলকো কিনারে মেঁ উনকা কোঠি, রাতমে উধার হি ঠারেগা।

অধীর আগ্রহে ভূত-পেত্নীর বাঁশীর ডাক শোনার জন্য হাঁটতে থাকলাম সন্তর্পণে, উৎকর্ণ হয়ে। সামনে দেখতে পেলাম একটি ভালুক তার তিনটি বাচ্চাকে আগে নিয়ে দৌড়ে গেল। নিতান্ত বাচ্চাগুলি সঙ্গে আছে, তাই বুঝি আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না, নতুবা কি যে ঘটত বলা যায় না।

আপনারা কেউ কি ভালুকের বাচ্চা দেখেছেন ? মনে হ'ল সাদা লোমের তিনটি ফুটবল গুড়গুড় করে যেন গড়িয়ে চলে গেল।

বিকেল পাঁচটা - তখনও সূর্যাস্ত হয় নি, কিন্তু পাহাড় ও বড় বড় গাছের ছায়া পড়ে আমাদের পথ প্রায় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আবছা আলো-আঁধারীর মধ্যে আমরা দুটি মানুষ যেন এ লোকের বাসিন্দা নয়, যেন কোন গ্রহান্তরের মানুষ। সহসা কানে এল বাঁশীর শব্দ। একটা অলৌকিক সুর বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। পথ চলছি মনে হচ্ছে বাঁশীটা যেন আমার ঠিক্ পেছনেই বাজছে। দৌড়াতে আরম্ভ করতেই মনে হ'ল, বাঁশী যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে বাঁশীটা কানের কাছে বাজছে, আবার কখনও বা মনে হচ্ছে বাঁশীর শব্দটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

ঝাউ গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়, এই বাশীর শব্দ কিন্তু সে রকম নয়, ঠিক বাঁশীর সুর। অথচ এ বনে কোন ঝাউ গাছ নেই। শাল, সাজা, বহেড়া, আমলকী, হরিতকী এবং লম্বা লম্বা প্রায় দু-তিন মানুষ উঁচু জঙ্গল এইটি। এই বাঁশির শব্দ শুনে অনেকে মূর্চ্ছা যায়। আমার সাথী সুমেরদাসজী-ই ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। কেবলই নাম জপ করে যাচ্ছেন।

আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, পেনড্রা রোডের সাহেবই হোন আর নর্মদাতটের সাধুই হোন, অনেকেই এই শব্দ শুনেছেন, কিন্তু এর কার্যকারণ রহস্যের উপর কেউ কোন আলোকপাত করতে পারেন নি। একজন মহাত্মা বলেছিলেন, ঐ জঙ্গলে হয়ত কেউ মহানাদসিদ্ধ মহাজন ছিলেন, তিনি অপ্রকট হয়েছেন, তাঁর সাধনার প্রকটিত নাদ এখনও জাগ্রত রয়েছে। মহাত্মার এই ব্যাখ্যাকে আমার যথোপযুক্ত বলে মনে হয় নি। কারণ সাধকদের কাছে যখন নাদ প্রকট হয় তখন তিনি এই দিব্যশব্দ অন্তঃকর্ণে শুনতে পান। সাধনালব্ধ ধন যাঁর কাছে প্রকট হয়, তাঁর দেহ চলে গেলেই এই নাদও দিব্য আকাশে লয় পায় - এটা কোনমতেই বাহ্যিক বস্তু নয় যে, যেখানে সাধক ছিলেন সেই স্থানের মাটিতে গাছপালায় বা জল আকাশের পরিসীমায় নাদ আবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে।

আপনারা ত সব 'পরখপয়ছানওয়ালা' লোক, কত বিজ্ঞান পড়েছেন, যুক্তিতর্কের কসরৎ শিখে কতই ত বিচক্ষন - যান না একবার ভোটেঙ্গার জঙ্গলে। বেশী দূর তো নয়, বিলাসপুর - কাটনি রেলপথে চড়ে পেনড্রা রোডে নেমে সাড়ে দশ মাইল গেলেই ভোটেঙ্গা! এখন তো শুনেছি, অমরকন্টকের পাদদেশ পর্যন্ত বাস চলে, ট্যাক্সি চলে, নর্মদার কাছাকাছি অনেক শহরও গড়ে উঠেছে, কত নাকি রেষ্ট হাউস, টুরিষ্ট লজ্ হোটেলও হয়েছে। আপনারা কেউ যাবেন সেখানে ? গেলে আপনাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই এর গোপন রহস্য ধরা পড়ে যাবে। তখন আমাকে এসে জানাবেন।

যাইহোক, ঐ রহস্যময় শব্দ শুনতে শুনতে এক মাইল যাবার পরেই সুমেরদাসজী বাঁ দিকে বাঁক নিলেন, জঙ্গল পড়ে রইল ডান দিকে। মিনিট কুড়ি হাঁটবার পরেই এক কুটির-দ্বারে এসে হাঁক পাড়লেন - ঝগড়ু-এ ঝগড়ু। ঝগড়ু দরজা খুলে আমাদেরকে একটি কুশ ও পাতা দিয়ে তৈরি ছোট কুঁড়ে ঘরে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিল। আহারের জন্য দিল দু-তিন রকমের সুমিষ্ট ফল ও দুধ।

খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম শব্দ রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। সকালে প্রাতঃকৃত্য এবং ঝরণার জলে স্নান সেরে আবার অমরকন্টকের পথে যাত্রা করলাম। পনের কুড়ি মিনিট হাটার পরেই পেলাম আমনালা বা অমরনালা। নালা বলতে একটি ঝরণা বয়ে চলেছে। সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, ইয়ে হ্যায় অমরনালা, মুরখ্ আদমী কহতা হ্যায় - আমনালা। অসুরোঁকো সাথ্ দেওতালোগকো কাফি লড়াই হুয়া থা, সত্যযুগমে। অমরাণাং কটঃ - হাজারো দেওতাকো দেহ্ খতম্ হো চুকা। কট কা মতলব দেহ্। উসমে যো খুন নিকলা, উসসে ইয়েহ্ নালা পয়দা হো গয়া। আভি দেখতে হ্যায় ঝরণা কা পানি - ক্যা দৈবী মায়া। অমরাণাং কটসে হি অমরকন্টক নাম ভি নিকলা।

আমি বললাম - মহাকবি কালিদাস এই পর্বতশৃঙ্গকে আম্রকূট বলে উল্লেখ করেছেন, আম্রকূট থেকেই নাম হয়েছে অমরকন্টক।

গর্জে উঠলেন সুমেরদাসজী - আরে কবিলোগ্ ক্যা বাতায়েগা? হম্ যো কহা, ওহি সাচ্চা বাত। ওহি কহানী মার্কণ্ডেয় মুনিজীনে কহা মার্কণ্ডেয় পুরাণমে। স্কন্দপুরাণমে ভি এহি জিকর আয়া। হুঁসিয়ার, এ সমুচা খাড়াই হ্যায়, ঠিকসে চলিয়ে।

তথাস্তু। পথপ্রদর্শকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, একটি পাকদন্ডি অতিক্রম করতেই সুবিশাল বিন্ধ্য পর্বতমালার অমরকন্টক শৃঙ্গ দেখা গেল। এতক্ষন রোদে ঝলমল করছিল চারদিক, সহসা দেখলাম কোথা থেকে একখন্ড মেঘ ভেসে এল, মনে পড়ল 'আষাঢ়স্য প্রথমঃ দিবসঃ' ক্রমেই এগিয়ে আসছে। একখন্ড জলভারে নত মেঘ অমরকন্টকের চুড়ায় নীলাভ পাহাড়ের বুকে যেন জমাট বেঁধেছে। পর্বত ছেড়ে বাইরের আকাশে সূর্যরশ্মি, নীল ও সাদা মেঘ ভেদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বাইরের আকাশকে পাণ্ডর দেখাচ্ছে। মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য মেঘদূতম্ এর শ্লোক মনে পড়ে গেল -

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মুদ্ধনা,
বক্ষত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।

অলকাপুরী হতে নির্বাসিত যক্ষ পত্নীবিরহে কাতর হয়ে মেঘকে পত্নীর খবর দিতে অনুরোধ করছেন। বলছেন - -হে মেঘ, তুমি পথে যেতে যেতে পথশ্রান্ত হলে আম্রকূট পর্বতে বিশ্রাম নেবে। সে তোমাকে সাদরে মস্তকে ধারন করবে।

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ -
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেনীসবর্ণে।
নুনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষনীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডু॥

বিরহী যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করে আরও বলছেন - তোমার বর্ণ সুস্নিগ্ধ বেণীর ন্যায় শ্যামল, পথে যেতে যেতে দেখতে পাবে, আম্রকূট পর্বতের উপান্তভাগ পরিপক্ক ফুলে-ফলে শোভিত, চারিদিকেই তার আম্রকানন। যখন পর্বতের মধ্যভাগে আরোহণ করবে, তখন দেখতে পাবে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। পর্বতের মধ্যভাগে শ্যামল এবং অবশিষ্ট অংশকে পাণ্ডুবর্ণ দেখাবে, মনে হবে যেন পর্বতের ঐ অংশটি ধরিত্রী মাতার স্তনের রূপ ধারণ করেছে।

ক্রান্তদর্শী মহাকবি কোন ভুল বলেন নি, সামনের অপরূপ দৃশ্য দেখলে মনে হয়, পূর্বকালের আম্রকূটই অপভ্রাংশে লোকমুখে অমরকন্টক নামে পরিচিত হয়েছে।

বাবা আমাকে অমরকন্টকের আরও অর্থ বলেছিলেন - অমরস্য মহামৃত্যুঞ্জয়স্য শিবস্য কণ্ঠাৎ নির্গতা হয়েছিলেন নর্মদা যেখানে, সেই জন্য ঐ স্থানের নাম অমরকণ্ঠক - অপভ্রাংশে অমরকন্টক। কিংবা পানিপথের যুদ্ধে আমরা যেমন বিদেশী শক্তির কাছে বার বার হেরে গেছি, আমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছিল, তেমনি ঐখানে বারবার দেবতারা দৈত্যদের কাছে পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে স্থানটি কণ্টকস্বরূপ- -অমরানাং কন্টকঃ - এইজন্য ঐ পর্বতশৃঙ্গের নাম অমরকন্টক।

অমরনালার কাছে কয়েকটি সাধু সন্ন্যাসীর কুটির দেখলাম। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। সুমেরদাসজী একটি কন্দমূল সংগ্রহ করে দিলেন। কন্দমূল খেলে ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকেনা। অথচ শরীর ভাল থাকে। পাহাড় ও অরণ্যপথে এই কন্দমূলই পরিব্রাজক তপস্বীর প্রাণরক্ষা করে।

পেনড্রা রোড থেকে প্রায় সাড়ে বার মাইল রাস্তা অতিক্রম করা হয়ে গেল। অমরকন্টক আর মাত্র দেড় মাইল। কিন্তু সামনের এক মাইল খাড়া চড়াই; আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডী অতিক্রম করে পাহাড়ের গায়ে গায়ে চড়াই শুরু হল। কোথাও অতলস্পর্শী খাদও দেখলাম। উৎরাই - এর পথ শুরু হতেই দেখতে পেলাম অমরকন্টকের মন্দির। কিছুদূর পর্যন্ত মালভূমি অতিক্রম করার পর ইপ্সিত স্থান অমরকন্টকে পৌছে গেলাম। তখন সকাল আটটা। পথ চলতে চলতেই সুমেরদাসজী জানিয়েছিলেন, অমরকন্টকে সাধু সন্ন্যাসী পাণ্ডা ছাড়া রাজপুত, ব্রাহ্মন, গোয়ালা, গৌড় প্রভৃতি নিয়ে প্রায় দুইশত ঘরের বসতি আছে। দুধ, ঘি প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়।

পথে আসতে আসতেই অমরকন্টকের বাসিন্দাদের বাড়ীঘর দেখতে পারছিলাম। সুমেরদাসজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে অহল্যাবাঈ ধর্মশালাতে গিয়ে উঠলেন। পাথরের দেওয়াল, এখানকার দারোয়ান সুমেরদাসজীকে খুব শ্রদ্ধা করে দেখলাম। একখানা বড় ঘর দখল করে আমাদের জিনিষপত্র রেখে মন্দিরের শ্বেতশুভ্র তোরণদ্বারে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানালাম আমার ঋষি পিতা, মহেশ্বর ও মাতা নর্মদার উদ্দেশ্যে।

বিশাল তোরণ - তোরণের মাথায় চূড়ার সারি, তোরণ পেরিয়েই বিশাল চত্বর। চত্বরের মাঝখানে একাদশ কোণবিশিষ্ট এক কুণ্ড, তার পরিধি ২৬০ হাত, আট-দশ হাত গভীর স্থির কাকচক্ষু জল, এত স্বচ্ছ যে তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই হল পরম পবিত্র নর্মদা কুণ্ড - যেখানে উদ্ভূত হয়েছেন শঙ্করের তেজসম্ভূতা নর্মদা, যার বাহ্যরূপ এই জল। শাস্ত্রানুসারে এই জলাধারকে বিশা যন্ত্র বলা হয়। মহাত্মাদের তত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই বিশা যন্ত্র মহাসিদ্ধির আধার। এই কুণ্ডের অভ্যন্তর থেকেই নর্মদা নদীরূপে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। কুণ্ডের পশ্চিমদিকে জল নিঃসরণের একটি নালা। এরই নাম গোমুখ। ছয় সাত হাত লম্বা এই গোমুখ দিয়ে নর্মদা আর একটি ছোট কুণ্ডে ঝরে পড়ছে। এরই নাম কোটিতীর্থ। মহাদেবের পরীক্ষা লীলায় বিভ্রান্ত কামমোহিত দেবতারা নর্মদা মাতার কাছে পরাজিত হয়ে এইখানে বসে নর্মদা-বন্দনা করেছিলেন। এই জল তীর্থযাত্রী ও পরিক্রমাকারী সাধুদের কাছে পরম পবিত্র। যে সমস্ত তপস্বী নর্মদার উত্তরতট হতে পরিক্রমা শুরু করেন, তাঁদেরকে এই কোটিতীর্থের জলে সংকল্প করতে হয়, কারণ পরিক্রমাকারীরা উত্তরতট হতে নর্মদা কুণ্ডে বা মন্দিরে যেতে পান না। শাস্ত্রের এই নিয়ম।

কোটিতীর্থের পাশে আরও দুটি কুণ্ড আছে - গায়ত্রী এবং সাবিত্রী কুণ্ড। একটি ছোট নদী 'উদগম' মন্দিরের উত্তর - পূর্ব কোণ হতে বয়ে এসে মন্দিরের পূর্ব ধার হয়ে নর্মদায় মিলিত হয়েছে, এর নাম সাবিত্রী। আর একটি জলের ধারাও মন্দিরের উত্তরদিকে বেষ্টন করে মন্দিরের পশ্চিমধার দিয়ে এসে নর্মদার ধারার সঙ্গে মিলিতা। এই তিনের মিলিত ধারাকে ত্রিকুটী বলা হয়। ত্রিকুটী যন্ত্র। এই তিন পবিত্রধারার সঙ্গমকে ত্রিকুটী যন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। কোটিতীর্থ হতে নর্মদা মাটির নীচে ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে গিয়ে পুনরায় প্রকটিত। এখান হতেই নর্মদা পশ্চিমগামিনী। বিন্ধ্যপর্বত এবং দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পাহাড় কন্দর ভেদ করে নর্মদা ভীমবেগে বয়ে চলেছেন, যার শেষ আরব সাগরে।

নর্মদাকুণ্ডের প্রস্তরমণ্ডিত চত্বরের চারিদিকে ষোলটি মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দির পাথরের, দেওয়ালগুলি শ্বেতশুভ্র, প্রত্যেকটিই উচ্চচূড়া বিশিষ্ট, আয়তনের তুলনায় মন্দিরগুলির উচ্চতা অনেক বেশী। এই ষোলটি মন্দিরের দেবতা ছাড়াও আর সাতটি ছোট ছোট মূর্ত্তি আছে - মোট তেইশটি মূর্ত্তি। কুণ্ডের মধ্যে উত্তরদিকে ঘেঁষে অমরকণ্ঠেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে জলের নিচে বিরাজ করছেন নর্মদেশ্বর মহাদেব, কন্যা নর্মদা তাঁর ডান পায়ের উপর কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা। উত্তরতীরে আরও দুটি মন্দির আছে। পাশাপাশি দুই মন্দির, মুখোমুখি তাদের প্রবেশদ্বার। মাঝখানে একটি সভামণ্ডপ। সভামণ্ডপের দক্ষিনদিকের প্রবেশপথে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে, 'হর নর্মদে', উত্তরদিকের প্রবেশপথে লেখা আছে 'জয় মা নর্মদে'। পূর্বমুখী মন্দিরটিতে নর্মদা মাতা সমাসীনা। কালো কষ্টিপাথরের মূর্তি - আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু, উন্নত নাসা, ক্ষীণকটী, নিরাভরণ, তপস্বিনী মূর্তি।

আদিকন্যকা শক্তির প্রতীক মহাকুমারী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সম্মুখেই পশ্চিমমুখী মন্দিরস্থ অমরনাথ মহাদেবের দিকে। আনন্দ বিধায়িনী আত্মজার দিকে তাকিয়ে পিতারও চোখের পলক পড়ছে না। দুচোখ দিয়ে বাৎসল্য ঝরে পড়ছে যেন। অমরনাথ মন্দিরের সামনে দুটি মন্দির - গোরক্ষনাথ ও গৌরীশংকরের। কাছাকাছি আরও দুটি মন্দির - চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও নারায়ণের। উত্তর-পূর্ব কোণে মহাদেবজী, উত্তর-পশ্চিম কোণে রোহিনীদেবী। পূর্ব তীরের দুটি মন্দিরে পার্বতী ও বালাসুন্দরী। পশ্চিম তীরে দুটি মন্দিরে - একাদশী ও মুরলীমনোহর। দক্ষিণেও তিনটি মন্দির, গৌরীশংকর, শ্রীরামচন্দ্র ও মহাভৈরব ঘন্টেশ্বর। অমরকন্টকের চূড়ায় এই বিশাল নর্মদা মন্দিরটিকে দূরে থেকে একটি মন্দিরময় দূর্গের মত দেখায়।

কোটিতীর্থের সামনে গোমুখের কাছে দাঁড়িয়ে সুমেরদাসজীর সঙ্গে কথা বলছি, সেই সময় একজন মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মন, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, গলায় উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, সহাস্যবদনে এসে মহাত্মাকে 'হর নর্মদে' বলে অভিবাদন জানালেন।

সুমেরদাসজী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, ইনোনে নর্মদা মায়ীকী প্রধান পুরহিত হ্যায়। ইনকা শুভনাম পণ্ডিত শ্রীরামাধীন দ্বিবেদী, পাণিনি ব্যাকরন ঔর বেদান্ত শাস্ত্রকা বড়া বিদ্বান হ্যায়। তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন - ইনোনে বাংলা মুলুক সে আয়া হ্যায়। ইনকা পিতাজী ইনকো নর্মদা মাতাজীকো দর্শন ও প্রণাম কে লিয়ে অমরকন্টক মেঁ একেলাহি ভেজে হৈ, স্টেশন কা নজদিক বাজার মেঁ ইনকা সাথ ভেট হুয়া, একসাথ্ হম্ দোনো ভোটেঙ্গা কা জঙ্গল পার হো কর মাতা নর্মদাজীকা চরণ তলমেঁ পৌছ্ গিয়া। বহুত আচ্ছা হুয়া আপকা সাথ ভেট হুয়া। আপ্ ইনকো অমরকন্টক মহাতীর্থকা বারে মেঁ কিসসা শুনাইয়ে। পণ্ডিতজী হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন - -' এখন যেখানে নর্মদাকুণ্ড সুদুর অতিতে এখানে একটি বাঁশবন ছিল। সেই বাঁশবনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল নর্মদার উৎস। এই উৎসকে আবিষ্কার করেন মারাঠারাজ দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও, সেইসময় থেকেই এই তীর্থ জাগ্রত হয়। বেণুবনের মধ্য থেকে প্রকাশিত হল বলে নর্মদেশ্বর শিবের অপর নাম বেণ্বেশ্বর।

ইন্দোরের হোলকার, নাগপুরের ভোঁশলা, বারোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া প্রভৃতি মারাঠা রাজবংশের প্রায় সকলেই নর্মদা ও নর্মদাশংকরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, নর্মদেশ্বরের মন্দির সংস্কার করেছিলেন ইন্দোরের মহারাজা সংবৎ ১৯২৯ সালে। মন্দিরের সামনে যে বিশাল শ্বেত তোরণ, সেটি রেওয়ারাজের দান - নির্মানকাল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ। যে যাত্রীনিবাসে আশ্রয় পেয়েছেন, সেইটি প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী অহল্যাবাঈ- -এর দান'।

সুমেরদাসজী ও পণ্ডিতজী ঘুরে ফিরে আমাকে সমস্ত মন্দিরগুলি দেখালেন, প্রত্যেক দেবতার পরিচয় দিয়ে মহিমা বর্ণনা করলেন। মন্দিরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ভক্তরা সাশ্রুনয়নে পুজা করছেন, অনেক সাধু ধ্যান জপ করছেন, দেখতে পেলাম। পণ্ডিত রামাধীন দ্বিবেদীজী* আমাকে নর্মদা মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে শ্রীকার্তিকেয় স্বামীর মুর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন - 'কার্তিকেয়-স্বামীর মাহাত্ব হচ্ছে এই; এখানে ধ্যান জপ এবং পূজা করলে অপস্মার মৃগী, অর্শ, ভগন্দর এবং কুষ্ঠরোগ থেকে মানুষ রোগমুক্ত হয়। এই নর্মদাক্ষেত্র মহাসিদ্ধপীঠ, শ্রেষ্ঠ তপস্যাস্থল। নর্মদায়াং তপঃ কুর্যাৎ মরণং জাহ্নবীতটে। গঙ্গাতীরে মৃত্যু হলে জীবের উচ্চগতি হয় কিন্তু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে আসতে হবে নর্মদাতটে। মহাচৈতন্যময়ী চৈতন্যকারিণী নর্মদা মায়ীর কৃপা কটাক্ষ ছাড়া জ্ঞানসিদ্ধি বা কৈবল্যসিদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। মহর্ষি ভৃগু মার্কণ্ডেয় থেকে আরম্ভ করে মহর্ষি পতঞ্জলি, গুরু গোবিন্দপাদ, শংকরাচার্য, গোরক্ষনাথজী সবাই ছুটে গিয়েছিলেন নর্মদায় তপস্যা করতে। ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা মাত্রেই নর্মদার কৃপাসিদ্ধ, আশীর্বাদধন্য।

---

*গত ১৯৮৩ সালে পুনরায় আমি অমরকন্টক গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল পুত্র আনন্দমোহন, তার মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী দেবীরাণী ঘোষাল ও হাওড়া নিবাসী শ্রীঅমরকেতন রক্ষিত। এবারে গিয়ে শুনলাম পণ্ডিত রামাধীন দ্বিবেদীজী ১৯৬৫ সালে দেহরক্ষা করেছেন এখন পণ্ডিতজীর জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বিবেদীজী নর্মদামায়ীর প্রধান পুরোহিত। ইনিও সংস্কৃত ব্যাকরনের 'আচার্য' উপাধিধারী, নর্মদামায়ীর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতেই তিনি জানালেন - ' গত ১৯৪৯ সালে তৈবাবার আমলে যে অমরকন্টক দেখে গেছলেন, এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন এখানে লোক বসতি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। নর্মদা মন্দিরের পূর্বদিকে গড়ে উঠেছে বরফান আশ্রম, মন্দির থেকে বেরিয়ে কপিলামার্গ ধরে পশ্চিমদিকে কিছুটা এগোলেই দেখতে পাবেন শান্তি কুটির, কল্যান আশ্রম এবং মাইল দেড়েক দূরে রামকৃষ্ণ কুটির। এগুলি সবই নর্মদার উত্তরতটে অবস্থিত, সবই যাত্রী-নিবাস।

পণ্ডিতজী পূজাপাঠের জন্য মন্দিরে চলে যেতেই সুমেরদাসজী বললেন - চল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদার ধারা কিভাবে কোটিতীর্থের ঘাট হতে পশ্চিমগামিনী হয়ে বয়ে যাচ্ছে তোমাকে কতকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসি।

নর্মদা কুণ্ড হতে মন্দিরের পশ্চিমদ্বার দিয়ে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম নর্মদা ধারার উত্তরতট দিয়ে।

নর্মদা মন্দিরের আবেষ্টনীর বাইরে কিছুটা দূরে দক্ষিণে রয়েছে পাতালেশ্বর শিবমন্দির, পাশেই রয়েছে একটি বিশাল আম্রবৃক্ষ। পাঁচ-ছয় হাত নীচে এক গহ্বরের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন পাতালেশ্বর মহাদেব। নর্মদা কুণ্ডের সঙ্গে এই গহ্বরের গুপ্তভাবে যোগাযোগ রয়েছে। ফলে সেখানে থেকে মাঝে মাঝে গহ্বরের মুখ পর্যন্ত জল উৎসারিত হয়। ফলে আমগাছের তলা পর্যন্ত ভিজে যায়। পাতালেশ্বর শিবমন্দিরের পাশেই রয়েছে একজন দণ্ডী - সন্ন্যাসীর কুঁড়েঘর; তাঁর নাম শ্রীমৎ স্বামী নারায়ণ আশ্রম বিতরাগ, ইনি দ্বারকাপিঠের জগৎগুরু শংকরাচার্য শ্রীমৎ স্বামী অভিনব সচ্চিদানন্দ তীর্থের কাছে সন্ন্যাস নিয়েছেন। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে পাতালেশ্বর মহাদেব খুবই জাগ্রত দেবতা। অনেক সিদ্ধ মহাত্মা সূক্ষ্ম দেহে এসে প্রতিদিনই পাতালেশ্বর মহাদেবের পূজা করে যান। সমগ্র মন্দির চত্বর সুগন্ধে ভরে যায়। আমি যখন পাতালেশ্বর মন্দিরে নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার নাকেও এক অপূর্ব সুগন্ধ ভেসে এল। সন্ন্যাসী বললেন - এই সময় নিশ্চয় কোন মহাত্মার আগমন ঘটেছে।

নর্মদার দক্ষিণ দিকে দেখলাম, উঁচু উঁচু টিবির মত পাহাড়, ঘোর জঙ্গলে ঢাকা। সুমেরদাসজী বললেন - দক্ষিণ দিকে ঐ পাহাড়ী অংশের নাম জাম্না দাদার, পরের অংশের নাম ভিন্দোয়াল দাদার, তার পরের অংশের নাম কুকরী দাদার। কুকরী দাদারের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে দক্ষিন দিকে, মুণ্ডমহারণ্যের দিকে। জাম্না দাদারের মধ্যেই নকটির জঙ্গল, বিষধর সাপ এবং শ্বাপদে পরিপূর্ণ। নকটির জঙ্গল ভৃগু কমণ্ডলু পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিন তোমাকে ভৃগু কমণ্ডলু দেখিয়ে নিয়ে আসার ব্যাবস্থা করব। তাঁর সঙ্গে পুনরায় ফিরে এলাম কোটিতীর্থের ঘাটে। এসেই সুমেরদাসজী তাড়া লাগালেন-চল চল ধর্মশালায় ফিরে যাই। ভোজন বানাতে হবে।

অনেকক্ষন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক কোটিতীর্থের চারদিকে ঘুরে ফিরে তাঁর সঙ্গী একজন যুবককে মন্দিরগুলির চুড়াগুলি দেখিয়ে মন্দির গাত্রে অঙ্গুল ঠুকে ঠুকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। তাঁরা দুজনে ধীরে ধীরে কুণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গীকে যা বললেন তার মর্মার্থ এই, অন্ধসংস্কার ও ভক্তিবশেই আমরা ভারতীয়রা সব জায়গায় তীর্থ মন্দির গড়ে তুলেছি, যেখানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা প্রকৃতির ভয়াল রূপ আমাদেরকে বিহ্বল করেছে, সেখানেই আমরা ভয়ে বিস্ময়ে দেবত্ব আরোপ করেছি। এই যে নর্মদা মন্দিরে এত শিব দেখছ, এই শিব বা লিঙ্গপূজা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগ থেকে আর্য সংস্কৃতির মধ্যে এসে অনুপ্রবেশ করেছে। শিব আসলে অনার্যদের দেবতা। এইজন্য বেদে শিবপূজা বা লিঙ্গপূজার কোন উল্লেখই নেই।

সুমেরদাসজী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, কোন মুরখ্ নে আপকো এ বাত বাতায়া ?

ভদ্রলোকের সঙ্গী যুবকটি কড়া সুরে বললেন - জানেন, আপনারা কার সঙ্গে কথা বলছেন, ইনি অধ্যাপক পি. কে. মবলঙ্করজী, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান।

আমি সুমেরদাসজীকে চুপ করতে বলে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার জানিয়ে বললাম - আপনার মত পণ্ডিতের কাছে আমি বালক মাত্র। আমার ধৃষ্টতা যদি মার্জনা করেন তবে সবিনয়ে জানাতে চাই, বেদে বহুস্থানে শিবের উল্লেখ আছে, বৈদিক ঋষিরা শিবকে অনাদি কারণ মুল ভগবান বলে মানতেন। আমি আপনাকে বেদমন্ত্র শোনাই। এই বলে করজোড়ে বেদোক্ত রুদ্রসুক্ত পাঠ করে শিব ও নর্মদার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে ধুল্যবলুন্ঠিত প্রণাম করলাম।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে জানালাম - এইমাত্র যে বেদমন্ত্র শুনলেন, এগুলি ভগবান কুৎস্ - ঋষি দৃষ্ট মন্ত্র। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৪ নম্বর সুক্তের অন্তর্গত। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস্, তাঁর অপর তিন ভ্রাতা হলেন হিরণ্যস্তূপ, সব্য এবং গৃৎসমদ। পিতা পুত্র সকলেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। এই যে এগারটি মন্ত্র শোনালাম তার প্রথম মন্ত্রটি হল -

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।
যথা শমসৎ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ অনাতুরম্॥

এর অর্থ হল, মহান্ কপর্দী বীরদর্পচূর্ণকারী রুদ্রদেবতাকে আমরা এই মন্ত্রে আবাহন করছি। তাঁর কৃপায় যেন দ্বিপদ মনুষ্য এবং চতুষ্পদ জন্তু সকলেই সুস্থ ও রোগশূণ্য হয়; মর্ত্ত-মানুষের আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য হে রুদ্র। তোমাকে প্রণাম নিবেদন করছি।

এই সূক্তের চার নম্বর মন্ত্রে আছে -

তেষাং বয়ং রুদ্র যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্ দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে॥

- আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সুরক্ষার জন্য দীপ্তিমান, যজ্ঞসাধক, রহস্যময়, গতিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময় রুদ্রদেবতাকে আহ্বান করছি, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, হে রুদ্র, তুমি আমাদেরকে দয়া কর। মন্ত্রোক্ত রুদ্র ও কপর্দী যে শিবের নাম আশাকরি তা আপনার মত বিদ্বানকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সুমেরদাসজী আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন, আমাকে একরকম বগলদাবা করেই ধর্মশালাতে নিয়ে গেলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম, আহারাদি সেরে ঘুমালাম বেলা পাঁচটা পর্যন্ত। সেদিন আর কোথাও গেলাম না। ধর্মশালার ছাদে উঠে নিবিড় অরণ্যানির অপরূপ শোভা উপভোগ করতে লাগলাম। নীচে কতকগুলি বন্য শৃগালকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। একটা নেকড়ে বাঘকেও দেখলাম, সুমেরদাসজীর ভাষায় 'হুড়াল'। মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি কানে এল, আরতি হচ্ছে।

অমরকণ্টকে দ্বিতীয় দিন। ভোরে উঠেই দুজনে নর্মদাঘাটে স্নান করে এলাম। সুমেরদাসজী তাঁর ছোট কমণ্ডলুতে জল ভরে বললেন - চলিয়ে *জ্বালেশ্বর মহাদেবকো আজ পূজা চড়ায়েগা। মহাজাগ্রৎ শিউজী হ্যায়। ধর্মশালা থেকে বেরিয়েই কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা অতিক্রম করেই একটা চওড়া পাকা রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। এই পাকা রাস্তার নাম শাডোল-রোড্। এই রাস্তা উত্তরগামী এক বিশাল সড়ক। রেওয়া আর অমরকন্টকের মধ্যে এই সড়ক সংযোগ রক্ষা করছে। প্রান্তরের মাঝে মাঝে বিশাল বনস্পতি, ছায়ায় ঘেরা গ্রাম্য বসতি। অধিকাংশই কুটির, মাঝে মাঝে দু-একটা পাথরের একতলা বাড়ীও আছে। পথে কয়েকটা বড় বড় খাটাল চোখে পড়ল। খাটাল ভর্তি বিশালদেহী কালো মহিষ; মাঠেও বাঁকানো শিং-জোড়া নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা রাখাল বালক আছে তাদের পিছনে। রোদের তাপ বাড়ছে। প্রায় মাইল পাঁচেক উত্তরদিকে শাডোল রোড ধরে আমরা হেঁটে ফেললাম। এতটা রাস্তার বাঁদিকে দেখে এলাম ধূ ধূ করছে মাঠ। ডানদিকে গভীর বন। সেই বন- খাদের অন্ধকারে কোথায় নেমে গেছে। ঘন জঙ্গলের ওপারে আবার পাহাড় - পাহাড়ের পর পাহাড়। ডানপাশে দেখলাম, পাথরের দুটি বিরাট চাঙর পাশাপাশি। তাদের মাঝখান দিয়ে সরুপথ। এইখানে ডানদিকে সুমেরদাসজী মোড় নিলেন। আমি পিছু পিছু চলেছি। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে সেই পথ নেমেছে। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে সেই পথ; ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে উৎরাই। দুধারে উঁচু উঁচু প্রাচীন গাছ। সেইসব গাছের রুক্ষ বঙ্কল ঢাকা মোটা গুঁড়ি আর পাথরের চাঙর এড়িয়ে সরু পথ ঘুরে ঘুরে নেমেছে। বড় বড় গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট পাতা ভেদ করে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারছে না। ছায়া ছায়া অন্ধকার। গড়ানে আঁকাবাঁকা পকদণ্ডীতে কোথাও কোথাও মোটা মোটা শিকড় এবং কাঁটা ঝোপ। সেইসব ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হোঁচট্ খাচ্ছি, পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। জনপ্রাণীহীন এই নির্জন পথে যে কোন সময় বাঘ এসে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। গা ছমছম করছে ভয়ে। এইভাবে প্রায় দেড় মাইল উৎরাই এর পথে হাঁটার পরই পেলাম কিছুটা সমতলভূমি, তার পাশেই আবার বড় খাদ। বড় বড় গাছের ছায়ায় দেখতে পেলাম ছোট সাদা রঙের মন্দিরটি,

---

* জ্বালেশ্বর – ২১ অধ্যায় রেবাখণ্ডম

জ্বালেশ্বরাদি তীর্থানি পর্বতেহস্মিন নরাধেপ
পিতৃতুষ্টি প্রদান্যত্বঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদানি চ॥

জ্বালেশ্বরাদি তীর্থ পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ ও স্বর্গমোক্ষদ বলে বিখ্যাত। (অমরকণ্টকের পশ্চিমদিকে)

দরজার মুখে বৃষভ - নন্দী, দ্বার শীর্ষে ঘন্টা। মন্দিরের চাতালের বামদিকে ঘেঁষে একটি বড় ইঁদারা। দড়ি নেই, বালতি নেই। থাকলেও ইঁদারাটি এত গভীর যে সেখান থেকে জল তোলা আমাদের সাধ্যে কুলাতো না। মন্দিরের পূর্বদিক ঘেঁষে একটি খিরিশ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। জয় জ্বলেশ্বর। সুমেরদাসজী মন্দিরের দ্বারেই লুটিয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে সুমেরদাসজী বললেন - ইয়ে মহল্লেকা নাম হৈ - তামার ডাবর। মূল-নর্মদা মন্দিরের ঈশান কোণে এই মন্দির। মন্দিরের পূর্বদিকে যে পাহাড় তার নাম জ্বালেশ্বর। ঐ পাহাড়ের পরে যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে তার নাম আজমীর পাহাড়। সেই পাহাড়ে প্রায় শতাধিক গুহা আছে। শুনেছি সেখানে নাকি সিদ্ধ মহাত্মারা থাকেন। বাঘের রাজত্ব।

মন্দিরের মধ্যে বসে আছেন জ্বালেশ্বর মহাদেব - মহাকাল। কোথাও কোনও সাড়া নেই, পূজারী নেই, ফুল নেই, কেউ সাম্প্রতিককালে পূজা করেছে বলেও মনে হ'ল না। ধূপ দীপ ফুল নৈবেদ্য শূণ্য এই শূণ্য মন্দিরে নির্জনতম পরিবেশে মহাদেব বসে আছেন। কালো পাথরের শিবলিঙ্গ, মাথায় কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা দাগ। মন্দির একতলা পশ্চিমমুখী, মন্দিরের পূর্বদিকে একটি খিরিশ গাছ। সুমেরদাসজী বললেন - জ্বালেশ্বর মহাদেও কি বারে মেঁ পুরাণ মেঁ কুছ্ নাহি পড়া? ইনোনে ত্রিপুরাসুরকো খতম্ কিয়ে থে।

- পড়েছি বই কি। ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্যই মহাদেবের নাম হয়েছে ত্রিপুরারি। ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন ভীমা নদীর উৎসস্থানে। যুদ্ধক্লান্ত শিবের স্বেদবারি থেকে ভীমা নদীর উৎপত্তি। সেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ ভক্তবৎসল আশুতোষ এখানে বসে তপস্যায় সিদ্ধি ও ঋদ্ধি দান করেন নর্মদাবাসী সাধকবৃন্দকে।

কমণ্ডলুটি আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, পিয়ারী লেড়কী নর্মদাজীকা পানি সে জ্বালেশ্বর খুশ্ হোতে হৈ। অব পানি চড়াইয়ে। ঔর উস্ দিন প্রফেসর সাহেবকো যো মন্ত্র শুনায়া থা, ওহি বেদমন্ত্র জ্বালেশ্বরজীকো শুনাইয়ে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সাধুর উদারতায়। তিনি জানেন নর্মদা সলিল জ্বালেশ্বরের বড় প্রিয়। সেই নর্মদার জল এই দুর্গম পথে তিনিই কষ্ট করে বয়ে এনেছেন আর আমাকে বলছেন সেই জল মহাদেবের মাথায় ঢালতে। জ্বালেশ্বরজীর মাথায় কিছুটা জল ঢেলে কমণ্ডলু তাঁর হাতে দিলাম। তিনি বাকী জল শিবের মাথায় ঢেলে গালবাদ্য করলেন - বম্ বম্ ববম্-বম্।

রুদ্রসূক্ত উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলাম। মন্ত্রধ্বনি গম্ গম্ করতে লাগল মন্দিরের মধ্যে। রোমাঞ্চিত হলাম, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

এই বেদমন্ত্রই বাবার কাছে শিখেছি। হে শিবসুন্দর, বেদমন্ত্র ধ্বনিই আমার পূজা, তুমি তুষ্ট হও। জ্বালেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে নর্মদা মন্দিরের দিকে আসতে আসতে সুমেরদাসজী জানতে চাইলেন - কৌন্ কিতাব মেঁ আপ্ ত্রিপুরাসুর ঔর ত্রিপুরারিজীকা বারেমে পড়া হ্যায়, কিসসা শুনাইয়ে। চলনেকা তকলিফ্ ইসমে মালুম নেহি হোগা।

বললাম - মহাভারতের কর্ণপর্ব এবং হরিবংশে ত্রিপুরাসুরের গল্প আছে। একবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যগণ পর্যুদস্ত হন। অপমানের জ্বালায় দৈত্যরাজ তারকাসুরের তিন পুত্র - তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুম্মালী কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এই বর প্রার্থনা করে যে তারা তিনজন যেন এমন পৃথক পুর অর্থাৎ নগরে বাস করতে পারে, যেখানে সকল রকমের অভীষ্ট বস্তু থাকবে, যা দেব দৈত্য যক্ষ বা রাক্ষসরা ধ্বংস করতে পারবে না, এমন কি ব্রহ্মশাপেও তা বিনষ্ট হবে না। সহস্র বৎসর পরে তারা মিলিত হয়ে যখন একদেহ, একপ্রাণ হবে, তাদের এই তিনটি পুরীও যখন একত্র হয়ে যাবে, তখন যে দেবশ্রেষ্ঠ এই সম্মিলিত ত্রিপুরকে একবাণে ভেদ করতে পারবেন, তাঁর হাতেই তাঁদের সম্মিলিত-সংযুক্ত দেহ ত্রিপুরাসুরের মৃত্যু হবে। ব্রহ্মা তাদের এই প্রার্থিত বর দান করেন। তারকাসুরের এই পুত্ররা ময়দানবকে দিয়ে তিনটি পুর বা নগরী নির্মান করান - তারকাক্ষের জন্য স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর, এবং বিদ্যুন্মালীর জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণলৌহপুর।

তারকাক্ষের পুত্র হরি কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পেয়ে পূর্বোক্ত তিন পুরে এক একটি মৃতসঞ্জীবনী সরোবর নির্মান করেন। সরোবর এই গুণ ছিল যে, এতে মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনর্জীবিত হয়ে উঠত।

এই পুনর্জীবিত দৈত্যরা সকলকে উৎপীড়ন করতে শুরু করল। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তাঁদেরকে শিবের কাছে যেতে বলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব এই দৈত্যদেরকে বধ করতে সম্মত হন এবং নিজে দেবতাদের অর্ধেক তেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশী হয় এবং তিনি মহাদেব নামে বন্দিত হন। মহাদেব দেবতাদেরকে রথ ও ধনুক প্রস্তুত করতে বললেন। পৃথিবী, দেবীশক্তি, মন্দার পর্বত, দিগ্বিদিক, নক্ষত্রমণ্ডল, বাসুকি, হিমালয়, বিন্ধপর্বত, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী, দিনরাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ পভৃতির অংশ এবং ইন্দ্র, বরুন, কুবের ও যম এই দেবতারা অশ্ব হন। রথের ধ্বজদণ্ড হয় সুমেরু পর্বত এবং বিদ্যুন্ময় মেঘ হয় পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু ও কালরাত্রিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বান হন। ব্রহ্মাকে সারথি করে মহাদেব ত্রিপুরের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। বাণস্থিত বিষ্ণু, অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা এবং স্বয়ং মহাদেবের ভারে রথ ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়। তখন বাণ থেকে নির্গত হয়ে নারায়ণ বৃষরূপ ধারণ করে রথকে মাটি থেকে উত্তোলন করলেন। মহাদেব তখন অশ্বপৃষ্ঠে এক পা এবং বৃষরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে আর এক পা স্থাপন করে সেই দৈত্যপুরী নিরীক্ষণ করতে থাকেন। তিনি ধনুকে পাশুপত্ অস্ত্র যোজনা করে ত্রিপুরের একত্র হবার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন, এইখানে এখন যেখানে জালেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে এলাম। যথাকালে যথালগ্নে এই তিনপুর একত্র মিলিত হ'ল এবং তিনপুরের তিন দৈত্য সংযুক্ত হয়ে ত্রিপুরাসুরের উদ্ভব হ'ল, ভীমা নদীর উৎসস্থলে, এখন যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমশংকর বিরাজিত। মহাদেব অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ত্রিপুরাসুরের প্রতি - ত্রিপুরাসুর সহ ঐ বিচিত্র দৈত্যপুরী দগ্ধীভূত হলে পশ্চিম সাগরে গিয়ে পড়ল তার ধ্বংসাবশেষ।

জালেশ্বর মহাদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই 'কিসসা' বা গল্প প্রচলিত থাকলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জালেশ্বর মহাদেব জীবের সংসার জাল, কর্মজাল এবং মায়াজাল ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন করে জীবের স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ - এই তিনটি পুরের বিলয় ঘটিয়ে তুরীয় (চতুর্থ) জগতে মহাচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করেন জালেশ্বর। তাঁরই প্রসাদে জীবের স্বরূপস্থিতি ঘটে।

আমরা প্রায় সকলেই চাই, সংসারী লোক মাত্রেরই অন্তরের কামনা, এত আশা নিয়ে যে সুখ ও সাধের পৃথিবী গড়ে তুলেছি, তার যেন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই জন্যই ত তীর্থে তীর্থে এত ব্রত ও জপের অনুষ্ঠান। এই জন্যই তো এত ধর্মকর্ম ও দেবতা পূজার ঘটা। নির্বাণ কে চায় ? অথচ জালেশ্বর মহাদেব শুধু নির্বাণ - মুক্তিই দান করেন এই জন্য তাঁর মন্দিরে পূজারী নাই, পুজার কোন উপকরণ নাই। নাই কোন ভক্তের ভীড়, মহাজাগ্রত মহাকাল শুধু দ্রষ্টা হয়ে বসে আছেন একা একা এই দুর্গম নির্জন অরণ্যের মধ্যে।

সুমেরদাসজী বললেন- এ আপনে সচ্ বাতায়া। হম্ লোগ্ সব্ লালচী হৈ। ফিকিরকা পিছুমে দৌড়তে হৈ, ঘুমতে হৈ। ইসলিয়ে কহা যাতা হৈ -

ফিকির সবকো খা লিয়া সব্ বন্ গয়া ফকির।
ফিকিরকো যো খা লিয়া উসকা নাম হৈ ফকির॥

গল্প করতে করতে ধর্মশালায় এসে পৌঁছে গেলাম।

আহার বিশ্রামের পর সুমেরদাসজী বললেন - চলিয়ে আপকো মায়ীকী বাগিয়া দেখায়েগা। কাফি দূর নেহি, সওয়া এক্ মিল হোঙ্গে জ্যায়দা সে জ্যায়দা।

নর্মদা মন্দির থেকে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম দুজনে উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ দিয়ে। দুধারের বসতি ছাড়িয়ে জঙ্গল শুরু হয়েছে। বস্তির মধ্য দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম, বহুলোকের জটলা, হৈ হৈ হচ্ছে। শুনলাম কিছু আগেই একটা বাঘ এসে একটা বড় মহিষকে ধরে নিয়ে গেছে। সুমেরদাসজী আশ্বাস দিলেন - কোঈ ডর নেহি, নর্মদা মাতাকী কৃপাসে হমলোগকা কোঈ খতরা নেহি হোগা। নর্মদা মাতাকো জয় হো। জয় শিবশম্ভো !

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর মায়ীকী বাগিয়াতে পৌঁছে গেলাম। ঘন বনের মধ্যে এত বড় একটি সুন্দর বাগান কোথায় লুকিয়েছিল নিতান্ত নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত হত। শুধু বিশাল নয়, অতি প্রাচীন।

অরণ্য ও পাহাড়ের রাজ্যে এমন মনোরম বাগানের পরিকল্পনা কারা যে করেছিলেন জানা নেই। সে বিষয়ে কোন লেখাও চোখে পড়ল না। নানা জাতীয় ফল ফুলে ভরা, চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে। একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। বাগানের একপাশে নিয়ে গিয়ে সুমেরদাসজী কতকগুলি কচি কলাপাতার চারা বা কেনাগাছের মত একরকম গাছ দেখালেন। সাদা সাদা লম্বাটে কেনাফুলের মত ফুল ফুটে আছে। এর নাম গুলবকাওলি ফুল, অমরকন্টক ছাড়া সমগ্র মধ্যভারতে আর কোথাও নাকি এ ফুল পাওয়া যায় না। শুনলাম এ ফুল নাকি চোখের পক্ষে খুব উপকারী, যে কোন চক্ষুরোগের মহৌষধ, এখানে গুলবকাওলির সুর্মাও কিনতে পাওয়া যায়। সারা ভারতবর্ষ আমি চারবার পরিক্রমা করেছি। হিমালয়ের নন্দনকাননের যে অতুলনীয় মনোলোভা ফুলের রাজ্য তাও দেখেছি, কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত এমন সুগন্ধি ছড়ায় এমন কোন ফুল আর কোথাও আমার চোখে পড়ে নি।

মায়ীকী বাগিয়া দেখে ফিরে আসার পথে সুমেরদাসজী জানালেন যে পরের দিন তিনি কোথাও যাবেন না। মন্দিরের মধ্যে সারাদিন জপ্ ও পুরশ্চরণ করেই কাটাবেন। কারণ নর্মদাতীর তপস্যাভূমি, এখানে জপ্ ও পুরশ্চরণাদির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। আমরা পথে একটা হরিণকে দ্রুত দৌড়ে যেতে দেখলাম। একদল ময়ুর পেখম তুলে নাচছে - আকাশে মেঘের সঞ্চার। ধর্মশালার ছাদে উঠে পর্বত ও অরণ্যের শোভা দেখতে লাগলাম। অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে, চারদিকে একটা থমথমে নিস্তব্ধ ভাব।

নিচে সুমেরদাসজী রুটি তৈরি করতে করতেই হাঁক ছাড়ছেন। এ কদিনেই দেখছি এই প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর আমার উপর মায়া পড়ে গেছে। একটি মিনিটও চোখের আড়াল করছেন না। অথচ কয়দিন আগেও তাঁর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। বাবা আমাকে একা পাঠিয়েছেন তীর্থ করতে। পথে বেরুলেই দেখেছি পথিক বন্ধু পায়, পথিক সহজেই দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করে নিতে পারে। সেইজন্যই আমাদের উপনিষদের ঋষিদের এই সত্য ঘোষনা -

চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুমুদম্বরম্। পশ্য সূর্যস্য শ্রেমানং যোন তন্দ্রয়তে চরণ্। চরৈবেতি চরৈবেতি।

পথিক তুমি এগিয়ে চল। যে চলে সেই মধু পায়, তার গতি কোনদিন স্তব্ধ হয় না। চলতে চলতেই সত্যের সন্ধান পায়, জ্যোতির স্পর্শ পায়। সূর্য নিরন্তর চলছেন বলেই এত জ্যোতির্ময়। তীর্থে বেরিয়ে পড়লে তীর্থদেবতাই রক্ষা করেন।

অমরকন্টকের জলবায়ু সব ঋতুতেই স্বাস্থ্যপ্রদ, সব ঋতুতেই মনোরম। বর্ষাকালে দুর্গমতা ও মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ছাড়া শরীর স্বাস্থ্যের কোন অসুবিধা ঘটে না। জ্যৈষ্ঠ মাস সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সমগ্র বিহার ও উত্তরভারত এখন প্রচণ্ড গরমে জ্বলছে, লু বইছে, কিন্তু অমরকন্টকে গ্রীষ্মকালও মনোরম। ভোরে উঠে স্নান করেই সুমেরদাসজী চলে গেলেন মন্দিরে তাঁর সংকল্পিত জপ-পুরশ্চরণ শেষ করতে। যাবার আগে পই পই করে দূরে কোথাও যেতে বারণ করে গেলেন - মুড়িয়া মহারণ (অর্থাৎ মুণ্ডমহারণ্য) নজদিক্ হৈ। শের ঔর ভাল্লু হরবখত্ ইধর উধর ঘুমতা হৈ। আগল্-বগল্ ছোড়কে ঔর কাঁহি নেহি জাবেগা।

তিনি বেরিয়ে যেতেই নর্মদা ঘাটে স্নান ও বেদপাঠ সেরে বেরিয়ে পড়লাম পথে, নর্মদাকুণ্ড থেকে বেরিয়ে নর্মদা যেখানে নদীর আকার নিয়েছে, তার ধার দিয়ে, যে পথ দিয়ে পরিক্রমাকারীর পরিক্রমা করেন, পায়ে চলা পথের দাগ লক্ষ করে করে হাঁটিতে লাগলাম। মাইলখানেক হাঁটার পরেই দেখলাম জঙ্গল ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে, নর্মদার দক্ষিণ দিকে সাতপুরা পর্বতের দিকে তাকিয়ে কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছি, সহসা একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম, গোটা অরণ্য যেন আলোড়িত হচ্ছে। হরিণ, শেয়াল, চিতাবাঘ আরও সব বন্য জন্তু প্রাণপণে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। একজন স্থানীয় যুবক হিন্দিতে চিৎকার করে আমাকে জানালো লক্ষ লক্ষ মৌমাছির ঝাঁক আসছে। এই পাহাড়ী মৌমাছির কামড়ে বাঘ-ভাল্লুক অবধি মারা পড়ে। আমিও পেছন ফিরে মন্দিরের দিকে দৌড়ালাম। মনে হ'ল, এক ঝাঁক যুদ্ধবিমান জঙ্গল ভেদ করে চলে গেল।

সুমেরদাসজী তাঁর জপ্ পূজা সেরে এসে যখন আমার কাছে সব কথা শুনলেন, তখন রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা। বকতে লাগলেন-এ্যায়সা বেকুফি মৎ কিয়া করো, এ কোঈ খেল্ নাহি। যো সাধুলোগ্ পরিক্রমা করতে হৈ, উহ্ নর্মদা মাতাকো পূজারতি করকে, কড়াই ভোগ ঔর নড়াইল ডালকে নর্মদা মায়ীকী অনুমতি লেকর যাত্রা করতে হৈ। ইহ্ সিদ্ধ তপস্যাস্থলী হৈ, কলকাতা কা কোঈ লেক্ ইয়া দেহরাদুন মুশৌরী কা রাস্তা নেহি।

নর্মদাজীকী কঙ্কর, সমুচা শংকর। মহাতীর্থ শিবময় হৈ। ইধর দৈবীলীলা নিরন্তর চলতে রহে।

সুমেরদাসজী জানালেন যে তিনি তিন চারদিন আমার সঙ্গে বেরুতে পারবেন না, তাঁর জপপুজা পুরশ্চরণাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তাই বলে একা আমাকে ছাড়লেন না। এইখানকারই বাসিন্দা হরকিষণ বলে তাঁর এক শিষ্যকে আমায় সঙ্গে নিয়ে শোণমুড়া, ভৃগু কমণ্ডল, ধুনিপানি, কপিলধারা প্রভৃতি স্থান ঘুরে আসার নির্দেশ দিলেন। হরকিষণকে আমারই সমবয়স্ক বলে মনে হল।

অমরকণ্টকে আমার তিনরাত্রি তীর্থবাস হয়ে গেল। চতুর্থ দিনে খাওয়া দাওয়া করে দুপুরবেলাই বেরিয়ে পড়লাম, শোণমুড়ার উদ্দেশ্যে। কিছুটা এসেই হরকিষণজী মোড়ের মাথায় একটা দোকানে ঢুকলো।

– কি খেলে হরকিষণজী ?

– পতর-পতর রুটি ইধর বহুত বড়িয়া বনতে হৈ। ঔর শঁশাকা তড়কা। অব্ চলিয়ে, জ্যায়দা সে জ্যায়দা এক মিল হোগা ঔর ক্যা, সনেমারা পৌছ জায়েগা।

শোনমুড়া বা শোন্ উৎসস্থলকে এরা বলে 'সনেমারা'। মন্দির থেকে সোজাসুজি অগ্নিকোণের কিছুটা তৃণভূমি অতিক্রম করার পরেই দেখলাম, পথ আঁকাবাঁকা হয়েছে। সঙ্গে ঘন বন। বিশাল উঁচু উঁচু গাছ, মাঝখান দিয়ে সর্পিল পথ। সেই পথ দিয়ে পৌচেছে অমরকণ্টক পর্বত চুড়ার পূর্ব কিনারায়। আধ মাইল থাকতে থাকতেই পথ সংকীর্ণ হয়ে পার্বত্য পাকদণ্ডীতে পরিণত হয়েছে। পাশ দিয়ে চলেছে একটি শীর্ণ জলধারা, কখনও বা বনের মধ্যে পাথরের ফাটলে অদৃশ্য হয়েছে। এই সলিল রেখাই শোণ্-নদের উৎস।

গঙ্গার বিশিষ্ট উপনদ শোণ্। প্রায় পাঁচশো মাইল দীর্ঘ। আগেই বলেছি অমরকণ্টক থেকে নর্মদা পশ্চিমাভিমুখী, শোণের গতি কিন্তু উত্তর-পূর্বদিকে। অমরকণ্টক, নর্মদা ও শোণ উভয়েরই উৎসস্থল। শাডোল জেলার মধ্য দিয়ে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার পৌঁছে শোণের গতি হয়েছে উত্তর-পূর্বদিকে। বিহারের রাজধানী পাটনার কাছে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে শোণ্। রামায়ণ মহাভারত এবং কালিদাসের রঘুবংশমে শোণের উল্লেখ আছে। শোণের অপর নাম - হিরণ্যবাহু। শোণের ক্ষীণধারা ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড বেগবান হয়েছে। পাথরের বাধা মানছে না, গহ্বরের বাধা মানছে না।

স্রোত পিচ্ছল পাকদণ্ডীতে সন্তর্পণে পা ফেলে আমরা এগোতে লাগলাম। পথ ক্রমেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মূলস্রোতের মধ্যে পা ডোবালে একটানে কোথায় যে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। স্রোতের গা ঘেঁষে অতি সাবধানে পা ফেলে অবশেষে আমরা পৌছে গেলাম শোণ-নদের প্রপাত শীর্ষে।

এটি অমরকণ্টক পাহাড়ের পূর্ব প্রাচীর। এই প্রাচীরের কিনারা থেকে শোণভদ্র ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হাজার ফুটেরও বেশি নীচে। গর্জনের শব্দে কানে তালা লাগার জোগার।

প্রপাতের মুখে মোটা লোহার রেলিং। তার নীচে দিয়ে জলধারা উপছে পরছে নীচে।

সাথী হরকিষণ জানালো - ঐ দেখুন ডানদিকে একটা বিরাট জলাশয় দেখতে পাচ্ছেন, ওটাও এই শোণের জলে ভরে আছে। পুরাকালে এইখানে ছিল রাজা মৈকালের রাজধানী। ঐ বিরাট হ্রদের মধ্যে এখনো দু তিনটি মন্দিরের চুড়া দেখা যায়। রাজা মৈকালের একমাত্র কন্যার নাম ছিল - নর্মদা। তার দুই সখির নাম - হিমলা আর ঝিমলা। নর্মদা ফুল খুব ভালবাসত, বাপের খুব আদরের মেয়ে ছিল সে। নর্মদা রাজাকে বলেছিলেন একটা সুরম্য উদ্যান বানিয়ে দিতে। রাজা নর্মদার আবদার রেখেছিলেন। নর্মদা সেই উদ্যানে যখন খুশি সখীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নিত্য শিবপূজা করত। উদ্যানের মধ্যেই ছিল শিবমন্দির।

নর্মদা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সৌন্দর্য ও লাবন্যের খ্যাতি অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন শোনভদ্র নামে এক রাজপুত্র সন্ন্যাসীর বেশ ধরে নর্মদার উদ্যানে উপস্থিত হন। সেই সুন্দরকান্তি তরুন সন্নাসীকে দেখে নর্মদা মুগ্ধ হন, ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মে। শোণভদ্র নিজের আত্মপরিচয় দেন। শিবসাক্ষী করে উভয় উভয়কে বাগদান্ করলেন। উভয়ের মধ্যে কথা হয়, শোণভদ্র নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে বলবেন এবং যত শিঘ্র পারেন পিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে রাজা মৈকালের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নর্মদার পাণিপ্রার্থী হবেন। কিন্তু শোণভদ্র তাঁর রাজ্যে ফিরে যাবার পর যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে পিতা-পুত্র ব্যতিব্যস্ত থাকায় দুই বছর নর্মদার কোন সংবাদ নিতে পারেন না।

দু বছর কোন সংবাদ নেই, নর্মদা অধীর হয়ে পড়েন। এদিকে রাজা মৈকাল কন্যার বিবাহ দেবার জন্য উদগ্রীব হন। অবশেষে পিতামাতার চাপে বাধ্য হয়ে নর্মদা তাঁর পাণিপ্রার্থী অপর এক রাজপুত্রকে বিবাহ করতে বাধ্য হন।

বিবাহ যেদিন হয়ে গেল তার পরের দিনই শোণভদ্র তাঁর পিতা এবং অন্যান্য লোকজন সহ রাজা মৈকালের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সব শুনে শোণভদ্র নর্মদাকে অভিশাপ দিলেন - নর্মদা তুমি আমার প্রেমের অপমান করেছ, তোমার এই দুষ্কর্মের জন্য তুমি নদীতে পরিণত হও। তোমার দুই সখীও নিশ্চয়ই প্ররোচিত করেছে, আমাকে বাগদানের পরেও অন্যকে বিবাহ করতে। তারাও নদীতে পরিণত হোক।

নর্মদাও ক্রুদ্ধ হয়ে শোণভদ্রকে অভিসম্পাত করলেন - বিনা দোষে সব না জেনে, হঠাৎ আমাকে যে অভিসম্পাত করলে এজন্যে তুমিও নদীতে পরিণত হও।

পুরাণে আছে ব্রহ্মার অশ্রু হতে এই পবিত্র শোণনদের উৎপত্তি। ফিরবার পথে হরকিষণজীকে এই কথা শোনাতে সে বলল - একদম বাজে কথা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কাঁদবেন কোন দুঃখে ? প্রেমপাগল শোনভদ্র নর্মদার প্রেমে একদম 'দিওয়ানা' হয়ে গিয়েছিল। তার বিরহের অশ্রুধারা হতেই এই দুঃখের নদ শোণের সৃষ্টি। বাবুজী, বিরহ না থাকলে প্রেম পাকা হয় না, বিরহ ও মিলনের মাঝখান দিয়ে দুঃখের নদী চিরকাল ধরে বয়ে চলেছে। মহৎ প্রেমে মহৎ দুঃখ আছেই।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ধর্মশালায় পৌঁছে গেলাম। দেখলাম অধ্যাপক মবলঙ্করজী সুমেরদাসজীর কাছে বসে আছেন। শোণমুড়া থেকে ঘুরে এলাম শুনে তিনি বললেন, শোণ নদ বহু প্রাচীন। গ্রীক পর্যটক মগাস্থিনিস্ এবং অরিয়ান - তাঁদের ভারত বিবরণীতে এই নদের উল্লেখ করেছেন।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ধর্মশালায় পৌঁছে গেলাম। দেখলাম অধ্যাপক মবলঙ্করজী সুমেরদাসজীর কাছে বসে আছেন। শোণমুড়া থেকে ঘুরে এলাম শুনে তিনি বললেন, শোণ নদ বহু প্রাচীন। গ্রীক পর্যটক মগাস্থিনিস্ এবং অরিয়ান - তাঁদের ভারত বিবরণীতে এই নদের উল্লেখ করেছেন।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন - এখানে দেখছি সবাই শিবলিঙ্গের পূজা করেন। কাশীতেও দেখেছি সর্বত্র শিব। আপনি সেদিন যে বললেন, বেদে শিবমন্ত্র আছে, একটা স্তোত্রও শোনালেন। বৈদিক দৃষ্টিকোণ হতে এই লিঙ্গ শব্দের অর্থ কি ? ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে লিঙ্গ-পূজার অর্থ আমাদের কাছে অন্যরকম।

আমি জানালাম - আমার জ্ঞান অতি অল্প, সাধন ভজন করি না। আমার যা কিছু বিদ্যা বাবার কাছে শুনে শুনে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। বাবার কাছে একটি নর্মদা লিঙ্গ আছে, নিত্য তিনি পূজা করেন, হোম করেন। বাহ্যতঃ শিবলিঙ্গ তো একখণ্ড নুড়ি বা পাথর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই লিঙ্গকে বাড়তে কমতে দেখি; তার মধ্যে জ্যোতিও প্রকট হয়। জড়বস্তুর কি হ্রাস বৃদ্ধি হয় ? তাতে কি কোন অত্যুজ্জ্বল চিৎশক্তির খেলা দেখা যায় ? কিন্তু আমাদের শিবলিঙ্গে আমরা তা দেখি। কেন এ রকম ঘটে, তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। আমাদের ছটাক্ বুদ্ধিতে যা ধরা পড়ে না, তাকে অস্বীকার করতে হবে এই বা কেমন কথা ? এই রকম dogmatism বা regimentation of thought -ই বা আমাদের মধ্যে থাকবে কেন ? বাবার মতে - ন লিঙ্গম্ লিঙ্গমিথ্যাহু; যস্মিন সর্বে প্রলীয়ন্তে তল্লিঙ্গম্ লিঙ্গমুচ্যতে। যাতে সব লয় হয় অর্থাৎ স্থূলজগত (gross universe) সুক্ষ্মজগতে (causal universe) আর এই স্থূল-সুক্ষ্ম-কারণ জগতেরও লয় হয় beyond these three dimension চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় চৈতন্যে, সেই তুরীয় চৈতন্যেরই প্রতীক বা চিহ্ন হল এই শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের পূজা করা মানে শিবলিঙ্গকে সামনে রেখে যুগ-যুগ ধরে সাধকরা ডুবে গেছেন এর অন্তর্নিহিত গুঢ় অর্থে, তারা সে সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

অধ্যাপক সাহেব উঠতে চাইলেন কিন্তু সুমেরদাসজী তাঁকে ছাড়বেন না। ইতিমধ্যে তাঁর জন্য চা চাপিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক সাহেব অমরকন্টকে এসে উঠেছেন অহল্যাবাঈ ধর্মশালার কাছেই সদ্য নির্মিত রেষ্ট-হাউসে, এক মিনিটের পথ নয়। কোঈ ফিকর নেহি, হম্ আপকো সাথমে জায়েগা, নর্মদা মাতাজীকী এ্যায়সা কিরপা, ইধর কোঈ যাত্রীকো কভি কুছ্ হানি নেহি হোতা হৈ, কুছ বিগড়ায়েগা নেহি - সুমেরদাসজীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে অধ্যাপক সাহেব আরও কিছুক্ষন বসলেন। চা খেতে খেতে মাননীয় অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - আপনার পিতাজীর কাছে শিব বা শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে আর কি জেনেছেন বলুন।

আমি বললাম - বাবা গল্প করেছিলেন যে একবার সুমেরু শৃঙ্গে মহর্ষিগণ ত্রিলোক স্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট একমাত্র কোন তত্ত্ব অব্যয় তা জানতে চেয়েছিলেন। সেখানে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্রতুও উপস্থিত ছিলেন। কোন মীমাংসায় আসতে না পেরে ব্রহ্মা ও ক্রতু মহর্ষিগণকে বললেন, আসুন আমরা চারি বেদকে স্মরণ করি।
তখন ঋগ্বেদ প্রকট হয়ে বললেন -

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে
যদাহুস্তৎপরং তত্ত্বং স রুদ্রস্ত্বেক এব হি। **(কাশীখণ্ডম্ ৩২ অধ্যায়)**

ভূতগণ যাঁর অন্তরে অবস্থিত, যা হতে সমস্ত উৎপন্ন এবং মহাত্মাগণ যাঁকে চরম ও পরম বলে মনে করেন, সেই রুদ্রই একমাত্র।

যজুরুবাচ -

যো যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেন চ সমিজ্যতে।
যেন প্রমাণং হি বয়ং স একঃ সর্বদৃক্ শিবঃ ॥

যজুর্বেদ বললেন যে ঈশ্বর যজ্ঞসমূহ এবং যোগের দ্বারা পূজিত হন এবং যাঁর প্রভাবে বেদ সকল প্রমানরূপে ত্রিলোকে পরিগৃহীত, সেই সর্বদর্শী শিবই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

সামোবাচ -

যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যো বিচিন্ত্যতে।
যদভাসা ভাসতে বিশ্বং স একস্ত্র্যম্বকঃ পরঃ ॥

সামবেদ বললেন - যিনি এই বিশ্বকে ভ্রমন করাচ্ছেন, যিনি যোগিগণের দ্বারা বিচিন্তিত এবং যাঁর দীপ্তিতে বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, সেই একমাত্র ত্র্যম্বকই পরমতত্ত্ব।

অথর্বোবাচ -

যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং ভক্ত্যানুগ্রহিণো জনাঃ।
তমাহুরেকং কৈবল্যং শঙ্করং দুঃখতস্করম্ ॥

অথর্ববেদ বললেন - কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ যে দেবেশকে দর্শন করে থাকেন সেই কৈবল্যস্বরূপ দুঃখহারী শঙ্করকেই মহাত্মাগণ একমাত্র পরমতত্ত্ব বলে কীর্তন করে থাকেন।

মবলঙ্করজীকে আমি বললাম - লক্ষ করুন, এই মন্ত্রে একটা শব্দ আছে - দুঃখতস্করম্। তস্কর অর্থে চোর। মানুষের পার্থিব সম্পদ টাকা, সোনা, রূপা, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি অপহরন করে, কিন্তু শিবসুন্দর হরণ করেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আধি এবং ব্যাধি। এটি লক্ষ লক্ষ ভক্ত এবং ঋষি-মুনিদের উপলব্ধ সত্য। তাই ত অনাদিকাল হতে শিব আমাদের আরাধ্য দেবতা।

অমরকন্টকে আজ পঞ্চমদিন। সুমেরদাসজী আজ কোথাও যেতে দিলেন না। বললেন - আজ মন্দিরে আমি যতক্ষন থাকব, তুমি আমার কাছে বসে থাকবে। আজ বিশেষ একটি মন্ত্রের পুরশ্চরণ করবো, তুমি কাছে থাকলে ভাল হয়। তুমি যে ধর্মশালায় বসে নিত্য হোম কর, তোমার সেই নিত্যক্রিয়া মন্দিরে বসেই করবে। সব্ ইন্তেজাম হম্ কর দুংগা। তথাস্তু। সুমেরদাসজীর পুরশ্চরণপর্ব বেলা একটায় শেষ হল। ধর্মশালায় আহার বিশ্রাম সেরে চারটার সময় রেস্ট হাউসে গিয়ে মবলঙ্করজীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম।

নর্মদা মন্দির আর কোটিতীর্থের মাঝখানের লালমাটির রাস্তা গিয়েছে পূর্বদিকে। নর্মদা মন্দিরের প্রাচীর ছাড়িয়ে দুধারে উন্মুক্ত প্রান্তর কাঁটা ও গুল্মে ভরে আছে। তারই মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে। জনমানুষ নাই, একটা গরু-মহিষকেও এদিকে চরতে দেখলাম না। পেছনে ঘনঘোর জঙ্গল। বনের মুখেই বিশাল উঁচু এলাকা। সেইখানে অতি পুরানো যুগের পাঁচটি মন্দির জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। লাল পাথরে তৈরি অপূর্ব তাদের কারুকার্য - একটির নাম রংমহল, একটির নাম কেশবনারায়ণ, একটি মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং সর্বোচ্চ সর্বপ্রধানটির নাম কর্ণমন্দির। মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির দেখে অবাক হলাম, শিবকল্প এই মহাযোগী ছিলেন মহাযোগেশ্বর গোরক্ষনাথজীর গুরুদেব। নর্মদা মন্দিরের চত্বরে আছে গোরক্ষনাথজীর মন্দির আর এখানে দেখছি তাঁর গুরু সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথজী। গুরু শিষ্য উভয়েই তাহলে কোন-না-কোন সময়ে নর্মদা তটে তপস্যা করেছিলেন

মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে পরম সিদ্ধি অর্জন করতে হলে নর্মদাতটে তপস্যা করতেই হবে। সেখানে যুগ যুগ ধরে মহাত্মারা তপস্যা করেন, তাঁদের স্থলদেবতাকে অবলম্বন করে চিৎশক্তির অবতরন ঘটে। তার ফলে তপস্যাস্থলীর সমগ্র পরিমণ্ডল শুদ্ধ তড়িৎকণায় **surcharged** হয়ে পড়ে। পরবর্তী কোন সাধক সেইখানে বসে তপশ্চরণ করলে তাঁর সহজেই মনঃসংযম হয়। ধ্যান কেন্দ্রীভূত হয় ইষ্টবস্তুতে। নর্মদা মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াও যুগ যুগ ধরে শত শত ধ্যানীপুরুষের স্পর্শ-পূত পরিমণ্ডলে সাধনা করলে উত্তর-সাধকদের সমগ্র সত্তার দ্রুত বিশুদ্ধি ঘটে।

মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরে দেখলাম দশ-বার জন দীর্ঘদেহী নাঁগা সাধু বসে আছেন, তাঁদের সামনে ধুনি জ্বলছে। তাঁরা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন প্রায় সাতফুট লম্বা এক জটাজুট সাধু - সম্পূর্ণ নাঙ্গা। এত বড় দীর্ঘদেহী ভীমকান্ত সাধুকে সহসা দেখে হকচকিয়ে গেছলাম। আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতেই তিনি আমাকে বললেন - লেও বাচ্চা, এ-চিজ্ রাখ দেও। তিনি একটা পাতায় মুড়ে আমার হাতে কিছু দিলেন। মবলঙ্করজী তাঁর পায়ের কাছে পাঁচ টাকার* একটা নোট প্রণামী দিলেন, সাধু কিন্তু ঘুরেও তাকালেন না, পেছন ফিরে গর্ভগৃহে ঢুকে গেলেন, নোটটা বাতাসে উড়ে তিন হাত দূরে পড়ে রইল।

পাতার মোড়ক খুলে দেখি, তার মধ্যে একটি ছোট মোড়কে কিছু সাদা ভস্ম এবং শুকনো একগুচ্ছ ঘাসের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে খেসারির বুটির মত কিছু দানা লেগে রয়েছে। সুমেরদাসজী দেখেই বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, ইয়েতো নর্মদা মাতাজী কা খাস্ পরসাদী হ্যায়। ইহ্ বিভূতি ঔর ব্রাহ্মীবুটি।

আমি তার থেকে কিছু মবলঙ্করজী এবং সুমেরদাসজীকে দিতে চাইলাম। কিন্তু সুমেরদাসজী নিজেও নিলেন না, অধ্যাপক সাহেবকেও নিতে দিলেন না। বললেন - ক্যা আপ্ আপকে পিতাজীকে পাশ নেহি শুনা - দেওতাকো পরসাদী বাঁটো, সাধুকা পরসাদী খুদ্ সাঁটো। দেবতার প্রসাদ সকলে ভাগ করে খেতে হয় কিন্তু সাধুর প্রসাদ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। মহাত্মা যাকে দেন, তারই তাতে মঙ্গল, অপরের তাতে কোন ফল হয় না কারণ সাধুর তৎকালীন সংকল্পজাত কল্যান কামনা সেই বিশেষ লোকটিকে কেন্দ্র করেই জাগে।

ব্রাহ্মীবুটি স্বরভঙ্গ দোষ দূর করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ্ বায়ু পিত্তের সাম্য ঘটায় এবং যোগীর দেহকে যোগাগ্নি পরিপক্ক হতে সাহায্য করে।

আমরা ধীরে ধীরে কর্ণমন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারদিকে নিস্তব্ধ নির্জন। সুমেরদাসজী বললেন, এই মন্দির নাকি কুন্তীপুত্র মহাবীর কর্ণ স্থাপন করেছিলেন। তিনি অসাধারণ দাতা, অসাধারণ সূর্যভক্ত এবং অসাধারণ মহারথী হয়েও যে দুঃশাসন কর্তৃক রজঃস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত জঘন্য কাজ বিনা প্রতিবাদে দর্শন করেছিলেন, সেই পাপস্খলনের জন্যই এখানে তাঁকে তপস্যা করতে হয়েছিল।

পাছে সুমেরদাসজী চটে যান, এই জন্য তাঁকে আড়াল করে মবলঙ্করজী চুপি চুপি আমাকে ইংরাজীতে জানালেন যে এই কর্ণমন্দির অমরকন্টকের প্রাচীনতম মন্দির। মহাভারতের কর্ণ এটি নির্মাণ করেন নি। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কর্ণদেব। গৌরদের রাজত্বকাল শেষ হলে সমগ্র ভারতে কলচুরি বংশের আধিপত্য স্থাপিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। কর্ণদেব চেদী মহাচন্দ্র নামে বিখ্যাত ছিলেন।

পরদিন সকালেই অধ্যাপক মবলঙ্করজী আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র নাগপুরে ফিরে গেলেন, আমি হরকিষণজীর সঙ্গে ভৃগু কমণ্ডল্ দেখতে যাত্রা করলাম। হরকিষণজী আমাকে ধূনিপানি নিয়ে গেল প্রথমে, সে বলল - ইধর্ মহর্ষি ভৃগুজীকা ধূনি থা। ইস্ ধূনি সে আভি পানি নিকালতে হৈ। ইহ্ সারি অমরকন্টক ভৃগুজীকা তপোভূমি হৈ। আমি দেখলাম কোথা হতে ভেদ করে জল নির্গত হয়ে একটি প্রাকৃতিক ছোট হ্রদ সৃষ্টি করেছে। কাকচক্ষু জল। সেই হ্রদের পাড়েই রয়েছে কয়েকটি বড় বড় বাতাবি লেবুর গাছ এবং পেঁপে গাছ। এখানে আমার দু-চার মিনিটও অপেক্ষা করতে ইচ্ছা হয় নি, আমার যা কিছু আগ্রহ ছিল ভৃগু কমণ্ডল দেখার। অমরকন্টক হতে প্রায় সাড়ে চার মাইল রাস্তা, সেই এবড়ো খেবড়ো দুর্গম পথ, বিশাল ঘাসবন পেরিয়ে হেঁটে পৌঁছলাম ভৃগু কমণ্ডলুতে। পর্বতগাত্রে একটি গুহামুখ দেখলাম। সেই গুহামুখ হতে একটি ক্ষীণ জলপ্রপাত বেরিয়ে আসছে।

---

* ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৯ সালে, সাধারন ভাবে মনে হতে পারে পাঁচ টাকা আর বেশি কি। কিন্তু একটু ভাল করে ভাবলেই তৎকালিন পাঁচ টাকার মূল্য সহযেই অনুমেয়। প্রকৃত সাধু-মহাত্মাদের কাছে টাকা বা খ্যাতির কোনই চাহিদা নেই।

গুহামুখটিই আশ্চর্য। ঠিক যেন একটি কমণ্ডলুর আকৃতি, প্রকৃতির কি অদ্ভুত রহস্য। হরকিষেণের কাছে শুনলাম, এইখান হতে নির্গত জল পাহাড়ের স্তর ভেদ করে যেখানে গিয়ে অনবরত চুইয়ে চুইয়ে মাটির উপর এসেছে, সেইখানেই পূর্বে বাঁশবন ছিল, তারই উপর এখন নর্মদা-উদগম মন্দির গড়ে উঠেছে, সেইজন্য বলা হয় যে বংশকুণ্ড হতে নর্মদার উৎপত্তি।

ভৃগু কমণ্ডল দেখতে দেখতে অনেক কথাই মনে হতে লাগল। মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞসম্ভব ঋষি। একবার ব্রহ্মা, বরুণের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞাগ্নি হতেই ভৃগু আবির্ভূত হন, সয়ম্ভূ ঋষি। মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি ভৃগুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সমীহ করে চলতেন, সামান্য আতিথ্যের ত্রুটি হওয়ায় তিনি একবার ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেন। সেই ভৃগু পদচিহ্ন ভগবান সাদরে বক্ষে ধারন করে আছেন - এইসব বর্ণনা মহাভারত ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তার থেকে এই সারমর্ম বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতে মহর্ষি ভৃগুর অসামান্য প্রভাব ছিল। ইনিই ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরই পৌত্র ছিলেন জামদগ্নি এবং প্রপৌত্র ছিলেন ভগবান পরশুরাম। তাঁরা ছাড়াও ভৃগু বংশে অনেক শ্রুতকীর্তি বীর এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি ভৃগু ধনুর্বিদ্যারও জনক।

বিষ্ণুপুরাণে আছে - ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, মনুসংহিতা মতে ইনি দশ জন প্রজাপতির অন্যতম। কর্দম ঋষির কন্যা খ্যাতি তাঁর স্ত্রী ছিলেন, এই খ্যাতির গর্ভেই ধাতা এবং বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী জন্মগ্রহন করেন। ভৃগু সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। শাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রতিদিন তর্পণকালে প্রত্যেককেই এই যজ্ঞসম্ভব মহর্ষির উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে হয়।

এইভাবে শুধু মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণেই মহর্ষি ভৃগুর প্রসঙ্গ ছড়িয়ে নেই, ঋগ্বেদের একাধিক স্থানেও মহর্ষি ভৃগু প্রসঙ্গে যে সব কথা আছে তাতে বুঝা যায়, যোগাগ্নি যজ্ঞাগ্নি এবং আদিত্যমণ্ডলস্থিত যে দিব্যতেজ - তারই প্রতীক হলেন মহর্ষি ভৃগু। ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, তার থেকে ভৃগু এবং ভৃগুবংশীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পরিচয় পাবেন।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৬০ সূক্তে ১ম মন্ত্রে আছে -

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোর্থম্।
দ্বিজম্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ ভৃগবে মাতরিশ্বা ॥

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা গৌতম ঋষির পুত্র নোধা ঋষি। এর সরল অর্থ এই যে অগ্নি হব্য বাহক, তিনিই দেবতাদের নিকট নিরন্তর হব্য বহন করে থাকেন। ভৃগু ও ভৃগুবংশীয়গণের তপোবলে প্রসন্ন হয়ে মাতরিশ্বা স্বয়ং সেই দিব্য অগ্নিকে মর্তে আনয়ন করলেন।

নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক মাতরিশ্বার অর্থ করেছেন বায়ু। মনে রাখবেন বেদে বায়ু বলতে সাধারণ অর্থে বাতাস নয়, বায়ুর অর্থ প্রাণব্রহ্ম। সায়নাচার্যের মতে 'মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ততে যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ'। মাতরিশ্বা বিবস্বানের জন্য দূতরূপে আকাশ হতে ব্রহ্মাগ্নির রহস্য ভৃগু ও তাঁর উত্তরসাধকদের নিকট প্রকট করে দেন। মর্ত্যবাসী সাধকরা ভৃগুদের কাছ থেকেই যজ্ঞাগ্নির রহস্য অবগত হয়েছেন। তাহলে বেদমন্ত্র হতে বোঝা যাচ্ছে, ভৃগু এবং তদ্বংশীয়রাই যজ্ঞ প্রবর্তক।

ঐ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের দশ নং মন্ত্রের দ্রষ্টা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। তৃতীয় ভৃগুতত্ত্বের গূঢ় রহস্য আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছেন -

উদস্তংভীৎসমিধা নাকমস্বোগ্নি র্ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে ॥

অর্থাৎ মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য যখন গুহাস্থিত হব্য বাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন তখন তেজোময় পদার্থের মধ্যে সর্বোত্তম তেজঃস্বরূপ অগ্নি ভৃগুদের তপস্যার তেজে এমনই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে স্বর্গের জ্যোতিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আচার্য সায়ন এখানে 'ভৃগুভঃ' শব্দের অর্থ করেছেন আদিত্যস্য রশ্মিভ্যঃ।

একটি শালগাছে হেলান দিয়ে বসেছিলাম কমণ্ডলুর মত দেখতে বিচিত্র সেই গুহামুখের দিকে তাকিয়ে। অদৃশ্য উৎস থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। মনের মধ্যে গুণগুণ করছে গুহা সন্তং হব্যবাহং সমিধে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, তার ম্লান রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে বিন্ধ্যপর্বতের সর্বত্র, ঘন অরণ্যের নীলাভ বর্ণের সঙ্গে যেন কোলাকুলি করছে সেই রশ্মি।

এক অবর্ণনীয় শোভা! সেই অবস্থাতেই মনের চির - চটুল স্বভাব দেখে কৌতুক বোধ করলাম। বেদমন্ত্রের আলোতে ভৃগু শব্দের গূঢ় তাৎপর্য নির্ণয়ে যখন তন্ময় ছিলাম, সহসা মন স্মরন করিয়ে দিল যে ভৃগু শব্দের আভিধানিক অর্থ - পর্বতের সানুদেশ, অত্যুচ্চ স্থান, পর্বতের ঢাল। ভ্রসজ্ ধাতুর কু প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ভৃগু শব্দে শিবকেও বোঝায়। শিবময়ী নর্মদা তীর্থে বসে ঐসব কথা ভাবতে ভাবতে কি যে হল, মনে হল যে আমার স্নায়ুশিরা মাংসপেশী সব আলগা হয়ে গেছে। আমি যেন আর আমাতে নাই। সহসা চোখের সামনে এক নুতন দৃশ্যপট ভেসে উঠল - আকাশপটে দাঁড়িয়ে আছেন শ্বেতশ্মশ্রু এক জটাজূট ঋষি, সমগ্র অমরকণ্টক পর্বতটাই যেন তার হস্তস্থিত একটি কমণ্ডল, আর সেই কমণ্ডলুর মুখ থেকে তর্ তর্ করে গড়িয়ে পড়েছে জ্যোতি বিজড়িত জলের ধারা।

হঠাৎ কানে গেল - উঠিয়ে জী, আভি চল্ পড়ে, সামকা বখত্ ইধর শের ঔর ভাল্লুকা বহত্ ডর হ্যায়। হরকিষণের তাগিদে জেগে উঠলাম। ভূলুন্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি ভৃগুর উদ্দেশ্যে।

সমগ্র অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। হরকিষণকে বললাম - ভাইয়া তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়, থোরা দূর তক্ মেরে হাথ্ পাকড়কে লে চলিয়ে, আহিস্তা আহিস্তা হম্ ঠিক হো যাবেগা।

আজ মনে হল, নর্মদাতীর্থে আসা আমার সার্থক হয়েছে।

ধর্মশালায় যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অমরকণ্টক পর্বত তখন ঢেকে গেছে নিথর অন্ধকারে। ফাটকে ঢুকে দেখলাম, ভোজন বানাতে বানাতে সুমেরদাসজী আপনমনে গেয়ে চলেছেন,

সুরতিয়া সুরতিয়া সুরতিয়া হো।
সুরত্ নিরত্ মন পাবন পর সোহং সোহং হোয়।
শিব মন্তর রেবা দিয়া অমর ভই হৈ সোয় ॥
শুন বিদেশি ধ্যেয়ান ধর বৈঠো ত্রিকোটী তীর।
মান - সরবর হংস হৈ বাণী ককিলকীর ॥
সুরতিয়া সুরতিয়া সুরতিয়া হো।

অমরকণ্টকে আজ আমার সপ্তম দিন। সুমেরদাসজীর জপ্-পুরশ্চরণাদীর কাজ শেষ হয়েছে। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কণ্ডেয় আশ্রম দেখাতে চললেন। নর্মদা মন্দির থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অগ্নিকোণে এই আশ্রম। এত কাছে, যেখানে পূর্বেই যাওয়া উচিৎ ছিল, অথচ হরকিষণ এতদিন নিয়ে যায় নি, এজন্য তাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন।

ভর্তসনা করার কারণ এই যে - সপ্তকল্পান্তজীবি মহামুনি মার্কণ্ডেয় মুনি হলেন নর্মদা মহিমার প্রথম উৎগাতা। যে নর্মদা পরিক্রমায় সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হয় ত্যাগ তিতিক্ষা সহনশীলতা ধৈর্য্য শম্, দমাদি ষট গুণ সমস্ত পরিক্রমাকারীর স্বভাবগত হয়, সর্বোপরি পদে পদে ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ় হয়; পৃথিবীতে সেই বার্তা সর্বপ্রথম ঘোষনা করেছিলেন মার্কণ্ডেয়। তিনি প্রথম জগৎবাসীকে জানিয়েছেন যে হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, নাদযোগ, অব্যয়যোগ প্রভৃতির মত নর্মদা - মার্গ একটি সিদ্ধমার্গ।

প্রজাপতি কর্দম ঋষির কন্যা খ্যাতির পুত্র ছিলেন ঋষি মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডু প্রৌঢ় বয়েসে উপনিত হলেন, তবুও তার কোন পুত্র হল না। লুপ্ত পিণ্ডদক্ ক্রিয়া - এই ভয়ে তিনি শিব সাধনা শুরু করলেন। তার কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে বিশ্বেশ্বর তাঁর কাছে প্রকট হলেন। মৃকণ্ডু তার কাছে একটি পুত্র লাভের বর চাইলেন। মহাদেব বললেন - কিরকম পুত্র চাও তুমি ? আমার বরে তোমার একটি শতবর্ষজীবি পুত্র হতে পারে কিন্তু সে মুর্খ্য হবে। পরিবর্তে মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র তুমি পেতে পার কিন্তু সে হবে অল্পায়ু, মাত্র চৌদ্দ বৎসর বেঁচে থাকবে। মৃকণ্ডু জানালেন - প্রভু একটি স্বল্পায়ু পুত্র হোক কিন্তু সে যেন ঋষিত্ব অর্জন করতে পারে। মুর্খ্য পুত্র বংশের কলঙ্ক ও অভিশাপ স্বরূপ।

শঙ্করের আশির্বাদে যথাকালে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহন করলেন।

মৃকণ্ডু ও তাঁর পত্নী পুত্রলাভে আনন্দিত হলেও মার্কণ্ডেয় যত বড় হতে লাগলেন, পুত্রের অল্পায়ুর কথা চিন্তা করে, ততই তারা ম্রিয়মান হয়ে পরলেন। নয় বৎসর বয়সে পদার্পন করতেই মৃকণ্ডু পুত্রের উপনয়ন দিলেন।

উপনয়নকালে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণকে। আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন এখনও আমাদের দেশে সদ্য উপনীত ব্রহ্মচারীকে আশীর্বাদ করার বেদমন্ত্র হল - ত্বং জীব শরদঃ শতং। আয়ুষ্মান্ তেজস্বী বরচস্বীভূয়াঃ। অর্থাৎ একশত বৎসর পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকো। আয়ুষ্মান তেজস্বী ও বর্চস্বী হও। আশির্বাদবাক্য শুনে মৃকণ্ডু সাশ্রুনয়নে পুজ্যপাদ ঋষিগণকে জানালেন - আপনারা আমার পুত্রকে চিরজীবী হবার আশীর্বাদ করলেন, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। আশা করছি ঋষিবাক্য মিথ্যা হবে না, কিন্তু স্বয়ং শিব বলেছেন বালক চৌদ্দ বৎসর বয়সের বেশী বাঁচবে না। মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন - তাতে কি হয়েছে। আমাদের বাক্য মিথ্যা হবে না। মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করে বললেন - তুমি এইখানে এই নর্মদাক্ষেত্রে বসেই শিবের তপস্যা কর। যিনি স্বল্পায়ু দান করেছেন, সেই আশুতোষই তোমাকে চিরায়ু করবেন।

যদ্ দুরাপং যদ্ দুর্লভং দুস্তরং দুর্গমেব চ।
তৎ সর্বং তপস্যা প্রাপ্য তাপোহি দুরতিক্রমঃ॥

- জগতে যা কিছু দুঃসাধ্য, দুর্লভ, দুর্গম বা দুরতিক্রমনীয় সেই সমস্তই তপস্যার বলে সুসাধ্য, সুগম, সহজলভ্য হয়ে যায়। তপস্যার শক্তিকে কেউ রদ করতে পারে না।

মার্কণ্ডেয় সেই ঋষিবাক্য শিরোধার্য করে তপস্যার পথ বেছে নিলেন। সেই তপস্যা ছিল তার রেবা বা নর্মদাতটের তপস্যা। শিবের তপস্যা। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত মার্কণ্ডেয় হলেন ধ্যানমগ্ন। বহু যুগ কেটে গেল, বালক মার্কণ্ডেয় বৃদ্ধত্বে উপনীত হলেন তাঁর ধ্যানাসনে বসে। অবশেষে দুশ্চর তপস্যার শেষ হল। শিবশংকর দর্শন দিয়ে বললেন -

তুষ্টস্তস্মৈ বরং প্রাদাদ্ ব্রহ্মো বৃদ্ধ তপস্বিনে।
অলং বিলম্ব্য যাচস্ব কস্তে দেয়ো বরো ময়া॥

আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট। বিলম্বে কি প্রয়োজন। কি বর তুমি প্রার্থনা কর, আমাকে বল।

মার্কণ্ডেয় যুক্তকরে নিবেদন করলেন -

যদি প্রসন্নো ভগবন্ অমরত্বং দেহি প্রভো।
তপো এব পরো ধর্মস্তপ এব পরং বসু।
ততঃ তপশ্চরিস্যামি লোকদ্বয় মহত্বদম্।
সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ মমতপঃ প্রভাবতঃ॥

ভগবান্! আপনি যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমাকে অমরত্ব দান করুন। তপস্যাই পরম ধর্ম; তপস্যাই পরম সম্পদ। আমি চিরকাল ধরে ইহলোক এবং পরলোকের হিতকর তপস্যার অনুষ্ঠান করব, আমার তপস্যা প্রভাবে যেন সকলের মঙ্গল হয়।

সর্বলোকের হিতকর তপস্যার অনুষ্ঠান করব, মার্কণ্ডেয়ের এই সাধু সংকল্পের কথা শুনে আশুতোষ খুবই প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন - মার্কণ্ডেয়, আমার আশীর্বাদে তুমি সপ্তকল্পান্তজীবী হবে। তুমি 'রেবা' মন্ত্র জপ কর। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে তুমি এক মহাকুমারী মন্যার দর্শন পাবে, প্রতি কল্পান্তে প্লাবনের মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি যখন বিনষ্ট; সমস্ত জগৎ যখন মহাসমুদ্রে বিলীন - সেই চরমতম সংকটকালে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। এই যে উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালা, এই দুটি যেখানে এসে সংযুক্ত হয়েছে তার নাম মেকল, ঋষ্য বা অমরকণ্টক। এইখান থেকে পশ্চিমগামিনী যে জলধারা নির্গত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এই নদীই রেবা। সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে যেখানে মহা আবর্তসঙ্কুলা, শুভ্রফেনতরঙ্গান্বিতা হয়েও এই কামগামিনী নদী আপন স্বরূপে স্থিত আছে। আমি যে মহাকুমারীর কথা বললাম - ঐ নদীরূপই তাঁর বহিরঙ্গরূপ। ঐ সিদ্ধক্ষেত্রে বসে তপস্যা কর বৎস, তপস্যা কর তাঁর দর্শন পাবে।

মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

শুলপাণির নির্দেশে যেখানে বসে মার্কণ্ডেয় তপস্যা করেছিলেন, তারই নাম মার্কণ্ডেয় আশ্রম। সুমেরদাসজীর সঙ্গে পৌছে গেলাম সেই আশ্রমে। আশ্রমই বটে, চারধারে বড় বড় বটগাছ, সাজা ও শালগাছ এছাড়া কয়েকটি আমলকী ও হরিতকীর গাছও আছে। বিশাল এক বট-বৃক্ষছায়ায় কয়েকটি প্রাচীন দেব-দেবীর মুর্তিও দেখলাম। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণগুলিতে প্রাচীন ঋষিগণের মনোরম তপোবনের যে আলেখ্য আঁকা আছে, এই আশ্রমটিকে সেইরকম শান্তিশ্রীবিমণ্ডিত তপোবন বলেই মনে হল।

সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হলাম আশ্রমে ঢুকেই। সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, মিট্টিমেঁ ক্যা হৈ, উধর চলিয়ে এক সিদ্ধযোগীভি ইধর বিরাজমান হৈ।

আমি বললাম স্বামীজী, মহাত্মাকে তো দর্শন করবই তবে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যেখানে বসে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানের মাটিও পবিত্র। আজকাল বৈজ্ঞানিকরাই আবিষ্কার করতে পেরেছেন যে কোন গৃহে কেউ দীর্ঘদিন বাস করে গেলে গৃহের প্রতি ইটেই বসবাসকারীর ছাপ বা চিহ্ন থেকে যায়, বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফটো তুললে তাতে তার মোটামুটি একটা রেখাচিত্রও ফুটে ওঠে। আর এ-ত মহাযোগীর স্পর্শ-পূত স্থান। এখানকার সমগ্র পরিমণ্ডলেই চিৎকণায় পূর্ণ আছে।

সুমেরদাসজী আশ্রমের উত্তরদিকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম গাছের তলায় একটি বাঁধানো বেদীতে বসে একজন বৃদ্ধ সাধু অস্ফুট কণ্ঠে 'রেবা রেবা' জপ্ করছেন। সাধুর নাম শিউপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

প্রণাম করে আধঘন্টা বসার পর সাধু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন, সুমেরদাসজীর কাছে আমার পরিচয় নিলেন।

বললেন - সব্ কুছ্ দেখ্ চুকা ? মৎস্যেন্দ্রনাথজীকা মন্দিরমেঁ গয়ে থে ? যা-যা দেখেছি সবই তাঁকে বললাম।

- মৎস্যেন্দ্রনাথজীকা মন্দিরমে যো দীর্ঘদেহী মহাত্মাকো দেখা হ্যায়, উনোনে নাথপন্থী, বহুৎ উচ্চকোটিকা মহাত্মা হৈ, উনকা গুরুজী উনকা নাম দিয়া শংকরনাথ। কাফি বিদ্বান, বিলায়েৎসে ডিগ্রী লিয়া, পাঁচ-সাত ভাষা ভি জানতা হৈ। এ্যায়সা পৌছে হুয়ে মহাত্মাকো যেৎনা দফে দর্শন করেগা উসমে আপকা ফায়দা হোগা। আমি সশ্রদ্ধ ভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - এখানে নর্মদা মন্দিরে, কর্ণমন্দিরে সর্বত্রই দেখছি, সকলেই নিরন্তর 'রেবা রেবা' জপ্ করে চলেছেন। আমার সাথী এই স্বামীজীও 'রেবা রেবা' করেন, আপনাকে এসে দেখলাম, আপনিও রেবা মন্ত্র জপ্ করে চলেছেন। এর কারণ কি? বেদের চারি মহামন্ত্র ছাড়া আমাদের শাস্ত্রে বহু সিদ্ধনামের উল্লেখ আছে, গুরু পরম্পরা চলে আসছে এমন অনেক সিদ্ধ মন্ত্রও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, যেমন - শিবমন্ত্র, রামমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, আরও কত কি। নর্মদাতটে এসেই শুধু দেখছি, এখানে 'রেবা' এই দ্বাক্ষর মন্ত্রই সকলের জপমন্ত্র - এর তাৎপর্য কি ? নর্মদার অপরনাম রেবাই বা হল না কেন ?

মৃদু হেসে সাধু উত্তর দিলেন - মহাদেব মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন 'রেবা' মন্ত্র জপ্ করতে। পঞ্চাননের মুখ থেকেই বেদ প্রকট হয়েছে পৃথিবীতে, আগম-নিগমের যত রহস্য-মন্ত্র তারও বক্তা মহেশ্বর; তিনিই আদি ভগবান। সমস্ত যোগশাস্ত্রের কর্তা এবং বক্তা স্বয়ং প্রভু হিরণ্যগর্ভ। রেবা মন্ত্রটিও শিববাক্য। মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরের নিজ মুখ হতে ব্যক্ত বলে রেবা শব্দও মহাচিন্ময় মহাসিদ্ধ মন্ত্র। বৈদিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত নর্মদাতটবাসী লক্ষ লক্ষ সাধকও এই মন্ত্র জপ্ করে মন্ত্রের সিদ্ধ প্রভাব উপলব্ধি করেছেন। তাই এখানে সবাই রেবা মন্ত্রই জপ করেন, শিববাক্যানুসারে রেবা রেবা জপ্ করলে নর্মদা মায়ীর কৃপালাভ হয়, ইষ্টদর্শন হয়। এইজন্য রেবা শব্দই আমাদের পারের কড়ি, একমাত্র শেষের সম্বল।

নর্মদার রেবা নামের আর একটি কারণ এই যে -

ভিত্বা শৈলঞ্চ বিপুলং প্রযাতেব্যং মহার্ণবং
ভ্রাময়ন্তী দিশঃ সর্বা রবেন মহতা পুরা।
প্লাবয়ন্তী বিরাজন্তী তেন রেবা ইতি স্মৃতা ॥

অর্থাৎ নর্মদা নদী পর্বত ভেদ করে বিপুল হর্ষে উচ্ছল গতিতে মহার্ণবের দিকে ধাবিত হলেন। তিনি যখন মহার্ণবে পতিত হন তখন মহারবে দিগ্-দিগন্ত বিভ্রান্ত ও প্লাবিত করে তিনি প্রবাহিত হয়েছিলেন, এইজন্য নর্মদার নাম হয়েছিল রেবা।

এছাড়া এর একটি যৌগিক অর্থও আছে। রামায়নের যুগে এই অমরকন্টক পর্বতকে বলা হত ত্রিকূট পর্বত। যোগশাস্ত্রে ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার সংযোগস্থলকে বলা হয় ত্রিকুটি। ত্রিকুটি হতেই জীব - চৈতন্যের ধারা যখন সহস্রারস্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সাগরের সাথে মিলিত হতে যায় তখন মহাউদগীথনাদ প্রকট হয়। নর্মদা তটে সাধনা করলে সাধক সহজেই মহাউদগীথনাদ বা রবের সন্ধান পায়। সেই গুঢ় অর্থেই নর্মদার সিদ্ধ নাম রেবা।

জিজ্ঞাসা করলাম - বেদে কি এই রেবা নাম আছে ? - বললেন - আমার জানা নাই। বেদ আমি পড়িনি। আপনার মহাগুরু পিতাজীর কাছ থেকে জেনে নেবেন।

- আপনি কি করে জানলেন আমার বাবা বেদজ্ঞ ?

হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন - নর্মদা মাইকী কৃপাসে।

একজন সত্যিকারের সাধুর দর্শন পেলাম। সুমেরদাসজী সাধুজীকে আলিঙ্গন করে উঠে পড়লেন - বস্ করোজী। অভি চলেঙ্গে। আমি প্রণাম করার উপক্রম করতেই বললেন - থাক, থাক, প্রণাম করতে হবে না। প্রণাম করুন মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে নর্মদা মায়ীর রহস্য কেউ জানতে পারে না। দিব্য নর্মদা মন্দিরের দিব্য তোরণের দ্বারী হলেন মার্কণ্ডেয়।

তিনি নিজ মুখে বলেছেন - সেই স্বমহিমায় নিত্য প্রতিষ্ঠাতা মহাতটিনীর বক্ষে আমি দেখলাম একার্ণবে ভ্রমত্যেকা চন্দ্র নিভাননা দেবীকে। মহাবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম - কে তুমি মা ? তুমি কি বেদমাতা গায়ত্রী কিংবা বাগদেবী সরস্বতী ? তুমি কি সাগরোত্থিতা লক্ষ্মী অথবা শিখরবাসিনী উমা ? তুমি কি সরিতম্বরা স্বর্গমন্দাকিনী অথবা কালরাত্রি করালিনী ?

সেই দেবী আমাকে অভয় দিয়ে বললেন - প্রতি কল্পান্তকালে প্রলয় পয়োধি নীরে সেই অন্তবিহীন একার্ণবে একাকী যখন সন্তরন করতে থাকবে তখন আমিই তোমাকে রক্ষা করব।

আমি হলাম রুদ্রতেজ-সমুদ্ভুতা পাপহরা স্রোতস্বতী, অমৃতময়ী নর্মদা।

মার্কণ্ডেয় আশ্রম হতে ফিরে ধর্মশালায় আহারাদি সেরে কিছুক্ষন বিশ্রাম করলাম। বেলা চারটা নাগাদ আবার বেড়াতে গেলাম একা একা মৎসেন্দ্রনাথের মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে দেখলাম আগের দিনের মতই দশ-বার জন নাঁগা ধুনি জ্বেলে বসে আছেন, নিজেরা যে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে ধ্যান করছেন। আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকালেন না। মন্দিরের পেছন দিকে একজন বসে আছেন। তিনি ইসারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন - মন্দিরের গর্ভগৃহে যে জটাজুট দীর্ঘদেহী মহাপুরুষ বসে আছেন। তিনি স্বেচ্ছায় বাক্যালাপ না করলে তাঁর কাছে যাবেন না। পূর্বাশ্রমে উনি মহাবিদ্বান ছিলেন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে উনি নর্মদা পরিক্রমা করছেন, নর্মদা মায়ীর দর্শন পেয়েছেন, এমনিতে কারও সঙ্গে কথা বলেন না। অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও ভীষণ ভয় করেন, মাঝে মাঝে রুদ্ররূপ ধারণ করেন, চিমটা প্রহারে ভক্ত বা দর্শনার্থীকে জর্জরিত করে ছেড়ে দেন। এইজন্য আপনাকে সাবধান করে দিলাম। আপনার অল্প বয়স। এই বয়সে কৌতূহল এবং প্রগলভ জিজ্ঞাসা অনেক থাকে।

আমি তাঁকে বললাম - আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাত্মাকে আমি কোন মতেই বিরক্ত করব না।

সামনের দিকে এসে দেখি, মহাত্মা গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসে বসে আছেন। আমাকে কাছে ডেকে বসতে বললেন। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে প্রণাম করলাম। চমকে গেলাম হাসিমুখে আমাকে বলছেন - কোঈ পুছনা হ্যায় তো পুছিয়ে। নর্মদা মায়ী আপকো মঙ্গল করেগা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম - মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে সপ্তকল্পান্তজীবী বলা হয়। এই সপ্তকল্প কি কি ?

উত্তর দিলেন- এই সপ্ত কল্প হল - মায়ূর, কৌম্য, পুর, কৌশিক, মাৎস, দ্বিরাদ ও বরাহ। এক এক কল্পের শেষে পৃথিবীর বুকে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছে - প্রলয়ের অবস্থা।

- সেই সব প্রলয়ে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলেও কেবল মার্কণ্ডেয় মুনি বেচেঁছিলেন বা আজও বেঁচে আছেন, এই বা কেমন কথা ? সমগ্র সৃষ্টি যখন একাকার হয়ে গেছে সেই সময় শুধু নর্মদা তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন, মার্কণ্ডেয়কে আশ্রয় দিয়েছেন - একি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার মাত্র ?

- মহাকুমারী নর্মদা মায়ী সৃষ্টি ও সভ্যতার বিধাত্রী এবং পালয়িত্রী দেবী। ঐ অতীন্দ্রিয় রহস্য বুদ্ধির ঘাটে বসে ধারণা করা যাবে না। তপস্যা চাই।

নাঁগা সাধুদেরকে বিস্মিত করে তিনি বলতে লাগলেন - এই নর্মদা তীরেই সুপ্রাচীন চেদীরাজ্য ছিল। সেখানকার একজন রাজা ছিলেন শিশুপাল। মহাবীর রাবণজয়ী কার্তবীর্যার্জুনের প্রাচীন মাহিষ্মতী নগরীও এই নর্মদাতটে ছিল। বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যে প্রবাহিত এই নর্মদাতটেই লেখা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবন্ত ইতিহাস। যা অশেষ গবেষনার দাবী রাখে।

আনন্দের কথা, নর্মদা মায়ীর ইচ্ছায় এই শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই দেশ-বিদেশের বহু গবেষক পণ্ডিত নর্মদা উপত্যকার প্রাক-ইতিহাস ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা নর্মদাতটবাসী সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক পথে মহাসিদ্ধির নানাবিধ স্তর উদঘাটনের জন্য সাধনা বা গবেষণায় রত আছি। তেমনি নর্মদার বহিরঙ্গ দিক নিয়ে নানা তথ্য উদঘাটনে ব্রতী আছেন সত্যানুসন্ধানী পণ্ডিতরা। ১৯০৫ সালে বিশ্ববিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ আমার বন্ধু মিঃ পিলগ্রিম নর্মদাতীরে খননকার্য চালিয়ে এক প্রস্তর কুঠার আবিষ্কার করেছেন।

তিনি নিজে এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিকরা দৃঢ় নিশ্চয় হন যে এটি কোন প্রাকৃতিক প্রস্তর নয়, এটি হ'ল আদি প্রস্তর যুগের মানুষের হাতে তৈরি, সে যুগের ব্যবহারযোগ্য প্রস্তরাস্ত্র। পিলগ্রিমের এই ঘোষনার পর আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকবার এই নর্মদা উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। ইয়েল ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত অভিযানে অনেক নূতন তথ্য জানা গেছে। তোমাদের দেশের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল গবেষক এই অমরকন্টক থেকে নরসিংহপুর পর্যন্ত নর্মদা উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে অনুসন্ধান করেছেন। পুনা রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের গবেষকরা পশ্চিমাঞ্চলে মহেশ্বর এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ধার করেছেন। গবেষকরাও বিশেষ উৎসাহে গবেষনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ পর্যন্ত এইভাবে যত গবেষণা হয়েছে তাতে সবাই কৃতনিশ্চয় হয়েছেন যে নর্মদার তীরে তীরে যে মানব সভ্যতা, তা পাঁচ লক্ষ বছরেরও বেশি প্রাচীন। নর্মদা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে তাঁরা উদঘাটন করেছেন পুরাপুলীয় যুগের বহু প্রস্তরাস্ত্র এবং জান্তব ফসিল। প্রমাণিত হয়েছে এই যে, এই উপত্যকা পুরাপুলীয় মানব সভ্যতার এক বিশিষ্ট আধার। বিশ্ব-মানব সভ্যতার আদি বিকাশ মধ্যভারতের এই নর্মদা তীরেই মূর্ত হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

সেই আদিম কালের প্লাবন ও প্লাবনোত্তর যুগ মিলিয়ে নর্মদার ভূস্তরকে সাতটি বিভিন্ন স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি স্তরের মধ্যেই পুরাপুলীয় মানব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সাতটি স্তর সাতটি কল্প - সেই যে একটু আগেই বলেছি শাস্ত্র বর্ণিত মায়ুর, কৌর্ম, পুর, কৌশিক, মাৎস্য, দ্বিরদ ও বারাহ প্রভৃতি কালের কথা। প্রতিটি প্লাবন প্রলয়ে নর্মদা উপত্যকার আদি মানবসভ্যতা রক্ষা পেয়েছে - একে নর্মদা মায়ীর কৃপা ছাড়া আর কি বলব। পুরাপুলীয় যুগে টিকে থেকে থেকে পৌছেছে নবপলীয় সভ্যতায়। তারপরেও এগিয়ে চলেছে মানব-সভ্যতার ধারা।

আদিম সেই সপ্তকল্প ধরে মানব সন্তান মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করেছিলেন একার্ণবে ভ্রমত্যেকা অমৃতনির্ঝরিণী অমৃতময়ী নর্মদা।

কথা শেষ করেই মহাপুরুষ ত্বরিৎগতিতে মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে ঢুকে গেলেন।

নর্মদাতটবাসী এই মহাত্মার পাণ্ডিত্যের গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য, তাঁকেও নর্মদা নাঙ্গা ফকির করেছেন। তিনি খুঁজে পেয়েছেন নর্মদা মায়ীর মধ্যে অমৃতকে - যে অমৃত জগৎ ও জীবনকে ভুলিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মন্দিরে নর্মদা মা-কে প্রণাম করে ধর্মশালায় যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি সুমেরদাসজী এক উদাসী সাধুর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠিতে মত্ত। আমিও একধারে বসে গেলাম। উদাসী সাধু সুর করে গাইছেন -

বুঝ বুঝ পণ্ডিত পদ নিরবাণ।
বিনু গায়ন তহবাঁ উঠে গীত॥
নিত অমাবস নিত সংক্রান্ত।
হৃদয়া পরহন লাগু কোনখানা॥

সাঁঝা পর কহবাঁ বসে ভান।
চাহন্ প্যাস মন্দির মহি জহবাঁ।
নিত নিত নবগ্রহ বৈঁঠে পাঁত॥
কহহি কবীরা ইতনো নহি জান।

উঁচ নীচ পর্বত ঢেলা না ইঁট।
সহস্ত্রৌ ধেনু দুহাবে তঁহবা।
মৈঁতো পুছো পণ্ডিত জনা।
কৌন শব্দ গুরু লাগায়া কাণ॥

অর্থাৎ হে তত্ত্বজ্ঞ। নির্বাণ পদটি বুঝিয়া গ্রহণ কর। সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য কোথায় থাকেন বলিতে পার ? তথায় উচ্চ নাই নীচ নাই অর্থাৎ উচ্চনীচের ভেদাভেদজ্ঞান নাই, ইঁট নাই, পর্বত নাই। কেউ সেইখানে গান করছে না তথাপি সেখানে অগুঞ্জন মহাসঙ্গীতের তরঙ্গ উঠছে। তথায় কোন মন্দির নাই, বিচারক নাই, তৃষ্ণা নাই অথচ তথায় সহস্র সহস্র গাভীর যুগবৎ দোহন হচ্ছে। তথায় দেখি নিত্য অমাবস্যা বর্তমান, নিত্যে পৌর্ণমাসীও বিরাজিত। নবগ্রহগুলি সেখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করছে। হে তত্ত্বজ্ঞ, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি - কখন, কোন ক্ষণে হৃদয়ের গ্রহণ উপস্থিত হয় ? তুমি যদি এইটুকুও না জান, তাহলে গুরু তোমার কানে কোন্ মন্ত্র বা শব্দ প্রবেশ করালেন ?

গানের শেষে সুমেরদাসজী আখর টানলেন -

বুঝ বুঝ পণ্ডৎ পদ নিরবাণ।
রেবা জপো, রেবা তপো, রেবাসে সব কুছ্ জান্॥
সুরতিয়া সুরতিয়া সুরতিয়া হো॥

অমরকন্টক পাহাড়ে আজ নবম দিন। ভোরে উঠেই সুমেরদাসজী রুটি তৈরি করে নিয়েছেন। আমি স্নানের পর নর্মদা মন্দিরে গিয়ে হোম সেরে আসার পর বেলা নয়টা নাগাদ তিনি দেরি না করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কপিলধারার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, পূর্ব-পশ্চিমগামী অমরকন্টকের প্রধান রাস্তা ধরে। স্থানীয় লোকদের বসতি পেরিয়ে পর পর তিনটি নালা অতিক্রম করলাম। তার মধ্যে একটি নালার নাম - বৈতরণী। একদিকে নর্মদা তার তীরে তীরে ঘন অরণ্য, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র কুশজাতীয় ঘন সন্নিবিষ্ট তৃণে পরিপূর্ণ। সেই ঘাস ঠেলে যেতে যেতে দুজনেরই সর্বাঙ্গ ছড়ে যেতে লাগল। কোথাও এক মানুষ কোথাও বা দু-তিন মানুষ উঁচু দুর্ভেদ্য তৃণের প্রাচীর। তারই মধ্যে যে একটু ক্ষীণ পথের রেখা, তা চার-পাঁচবার খুঁজে খুঁজে বের করতে লাগলেন সুমেরদাসজী। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হাঁটার পরেই হঠাৎ তিনি আমার হাত জাপটে ধরে থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর আঙুলের ইশারা লক্ষ করে দেখতে গেলাম একটা পাঁচ-ছয় হাত লম্বা সাপ মাত্র দুই-তিন ফুট দূরেই পথের ওপর শুয়ে আছে। তার লেজ ও মাথা ঘাস বনের মধ্যে। সুমেরদাসজী আমাকে 'হর নর্মদে হর' জপ্ করতে বলে নিজেও আমার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে জপ্ করতে লাগলেন। মিনিট তিন-চার পরেই দেখলাম সাপটা ঘাস বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোনমতে অতিকষ্টে ঘাসবনের বাইরে পৌঁছে হাঁপ ছেড়ে বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, মুণ্ডমহারন্ নজ্জদিগ্ হৈ। দেখিয়ে দো কিসিমকা ছাপ, ইয়ে হৈ সম্বর হিরণকা ঔর ইয়ে হৈ শেরকা। সম্বর হরিণের পেছনে যে ব্যাঘ্র মহারাজ ধাওয়া করে গেছে, তার কলেবর কলিকাতার পশুশালার যে-কোন রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে লজ্জা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

নর্মদাকে বাঁয়ে রেখে উত্তর-পশ্চিম দিকে আমরা এগিয়ে চললাম, এবার পথ ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠছে, পাশাপাশি দুজন মানুষ এই খাড়া সংকীর্ণ পথে হাঁটিতে পারব না। সুমেরদাসজী আগে আর আমি তাঁর পেছনে, এইভাবে পাকদণ্ডী পথে ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগলাম। নিচেই খরস্রোতা নর্মদা গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। জঙ্গল ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দুধারে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির মাঝখানে যেটুকু ফাঁকা আছে, সেই সংকীর্ণ পাকদণ্ডী দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটিতে হচ্ছে। দুধারের বড় বড় গাছগুলি সুমেরদাসজী চিনিয়ে দিচ্ছেন - ইহ্ হৈ শালাই, ইহ্ হৈ সাজা। এখানে অরণ্যের একটা বৈশিষ্ট চোখে পড়ল। পাশাপাশি দুটি শালাই বা দুটি সাজা গাছ কোথাও দেখলাম না। একটি সাজা, একটি শালাই, পরেরটি সাজা, তার পরেরটিই শালাই - এইভাবে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় প্রকৃতিরাণী যেন ঐ দুই জাতের গাছকে নিজের বুকে ফুটিয়ে রেখেছেন। তাতে প্রকৃতির অপূর্ব মনোহারিত্ব ফুটে উঠেছে। উভয় গাছের পরিধি উচ্চতা প্রায় সমান। কিন্তু রং আলাদা। শালাই-এর রং ধুসর আর সাজার রং কালো। ধুসর কালো - এইভাবে বনপথের বিচিত্র বর্ণবিন্যাস আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি।

সাড়ে চার মাইল পথ হেঁটে কপিলধারায় পৌঁছে গেলাম। প্রায় ষাট ফুট নিচে নর্মদার স্ফটিকস্বচ্ছ জল গর্জন করতে করতে একটা গহ্বরে আছড়ে পড়ছে। এই হল কপিলধারা - নর্মদার প্রথম জলপ্রপাত। জলধারার গর্জন যেন বিন্ধ্যপর্বতের অট্টহাস্য। এখানে নর্মদা মাত্র দশ-বারো হাত চওড়া। সুমেরদাসজী জানালেন আমরা সমতলভূমিতে যে বড় বড় ঘাসবন পেরিয়ে এসেছি, সেই ঘাসবনের মধ্য দিয়ে আরও দুটি জলধারা এসে এইখানে নর্মদার সঙ্গে মিশেছে। তাই নর্মদার গতিবেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। সেই দুটি ধারার মধ্যে একটির নাম এরণ্ডী আর একটির নাম - কপিলা বা বিশল্যা।

কপিলধারায় আছড়ে পড়ে জল অত্যন্ত ফেনিয়ে উঠছে। সেই ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের জলকণায় আমরা দুজন প্রায় ভিজে গেলাম। নিচে স্রোত এমনই প্রচণ্ড যে কোনমতে পা পিছলে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

সুমেরদাসজী বললেন - ওয়াহা দেখিয়ে উধর এক মহাত্মাজীকা আশ্রম হৈ, ধ্বজা দেখা। উধর চলো - উনকা নাম সচ্চিদানন্দ ঋষি। ঋষিবাবাকে পাশ বহুৎ সিদ্ধাই হৈ।

আমি বললাম - আর সিদ্ধাই দেখে কাজ নাই। আর এখানে কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিন, বেলা গড়িয়ে গেলে সেই ঘাসবন দিয়ে যেতে ভয়ানক্ কষ্ট হবে।

অনুমান করলাম বেলা তখন বারটা হবে। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ বড় বড় গাছ ভেদ করে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না, গাছ-পাতার ফাঁকে কেবল ঝিকমিক করছে, যেন লুকোচুরি খেলছে।

অগত্যা সুমেরদাসজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমদিকের এক সরু রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন। পথ এবারে আরও ঢালু, আরও দুর্গম। কখনও উবু হয়ে কখনও দু-তিন হাত নিচের পাথরে পা ঝুলিয়ে, সাবধানে পা ফেলে, কখনও কোন গাছের ভেজা শিকড় আঁকড়ে ধরে অন্য পাথরকে আশ্রয় করছি। যত নিচে নামছি ততো স্যাতস্যাঁতে হয়ে আসছে আবহাওয়া। লতাপাতা থেকে যেন জল ঝরছে। প্রায় আধ-মাইল হেঁটে আসা হয়ে গেল কপিলধারা থেকে।

এখানে দেখলাম নর্মদার দ্বিতীয় প্রপাত। বড়ই আশ্চর্য। এখানে জল দুধের মত সাদা। তাই এই প্রপাতের নাম দুধধারা। চারদিকে অনেক ফার্ণ ও বনফুল আর রাশি রাশি বনগোলাপ ফুটে আছে।

কপিলধারার কাছাকাছি গেলে জলের ছাট্ এসে সমস্ত শরীর ভিজে যায়। জল এত উঁচু হতে নিচে আছড়ে পড়ছে যে কাছে যাবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুধধারায় স্বচ্ছন্দে স্নান করা চলে। প্রায় দশ-বারো হাত চওড়া ধারার দুধের মত সাদা জল যেখানে লাফিয়ে পড়ছে, তারই ডানদিকে একটি অন্ধকার গহ্বর। সুমেরদাসজী বললেন - মহর্ষি দুর্বাসাজীকা গুফা, উনোনে ইস্ গুফামে তপস্যা কিয়ে থে।

গুহার গায়ে ধোঁয়ার দাগ দেখেও ভিতরে ঢুকতে কারও সাহস হল না। কারণ ক্রুদ্ধ ঋষি বা ক্রুদ্ধ শ্বাপদ যে কেউ বেরিয়ে এলেই বিপদ।

সুমেরদাসজীর মত্ নিয়ে এক হাঁটু জলে নেমে উবু হয়ে বসে দুধধারায় স্নান করলাম, সারা শরীর জুড়িয়ে গেল, পেটভরে জলপান করলাম। ধারে দাঁড়িয়ে গা মুছে নিচ্ছি এমন সময় জলের তোড়ে ঠিকরে প্রথমে দুটি, পরে একটি তার কিছু পরে দুধধারার প্রচণ্ড ঘুর্ণিপাকে আরও দুটি সাদা শিবলিঙ্গ এসে পড়ল।
এইসব সাদা শিবলিঙ্গের ভেতরে ওঁ ডম্বরু ত্রিশুল চিহ্ন স্বাভাবিক ক্রমে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার কিভাবে যে হচ্ছে, সে রহস্য বোঝা ভার।

যাইহোক সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, লে লো পাঁচঠো শিউলিঙ্গ, ইহ্ তুমহারা উপর নর্মদা মায়ীকা কৃপা হৈ। নর্মদা কী কংকর সব হি শংকর। ইহ্ শিউলিঙ্গ বহুৎ জাগ্রৎ হৈ।

শ্রদ্ধাসহকারে শিবলিঙ্গগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলাম সেই একই পথে বড় বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে গাছের শিকড় ধরে ধরে। ইতিপূর্বে সুমেরদাসজী যে আশ্রমের ধ্বজা দেখিয়েছিলেন, যেখানে আমি যেতে চাইনি, তারই কাছাকাছি কপিলধারা প্রপাতের উপর একটা গাছের গোড়ায় বসে খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, একজন উচ্চৈঃস্বরে হাঁক পাড়তে পাড়তে আসছেন - ব্রহ্মচারী ! ও ব্রহ্মচারী ! একলোটা গরম চা ঔর একলোটা পানি লেকর ইধরমে আইয়ে। উপরে উঠে এসে আমাদের সামনে যখন দাঁড়ালেন দেখলাম এক শালপ্রাংশু মহাভুজ, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী - বয়স অন্ততঃ আশী-নব্বই। চোখ দুটি যেন জ্বলছে।

সুমেরদাসজ্জী তাড়াতাড়ি হাত ধুতে ধুতে বললেন - দেখিয়ে খুদ্ ঋষিবাবা পধার গয়া। আমিও হাত ধুয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন - আভি আশ্রমমেঁ নাহি গিয়া, লেকিন্ চার সালকা অন্দর ইধর আপকো আনাহি পড়েগা। হামরা আশ্রম মেঁ এ্যায়সা অচানক্ আজ্জব কাণ্ড ঘট্ যায়েগা যিস্ মেঁ তুমহারা জীওনকা ধারা বদল জ্জাবেগা।

আমি বললাম - যে দুর্গম পথ, এ পথে নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি আর আসছি না। কাজ্জেই কিভাবে আর আপনার আশ্রমে পৌছে আমার জীবনের ধারা বদলাবে ?

কোন উত্তর না দিয়ে তিনি হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর ব্রহ্মচারী চা এবং জ্জল নিয়ে হাজ্জির হ'ল।

সুমেরদাসজ্জী বললেন - আপনে কেঁও এ্যাতনা তকলিফ উঠায়া মহারাজ ? ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহ্ -

রাসিক সাধু হাসতে হাসতে বললেন - ইসলিয়ে হম্ কহ্তা হৈ, আপলোগ হমারা অতিথি হৈ, অতিথিঃ নারায়ণঃ য তম্ অবজ্ঞানাতি স নিরয়ং যাতি। গৃহী ঔর সন্ন্যাসী যো আয়েগা, উনকো সেবা করনেই পড়েগা। ও হ্যায় হমারা মহান্ ভারতবর্ষকা শিক্ষা।

আমি মহাত্মাকে জ্জিজ্ঞাসা করলাম - এখানে কপিল পূজ্জিত কপিলেশ্বর শিব এবং তাঁর পায়েরও একটি ছাপ পূজ্জা হচ্ছে দেখছি। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বাইশজ্জন কপিলের কথা বলা আছে। এখানে নর্মদাতটে কোন্ কপিল এসেছিলেন ? আদি বিদ্বান কপিল যিনি সাংখ্যদর্শন প্রণেতা, বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যাঁর নামে মহাতীর্থ গড়ে উঠেছে তিনি ? নাকি যে কপিলের কোপদৃষ্টিতে পড়ে সগর বংশের সন্তানেরা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ? গয়াতে দেখেছি ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের গায়ে যে কপিলধারা আছে, সেখানে মহর্ষি কপিলের ব্যবহৃত একটি বিচিত্র প্রাকৃতিক দোতালা সাধনগুহা অদ্যপি বর্তমান। আপনাদের এই কৈলাস আশ্রমের কপিল এবং গয়ার সেই কপিল কি একই ব্যক্তি ? নাকি - প্রত্যেকের নামে সামঞ্জস্য থাকলেও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভগবত পুরাণে আর এক কপিলের বর্ণনা আছে যিনি তাঁর মহাগুরু মাতা দবহুতিকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, কলাবিদ্যা এবং জ্ঞানযোগ ইত্যাদির শিক্ষা দিয়ে তাঁর দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন। ভাগবত - বর্ণিত সেই কপিল মায়ের গুরু সাজার পাপস্খলনের জ্জন্য হয়তো আপনাদের এই কৈলাস আশ্রমে বসে কোন কালে নর্মদাতটে তপস্যা করে থাকতে পারেন, কিন্তু প্রজ্জাপতি কর্দম-ঋষি ও দেবহূতির পুত্র মহর্ষি কপিল যাঁকে আমরা আদি বিদ্বান, সাংখ্যদর্শন প্রণেতা এবং সর্বযোগেশ্বর ভগবান কপিল বলে পূজ্জা করি, তাঁর সাধনস্থল বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর সংগমে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ঋষিবাবা উত্তর দিলেন - উস্ আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিলজ্জী খুদ্ আয়েথে। নর্মদাতট সিদ্ধ তপোভূমি হৈ, নর্মদা তপস্যা - সে হি কৈবল্য প্রাপ্ত্ কর সকতা হৈ। মাতা নর্মদা কৈবল্যদায়িনী হৈ।

আরও দু একটি প্রশ্ন করলাম তাঁকে। সাংখ্যদর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জ্জানালেন যে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে। তাঁর মতে জ্জগৎ জ্জড়প্রকৃতি হতে উদ্ভূত। সাংখ্য মতে প্রকৃতি অনাদি, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষও (আত্মা) অনাদি। আত্মা সৃষ্টি করে না, সে দ্রষ্টা মাত্র। মানুষের কর্ম ফল অনুসারে আত্মা দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন কর্মক্ষয় হয়, তখন আত্মা আর দেহান্তর গ্রহণ করে না। আমাদের সাংখ্যদর্শন মতে বস্তু মাত্রই সৎ, সৎ হতেই সতের উৎপত্তি ঘটে।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম - আচ্ছা মহারাজ। স্যাংখকারিকার তিন নং সুত্রে আছে মূল প্রকৃতির বিকৃতিঃ। প্রকৃতির বিকৃতি কি ? প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

তিনি উত্তর দিলেন - সাংখ্যমতে উপাদান কারণকে প্রকৃতি বলে আর প্রকৃতির কার্যকে বিকৃতি বলে। পুরুষ প্রকৃতি বিকৃতি উভয় ভাব রহিত কারণ যেটি কোন পদার্থের হেতু, তার নাম প্রকৃতি আর যেটি কার্য, তার নাম বিকৃতি। পুরুষ কারও হেতু নয় বলে প্রকৃতি নয় আর কার্য নয় বলে বিকৃতিও নয়। সুতরাং অসঙ্গ।

দয়া করে বলবেন কি, সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্ব কেবল একটা অত্যন্ত উঁচুদরের দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র, না এ যুগে কেউ সাধনা করলে সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে ? তার সাধন প্রণালী কি ?

- ক্যা বৈখরী বচনসে ইসকা পতা চলেগা ? হমারা আশ্রমমেঁ ঠহরো, ঠিক ঠিক প্রণালীসে সাধন করো, কপিলজীকা কৃপা মিলেগী।

- মহারাজ এবারে ত সময় নেই, অমরকন্টকে ফিরতে হবে। আপনি তো বলেছেন চার বছরের মধ্যে আমাকে এখানে ফিরে আসতে হবে। সেই সময় যা হবার হবে।

প্রণামাদি সেরে আমরা উঠে পড়লাম। দুপাশের ঘন অরণ্যের বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পথে এবারে নীচে নামবার পালা। উৎরাই যখন শেষ হ'ল, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। আবার সেই ঘাসবন। 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে ঘাসবন কোনমতে অতিক্রম করা গেল। মাঠে কতগুলি ময়ূর দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো আট-দশটা শেয়াল তাদের তাড়া করে যাচ্ছে। আবার কখনো শেয়ালগুলি পালিয়ে আসছে। তাদের এই দৌড়ে যাওয়া আবার ফিরে আসার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, তারা যেন খেলা করছে, শেয়াল-পণ্ডিতদের দেখে মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হ'ল না।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অমরকন্টকের মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। সেদিন আর কোথাও গেলাম না। প্রচণ্ড গরমের জন্য ধর্মশালার ছাদ পরিস্কার করে রাতে ছাদে এসে শুয়ে পড়লাম দুজনে।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম নানা কথা। নর্মদাতীরে তাহলে সমস্ত ঋষিরাই এসেছেন - অঙ্গিরা, আঙ্গিরস, সনক, দীর্ঘতমা, জৈগীষব্য, অণীমাণ্ডব্য প্রভৃতি বৈদিক ঋষিরা ছাড়াও এখানে এসেছেন আদি বিদ্বান কপিল, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, মৎসেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, পতঞ্জলি, গোবিন্দপাদ, এমন কি ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির যিনি কোহিনুর-স্বরূপ সেই আদি শংকরাচার্যও এসেছিলেন এখানে তপস্যা করতে। অত্রিপুত্র দুর্বাসা যিনি শৈবাগম দর্শনের প্রবক্তা, তাঁর সহোদর ভগবান দত্তাত্রেয় সবাই কেন এখানে এসেছিলেন ? আরও কত যে প্রবর্ত্তক ব্রহ্মচারী, মুনি, ঋসি, ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয়ান, ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ নর্মদায় এসে তপস্যা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবে কি তপস্যায় পরমা সিদ্ধি অর্জন করতে হলে, নর্মদাতে আসতেই হয় ? কি এর রহস্য ? এই যে কপিলধারা দেখে এলাম আজই, সেখানকার মহাত্মা সচ্চিদানন্দ ঋষিবাবা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে আদি বিদ্বান সাংখ্যকার কপিল ঐখানে বসেই তপস্যা করেছিলেন, যাঁর নির্বান বা নির্যান ঘটেছিল বাংলার গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।

রামায়ণের এ ঘটনা সকলেরই জানা যে, কপিলের ব্রহ্মতেজে সগররাজের সন্তানরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন। সগরের পৌত্র তাঁকে তুষ্ট করে বর পান যে বিষ্ণুপদী গঙ্গা মর্তে যখন অবতরণ করবেন, তখন পরাংগতি প্রদায়িনী সেই গঙ্গাজলের স্পর্শে সগর পুত্রগণ গতিলাভ করবেন।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ ঘটান। তাহলে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, সগরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ভগীরথের আমলে গঙ্গার আবির্ভাব। কিন্তু ভগীরথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ সগর রাজার সমসাময়িক ছিলেন কপিল। সেই কপিল নর্মদার তীরে বসে তপস্যা করেছিলেন। কাজেই নর্মদা তাহলে গঙ্গার চেয়ে প্রাচীনতরা, কতকাল আগে যে তিনি রুদ্রতেজ হতে সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন, সেই সময়ের পরিমাপ কারও জানা নেই। মাতা নর্মদে তুমি কৃপা কর।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। সকালে নর্মদা মন্দিরের ঘন্টা-ধ্বনিতে জেগে উঠলাম। প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি সেরে সুমেরদাসজী গেলেন মন্দিরে; আমি চললাম মৎসেন্দ্রনাথের মন্দিরে সেই মহাপুরুষের দর্শনের জন্য।

আজও সেই একই দৃশ্য - নাঁগা সাধুরা, সকলেরই কানে কুণ্ডল। সুমেরদাসজীর ভাষায় কানফাট্টা, তাঁরা ধুনি জ্বেলে বসে আছেন, সবাইকে দেখছি আত্মমগ্ন। মন্দিরের দ্বারও রুদ্ধ। ভিতরে কিন্তু শব্দ পাচ্ছি যোগীবরের। কিছুক্ষন পরে মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে তাঁর উদ্দাত্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সমস্ত মন্দির গমগম করছে তাঁর স্তোত্র ধ্বনিতে -

নমোঽস্তুতে সিদ্ধগনৈঃ নিষেবেতে, নমোঽস্তুতে সর্বপবিত্রমঙ্গলে।
নমোঽস্তুতে বিপ্রসহস্রসেবিতে, নমোঽস্তুতে রুদ্রাঙ্গ সমুদ্ভবে বরে॥
নমোঽস্তুতে সর্বপতিতপাবনে, নমোঽস্তুতে দেবি বরপ্রদে শুভে
নমামি তে শিতজলে সুখপ্রদে, সরিদ্বরে পাপহরে বিচিত্রিতে॥ **(রেবাখণ্ডম্ ৩৬ অধ্যায়)**

হে দেবি! সিদ্ধগণ আপনার সেবা করেন, আপনি সকল রকমের মঙ্গল দান করে থাকেন, আপনাকে নমস্কার।
হে দেবি! আপনি রুদ্রদেহ হতে সমুদ্ভূতা হয়েছেন। সহস্র সহস্র দ্বিজ আপনার সেবা করে থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে শিবে! আপনিই অখিলবস্তু পবিত্র করেন, হে বরপ্রদে দেবি আপনাকে নমস্কার। আপনার জল সুশীতল, সুখপ্রদ ও পাপহরা। হে সরিদ্বরে আপনার গতি অতীব বিচিত্র, আপনাকে নমস্কার।

ওঁ সরাংসি নদঃ ক্ষয়মভ্যুপেতা ঘোরে যুগেহস্মিন্ হি কলৌ প্রদুষিতে,
ত্বং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা দিবীব নক্ষত্রপথে চ গঙ্গা ॥
তব প্রাসাদাৎ বরদে বরিষ্ঠে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা।
যমোহথ রুদ্রং তব সুপ্রাসাদাৎ তথা অয়ং কুরু বৈ প্রসাদম্ ॥

মহাপুরুষ কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন মা নর্মদে গো! এই কলিদুষিত ভীষণ যুগে সরিৎসরোবরাদি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু একমাত্র তুমি নক্ষত্রপথে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলরাশি সুক্ষ্মভাবে বক্ষে ধারণ করে বিরাজ করছ। হে বরদে! তোমার প্রসাদে যাতে আমরা এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করে রুদ্রপদ প্রাপ্ত হতে পারি। হে বরিষ্ঠে ! আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

স্তব শেষ হ'ল। কিন্তু দরজা খুললেন না। কিছুক্ষন বসে মন্দির দ্বারে প্রণাম করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। বেলা চারটা নাগাদ আবার গেলাম মহাত্মা শংকরনাথের কাছে। মন্দিরের দরজা খোলা। প্রবেশ করার হুকুম নেই। মন্দির দ্বারের সামনে প্রণাম করতেই অন্ধকার গর্ভগৃহ থেকেই বললেন - এবার দু-একদিনের মধ্যেই অমরকন্টক ছেড়ে যাও। বর্ষা আসছে। পথঘাট দুর্গম হয়ে পড়বে। আমিও ভোরে অন্যস্থানে চলে যাবো। মার্কণ্ডেয় আশ্রমে গিয়েছিলে অথচ ঐখানে আচার্য শংকর পূজিত পঞ্চমুখী শিব দর্শন করনি। কাল গিয়ে অতি অবশ্যই দর্শন করবে, অতি জাগ্রত শিব। পরে আবার দেখা হবে। ফিন্ আনা - শিবানং সন্তু পন্থানঃ - পুনরায় এসো, পথ মঙ্গলময় হোক।

বিদায় দিয়ে দিলেন। পরের দিনই ছুটলাম - মার্কণ্ডেয় আশ্রমে। শিউপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজী যথারীতি 'রেবা রেবা' জপ্ করে চলেছেন আপন মনে। আমি পঞ্চমুখী শিব দেখতে চাইলে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিজের পূজার ঘরে। ফুলে ঢাকা আছেন।

ব্রহ্মচারীজী বললেন - ইষ্টবস্তু প্রদর্শনীর বস্তু নয়। তাই নিজে আগ্রহ করে দেখাই না। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে তার সুক্ষ্ম মনের **current** আছে, আমার ইষ্টের স্বরূপে কোনো কলুষ **flow** এসে পড়ে, চাই না। পরে কি হবে জানি না, ক্রমেই অমরকন্টকে যাত্রীর সংখ্যা বাড়বে, ভাল ভাল রাস্তাঘাট, হোটেল, দোকান পসরায় ভরে যাবে। দিব্যবস্তু যতক্ষন গহন ও গোপন থাকে, ততক্ষনই তাঁর গৌরব ও মহিমা অক্ষুন্ন থাকে। এই শিব এখানেই আবিস্কার করেছিলেন আদি শংকরাচার্য। আমরা গুরু-পরম্পরা শুনে আসছি এই অর্ধনারীশ্বর পঞ্চমুখী মহাদেবকে পূজা করেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন।

মার্কণ্ডেয় আশ্রম থেকে ফিরেই মন্দিরে গেলাম। সুমেরদাসজীর ততক্ষনে জপ্ পর্ব শেষ হয়েছে।

ধর্মশালায় বসে খেতে খেতে সুমেরদাসজীকে বললাম, বর্ষা আসছে, এখানে তো মোটামুটি সব দেখা হয়ে গেল এবার অমরকন্টক থেকে ফিরে যেতে চাই।

- ঔর কাঁহা জানেকা বিচার হৈ ?

- বাবা বলেছেন একবার জব্বলপুর ঘুরে যেতে।

সুমেরদাসজী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

- ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, জব্বলপুর ত হমারা আস্তান হৈ। উধার ভিড়াঘাট মেঁ - যিধর ভগওয়ান দত্তাত্রেয়জীকা গুম্ফা হৈ, উধরই নর্মদাজীকী কিনার মেঁ হম্ নিবাস করতা হুঁ। ঔর ভি চারমূর্তি হ্যায় আশ্রম মেঁ। চলিয়ে হম্ সাথমে লে চলেঙ্গে। জব্বলপুর ভি বড়া নর্মদা তীর্থ হৈ।

পরদিন সকাল সকাল নর্মদাকুণ্ডে স্নান করে নর্মদামাতা এবং নর্মদেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে রওনা হলাম।

একই পথ - সেই ভোটেঙ্গার জঙ্গল হয়ে সেই অলৌকিক বাঁশির শব্দ শুনতে শুনতে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে গেলাম পেনড্রা রোড-এ। সকালে ট্রেনে চেপে বিলাসপুর - বিলাসপুর থেকে জব্বলপুরে পৌঁছলাম তার পরের দিন। অমরকন্টক থেকে জব্বলপুর প্রায় ১৫৫ মাইল রাস্তা।

সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম ক্যা কহুঁ, হমলোগ বহুৎ থক্ গয়ে। আভি টাঙ্গামে চলেঙ্গে। ভিড়াঘাট হিঁয়াসে করীব ষোলা মিল হোগা। ইয়েহি জব্বলপুরকা পুরাণা নাম থে জাবালিপত্তন। জাবালিজী ইধর আয়েথে তপস্যা করনেকে লিয়ে। উনোনে খুদ্ রামচন্দ্রজীকো ঝুটা উপদেশ দিয়া থা, ধোঁকা দিয়া থা, ওহি পাপ হঠানেকে লিয়ে উনোনে নর্মদাতটমে তপস্যা কিয়া থা। নর্মদা পাপহারিণী হ্যায়। জাবালী মুনিজীকা বারে মেঁ রামায়ণমে তো আপ জরুর পড়ে হোঙ্গে।

পড়েছি বৈকি। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসকালে যখন চিত্রকূটে ছিলেন তখন তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবার জন্য ভরত তাঁর সাথে মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং জাবালিকে নিয়ে চিত্রকূটে গিয়েছিলেন।

জাবালি রামচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর পরাবর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে সীতা অপহৃতা হবেন, সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রামচন্দ্রকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই সেই ভবিষ্যৎ সংকট থেকে রক্ষা করবার জন্য জাবালি রামচন্দ্রকে বলেছিলেন - তুমি যে পিতৃসত্য পালনকে ধর্ম বলে জ্ঞান করছ, তা তোমার সংস্কার মাত্র। শুক্র শোণিতের সংযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়। এ জগতে কে কার পিতা, কেই বা কার পুত্র ? পিতা দশরথ মারা গেছেন, তাঁর জীবিতকালে তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এখন তার মূল্য কতটুকু?

স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ - কুরু ॥

- দশরথ আর নেই, তাঁর নশ্বর জীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতিও শেষ হয়ে গেছে। এখন পরোক্ষ বা যা অদৃশ্য তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তোমার সন্মুখে যে বাস্তব জীবন পড়ে আছে, সেই প্রত্যক্ষকে তুমি বরণ করে নাও, অর্থাৎ তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে চল, অযোধ্যার রাজসিংহাসন অধিকার কর।

সত্যসন্ধ পিতৃভক্ত রামচন্দ্র জাবালির মুখে এইরকম বিসদৃশ উপদেশ শুনে বেদনাহত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন - আপনার উপদেশ মানা সম্ভব নয়। আপনি যে সকল কথা বলছেন তা সত্য বিরুদ্ধ এবং ধর্মবিরুদ্ধ, দেবতা ও ঋষি মুনিগণ সারাজীবন ধরে সত্যকেই মেনে গেছেন। যে সত্যাশ্রয়ী, সে অক্ষয়পদ লাভ করে -

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকোহস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥

সত্যসন্ধ জিতব্রত পিতৃভক্ত নরকুলে চন্দ্রমা রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। জাবালির উপদেশে কর্ণপাত করেন নি।

জব্বলপুর বড় শহর। প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে দ্রুততালে দুটো ঘোড়া আমাদের টাঙ্গাকে টেনে নিয়ে চলেছে। ক্রমে জনবহুল রাস্তায় বড় বড় অট্টালিকা, হোটেল, সিনেমা এবং দোকানের সারি অতিক্রম করে আমরা পার্বত্য বন্ধুর পথে এসে পড়লাম। কোথাও ইউক্যালিপ্টাস কোথাও শালবীথি কোথাও বা সারি সারি আম গাছ। এই আমগাছের ফলই দেশের বাইরে সি. পি. ল্যাংড়া নামে প্রসিদ্ধ। সব গাছের তলাতেই দেখছি বড় বড় কালো পাথরের চওড়া রাস্তাও পাথরে তৈরি। দূর থেকে সাতপুরা পর্বতমালা চোখে পড়ছে। মাঝে অন্ততঃ চার - পাঁচবার শত শত বকের সারি দেখতে পেলাম, তারা শস্যক্ষেত্রের ওপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে মনে হতে লাগল, প্রকৃতি - লক্ষীর কম্র কণ্ঠে বনদেবতা যেন পরম সোহাগে দুলিয়ে দিচ্ছেন এক ছড়া গজমোতির মালা।

দেখছি বড় পাথর ছড়িয়ে আছে, রাস্তার দুপাশে পাথরগুলির ফাঁকে ফাঁকে নানা জাতীয় অজস্র গাছ। আমি সুমেরদাসজীকে বললাম - স্বামীজী আপনাদের জব্বলপুর তো দেখছি সম্পূর্ণ পাথরেরই দেশ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন - হাঁ, ইসলিয়ে হম ক্যা কহু, ইয়েতো পত্থল কী হি দেশ হ্যায়। হিন্দী মেঁ, জব্বল কা মতলব পত্থল। পত্থলকী পুরী, ইসিওয়াস্তে ইসকা নাম জব্বলপুরী ইয়া জব্বলপুর।

প্রায় চৌদ্দ পনের মাইল যাবার পর একটা জায়গায় টাঙ্গাকে দাঁড় করিয়ে নিজেও নামলেন, আমাকেও নামালেন। বললেন-ঐ দেখ নর্মদা বয়ে যাচ্ছে। প্রণাম কর। আঙ্গুলের ইশারা করে বললেন - ঐ দেখ একটু দূরেই মার্বল রকস্, দুনিয়ামেঁ ঔর কঁহি এ্যায়সা নেহি হৈ। লাল, নীল, সবুজ, স্ফটিক পত্থলকা এ্যায়সা মনোহারী চিজ্ দেখনেসে আপ খামুস হো জাবেগা।

আবার টাঙ্গায় উঠলাম। মাইল দেড়েক যাবার পর পৌঁছে গেলাম ভিড়াঘাটে। সুমেরদাসজীর আশ্রমে। তাঁর চারজন নাঁগা শিষ্য শশব্যাস্তে দৌড়ে এসে আমাদের মালপত্র নামিয়ে নিলেন। পর্বতের কোলে নর্মদাতীরে অপূর্ব সুন্দর তাঁর আশ্রমিক পরিবেশ। একটি পাথরের তৈরি একতলা বাড়ী, তাতে তিনটে ঘর, সামনেই একটি শিবমন্দির, শিবমন্দিরের সামনে টিনের ছাউনি, তাতে ভক্তদের নিয়ে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও চারটি কুটির আছে, তাতে নাগা শিষ্যরা থাকেন। আশ্রমে দুটি গাই আছে। একটি আম, দুটি ইউক্যালিপ্টাস্ এবং কিছু ফুল গাছও আছে - এইসব নিয়েই সুমেরদাসজীর 'অবধূত আশ্রম'। আশ্রম থেকে একটু দূরেই দেখা যায় নর্মদার দুধারে মার্বল পাথরের পাহাড়। দু পাশের পাথরের প্রাচীর ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছেন শান্ত-ধীর গতিতে।

আহার নিদ্রার খুব পরিপাটি ব্যবস্থা। প্রথমেই সুমেরদাসজী তাঁর নাঁগা শিষ্যদেরকে বলে দিয়েছেন - ইনোনে হমলোগকা মেহমান হৈ। আচ্ছিতরাসে দেখভাল করনা। সেদিন আর কোথাও যাইনি। পরদিন সকালে নর্মদাতে স্নান, নিত্যকৃত্য হোম, বেদপাঠ এবং জলযোগের পর সুমেরদাসজী আমার ইচ্ছাতেই প্রথমে নিয়ে গেলেন - দত্তাত্রেয় গুহায়।

- ভগবান দত্তাত্রেয়কা বারে মেঁ আপ্ ক্যা জানতে হৈ ?

আমি বললাম - ইনি ছিলেন অত্রি ও অনুসূয়ার সন্তান। পুত্র কামনায় অত্রি বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন - দত্তোহহং পুত্ররূপেন, আমি পুত্ররূপে তোমাতে দত্ত হলাম। তাই তাঁর নাম - দত্তাত্রেয়। বিষ্ণুতেজে জন্ম, মহাযোগেশ্বর দত্তাত্রেয় অবধূত কুলচূড়ামণি। হরিদ্বারের কুশাবর্ত ঘাটও তাঁর তপস্যাস্থল। হৈহয় বংশের মহাপরাক্রান্ত মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন দত্তাত্রেয়ের বরেই সহস্র বাহু হয়েছিলেন। তিনি যে অবলীলাক্রমে ত্রিলোকজয়ী বিংশতি বাহু দশাননকে পরাজিত ও বন্দী করতে পেরেছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর গুরু এই দত্তাত্রেয়ের আশীর্বাদেই।

সুমেরদাসজী জানালেন - প্রাচীনকালে এই সমগ্র নর্মদা, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতাঞ্চল জুড়ে হৈহয়-বংশীয় মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের রাজত্ব ছিল। পুরাণের উপর তোমার শ্রদ্ধা কম্ দেখছি। তোমাকে যখনই কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি রামায়ণ, মহাভারত বা অন্য শাস্ত্র থেকে কাহিনী শোনাও। পুরাণের কথা এড়িয়ে চল। পুরাণ কি তুমি পড়নি ? মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, কুশিকবংশে এক কুষ্ঠরোগগ্রস্থ ব্রাহ্মন ছিলেন। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী সমস্ত কষ্ট সহ্য করে তাঁর সেবা করতেন। ঐ ব্রাহ্মন একদিন কামাসক্ত হয়ে এক সুন্দরী পতিতার কাছে নিয়ে যেতে পত্নিকে হুকুম করেন। সাধ্বী স্ত্রী পতির ইচ্ছানুসারে যখন তাঁকে কাঁধে বসিয়ে পতিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অন্ধকার রাত্রে শূলবিদ্ধ ঋষি অণীমাণ্ডব্যের গায়ে উক্ত ব্রাহ্মনের পা লাগাতে ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন - সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।

ভবন্তঃ সতীবলং অদ্য পশ্যন্তু দিবি দেবতা।
মরিষ্যতি ন মে ভর্তা আদিত্যো নোদয়িষ্যতি ॥

ব্রাহ্মনের সতী সাধ্বী স্ত্রী এই নিদারুণ অভিশাপ শুনে বললেন- তাহলে আপনারা সতীবল প্রত্যক্ষ করুন। সূর্যের উদয় আজ হতে আর হবে না। সতীর অব্যর্থ বাক্যে পরের দিন আর সূর্যোদয় হ'ল না। পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল। পৃথিবী বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে দেবতারা মহাসতী অনুসূয়ার শরণাপন্ন হলেন। অনুসূয়া সেই সতী ব্রাহ্মণীকে বুঝালেন - তুমি মুখে একটিবার উচ্চারণ কর, সূর্যোদয় হোক। সূর্যোদয়ে যদি তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় আমি তাকে পুনর্জ্জীবন দান করব, সে নীরোগ সুস্থ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকবে। ব্রাহ্মণী সূর্যোদয়ের সন্মতি দিলেন।

অনুসূয়ার মধ্যস্থতায় পৃথিবীর এই বিপর্যয় কেটে যাওয়ায় দেবতারা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন। দেবতাদের বরে দেবী অনুসূয়ার গর্ভে অত্রি ঋষির ঔরষে ব্রহ্মা সোমরূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে এবং স্বয়ং মহাদেব দুর্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আমি সুমেরদাসজীকে বললাম - পুরাণের কোন্ কাহিনীকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারি বলুন। আপনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী শোনালেন, কিন্তু অন্য এক পুরাণের কাহিনী শুনুন। চিত্রকূটের গুহায় অত্রি ঋষি একবার সমাধিস্থ ছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মূর্তিমতী তপস্যা অনুসূয়ার কাছে ছদ্মবেশে অতিথি সেজে আসেন। দেবী অনুসূয়া যখন অতিথিদেরকে আহার্য পরিবেশন করতে গেলেন, তখন মহামান্য অতিথিরা দাবী করলেন - নিরাবরণ হয়ে কোলে বসিয়ে আমাদের মুখে খাবার তুলে দিতে হবে। নতুবা আমরা অভুক্ত অবস্থাতেই ফিরে যাব।

অতিথিদের অশোভন আবদার রক্ষা করাও যায় না আবার অভুক্ত অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে ধর্মহানি হয়। তখন অনুসূয়া ইষ্টদেবকে স্মরন করে অত্রি ঋষির পরামর্শে অতিথিদের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। তিন প্রধান দেবতা শিশুতে পরিণত হয়ে গেলেন। তখন অনুসূয়া তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করে তাঁদের কথামত কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিলেন। এদিকে আবার দেবতাদের বিষম বিপদ। তাঁরা অনুসূয়াকে অনেক কাকুতি মিনতি করাতে তিনি পুনরায় দেবতাদের শিশুত্ব ঘুচিয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতি তুষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অনুসূয়াকে বর দিতে চাইলে দেবী অনুসূয়া তাঁদের পুত্ররূপে চাইলেন। এবং দেবতারা তাঁর পুত্র হয়ে জন্মালেন।

আমি চিত্রকূটে অত্রি অনুসূয়া স্থানে এই কথাই শুনে এসেছি। ঐসব অঞ্চলে পুরাণের এই গল্পকেই সবাই বিশ্বাস করেন।

সুমেরদাসজী বললেন - যানে দো। আভি শুন্ লিজিয়ে - ইয়ে দত্তাত্রেয়জীকা গুফা হৈ, ইধর মহর্ষি ভৃগুজী ভি আকর তপস্যা কিয়ে থে, দত্তাত্রেয়জী কা সাথ একই গুফামেঁ বৈঠ কর। এক মহর্ষিকা সাথ ঔর এক মহর্ষি ভিড়ে থে, দোনোকো মিলাপ হুয়া, দুসরা এক ছোটাসা নদী বামন্ গঙ্গা, উহ্ ভি ইধর নর্মদা কী সাথ ভিড়েঁ হ্যায়, ইসি-ওয়াস্তে এহি ঘাটকা নাম - ভিড়াঘাট।

আভি চলিয়ে ধুঁয়াধারাকী তরফ।

মহর্ষি ভৃগুর তপস্যার জায়গা দেখে এসেছি অমরকন্টকে যার নাম - ভৃগু-কমণ্ডলু। যেখানে নর্মদা মিলিত হয়েছে সমুদ্রে, ভারোচ্-এর কাছাকাছি - সেখানকার নাম ভৃগুকচ্ছ। নর্মদার আদিতেও ভৃগু, অন্তেও ভৃগু। মধ্যস্থলেও যেমন এখানে এবং আরও বিভিন্ন স্থানে ভৃগুর তপোবহ্নি দেদীপ্যমান, তার মানে সমগ্র নর্মদা জুড়ে ভৃগুর প্রভাব। প্রাচীন ভারতের ঋষিবর্গের জীবন-নদী ছিল তপস্যামুখীন্। তপস্যার সেই প্রবাহ একটি নদীর মতই। নিত্য কাল ধরে প্রবহমানা, সমুদ্রে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

ভিড়াঘাট থেকে সুমেরদাসজীর সঙ্গে হাটছি চড়াই-এর পথে। সেই চড়াই গিয়ে পৌচেছে ঘন অরণ্যে ঘেরা পার্বত্যভুমিতে। নানা বর্ণের বড় বড় পাথরের চাঙড়ে নর্মদার বুক ভরে আছে। সেই দুর্গম পার্বত্য বাধাকে হেলায় চুর্ণ-বিচুর্ণ করে, পর্বতকে ভেদ করে দুর্দম বেগে ছুটে চলেছেন নর্মদা, বিপুল গর্জনে আছড়ে পড়ছেন প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে - প্রপাতের আকারে। কোটি কোটি জলকনা ও বুদবুদের চঞ্চল নৃত্যে চোখের সামনে পুঞ্জীভুত বাস্প সৃষ্টি করেছে ধুম্রজাল। এইজন্য এর নাম ধুয়াধারা বা ধুঁয়াধার।

অমরকন্টকের মার্কণ্ডেয় আশ্রমে শিউপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজী রেবা নাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন - ভিত্বা শৈলঞ্চ বিপুলং, অর্থাৎ পর্বত বিদীর্ণ করে বিরাট রব বা গর্জন সহকারে নর্মদা পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে, তাই তাঁর অপর নাম রেবা। ধুঁয়াধারের নর্মদার গতিপ্রকৃতি দেখে বুঝা যায় তার রেবা নামের সার্থকতা।

প্রায় আঠের দিন হ'ল বাড়ী থেকে এসেছি। নির্দিষ্ট ঠিকানার অভাবে বাবাকে পত্র দিতে পারিনি। আজ অবধুত আশ্রম থেকে ভিড়াঘাটের ঠিকানা দিয়ে বাবাকে পত্র দিলাম। যাত্রাপথ, সঙ্গী ও তীর্থদর্শনের সমূহ বিবরণ দিয়ে।

সুমেরদাসজী আজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন চৌষটযোগিনী মন্দির দেখাতে। আশ্রম থেকে সাত মিনিটের পথ। মন্দিরের সামনে বিরাট চওড়া সিঁড়ি। পরপর একশো আটটি ধাপ অতিক্রম করার পর দেখলাম পাহাড়ের মাথায় বিরাট বৃত্তাকার সমতলভুমি। পাথরের উঁচু প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। প্রবেশ করেই দেখলাম প্রাচীরের ভিতর দিকের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে সার সার একাশিটি মূর্তি।

গোলাকার চত্বরে গৌরীশংকরের মন্দির। গৌরীশংকরকে ঘিরে আছে চৌষট্টি যোগিনীর দল। এছাড়াও আছে বৃষভারূঢ় হরপার্বতী। হরপার্বতীকে ঘিরে সূর্য, চন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ, তারাদেবী, গণেশ, দত্তাত্রেয়। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা আছে কিন্নরী ও বহু দেবদেবী মূর্তি। সবাই হরপার্বতীর বন্দনারত। প্রত্যেকটি মূর্তি গঠন-পারিপাট্যে অপূর্ব স্থাপত্যকলার স্বাক্ষর বহন করছে।

সুমেরদাসজী জানালেন যে, প্রাচীনকালে এইখানে বিশাল শৈবমঠ ছিল। শৈব সন্ন্যাসীরা এই গোলাকার চত্বরের জন্য মঠের নাম দিয়েছিলেন গোলকীমঠ। ভিতর দেওয়ালের এককোণে গিয়ে দেখালেন লেখা আছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করে এই মঠ স্থাপন করেছিলেন - কলচুরি বংশের রাজা পরম শিবভক্ত কেয়ুরবর্ষ। লেখাটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ভাঙাচোরা দেবনাগরী হরফ থেকে পাঠোদ্ধার করে শোনালেন সুমেরদাসজী। তিনি বললেন, পূর্বে এই মঠে নর্মদামায়ীকী কৃপাসিদ্ধ বহু শৈব-সন্ন্যাসী বাস করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে আচার্য সম্ভাবশম্ভুর ঋদ্ধিসিদ্ধির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষময়। আচার্য বিশ্বেশ্বরশম্ভু নামে একজন বাঙালী মহাপুরুষ এক সময়ে এই মঠের মোহান্ত হয়েছিলেন।

আমি সুমেরদাসজীকে বললাম - আমি এই মঠের একটি শাখা দেখেছি গয়াতে। ব্রহ্মজোনি পাহাড় এবং মঙ্গলগৌরী মন্দিরের মধ্যস্থলে। সে মঠের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, এখন আর সেখানে কোন শৈব সন্ন্যাসী নেই। কিন্তু সেখানকার সুবিশাল মন্দিরের অভ্যন্তরে আছেন 'প্রপিতেশ্বর মহাদেব'। সেই পঞ্চমুখী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে দেখলে আপনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবেন। এমনই জীবন্ত যে, মনে হবে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, এখনই কথা বলে উঠবেন। যাবেন আমার সঙ্গে গয়ায় সেই অপূর্বসুন্দর অপরূপ বিগ্রহকে দেখতে ?

সুমেরদাসজী জবাব দিলেন - নেহিজী। নর্মদা ছোড়কে কহি নেহি যাউঙ্গা। নর্মদামায়ী হমলোগকো ইষ্ট ঔর পরমাগতি হ্যায়। ইধর শিউজীকী জাগ্রৎলীলা হরবখৎ চলতে রহে। নর্মদা ছোড়কে দুসরা স্থানমেঁ যানেকা ক্যা জরুরৎ।

গৌরীশংকর মন্দির থেকে নেমে এলাম।

অবধুত আশ্রমে দিনগুলি আনন্দেই কাটছে। সুমেরদাসজীর স্নেহ যত্নের অবধি নাই। ভিড়াঘাটের নর্মদার জল খুব শান্ত, মনে হবে যেন একটি নিস্তরঙ্গ হ্রদ। সেখানে জব্বলপুর শহর থেকে প্রায় লোক আসে নৌকা-বিহারের জন্য। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুমেরদাসজী একটি নৌকা ভাড়া করে সশিষ্যে নৌকায় উঠলেন। শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত। তরতর করে নৌকা চলল কাছের দ্বীপের মত একটি উঁচু জায়গাতে। এই পার্বত্য দ্বীপের উঁচু চূড়ার দিকে চোখ পড়ল - দেখি একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ অমল ধবল চন্দ্র কিরণে ঝকঝক করছে। সুমেরদাসজী জানালেন যে দ্বীপের চূড়ায় এই শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ। ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিবেদিত না হলে কি ভগবানের আসন এইরকম সুন্দর স্থানে পাততে পারেন ! ঐ শিবলিঙ্গকে দেখে মনে হল ঊর্দ্ধাকাশের চন্দ্রলোক থেকে শুরু করে মর্তলোকের নর্মদাতটবাসী সকলেই এমনকি পার্বত্য প্রকৃতি পর্যন্ত নিরবে বন্দনা করছে শিবলিঙ্গস্থিত মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরকে।

কাশ্মীরের অমরনাথের গুহাতে বসে একদিন পঞ্চতরণী এবং তার চতুস্পার্শ্বস্থ সাদা বরফে ঢাকা পর্বতশ্রেণীকে দেখে মনে হয়েছিল আমার সামনে যেন শিবের রজত ধবল একটি অখণ্ড বিগ্রহ সত্তা বিরাজমান। আজ এই নর্মদা বক্ষে বসে নানা বর্ণের নানা রং এর মার্বল পাথরের পটভূমিকায় বর্ণালী শোভার ইন্দ্রজাল এবং চন্দ্র কিরণ বিধৌত শিবলিঙ্গ দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আবেগভরে গেয়ে উঠলাম -

চন্দ্রোদ্ভাসিত শেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শংকরে,
সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠ-কর্ণ-যুগলে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।
দান্তিত্বক-কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,
মোক্ষার্থং কুরুচিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্মভিঃ ॥

আচার্য শংকর এই স্তবকে গদগদ হয়ে বলেছেন - যাঁর মস্তক চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাসিত, মদনকে যিনি ভস্ম করেছেন, গঙ্গাকে যিনি ধারন করেছেন, যাঁর কণ্ঠ ও কর্ণযুগল সর্পদ্বারা ভূষিত, যাঁর নয়ন হতে অগ্নিস্ফুরিত হয়, যিনি গজচর্মের আচ্ছাদন পরিধান করেন, ত্রৈলোক্যের সারভূত সেই শিবসুন্দরে চিত্তবৃত্তি স্থাপনা কর। অন্য কর্মে কি প্রয়োজন ?

নর্মদার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে জ্যোৎস্নার ঢেউ তুলে নৌকা ঘাটে এসে ভিড়ল। স্তোত্র শ্রবণে দরবিগলিত অশ্রু সুমেরদাসজী নীরবে তাঁর কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন।

নর্মদাতীরের প্রধান আকর্ষণ, জব্বলপুরের সবচেয়ে পরমাশ্চর্য বস্তু এই মার্বল রকস্। দুই ধারের পাহাড় কোথাও নীল কোথাও সবুজ আবার কোথাও বা হলুদ। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে কতগুলি খোঁদল, কোনটি হাতির পায়ের মত, কোনটি ঘোড়ার ক্ষুরের মত। শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে হলেও ভিড়াঘাট থেকে দেড়মাইল মাত্র। এইখানে থাকার ফলে সকাল-সন্ধে দুবেলাই আমি মার্বল রকস্ দেখতে যাই। সূর্যোদয়ের সময়েও গিয়েছি, গিয়েছি সূর্যাস্তের সময়তেও। অরুণোদয় কালে সূর্যের অরুন আভা রঙীন মার্বল পাথরে পড়ে সাতরঙা রামধনুর চেয়েও বিচিত্রতর বর্ণাঢ্য দৃশ্য যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি সূর্যাস্তের সময়তেও সৃষ্টি হয় অপরূপ সৌন্দর্যের ভুবন-ভোলানো নন্দনলোক। কবিগুরু কি নর্মদাতীরের এই দৃশ্য কোনদিন দেখতে এসেছিলেন কিনা জানা নেই কিন্তু কবিগুরুর ভাষা দু বেলাই আমার মনে গুঞ্জরন তোলে - অপরূপকে দেখে নিলেম দুটি নয়ন ভরে।

একদিন বেড়াতে গেলাম গোওয়ারী ঘাট - সেখান থেকে তিলওয়ারা ঘাট। এখানে নর্মদার উপর এক বিরাট ব্রীজ আছে, ব্রীজের নীচেই তিলওয়ারা ঘাট। সুমেরদাসজী তটভূমিতে এক শিবলিঙ্গ দেখিয়ে বললেন - ইহ্ হ্যায় তিলভাণ্ডেশ্বর। মহাজাগ্রৎ হৈ।

বললাম কাশীতে তিলভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন, তিনি নাকি নিত্য তিলে তিলে বেড়ে চলেছেন, সেখানে ভক্তদের ভীড় লেগেই আছে, এখানেও দেখছি খুব ভীড়। সব শিবই তো এক, তার মধ্যে মহাজাগ্রত বা মহানিদ্রিত কাকে বলছেন ? সংসারী লোক যাদের হাতে থাকে পূজার ডালা আর মনে থাকে কামনা বাসনা, তাদের সেই আর্জি যে দেবতার কাছে পূরণ হয়, তখন সেই দেবতাকে কি জাগ্রত বলা হবে ? আর তা না হলেই বলা হবে দেবতা নিদ্রিত। 'মহাজাগ্রৎ' এর সংজ্ঞাটি কি ?

সুমেরদাসজী - নেহি জী, সংসারী আদমী ত লালচী হোতে হ্যায়। উন্ লোগোনকা হরেক কিসিমকা বায়না কী বাত ছোড় দো। ইধর অষ্টাবক্রজীকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সিধা ঔর স্বাভাবিক হো গয়ে থে।

- বাংলাতেও বীরভূমে বক্রেশ্বর বলে একটি জায়গা আছে। উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। জনশ্রুতি, সেখানে অষ্টাবক্র তপস্যা করেছিলেন। এই নর্মদাতীরেও তিনি এসেছিলেন - তপস্যা করতে ?

- জরুর, ইধর তপস্যা করনেসে হি উনকা দেহকী বক্রতা নর্মদামায়ী হঠা দিয়ে থে।

মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে অষ্টাবক্র সম্বন্ধে যা পড়েছি তা মনে করতে লাগলাম।

অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে মোক্ষধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই উপদেশাবলীর নাম 'অষ্টাবক্র-সংহিতা'। তাঁর পিতার নাম কাহোড় আর মা ছিলেন উদ্দালক মুনির কন্যা সুজাতা। অষ্টাবক্র যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তিনি পিতার বেদ ও শাস্ত্রপাঠ শুনে শুনে বেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন। গর্ভে থাকাকালেই অষ্টাবক্র পিতার বেদপাঠকে অশুদ্ধ বলায় কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে অভিশাপ দিয়ে বলেন - ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই তোর স্বভাব যখন এত বক্র, তখন বক্র বা বিকলাঙ্গ হয়েই তোকে জন্মাতে হবে।

এর কিছুদিন পরে কহোড় অর্থাভাবে জর্জরিত হয়ে জনক রাজার অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁর সভাপণ্ডিত বরুণ ঋষির পুত্র বন্দীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তর্কযুদ্ধে কহোড় পরাস্ত হন এবং শর্তানুযায়ী বন্দী তাঁকে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন।

অষ্টাবক্রের যখন বার বৎসর বয়স, তখন পিতা কহোড়ের এই দুর্দশার কথা মায়ের কাছে জানতে পেরে তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে জনক-সভায় যান এবং তর্কে বন্দীকে পর্যুদস্ত করে জলমগ্ন পিতাকে উদ্ধার করেন। পিতা কহোড় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রকে আশির্বাদও করেন - সমঙ্গা নদীতে স্নান এবং তপস্যা করলেই দেহের বক্রতা দূর হবে। তিনিই অষ্টাবক্রকে সাথে নিয়েই সমঙ্গা নদীতীরে গিয়েছিলেন। আমি মহাভারত ও পুরাণের এই গল্পটি বর্ণনা করেই প্রশ্ন করলাম - ইধর সমঙ্গা নদীকা জিকর আয়া হৈ - নর্মদাকা নেহি।

সুমেরদাসজী - নর্মদাকা নাম হি সমঙ্গা হৈ।

আমি - মুনি কহোড় কি পাপ করেছিলেন যে বন্দীর হাতে তাঁকে এত দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল ?

সুমেরদাসজী - বেদপাঠি ব্রাহ্মন হোকর মুনিজীনে অর্থ কি লালচ্ মে শাস্ত্র কা উপর তর্কযুদ্ধকা অবতারণ কিয়ে থে। সাধু মুনি যব প্রতিগ্রহকা ফিকর্ মে পড় যাতা হৈ, ত উসমেঁ উহ্ পতিত হো যাতা হৈ।

পিতা-পুত্র দোনো ইধর আকর এহি তিলওয়ারা ঘাটমেঁ তিলভাণ্ডেশ্বরজীকা উপাসনা কিয়ে থে।

তিলওয়ারা ঘাটে স্নান পূজা দর্শনাদি সেরে আশ্রমে ফিরে এলাম। যদিও ভোরেই ভিড়াঘাটে স্নান করেছিলাম, তবুও নর্মদার জল এমনই স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ যে বারবার স্নান করতে লোভ হয়। একদল স্থানীয় বালকের ভীড় প্রায় প্রতি ঘাটেই লেগে আছে। তারা নৌকা যাত্রীদের বলছে, টাকা সিকি পয়সা ছুঁড়ে দিতে। জলের তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পয়সা ছোড়ার সাথে সাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে এবং একটু পরেই কুড়িয়ে আনছে। এরা জলে ডুব দিয়ে শিবলিঙ্গও কুড়িয়ে আনে। গণ্ডকীতে যেমন নারায়ণ শিলা পাওয়া যায়, তেমনি নানা প্রকারের এবং নানা রঙ্গের শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় নর্মদাতে। দেশ-বিদেশের বহু লোক কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে ঐসব শিবলিঙ্গ নিয়ে গিয়ে পূজা করেন।

ঐ দিনই বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেড়াতে বেরোচ্ছি, এমন সময় 'হর হর বম্ বম্' আওয়াজ তুলে একদল নাঁগা আশ্রমে এসে ঢুকলেন। শিঙা, ভেরী, এবং সজ্ঞনাদের সঙ্গে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনিতে আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠল। অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন পর্বের শেষে সুমেরদাসজী তাঁদের সাথে ইষ্টগোষ্ঠীতে মেতে উঠলেন। এঁরা এসেছেন কাশীর নিরঞ্জনী আখড়া হতে। কাশীর গঙ্গাতটে পেশোয়া ঘাটের কাছে নিরঞ্জনী আখড়া আমি দেখে এসেছি। এঁরা সবাই দত্তাত্রেয়পন্থী অবধূত। তাঁরা চারদিন এখানে থেকে জপতপ করলেন। তাঁদের ভাণ্ডারা অর্থাৎ ভোজন মহোৎসব দেখলাম। কিভাবে এতজন নাঁগা সাধুর দীয়তাং ভুজ্যতাং পর্ব সুমেরদাসজী সমাধা করলেন, তা আমার বোধগম্য হল না। সুমেরদাসজীর স্নেহদৃষ্টিতে এই লোকসমাগমের মধ্যেও আমার কোন অসুবিধা ঘটল না। আমার যথারীতি স্নান, হোম, আহার, বিশ্রাম প্রত্যাহিক ভ্রমন এবং মার্বল রকস্ এর শোভা দেখা - কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটল না।

চারদিন পরে নাগা সাধুরা বিদায় নিলেন। সুমেরদাসজী একটি টাঙ্গায় চেপে আমাকে নিয়ে চললেন মহর্ষি দুর্বাসা পূজিত শিব ' গুপ্তেশ্বর' দর্শন করাতে। দীর্ঘপথ টাঙ্গাতে চেপে যাবার পর আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেই দিকটা জব্বলপুরের পুরানো শহর। একটা বিরাট আমবাগান এবং মাইলখানেক সমতল ও পার্বত্যভুমি পেরিয়ে আমরা একটা পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুমেরদাসজী টাকা এবং কিছু খাবার হাতে দিয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় করলেন। ঝোলা থেকে খাবার বের করে দুজনেই খেয়ে নিলাম।

পাহাড়ের চড়াই শুরু হল; খানিকটা পথ অতিক্রম করে চারিদিকে পাহাড়ঘেরা অপূর্ব সুন্দর একটি সমতলভুমিতে এসে পৌঁছলাম। সেইখানে পাথর কেটে কেটে বানানো হয়েছে একটা খুব সুন্দর মন্দির। মন্দিরের ভেতরে অন্ধকার গুহার ভেতর গুপ্তেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। কতকাল আগে যে এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ প্রকটিত হয়েছিলেন, তা কারও জানা নেই। লিঙ্গাকারে গঠিত কৃষ্ণকায় শিলাস্তূপ মাটির সঙ্গে সংযুক্ত। দেবতা এখানে গুহার মধ্যে গুপ্ত আছেন বলে, তাঁর নাম হয়েছে গুপ্তেশ্বর শিব।

মহাদেবের একপাশে শুভ্র মর্মরে গঠিত সিদ্ধিদাতা গণেশ। গুহার সামনে কালো কষ্টিপাথরের একটি ষাঁড়। নাটমন্দিরে বসে তিনজন সন্ন্যাসী জপ করছেন। একটি অনির্বচনীয় দৈব ভাবের মাধুর্যে পুরো মন্দির প্রাঙ্গণে শুচি-সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই শান্ত গম্ভীর নির্জনতার মধ্যে যেন অস্ফুট ধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে মহাদেবের কণ্ঠনিঃসৃত নাদব্রহ্ম, অনন্তকালের অন্তহীন বাণী॥

প্রণাম সেরে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল একটি বেশ গভীর কুঁয়া, তার জল খেয়ে দেখলাম - যেমন মিষ্টি, তেমনি ঠাণ্ডা, ওপর থেকে কুঁয়ার জল গভীর নীল মনে হচ্ছিল, হয়তো নীলাক্ষি নর্মদার সাথে এই কুঁয়ার কোন যোগাযোগ আছে।

আবার আমরা চড়াই - এর পথে রওনা হলাম। পথ যেন শেষ হতে চাইছে না। উঁচু নিচু - এর যেন কোন শেষ নেই। সামনে, পেছনে, দুইপাশে শুধু কালো পাথর আর তারই মাঝে সবুজ ঘাস। কোথাও কোন শব্দ নেই, কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধ থমথমে ভাব চারদিকে।

চলতে চলতে এক সময় অনেক ওপরে শৈলচুড়া দূর থেকে দেখা গেল। নানা রঙের সারি সারি পতাকা উড়ছে। সুমেরদাসজী বললেন - শ্রী শ্রী সারদা দেবীর মন্দির। সরস্বতীর অপর এক নাম সারদা। সেখানে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাই এর নাম সারদাপীঠ। চতুর্ভূজা, শ্বেতবসনা, নানা অলংকারে শোভিতা দেবীমূর্তি এতই সুন্দর লাগছিল যে মনে হচ্ছিল যেন অদ্ভুত এক স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মন্দিরের বাইরে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হল। আকাশের বুকে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছিল নীলাভ বিদ্যুতের ঝলক্। বাইরে বেরোবার উপায় নেই, অগত্যা সুমেরদাসজী ভজন গাইতে শুরু করলেন হিন্দীতে।

আমিও একটি স্তোত্র পাঠ করলাম -

হ্রীং হ্রীং হ্রীং জপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে,
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ দুরিতাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্ ।
বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে
মার্গাতীতপ্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে ॥

সৌভাগ্যক্রমে আধ ঘন্টা পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সারদাপীঠের জলেভেজা মন্দির প্রাঙ্গন অতিক্রম করতে করতে আমার মনে হল, ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরেছি, কিন্তু দেবী সরস্বতীর এমন সুন্দর বিগ্রহ এর আগে কোথাও দেখিনি।

পুর্বে এই সমগ্র অঞ্চল ছিল গণ্ডোয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গৌড়-রাজপুত বংশের ইতিহাস প্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর আমলেই সম্ভবতঃ এই সারদাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দুর্গম পথ যাত্রায় শরীরের কষ্ট যতই হোক; পথ চলার নেশাতে আর নুতন নুতন জিনিষ দেখার আগ্রহে মন খুশিই থাকে। মনে হয় যাত্রা দীর্ঘতম হোক ক্ষতি নেই। আমি শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে দেখি বিশ্বপিতার সৃষ্টির কোথায় কোন্ বৈচিত্র লুকিয়ে আছে। কতবার যে আমরা পাথরে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলাম, তার অন্ত নেই। তবুও কোথাও যেন পথ চলার ক্লান্তি আমাদের মনের আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি।

এইভাবে কিছুদূর এগোনোর পর চারিদিকে বেশ উঁচু শিলাস্তুপের আড়ালে দেখি একটি বিশাল দীঘি, চোখে মুখে জল দিয়ে, হাত পা ধুয়ে, পেট ভরে জল খেলাম। কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল মাঝে মাঝে দীঘির ভেতর মাথা তুলে আছে বড় বড় পাথর। পাথরগুলির বৈশিষ্ট হল, এগুলির জলের ওপরের ভাগ ঘন কালো কিন্তু নিচের অংশে সাদা সাদা সরলরেখা টানা আছে, যেন শ্বেত চন্দনের তিলক্। এই রকম ছোটি ছোটি নুড়ি হরিদ্বারে আমার নজরে এসেছিল কিন্তু আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

একটি পাথরের ওপর চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ সুমেরদাসজী নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন - রানী দুর্গাবতীর রাজত্বেই এই রকম আঠেরটি সরোবর তাঁর দুর্গকে চারদিক থেকে ঘিরে ছিল। কালের প্রকোপে তা ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হয়ে তার এই একটি মাত্র টিকে আছে। আমরা পাহাড় থেকে উৎরাই এর পথে এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম সেটি একটি শুকনো ঝরণার ধারাপথ; অরণ্য এখানে অপেক্ষাকৃত ঘন - কেমন যেন একটা গা ছমছমে পরিবেশ। তাড়াতাড়ি হেঁটে আমরা একটা গ্রামের কাছাকাছি সমতলভুমিতে এসে পৌছুলাম। সুমেরদাসজী জানালেন ঐ গ্রামটির নাম গড়হা। দেখলাম চারদিকে ছড়ানো আছে কোনো প্রাচীন প্রাসাদপুরীর ধ্বংসাবশেষ। সেইসব ধ্বংসাবশেষের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গাকারে গঠিত একটি বিশাল ত্রিতল বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা। এটাই গণ্ডোয়ানার রানী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর খাসমহল। বিবাহের পর স্বামী দলপত্ শাহ্-এর সাথে তিনি এই প্রাসাদে বাস করতেন। দলপত্ শাহর পূর্বপুরুষ গৌড়-রাজ মদন শাহ্ এই প্রাসাদ-দুর্গের নির্মাতা, তাই এর নাম মদনমহল। নির্মানকাল ১১১৩ খৃষ্টাব্দ।

এই প্রাসাদ-দুর্গের বৈশিষ্ট্য হল - এর মূল ভিত্তি একটি মাত্র দীর্ঘাকার পাষানখণ্ডের ওপর স্থাপিত। আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট বিশাল বিশাল পাথর একের পর এক বসিয়ে তৈরি হয়েছে দেয়াল, অত্যন্ত সুকৌশলে বানানো হয়েছে স্তরে স্তরে বহু জানালা, ছাদ ও অলিন্দ, দুর্গদ্বারের মাথায় বিশাল খিলান। প্রতিটি অলিন্দ এবং ছাদের প্রাচীর এর শীর্ষভাগ পদ্মের পাপড়ির মত ঢেউ খেলানো এবং তার নিচের দিকে ছোট ছোট ছিদ্র। মহলের ভেতরে জমাট অন্ধকার; হয়তো সরিসৃপের রাজত্ব, বদ্ধ ঘরের গুমোট গন্ধ ও জঞ্জালে ভরা। কোথাও কোন কারুকার্য নেই।

প্রাসাদ শীর্ষে উঠে মাত্র চার মাইল দূরের জব্বলপুর শহরকে ছবির মত দেখা যায়। শত শত অট্টালিকা, বড় বড় সরকারী দপ্তর, কলকারখানা, দোকান বাজার স্কুল-কলেজ, লক্ষ লক্ষ জনতার কোলাহলে জব্বলপুর মুখর, কিন্তু এই নির্জন গড়হা গ্রামের কাছে মদনমহল পড়ে রয়েছে কেবল মহীয়সী রাণী দুর্গাবতীর স্মারক চিহ্ন হিসেবে। দুর্দান্ত আরণ্যক জাতি গৌড়দের দুর্জয় শৌর্যবীর্যের প্রতীকরূপে।

মদনমহল দেখতে দেখতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। সেই রাতে আর অবধূত আশ্রমে ফেরা হল না। সুমেরদাসজী গড়হা গ্রামেই তাঁর এক ভক্তের বাড়ী গিয়ে পৌছুলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর পৌছনোর খবর পেয়ে দশ-বার জন প্রতিবেশীও সপরিবারে সাধুদর্শনে এলেন। এইখানে এক আশ্চর্য কাহিনী শোনালেন সুমেরদাসজী, বললেন তাঁর গুরুদেবের কথা। তাঁর গুরুদেব থাকতেন ত্রিপুরী গ্রামে - নর্মদাতট সেখান থেকে দেড়-দু মাইলের মধ্যে; এই সেই বিখ্যাত ত্রিপুরী যেখানকার নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারত গৌরব নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু। সুমেরদাসজীর গুরুর নাম ছিল ভীষ্মদাস, চাষবাসই ছিল তাঁর উপজীবিকা। তিনি খোঁড়া ছিলেন, তাঁর সবেধন নীলমনি একমাত্র পুত্র তরুন যুবক ভীম-ই চাষবাসে বিপুল পরিশ্রম করত।

তিলওয়ারা ঘাটের শিবরাত্রির মেলায় গিয়ে ছেলে আর ফিরল না। সকালে একজন প্রতিবেশী এসে খবর দিল; এখন যেখানে নর্মদার ওপর ব্রীজ আছে, যে ব্রীজ-র থেকে রাস্তা চলে গেছে নাগপুরের দিকে, তখন সেই ব্রীজ তৈরি হচ্ছিল। সেইখানে পা পিছলে ভীম নর্মদার জলে পড়ে তলিয়ে গেছে, তাকে আর কেউ উঠতে দেখেনি।

পরদিন সকালে এই নিদারুণ সংবাদে ভীষ্মদাস পাগল হয়ে যান। ভীম-ভীম বলে চিৎকার করাতে করতে তিনি দৌড়ে গিয়ে নর্মদাতে ঝাঁপ দেন। লোকজন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে নর্মদা থেকে টেনে তোলে। জ্ঞান হবার পর নর্মদাতটে দৌড়োতে থাকেন, আবার ঝাঁপ দেন। এইভাবে তিনবার ঝাঁপ দেন; তিনবারই তিনি বেঁচে যান। বদ্ধ পাগল অবস্থা তখন তাঁর। এইভাবে পাঁচদিন কেটে গেল। ষষ্ঠদিনে গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন নীলনয়না শ্যামলাঙ্গী এক জ্যোতির্ময়ী কুমারী কন্যা এসে বলছেন; ভীষ্ম তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ কেন, ভীড়াঘাটে গিয়ে দেখ, তোমার ভীম সেখানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে, সে বেঁচে আছে।

ভীষ্ম দৌড়ে গিয়ে দেখেন তিনি যে রকম দেখেছিলেন ঠিক সেভাবেই ভীম আছে। সংজ্ঞাহীন পুত্রকে পেয়ে তিনি আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। যাই হোক ছেলে তো সুস্থ হয়ে উঠল সাথে সাথে তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর খঞ্জ পা-টিও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজন এসে ভীমকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কিন্তু ভীষ্ম আর ফিরে গেলেন না সংসারে।

ভিড়াঘাটে এখন যেখানে অবধূত আশ্রম, সেখানেই তিনি পড়ে রইলেন; মুখে কেবল রেবা রেবা। রোদ জল ঝড় বৃষ্টি; গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম কিংবা শীতকালের প্রচণ্ড শৈত্য সব কিছুকেই অগ্রাহ্য করে তিনি জপ্ করতে লাগলেন রেবা রেবা রেবা রেবা।

সুমেরদাসজী বলে চলেছেন - তাঁর গুরুদেব ভীষ্মদাসের পুত্রের পুনর্জীবন লাভ এবং গুরুদেবের খোঁড়া পা স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ঘটনা চারিদিকে ছড়িয়ে পরতেই সারা জব্বলপুর শহর ভেঙে পড়ে ভীষ্মদাসের কাছে। অতিষ্ঠ হয়ে ভীষ্মদাস একদিন গভীর রাত্রে জংগলে গিয়ে আশ্রয় নেন। এই সব ঘটনা ঘটে তখন আমার বয়েস বার বৎসর। ঘটনা শুনে আমার মনে তুফান ওঠে। আমারও পূর্বাশ্রমের বাড়ী ছিল ত্রিপুরী গ্রামে। একদিন রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই, গিয়ে পৌছুই অমরকন্টকে। পরিক্রমাবাসী সাধুদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে মান্দালার জংগলে একদিন ভীষ্মদাসের সন্ধান পাই। সেই থেকে আমি গুরুদেবের দাসানুদাস হয়ে ভীড়াঘাটে পড়ে আছি।

আমি সুমেরদাসজীকে প্রশ্ন করলাম - মহাভারতে সমঙ্গা নদীর উল্লেখ আছে। অষ্টাবক্রের দৈহিক বক্রতা যে সমঙ্গা নদীতে স্নানের ফলে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল সে কথাও লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এই নর্মদাই যে সমঙ্গা মহাভারতে তার স্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নাই।

সুমেরদাসজী বললেন - তিলওয়ারা ঘাটে কহোড় এবং তার পুত্র অষ্টাবক্র যে নর্মদায় স্নান করে তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন সে কথা আবহমান কাল থেকে গুরুপরম্পরা চলে আসছে। আমার গুরুর পা যখন খোঁড়া ছিল তখন তাঁকে দেখেছি আবার নর্মদামাঈর কৃপায় যখন তাঁর পা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল তখনও তাকে স্বচক্ষে দেখেছি। দীর্ঘকাল তাঁর সেবা করেছি। সম্যানি অঙ্গানি সস্যাঃ সকাশাৎ সেতি সমঙ্গা। নর্মদার কৃপাতে আমার গুরুর খঞ্জ পা স্বাভাবিক হয়েছিল - নর্মদাই সমঙ্গা একথা তোমরা বিশ্বাস কর। নর্মদার মহিমার শেষ নেই - এই ঘোর কলিযুগেও তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই জন্য শাস্ত্রে গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী নদীর মাহাত্ম্যের বর্ণনা থাকলেও একমাত্র নর্মদা পরিক্রমার কথাই সাগ্রহে ঋষিরা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গা পরিক্রমা বা অন্য কোন

নদীর পরিক্রমার কথা শাস্ত্রে শোনা যায় না। কিন্তু চিরকালই মহাত্মারা দলে দলে নর্মদা পরিক্রমা করে চলেছেন। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, ধারণা, সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধির সাধনাদি দুশ্চর তপস্যায় যে বস্তু লাভ হয়, তা সহজেই নর্মদা পরিক্রমায় অধিগত হয়। পরিক্রমাকারীর সাধনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন মা নর্মদা।

সেই রাত্রি গড়হা গ্রামে কাটিয়ে পরদিন এসে পৌঁছলাম অবধূত আশ্রমে। দুদিন পরেই বাবার একখানা চিঠি হাতে এল, মানি অর্ডারে টাকাও পাঠিয়েছেন। সুমেরদাসজীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সাদর সম্ভাষন ও দণ্ডবৎ জানিয়েছেন। আমাকে বিশেষ করে স্মরণ করিয়েছেন – ঐ টাকা যেন সুমেরদাসজীর হাতে প্রণামী দেওয়া হয়, কারণ তীর্থ ঋণ রাখতে নেই।

বাবার পত্র শোনালাম সুমেরদাসজীকে। তিনি পঞ্চাঙ্গ (পঞ্জিকা) দেখে যাত্রার দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু ঝঞ্ঝাট হ'ল তাঁকে টাকা দিতে গিয়ে। তিনি কিছুতেই টাকা নেবেন না। কারণ আমি তাঁর 'মেহমান'। আমি বললাম - এই দুর্গম দেশে অমরকন্টক থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত সমস্ত যাত্রাপথে আপনার কাছে যে স্নেহ ও সাহচর্য পেয়েছি, তা কোনকালেই সামান্য টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না। তবে বাবার আদেশ আমাকে মানতেই হবে। বাবা আপনাকে টাকা দিতে বলেছেন, তা দয়া করে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু সুমেরদাসজীর সাফ জবাব - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, আপকে লিয়ে ইয়ে জরুরী হ্যায়, কেঁও কি আপকো পিতাজীকা আদেশ মাননেই পড়েগা। লেকিন্ উহ্ আদেশ মাননা হমকো লিয়ে জরুরী নেহি হ্যায়, রুপেয়া লেনা ন লেনা উহ্ হমারা এক্তিয়ারমে হৈ। কিছুতেই তিনি টাকা নেবেন না দেখে শাস্ত্রগতপ্রাণ সাধুর কাছে শাস্ত্রের দোহাই পাড়লাম। বললাম – মহাভারতের বনপর্বে আছে যুধিষ্ঠির যখন তীর্থভ্রমন করতে যাচ্ছেন তখন মহামুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন -

প্রতিগ্রহাৎ অপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহংকার নিবৃত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥

অর্থাৎ তীর্থ করতে গিয়ে প্রতিগ্রহ (অপরের কাছ থেকে টাকা পয়সা ও বিনামূল্যে অন্নগ্রহণাদি) করতে নাই, সবরকম অবস্থাতে মনের সন্তোষ বজায় রাখতে হয়, এবং নিরহঙ্কার হতে হয়, তবেই তীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। পুলস্ত্য মুনি বলেছেন – প্রতিগ্রহাৎ অপাবৃত্তঃ - প্রতিগ্রহ করা চলবেনা। আপনি কি তাহলে পুলস্ত্য মুনির উপদেশ মানবেন না ?

শাস্ত্রগতপ্রাণ সাধু এইবার ফাঁপরে পড়লেন। বললেন - পুলস্ত্যজীনে যব্ কহা তব্ ক্যা কিয়া যায় ! এক নাগা শিষ্যকে ডেকে বললেন - ঐ টাকা তোমার কাছে রেখে দাও, আশ্রমে সাধু মহাত্মা এলে ঐ টাকা তাঁদের সেবাতে খরচ্ করবে।

সুমেরদাসজীর নির্দিষ্ট শুভদিনে এলাহাবাদগামী ট্রেন ধরবার জন্য টাঙ্গায় উঠে যাত্রা করলাম। জব্বলপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দিবার জন্য তিনি নিজে আশ্রম সেবক নাঁগা মেহেরদাসকে সঙ্গে নিয়ে টাঙ্গায় এসে উঠলেন। যথা সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছে শুনলাম ট্রেন আসতে তখনও আধ ঘন্টা দেরী। এরই মধ্যে তিনি কয়েকবার শুনিয়েছেন, ট্রেনে সর্বদাই আমি যেন নর্মদা মায়ীকে স্মরণ করি। সঙ্গে পুরী লাড্ডু দেওয়া আছে, তা যেন মনে করে খাই। জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না, সবই নর্মদা মায়ীর ইচ্ছা।

সংসার বিরক্ত নিরাসক্ত সাধুর স্নেহে আমি অভিভূত। প্রণাম করে বললাম - আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন - আমি লেখাপড়া শিখিনি। আমার যা কিছু শিক্ষা নর্মদাতটবাসী সাধুদের বাণী বচন। মুণ্ডমহারণ্যের জঙ্গলে এক মহাত্মা আমাকে মহাভারত থেকে কায়ব্য ব্যাধের গল্প শুনিয়েছিলেন। তা আমার মনে খুব রেখাপাত করে। আমার বিরক্ত জীবনে সেই ধারারই অনুসরন করি। আমি নিজে যা করি এবং মানি তাই তোমাকে বলছি। মহাত্মা ভীষ্মদাস আমার গুরু, নর্মদা আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা, সেই মহাত্মার উপদিষ্ট কায়ব্য-ব্যাধের জীবন বৃত্তান্ত লোকচক্ষুর অগোচরে আমার অন্তরজীবনকে পরিচালিত করে চলেছে। সেই গল্পই বলছি শোন এবং চিরকাল স্মরণে রেখ।

কায়ব্যের জন্ম ব্যাধকুলে। ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বন করেই সে আপন পরিবারের সকলের ভরণ-পোষন করত। সে প্রতিদিন মদ, মাংস, ফলমূল এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করে বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির ও মাতাপিতার সেবা করত। তাঁর কাছ হতে কোন অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। দিনে এবং রাত্রিতে দুবেলাই সে একটা নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনায় বসত। শত বাধা-বিপত্তিতেও সে উপাসনার আসন ছেড়ে উঠত না।

কায়ব্যের এই জীবনযাত্রার ধারা সমগ্র ব্যাধ পল্লীতে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করে। তাঁকে গ্রামের সবাই মিলে গ্রামনী (প্রধান ব্যাক্তি) নির্বাচিত করে। তাঁর শাসনানুসারেই চলতে সম্মত হয়। ব্যাধদের প্রতি কায়ব্যের উপদেশ ছিল - সত্যের কোন অপলাপ কোর না। স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর কোন অত্যাচার কোর না। সর্বস্ব ত্যাগ করেও সাধু, ব্রাহ্মন এবং অতিথির সেবা করবে। নিত্য নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করবে।
কায়ব্য নিজেও যেমন এই ধর্মনীতি নিজের জীবনে আচরণ করে অন্তকালে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর শিক্ষাধীনে ব্যাধদেরও ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি ঘটেছিল।
কায়ব্যের এই উপদেশ শুনিয়ে সুমেরদাসজী বলেছিলেন - উচ্চস্থান হতে বড় শিলা অকস্মাৎ ভূমিতে পড়ে গেলে সেখানকার মাটি যেমন নিষ্পেসিত হয়ে ধুলি উৎপন্ন হয়, শিলার উপর ধুলি রেখে অন্য শিলা দ্বারা পেষণ করলে তা যেমন ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়, তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের যতই অনুশীলন করা যায়; ধর্মনিহিত তত্ত্ব ততই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উপলব্ধিতে ফুটে ওঠে -

যথা হ্যকস্মাদ ভবতি ভূমৌ পাংশুর্বিলোলিতঃ।
তথৈবেহ ভবেদ্ধর্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মতরস্তথা ॥

গাড়ী প্লাটফরমে ঢুকছে, বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুমেরদাসজী বলে চলেছেন - 'জীবনে আর দেখা হবে কি না জানিনা, কিন্তু 'জিন্দেগীভর' আমার এ কথাটি মনে রাখবে, 'জিন্দেগীভর' ধর্মের অনুশীলন করবে, ধ্যানজপ্ করবে, জিন্দেগী সফল হো জাবেগা'
গাড়িতে বসে জানালা দিয়ে যতক্ষন দৃষ্টি গেল; চেয়ে দেখলাম তিনি হাত তুলে দাঁরিয়ে আছেন। মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললাম - হে নর্মদাবাসী মহাত্মন ! সারাজীবন তোমার উপদেশ তোমার স্নেহ-
-যত্ন মনে রাখব। দুর্গম দেশে দুর্গম পথের বন্ধু তুমি, সাথী তুমি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাচ্ছি।

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৫২ সাল। স্থান নৈমিষারণ্য। বাবা ব্রহ্মকালীন হবার পর হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভারতের তীর্থে তীর্থে, পাহাড়ে পর্বতে, কন্দরে-কুটিরে। নরনারায়ণ পর্বত, সিদ্ধসেবিত শতপন্থ, বদরীনারায়ণ, ত্রীযুগী-নারায়ণ এবং গৌরীকেদার প্রভৃতি স্থান পর্যটন করে হরিদ্বার হতে ধেনুমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যে এসে পৌঁচেছি। নৈমিষারণ্যের অপর নাম নিমিষার। ধেনুমতীরই অপর নাম গোমতী নদী।

স্বয়ং বেদব্যাস মহাভারতে এই নৈমিষারণ্যকে সিদ্ধ তপোক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন পুলস্ত্য মুনির মুখ দিয়ে -

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি নৈমিষে তানি ভারত !
নিত্যং মেধ্যঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসত্তম !

(মহাভারত, বনপর্ব ৬৯ অধ্যায়)

পুলস্ত্য যুধিষ্ঠিরকে বলছেন - রাজশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদয়ই নৈমিষারণ্যে আছে। নৈমিষ তীর্থ সর্বদাই পবিত্র এবং পুণ্যজনক।

পূর্বকালে ৮৮০০০ ঋষি এই তপোভূমিতে বাস করতেন। বেদপাঠের উদ্দাত ধ্বনি এবং যজ্ঞধূমে পূর্ণ থাকত এখানকার আকাশ বাতাস। এইখানেই সূতবংশীয় লোমহর্ষনের পুত্র সৌতি - যাঁর প্রকৃত নাম ছিল উগ্রশ্রবা - তিনি প্রতিদিন সমগ্র ঋষিমণ্ডলীর কাছে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন।

এখানে এখনও অজস্র তপোবন আছে, কিন্তু জনশূন্য; চারদিকে বিরাট বিরাট চক্রাকারে সাজানো আমবাগান, মধ্যস্থলে পরিচ্ছন্ন মুক্ত প্রাঙ্গণ, পরিত্যক্ত যজ্ঞস্থলী, কুশবন, সংখ্যাতীত পেয়ারা, আমলকী, বহেড়া, হরিতকী, কিছু কিছু চন্দন গাছ, দু-তিন হাত মাটি খুঁড়লেই মাটির নিচেই যজ্ঞভস্ম - এসব দেখলে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে মহাভারতে উল্লেখিত নৈমিষারণ্য পূর্বে ঋষিদের তপস্যাস্থলী ছিল।

সীতাপুর জংশন হতে রামকোট হয়ে হেমা তপোবন, হেমা থেকে ধেনুমতীর তীর পর্যন্ত সর্বত্রই শত শত তপোবনের আকারে সাজানো বাগান - মধ্যে যজ্ঞবেদী এবং যজ্ঞকুণ্ড। ধেনুমতীর দক্ষিণ তীরে এখনও অনেক সিদ্ধ মহাত্মার বাস, কুশের জঙ্গলে ঢাকা সুড়ঙ্গের আকারে গুহা। তাঁরা লোকচক্ষে কদাপি আবির্ভূত হন না। কুশের জঙ্গল ভেদ করে যারা তাঁদের সুরঙ্গ বা গুহার দ্বারে ধৈর্য ও ভক্তি সহকারে পড়ে থাকতে পারে কেবল তারাই তাঁদের দর্শন লাভে ধন্য হয়। গভীর রাত্রে তাঁদের গুহাশ্রম থেকে সামবেদের ঝঙ্কার আজও শোনা যায়।

পুরাণে আছে, দ্বাপর যুগের প্রথমভাগে ঐখানে গৌরমুখ নামে এক উগ্রতেজা মুনি তপস্যা করতেন। একবার সহসা একদল অসুর এসে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করে দেয়। ক্রুদ্ধ ঋষি তাদের দিকে এক নিমেষ তাকিয়েই তাদের ভস্মীভূত করে ফেলেন, এইজন্য এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। কিন্তু মহাভারতে আছে, কলিযুগ সমাগত দেখে প্রজাপতি মনু ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, কলিযুগে ধর্ম বিলুপ্ত হবে, মানুষ ধর্মভ্রষ্ট এবং আচার ভ্রষ্ট হবে, আমরা কোথায় বসে তপস্যা করব ? বিষ্ণু উত্তর দেন - আমি এই সুদর্শন চক্র পৃথিবীতে নিক্ষেপ করছি, যেখানে এই চক্র এক নিমেষকাল ঘূর্ণিপাক খেয়ে আমার হাতে ফিরে আসবে, আপনারা জানবেন সেই স্থানই তপস্যার অনুকূল, সেই স্থানের পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করেই সত্য ও ধর্মজিজ্ঞাসা চিরজাগ্রত থাকবে।

মনু দিব্যদৃষ্টিতে সেই চক্রপথ অনুসরণ করে দেখতে পেলেন যে একটি বিশেষ স্থানে সুদর্শন চক্র এক নিমেষকাল আবর্তিত হয়ে ভগবানের হাতে ফিরে গেল। এই আবর্তনের প্রচণ্ড গতিতে চক্রনেমি পৃথিবী পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে পাতাল গঙ্গাকে উৎসারিত করে দিল। সেই জলই ধেনুমতী নদী আকারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং ঐ স্থানের নাম হয়েছে চক্রতীর্থ - শ্রেষ্ঠ পিতৃতীর্থ। চক্রতীর্থের জলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন এবং কব্য আহুতি দিলে পিতৃপুরুষরা পরমাগতি লাভ করেন। চক্রতীর্থ নামক কুণ্ডটিই হচ্ছে ধেনুমতীর উৎস। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে। চক্রতীর্থের পূর্বপাড়ে ভূতনাথ শিবের মন্দির। এরকম অদ্ভুত শিবলিঙ্গ আমি আর কোথাও দেখিনি। শিবলিঙ্গে অত্যুজ্জ্বল দুটি চক্ষু - অন্ধকারে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। পশ্চিমপাড়ে গণেশ ও ব্রহ্মার মন্দির। ফাল্গুনী পূর্ণীমাতে প্রতি বৎসরই শত শত সাধু এই মন্দির হতেই পরিক্রমা শুরু করে নিমরিখ নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ দধীচি কুণ্ড হয়ে হত্যাহরণ পর্যন্ত চুরাশি ক্রোশ পথ পরিক্রমা করে থাকেন।

চক্রতীর্থ ও ধেনুমতী নদীর মধ্যস্থলে মনু ও শতরূপার তাপস্যাস্থল - ধেনুমতীর তীরে। প্রায় পচিঁশ গজ দূরে জৈমিনি ঋষির আশ্রম এবং ব্যাসগদী। চক্রতীর্থের উত্তরে ললিতাদেবীর মন্দির। এইখানকার সাধু এবং পাণ্ডারা বলেন, ঐ ব্যাসগদীতে বসেই বেদব্যাস তাঁর শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল ও বৈশম্পায়নকে চারটি বেদেরই শিক্ষা দেন আর লোমহর্ষণ মুনিকে শিক্ষা দেন পুরাণ এবং ইতিহাসের।

আমি নৈমিষারণ্যে গিয়ে প্রথমে চক্রতীর্থ হতে আট মাইল দূরে নিমরিখ্ নামক স্থানে দধীচি কুণ্ডে আসন পাতি। দধীচি কুণ্ড একটি বিরাট দীঘি, তার তীরেই দধীচি মুনির স্মারক মন্দির। মহাভারত এবং অগ্নিপুরাণ মতে অর্থবা ঋষির ঔরষে কর্দম প্রজাপতির কন্যা শান্তির গর্ভে দধীচির জন্ম হয়। স্কন্ধপুরাণ মতে দধীচির পত্নীর নাম - সুর্বাচা। দেখলাম স্মারক মন্দিরের দেয়ালে দধীচি কুণ্ডের অধিকারী বেদবিৎ ব্রাহ্মনরা বৈদিক সাহিত্য হতে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে রেখেছেন যে, দধীচি পুত্রের নাম পিপ্পলাদ, তিনিও মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

একথা প্রায় সকলেই জানেন দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হয়েছিল, সেই বজ্র নিক্ষেপেই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে পেরেছিলেন। বৃত্রাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাগণ বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচির স্মরনাপন্ন হয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করেন এবং কল্যানব্রতী ঋষি অম্লান বদনে যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। দধীচি শব্দ দধ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন। দধ্ ধাতুর অর্থ দান করা, ত্যাগ করা (দধ্+ঈচ্, ঈচি কর্তৃবাচ্যে)। দধীচি ভারত ইতিহাসে ত্রৈলোক্যস্য হিতায় আত্মদান বা আত্মত্যাগের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। পূজার্হ, চির-নমস্য ঋষি।

প্রায় দশদিন দধীচি কুণ্ডে থেকে আমি ধেনুমতীর তীরে জৈমিনী আশ্রমে চলে যাই, সেখানেই অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে চুরাশী ক্রোশব্যাপী নৈমিষারণ্য পরিক্রমা করি। একদিন গভীর রাত্রে বেদমন্ত্রের ধ্বনি কানে এল। নিস্তব্ধ রাত্রির শান্ত নির্জন পরিবেশে ভাল করে কান পেতে শুনতে পেলাম, ধেনুমতীর ওপারের গুহা হতে কোন মহাত্মা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন -

ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কং মনোজবিষ্ঠং পতয়ত্ স্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসা সকেতা একং ক্রতুং অভি বি যন্তি সাধু॥ (ঋ ৬।৯।৫)

মহাত্মা যেন বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে বলছেন - কলিহত জীব তোমরা শোন, তিনি ধ্রুবজ্যোতি, শাশ্বত আলোক। অকম্প অনির্বান সে দ্যুতি মানসলোকের দ্রুততম চিন্তার চেয়ে দ্রুতগামী। সমস্ত বিবর্তনের মাঝে, সমস্ত ক্ষণিকভাতির অন্তরে তাঁরই প্রকাশ - সেই নিগুঢ় আবির্ভাবই মানুষকে পথ দেখায়, জীবনের অন্ধকারে সত্য ও সুন্দরের পথে নিয়ে যায়।

সেই বেদধ্বনি শুনতে শুনতে ধেনুমতীর তীরে বসে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত আকুতি আমার মনেও জেগে উঠলো -

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরমঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।

জৈমিনী আশ্রমে বসে আছি। একদিন সকালে দেখি চারজন সাধু এসে মনু-শতরূপার স্থানে পৌঁছলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করে বসে থাকার একটি বিশেষ ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল এঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আমি তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেই সেই সাধুটি বললেন - ক্যা অমরকন্টককী মহাত্মা শংকরনাথজীকো ইয়াদ হ্যায় !

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কর্ণমন্দিরের সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ মহাত্মাকে।

সাধু বলে চললেন - হম্ গয়ে থে বদরীনাথজীকো তরফ্। আনেকা বখত্ উনোনে কহা, আপকা সাথ ভেট হোনেসে ইহ্ বোল দেনা, আপকে পিতাজীকা নর্মদা মায়ীকী বারে মেঁ যো আদেশ থী, উস্ বাত্ ইয়াদ করেঁ।

যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল স্মৃতির মণিকোঠায়। আমার ঋষি পিতার অন্তর্ধানের পর পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি তীর্থে তীর্থে। আমার জীবনে প্রেমের ফুল একবারই ফুটেছিল, নরন্তর সুরভি বিলিয়ে সে ফুল ঝরে গেছে বটে কিন্তু অহরহ আমার অন্তর্সত্ত্বা এবং বহির্সত্ত্বাকে ব্যাপ্ত করে মর্মদেশের কোরকে জেগে আছেন তিনিই।

প্রথমবার অমরকন্টক দর্শন করে ১৯৪৯ সালে ফিরে যাবার পর শাস্ত্রানুসারে নর্মদা-পরিক্রমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বাবা।

মহাত্মা শংকরনাথজীর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি আমাকে পিতার আদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নর্মদা-পরিক্রমার প্রবল উৎসাহ আমাকে অস্থির করে তুলল।

এই ঘটনার পরদিনই নৈমিষারণ্য থেকে এলাহাবাদ যাত্রা করলাম। ঐ সাধুও আমার সঙ্গে চললেন। দুদিন ত্রিবেণী বাঁধের উপর হঠযোগী হাড়োয়া বাবার আশ্রমে থেকে দুজনে গেলাম জব্বলপুর। ভিড়াঘাটের 'অবধূত আশ্রমে' গিয়ে শুনলাম - সুমেরদাসজী গেছেন মান্দালায় নর্মদার তীর ধরে হেঁটে হেঁটে। মেহেরদাসজীর আগ্রহে সেখানে দুদিন কাটিয়ে বিলাসপুর - পেন্ড্রারোড হয়ে পৌঁছে গেলাম অমরকন্টকে।

সাধু আমাকে নিয়ে হাজির করলেন মৎসেন্দ্রনাথজীর মন্দিরে।

শংকরনাথজী অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন। সেদিন ২৮শে ভাদ্র। বললেন - আর চার-পাঁচদিন পরেই পরিক্রমা শুরু হবে। পরিক্রমাকারী অনেক সাধু এসে গেছেন। আমিও সঙ্গে থাকব। এখন নর্মদায় স্নান করে মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে এসো। এ কয়দিন আমার কাছেই থাক। এই মুহূর্ত্ত থেকে নর্মদাই তোমার ধ্যান জ্ঞান হোক।

আমি মহাত্মাকে নিবেদন করলাম - তা কি করে সম্ভব ? নর্মদার জল প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এঁর যে কোন দিব্যরূপ আছে আমার তো তা উপলব্ধি হয়নি। যে জিনিষের উপলব্ধি হয়েছে তারই তো স্মরণ মনন করা সম্ভব, ড্যাফোডিল ফুল আমার দেখা নেই, নীলপদ্মও আমি দেখিনি। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলে বা মনে করার চেষ্টা করলে আমার মানসচক্ষে তা কি করে ভাসবে ? নর্মদা-মন্দির এবং মন্দিরস্থ নর্মদা মূর্তি আমি দেখেছি, এখন আপনার সামনে চোখ বন্ধ করে মানসপটে তা ফুটিয়ে তুলতে পারি, কিন্তু তা কি মনুষ্য কল্পিত মূর্তি নয় ?

তাছাড়া আমি বেদপাঠী। বেদের স্পষ্ট ঘোষনা - ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্দশঃ (যজু)। সেই অজ অব্যয় পরমেশ্বরের, সর্বব্যাপ্ত নিরঞ্জনের কোন মূর্তি হয় না। যথেষ্ট শ্রদ্ধা সহকারেই বলছি, বেদবিরুদ্ধ ধারণা বা কল্পনাকে মনে মনে লালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মহাত্মা সহাস্যে বললেন - প্রথম থেকেই যদি তর্ক কর, তাহলে তত্ত্বের গভীরে ডুববে কি করে ? বৈজ্ঞানিকরাও প্রথমে একটা **Hypothesis** ধরেই গবেষণাগারে গবেষনা করতে বসে যান।
তারপরে **Confirmation test** - এ উপনীত হন। **Hypothesis**-টাও ধরা হয়, পূর্ব পূর্ব গবেষক বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার মূল সুত্রের ওপর ভিত্তি করে। তার বিশিষ্ট **laboratory Process** ও তাঁরা দিয়ে গেছেন।

আধ্যাত্মিক গবেষণার ক্ষেত্রেও, পূর্ব পূর্ব ঋষিরা আমাদের পূর্বজরা, নিজেরা যে পথে গবেষণা বা সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন, সেই সাধনপথকে বিশ্বাস করেই আমাদেরকে এগোতে হয়।

আমাদের পূর্বজ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় - যাঁকে কপিল, সনক, ভৃগু, কহোড়, বেদব্যাস প্রভৃতি বেদজ্ঞ মহাসিদ্ধ ঋষিগণও সপ্তকল্পান্তজীবী চিরঞ্জীবী অমর ঋষি বলে ঘোষণা করে গেছেন, তিনি মহাপ্রলয়কালে যে অতীন্দ্রিয় দিব্য অনুভূতি লাভ করেছিলেন তা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিজমুখে বলে গেছেন, তা বলছি শোন।
মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলেছেন -

ততোঽহদ্রাক্ষং সমুদ্রান্তে মহাদাবর্তসঙ্কুলাম্। উদ্যত্তরঙ্গ সলিলাং ফেনপুঞ্জাট্টহাসিনীম্॥
নদীং কামগমাং পুণ্যাং ঋসমীন সমাকুলাম্। নদ্যন্তস্যাস্তু মধ্যস্থা প্রমদা কামরূপিনী॥
নীলোৎপলদলশ্যামা মহৎপক্ষোভবাহিনী। দিব্যহাটকচিত্রাঙ্গী কনকোজ্জ্বলশোভিতা॥

অর্থাৎ - দেখ যুধিষ্ঠির, মহাপ্রলয়কালে সমগ্র পৃথিবী যখন জলময়, সেই সময়ে সাগর মধ্যে আমি এক কামগামিনী পুণ্যা নদীকে দেখতে পেলাম, ঐ নদী মহাআবর্তসঙ্কুলা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎসাদিতে পরিপূর্ণা। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তার জল কেবল উথাল-পাথাল হয়ে উঠছে, তার পুঞ্জীভূত শুভ্রফেনা দেখে মনে হয় ঐ নদী যেন অট্টহাসি হাসছে। সেই নদীর মধ্যে সহসা দেখতে পেলাম এক কামরূপিনী দিব্যা নারীমূর্তি, তাঁর বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম, দিব্য হাটক অর্থাৎ ধুতুরা ফুলে সুশোভিতা। মনোহরাঙ্গীর স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।
এই শ্লোক বলে মহাত্মা আমাকে বললেন - বেদে তোমার শ্রদ্ধা আছে, বেদজ্ঞ মহাপুরুষদের ওপর কি তোমার শ্রদ্ধা নেই ? মহামুনি মার্কণ্ডেয় কি কথা বানিয়ে বলার লোক ? পরিক্রমাকালে ঋষির বর্ণনা মত তুমি নর্মদা মায়ীর ধ্যান করার চেষ্টা করবে।
বললাম - আপনার শ্লোকোক্ত বর্ণনা শুনে আমার পক্ষে আরও বেশী অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কারণ ঐ শ্লোকে একটি শব্দ আছে 'নীলোৎপলদলশ্যাম' অর্থাৎ নীলপদ্মের মত শ্যামকান্তি, কিন্তু নীলপদ্ম আমি দেখিনি। কল্পনায় ভেবে কোনো মনঃকল্পিত মূর্তির পদতলে গোড়ালুটি খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
শিশুকাল থেকে আমি বাবার অপরিসীম স্নেহ যত্ন আদর ভোগ করেছি। আমাকে মানুষ করার জন্য তাঁর কাতরতা, রোগে পড়লে তাঁর সারা রাত জেগে কাটানো, আমাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য তাঁর অকুলতা-ইত্যাদি টুকরো টুকরো অজস্র অসংখ্য স্মৃতি আমাকে বিহ্বল করে। স্রষ্টা ভগবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু আমার এই স্থূলদেহের স্রষ্টা জন্মদাতা পিতাকে দেখেছি, তিনিই শিক্ষা ও জ্ঞানে পরিপুষ্ট করে আমার সূক্ষ্ম জ্ঞানময় দেহকেও গড়ে তুলেছেন। তাঁর দেহান্তরের পর তাঁরই স্নেহসজল, করুণা ঢলঢল সদানন্দময় মূর্তিকেই আমি ধেয়ে বেড়াচ্ছি। নর্মদা পরিক্রমাকালে যদি অভ্যাসমত আমার সেই জীবন্ত ঈশ্বরের ধ্যান করি, তাতে কি পরিক্রমা খণ্ডিত হয়ে যাবে ?
মহাত্মা বললেন - তুমি তাই করো। শাস্ত্রানুসারে নর্মদা পরিক্রমার আদেশ তিনিই তোমাকে দিয়ে গেছেন। তোমার সেই আরাধ্য দেবতার হুকুম মানছো, এই মনে করেই নিষ্ঠাসহকারে নর্মদা পরিক্রমা করতে থাকো। তারপর নর্মদা মায়ীর যা ইচ্ছা। এখন আমাকে কিছু অনুষ্ঠান করতে দাও।
এই বলে তিনি মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে একটি কাঠের কৌপীন এনে আমাকে পরিয়ে দিলেন, গায়ে দিলেন একটি হলদে আলখাল্লা। হাতে শক্ত লাঠির মত একটি দণ্ড দিয়ে 'সত্যং বদিষ্যামি, ব্রত্যং চরিষ্যামি' ইত্যাদি কয়েকটি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে হবন করালেন। মহামৃত্যুঞ্জয় শিবমন্ত্র এবং সদ্য প্রদত্ত নর্মদা মাতার রহস্য মন্ত্রে আমাকে নিজে নিজে হোম করতে বললেন।
অনুষ্ঠান-পর্ব শেষ হলে তিনি আমাকে পরিক্রমা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ, পরিক্রমার অবশ্য পালনীয় নিয়ম এবং কি কি বিশেষত্ব আছে তা জানাতে লাগলেন। বললেন - নর্মদা পরিক্রমা দুই প্রকার, যথা - রুণ্ডা পরিক্রমা ও জলে-হরি পরিক্রমা। রুণ্ডা অর্থাৎ নর্মদাতটের যে কোন ঘাট হতে পরিক্রমা আরম্ভ করে নর্মদা মাতাকে দক্ষিণাবর্তে রেখে উভয়তট ঘুরে পুনরায় ঐ ঘাটে এসে সংকল্পমুক্ত হতে হয়, যাত্রার শুরুতেও থালাতে কর্পূর আরতি ও কড়াই ভোগ সমর্পণ এবং যাত্রার শেষেও সেই একই বিধিতে পূজারতি। এর নাম রুণ্ডা পরিক্রমা। কড়াই অর্থে ঘি, আটা, চিনিসহযোগে মোহনভোগ, তৎসহ নারকেল ও ফুলচন্দন -এর ডালি নর্মদার জলে সমর্পণ।

আর জলে-হরি অর্থাৎ সমুদ্র-রেবা সংগমস্থল হরিধাম বা বিমলেশ্বর হতে পরিক্রমা আরম্ভ করে অমরকন্টকে শেষ কিংবা অমরকন্টক হতে আরম্ভ করে বিমলেশ্বর-জ্যোতির্লিঙ্গ পর্যন্ত পরিক্রমা। জলে-হরি পরিক্রমার এইটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বর্তমানে অধিকাংশ পরিক্রমাকারী যাঁদের রুণ্ডা পরিক্রমাতে মন ভরে না, তাঁরা এইভাবে জলে-হরি পরিক্রমা করেন। কিন্তু পূর্বকালের মহাত্মারা যাঁরা তপোবলে কঠোর ব্রতচারী ও আচারনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা শাস্ত্রানুসারে যাকে পূর্ণ জলে-হরি পরিক্রমা বলা হয়, প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্রসাধন করেও তা সম্পূর্ণ করতেন।

সেই সম্পূর্ণ সার্থক জলে-হরি পরিক্রমার নিয়ম হল - অমরকন্টক হতে পরিক্রমা আরম্ভ করলে প্রথমে দক্ষিণতটে বিমলেশ্বর পর্যন্ত যেতে হবে, পুনরায় ঐখান হতে ফিরে অমরকন্টক আসতে পারলে তবে পরিক্রমা পূর্ণ হবে।

আর বিমলেশ্বর হতে পরিক্রমা শুরু করলে অমরকন্টক পর্যন্ত যেতে হবে, ফিরে অমরকন্টক হয়ে বিমলেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে। আর যদি হরিধাম হতে আরম্ভ করা যায় তবে অমরকন্টক হয়ে বিমলেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে হরিধামে পৌঁছে পরিক্রমার সংকল্প সমর্পণ করা যাবে। এইরকম পরিক্রমাকে পূর্ণ জলে-হরি পরিক্রমা বলে। জলে-হরি পরিক্রমা বলতে বিমলেশ্বর বা হরিধাম হতে জাহাজে বা নৌকায় ১৫ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে তৃতীয় নেত্র দর্শন।

একটি জলে-হরি পরিক্রমাতে দুটি রুণ্ডা-পরিক্রমার সমান সময় লাগে। রুণ্ডা পরিক্রমা, সংক্ষিপ্ত জলে-হরি কিংবা পূর্ণ জলে-হরি যেভাবেই হোক্ নর্মদা মাতাকে পরিক্রমা করতে পারলে পূর্ণ যোগানুষ্ঠানের ফল লাভ করা যায়। পরিক্রমাকারী নর্মদা মাতার কৃপা প্রতিপদেই অনুভব করতে পারেন। যদি কোন দুরূহ কর্মবশে মায়ের দিব্যদর্শন নাও ঘটে, নর্মদা মাতা - যে কোন মূর্তিতে দর্শন দিয়ে পরিক্রমাকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; নর্মদা মাতা ভক্তকে হিংস্র শ্বাপদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন কিংবা পথভ্রান্ত পরিক্রমাকারীকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন - এইরকম অজস্র অভিজ্ঞতা প্রত্যেক পরিক্রমাকারীরই ভাগ্যে ঘটে।

জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য ঘটনাকে সাধারণতঃ আমরা 'অলৌকিক' আখ্যা দিই। সেই অলৌকিক যদি কেউ দেখতে চায়, সে নর্মদাতটে আসুক, যে কোন স্থানে বসে তপস্যা করুক কিংবা পরিক্রমা করুক, অলৌকিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ঘটবেই - একথা পূর্ব পূর্ব ঋষিরা ত্রিসত্য করে বলে গেছেন। নর্মদা তীর তপস্যা-ভূমি। এখানে তপস্যার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

পরিক্রমার প্রধান নিয়ম -

১। নিরন্তর রেবা মন্ত্র জপ্।

২। নর্মদার জলধারাকে সর্বদা চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা।

৩। কোনমতেই নর্মদার জল লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা যাবে না। অতিক্রম করা হলেই পরিক্রমা খণ্ডিত হবে।

৪। পরিক্রমাকালে মন্দির চোখে পড়লে নর্মদার জলে শিবলিঙ্গের অর্চনা।

৫। পদব্রজেই পরিক্রমা করতে হয়, পায়ে জুতা, যানবাহন, কুলিমজুর নিষিদ্ধ, নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেকেই বহন করতে হবে।

৬। বড় জোর একদিনের খোরাক ছাড়া বেশী খাদ্যবস্তু ঝুলিতে রাখা যাবে না।

৭। সত্য, ব্রহ্মচর্য ও সদাচার পালন। সর্বাবস্থায় নর্মদা মায়ীর উপর নির্ভরতা।

৮। বেশী জলে নামা নিষিদ্ধ।

মহাত্মা বলে চলেছেন - অনন্যচিত্ত হয়ে নর্মদার শরণ নিলে মা নর্মদাই পরিক্রমাকারীর যোগ ও ক্ষেম (অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) বহন করে থাকেন।

নর্মদা পরিক্রমাকালে তিনটি বিষমস্থল অতিক্রম করতে হয়। প্রথমতঃ মুণ্ডমহারণ্য - এই অরণ্য এত ঘন, প্রস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ যে পাখীও এই জঙ্গলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ডানা মেলে উড়তে পারে না। পূর্বে সিংহ ছিল, এখন হিংস্র বাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, চিতা, বিষধর সর্পে পরিপূর্ণ। এই বন ৮০ ক্রোশ অর্থাৎ ১৬০ মাইল লম্বা ও ১০ মাইল চওড়া। মুণ্ডমহারণ্যের পরেই ওঙ্কারেশ্বর পর্যন্ত সমতল মালভূমি ও জঙ্গলসহ প্রায় ৫০০ মাইল লম্বা। আর তৃতীয় হল শূলপাণির ঝাড়ি। নর্মদাতটেই বাবলাগজা বলে একটা স্থান আছে সেখান থেকে কোটেশ্বর পর্যন্ত ১০০ মাইল লম্বা, অতি কষ্টকর পথ। শুলপাণির ঝাড়ির পাথর সুঁচলো।

এই তিনটি জঙ্গলই পরিক্রমাকারীর পক্ষে বিষম পরীক্ষার স্থল। এই তিনটি স্থানেই কাঁটা ও পাথরের জন্য পথ চলা অতি দুষ্কর। কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ শূলপাণির ঝাড়ির পাথর ঠিক যেন ছুঁচ বা ছুরির মত ধারাল, তার উপর দিয়ে হেঁটে জাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। হাঁটবার সময় পথের কষ্টে চোখে জল আসে। অনেক সময় পায়ে কাপড় ও চট জড়িয়ে হাঁটিতে হয়।

নর্মদার আর একটি বিশেষত্ব এই যে নর্মদা মাতা পরিক্রমাকারীদের কারও কোনও নিয়ম বরাবর রাখেন না, নিয়ম ভেঙে দেন এবং কাউকে একত্র বা দলবদ্ধভাবে থাকতে দেন না, অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও প্রত্যেককে পৃথক করে দেন। কখনও কখনও প্রায়ই ঘোর জঙ্গলে একাকীই রাত্রি যাপন করতে হয়। তখন নর্মদা মাতাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। কখনও কোন পরিক্রমাকারী হিংস্র জন্তু বা সাপের দংশনে মারা গেছেন এরকম শোনা যায় নি।

নর্মদা পরিক্রমাকালে ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ় হয়। প্রতি পদে প্রতি সঙ্কটে কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন রক্ষা করে চলেছে, এই অনুভূতি দৃঢ় হওয়ার ফলে পরিক্রমাকারীর অখণ্ড বিশ্বাস ও শরণাগতির অচ্যুতভূমি লাভ হয়। এইজন্য নর্মদা-পরিক্রমা নিজেই একটি সিদ্ধ যোগমার্গ, যার নাম - মাহেশ্বর যোগ।

খুব মনোযোগ সহকারে মহাত্মার কথাগুলো শুনলাম, কিছু কিছু নোটও নিলাম। তিনি আবার বলতে লাগলেন - চাতুর্মাস্যের সময় বা ঘোর বর্ষাকালে পরিক্রমা না করাই ভাল। চাতুর্মাস্যের শেষে বা বর্ষা বন্ধ হলে পুনরায় যখন পরিক্রমা শুরু করবে তখন নর্মদাতে কড়াই প্রসাদ, অভাবে মায়ের কর্পূর আরতি করে যাত্রা করতে হয়। এইভাবেই আমরা পরিক্রমা করে থাকি। সঙ্গে রান্না করার জিনিষ রাখবে। ভাঁটা কাঁটা আটা, নর্মদাতটে এই তিনের নাই ঘাটা - অর্থাৎ নর্মদা তীরে পাথর কাঁটা আর আটা এই তিন বস্তুর কোন অভাব নাই। নর্মদার চার ভাগের তিন ভাগ মধ্যপ্রদেশে, মাত্র একভাগ গুজরাটে। সর্বত্রই দানশীল ধার্মিক ব্যাক্তিদের দ্বারা সাধুদের জন্য সদাবর্ত আছে। সেখানে কোদাহ্, জোনার, আটা পাওয়া যায়। মুণ্ডমহারণ্যে কোদাহ্, ভূপালে গম ও বুট মিশ্রিত একরকম আটা যার নাম বিরড়া এবং গুজরাটে পাওয়া যায় বাজরা। সদাবর্তের অভাব যেখানে, সেখানে আদিবাসী ভীল বা গোঁড়দের কাছে ভিক্ষা পাওয়া যায়। কাছে ত রন্ধনপাত্র থাকবে, নিজের খাদ্য স্বপাকে আহার করতে চাইলে কোন অসুবিধা ঘটার কারণ নাই।

এইখানে আমি বললাম - তা আমার পোষাবে না। আমি রান্না করতে জানিনা, কাজেই রন্ধনপাত্র রেখে লাভ কি ? আমার বাবা বলতেন - যৎ ভোগ্যং তৎ প্রাপ্তব্যং। বাবার কথা আমি বিশ্বাস করি। একটি পুরোনো বই আমি দেখেছি তার নাম 'বিশ্বেশ্বর পদ্ধতি'। কাশীর প্রাচীনতম কামরূপ মঠে তাঁর আচার্য শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ তীর্থ ঐ বই-এর ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন। তাতে সন্ন্যাস ধর্মের যে সব বিধিনিষেধ আছে বা 'যতিধর্মনির্ণয়ে' প্রকৃত সন্ন্যাস ধর্মের যে সব কঠোর নিয়মাবলির উল্লেখ আছে, আপনার কাছে নর্মদা পরিক্রমার যে বিবরণ শুনলাম, তার সাথে দেখছি বহু বিষয়ে মিল রয়েছে।

মহাত্মা - তা তো হবেই। এই নর্মদা পরিক্রমা ত কার্যতঃ যতি মুনি ঋষি সন্ন্যাসীদেরই আচরিত ধর্ম। সন্ন্যাস ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং আচার্য শংকরও নর্মদা পরিক্রমা করেছেন। তিনি গুরুলাভ করেছিলেন ওঙ্কারেশ্বর তীর্থে, সেও এই নর্মদাতটে। আচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ তাঁরও গুরু গৌড়পাদ এমনকি মহাযোগী পতঞ্জলির সাধনগুহাও এ ই নর্মদাতটে। নর্মদা মায়ীর প্রত্যক্ষ কৃপালাভ করেই তাঁরা ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন। কাজেই তাঁদের প্রবর্তিত যোগমার্গ বা সন্ন্যাস ধর্মের সঙ্গে নর্মদা পরিক্রমার আচরণীয় বিধির মিল থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কি ? মহর্ষি দুর্বাসা, পতঞ্জলি, শঙ্করাচার্য সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে এসে নর্মদাতে সাধনা করেছেন। তাঁদের প্রবর্তিত যোগদর্শন তা শৈবাগমই হোক পাতঞ্জল যোগ বা রাজযোগই হোক সবই নর্মদামার্গ তথা মাহেশ্বর যোগের অনুবর্তন মাত্র।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মন তোমার পিতাজী এ রহস্য জানতেন বলেই তোমাকে নর্মদা পরিক্রমার কথা বলেছিলেন। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, এই কঠিন পথ বরণ করে নিতে পারবে কি না। রুণ্ডা পরিক্রমা বা জলে-হরি পরিক্রমা ছাড়াও আরও একটি সহজ পরিক্রমা আছে। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। পঞ্চক্রোশী করতে হলে কোটিতীর্থ থেকে সংকল্প করে কড়াই প্রসাদ ও আরতির পর কপিলধারা, বরাতীনালা, জালেশ্বর, মায়ীকী বাগিয়া, শোনমুড়া ও ভৃগু কমণ্ডলু পরিক্রমা করে পুনরায় কোটিতীর্থে এসে পরিক্রমা শেষ করতে হয়। এই পঞ্চক্রোশী করলেও অনেক পূণ্য, তাতেও নর্মদা মায়ের কৃপালাভ হয়।

আমি বললাম - ঐ পঞ্চক্রোশী ত আমি গতবারেই (১৯৪৯ সালে) করে গেছি। বাবাকে গিয়ে সব বিবরণ জানিয়েছিলাম। সব শুনেও বাবা স্পষ্ট আদেশ দিলেন অমরকন্টক হতে দক্ষিণতটে বিমলেশ্বর বা উত্তরতটে হরিধাম পর্যন্ত পরিক্রমা করবে। মরণপণ করেও আমি তাঁর সেই আদেশ পালন করতে এসেছি। কোন ফল লাভের আশা নিয়ে আমি এই পরিক্রমা করতে যাচ্ছি না, আমার জীবনের প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ পালনই আমার লক্ষ।

মহাত্মা - আগামী পরশু শনিবার শুক্লপক্ষের একাদশী। ঐ দিনই কোটিতীর্থে সংকল্প করে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা আরম্ভ করব অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে। তুমি প্রস্তুত থেক। মাঝে মাত্র একটা দিন। আজ আর কাল প্রাণভরে মন্দিরে গিয়ে নর্মদা ও অমরকণ্ঠেশ্বর শিবকে দর্শন কর। আর রেবামন্ত্র কিংবা তোমার পিতৃদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ্ কর।

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল। ১৩৫৯ সালের ৩ রা আশ্বিন (১৯.৯.১৯৫২) আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, আজ থেকেই আমার জীবনে নর্মদা-পরিক্রমা শুরু হবে। সকালেই স্নান হোম পিতৃস্মরণাদি নিত্যকর্ম সেরে মন্দির হতে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে কোটিতীর্থের ঘাটে এসে পৌঁছুলাম। আরও জনা কুড়ি সাধু এবং স্বয়ং শংকরনাথজী পূজার আয়োজন করছেন। পূজায় আমিও যোগ দিলাম। কর্পূরারতি সুরু হ'ল। শংকরনাথজী মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, আমরা সমস্বরে উদাত্তকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম -

জয় জগদানন্দী হো মেইয়া জয় জগদানন্দী হো রেবা জয় জগদানন্দী।
ব্রহ্মা হরিহর শংকর, রেবা শিব হরিহর শংকর রুদ্রী পালন্তী / হরি ওঁ জয় জগদানন্দী ॥
দেবী বাজত তাল মৃদঙ্গ, সুরমণ্ডল রমতি হো মেইয়া সুরমণ্ডল রমতি হো রেবা সুরমণ্ডল রমতি।
তোড়ী তান তোড়ী তান তোড়ী তান তুড়তুড় তুড়তুড় তুড়তুড় রমতি সুরবন্তী
হরি ওঁ জয় জগদানন্দী ॥
দেবী সকল ভুবনপর আপ বিরাজত নিশিদিন আনন্দী হো মেইয়া নিশিদিন আনন্দী হো।
রেবা নিশিদিন আনন্দী গাবত গঙ্গা শংকর সেবত রেবা শংকর তুম ভব মেটন্তী হো মেইয়া
তুম রেবা ভব মেটন্তী / হরি ওঁ জয় জগদানন্দী ॥

আরতি শেষ হ'ল। 'জয় রেবা, জয় নর্মদা-শংকর' - জয়ধ্বনি দিয়ে যে যার বিস্তারা সামানাদি পিঠে ঝুলিয়ে নিলেন। আমার পরিধানে সেই কাঠের কৌপীন, হলুদ রঙের আলখাল্লা, হাতে দণ্ড। গাঁঠরীতে একসঙ্গে বাঁধা আছে একটি সাড়ে তিন হাত লম্বা, দুহাত চওড়া কুশাসন, একটি কম্বল, একখণ্ড ঋগ্বেদ ও রেবাখণ্ড নামক হস্তলিখিত পুঁথিটি। বই দুটি বালিসের কাজ করে। কম্বল ও কুশাসন বিছানা। একটি ছোট্ট হালকা অলাবুর কমণ্ডলু ঝোলার সঙ্গে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছি।

পরিক্রমা শুরু হয়ে গেল নর্মদার ধার ধরে। মহাত্মা শংকরনাথ পথ দেখিয়ে চলেছেন। পার্বত্যপথ পাথর, কাঁটাঝোপে পরিপূর্ণ। দুই পাশে বিরাট বড় বড় গাছ, শাল সাজা বট হরিতকী আমলকী বহেড়া খদির ও তেলেণ্ডু। সমতলভূমিতে প্রায় দুই মাইল হাঁটার পর একটু একটু করে চড়াই শুরু হল। ক্রমেই জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে, সূর্যরশ্মি কোথাও ক্ষীণভাবে ঢুকতে পেরেছে, কোথাও আদৌ ঢুকছে না। মহাত্মা শংকরনাথকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম – সকাল আটটায় নর্মদা মন্দির থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যাত্রা করে সাড়ে দশটায় অর্থাৎ আড়াই ঘন্টা হেঁটে মাত্র আড়াই মাইল রাস্তা আসতে পেরেছি। জঙ্গলের মধ্যে পাথুরে রাস্তায় লাঠি ঠুকে-ঠুকে কোনমতে শরীরটাকে টেনে হেঁটেছি। কোন পাখী তো দেখা দুরের কথা তাদের কোন ডাকও শুনতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ কতকগুলো শেয়াল দৌড়ে গেল দেখতে পেলাম। খিক্ খিক্ করে বিকট হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। মহাত্মা জানালেন - হায়নার হাসি। ধারে কাছে কোথাও আছে। ভয় নাই, নর্মদার দিকে তাকিয়ে 'রেবা রেবা' জপ কর। রেবার প্রতি যার প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতি আছে, হিংস্র জন্তু থেকে তার কোন ভয় নেই।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - এই কি তাহলে মুণ্ডমহারণ্য পরিক্রমা শুরু হ'ল ? তিনি বললেন- এটাকে মুণ্ডমহারণ্যের **Continuation** বলতে পারো। আসল মুণ্ডমহারণ্য শুরু হবে দূরে ডিনডোরি থেকে, মান্দালা পর্যন্ত ভয়াবহ জঙ্গল। আরও একমাইল চড়াই পার হবার পর মনোরম সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম, নাম কবীর চবুতরা। এখানে ঝোলা কম্বল নামিয়ে নর্মদা মাতার ভোগের আয়োজন করতে বললেন শংকরনাথজী।

এখানে কবীরপন্থী এক সাধু ছিলেন। তিনি আমাদের এই পরিক্রমাবাসী দলটির যথেষ্ট সৎকার করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - কবীরজী কি এখানে এসেছিলেন ?

- হাঁ জী, ইধর উনোনে তপস্যা কিয়ে থে, ইধরই উনোনে চোলা ছোড় দিয়া। দূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, জঙ্গলকি তরফ দেখো এক বিরাট বট কি পেড় হ্যায়, হিঁয়াসে করীব আধামাইল হোগা। উসকা নাম কবীর বট। কবীর সাহেবকী মাজুন কাঠিসে উস্ পেড় পয়দা হুয়া। সারি হিন্দুস্থানমেঁ এতনা বড়া পেড় কভি নেহি দেখিয়ে গা।

আমি বললাম - কবীরজীর 'বীজক' আমি পড়েছি। তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য ধর্মদাসজীর গ্রন্থ থেকেও জানা যায়, তাঁর মৃত্যুকালে হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের দ্বন্দ্ব দেখে তিনি কাশী থেকে দূরে মগহর নামক স্থানে গিয়ে দেহরক্ষা করেন। তাঁর দেহান্তের পর দেহের উপরের কাপড়টি সরিয়ে দেখা গেল সেখানে, কিছু ফুল পড়ে আছে। দেহ নেই। হিন্দু শিষ্যরা ফুলগুলিকে গঙ্গাতীরে দাহ করেছিলেন আর তাঁর মুসলমান শিষ্যরা চাদরটিকে মগহরেই কবরস্থ করেছিলেন। যোগীবর যোগ বলেই যখন অন্তর্হিত হলেন, তখন নর্মদা তীরে এসে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণের সুযোগ পেলেন কিভাবে ? কবীর সাহেবের পুত্র কামাল সাহেবের গ্রন্থও পড়েছি, কৈ সেখানেও তো কবীরজীর নর্মদাবাসের কথা নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে শংকরনাথজী বলে উঠলেন - আমি বলছি, মগহরে 'অন্তর্হিত' হবার পরেই তিনি এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন, শেষে এইখানে এই নর্মদা-তটেই তিনি তাঁর ইষ্টপদে লীন হন। তুমি তর্কবুদ্ধি ছাড়। বেকার তর্ক করে লাভ কি ? এখানে ভোগ প্রস্তুত হতে থাকুক, তুমি আমার সঙ্গে এস।

কবীরপন্থী সাধুকে বললেন - ইসকা করীব বাইশ তেইশ সাল উমর হোগা, ইয়ে আভি তক্ বাচ্চা হ্যায় ইনকা উপর নারাজ না হো। সাধু বললেন - নেহি জী, যব পরিক্রমা কর রহা হৈ, নর্মদা মায়ী ইনকো শায়েস্তা কর দেগা।

শংকরনাথজী আমাকে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন নর্মদার ধার ধরে। পাথুরে রাস্তা, দণ্ড দিয়ে লতাগুল্ম সরিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। এইভাবে প্রায় মাইল খানেক যাবার পর নর্মদার ঘাটে নেমে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বেদমন্ত্রে পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং কিছুক্ষন রেবামন্ত্র জপ্ করতে বললেন। তর্পণের পর বললেন - এই ঘাটের নাম ঔর্বঘাট। মহর্ষি ঔর্ব এইখানে নর্মদাতটে তপস্যা করেছিলেন।

ঔর্বের নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম, বললাম - আমার গোত্র বাৎস্য। বাৎস্য গোত্রের যাঁরা বরণীয় পুরুষ তাঁদের অগ্রগন্য হচ্ছেন ঔর্ব। বেদবিৎ মহর্ষি। মহারাজ সগরের গুরু।

হরিবংশে আছে, উর্ব নামে জনৈক ঋষি সবসময়ে কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। দেবতারা তাঁর বংশ লোপ হবে আশঙ্কা করে তাঁকে বিবাহ করতে অনরোধ করেন কিন্তু তিনি বিবাহ না করেই যজ্ঞাগ্নিতে উরু-মন্থন করেই এক সন্তান উৎপন্ন করেন, তাঁর নাম ঔর্ব।

আর মহাভারত মতে, কৃতবীর্য নামে এক রাজা মহর্ষি ভৃগু এবং ভৃগুবংশীয় পুরোহিতদেরকে তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। ফলে কৃতবীর্যের বংশধররা দরিদ্র হয়। সেইসব দরিদ্র ক্ষত্রিয়রা ভার্গবদের কাছ থেকে কৃতবীর্য প্রদত্ত ধন সমস্ত লুন্ঠন করে তাঁদেরকে হত্যা করে। ভার্গব নারীরা ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নেন। তাঁদের মধ্যে ভৃগু-পত্নীও ছিলেন। ক্ষত্রিয়রা তাঁর গর্ভ নষ্ট করতে এলে ব্রাহ্মনীর উরু ভেদ করে অগ্নির মত দীপ্তিমান এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। ক্ষত্রিয়রা কাতরভাবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করায় ব্রাহ্মণী বললেন - তোমরা আমার উরুজাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়দের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু পিতৃপুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ক্রোধ সংবরণ করতে বললেন। সেইসময় পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব সমুদ্রে তার ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর মস্তকরূপে (বড়বা) অগ্নি উদগার করে সমুদ্র জল পান করে। তার নাম - বাড়বাগ্নি (আদিপর্ব)

হরিবংশ বা মূল মহাভারতের আদিপর্বের উপাখ্যান, উভয় মতেই দেখা যাচ্ছে - মহর্ষি ভৃগু যেমন ব্রহ্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, তেমনিই মহর্ষি ঔর্ব তপস্যার তেজ হতে উদ্ভূত। উভয়েই যজ্ঞ বা তেজ সম্ভব ঋষি। ঔর্ব শব্দের অর্থও হ'ল তপস্যার তেজ।

ঔর্বের তপস্যাস্থলীতে প্রণাম করে উভয়েই ফিরে এলাম কবীর-চবুতরায়। নর্মদা মাঈর উদ্দেশ্যে ভোগারতি নিবেদন করে সবাই মিলে প্রসাদ পেলাম। তখন বেলা প্রায় দুটো। একঘন্টা বিশ্রাম করে আবার পরিক্রমা শুরু হ'ল।

আমাদের এই দলে আমিই সবার চাইতে ছোট, গ্রামের ছেলে হাঁটতেও খুব পারি। নৈমিষারণ্যের চুরাশী ক্রোশ পরিক্রমা, চিত্রকূটের কামোদগিরি পরিক্রমা করার সময় দেখেছি আমি সবার আগে। সে সব পথের তুলনায় এই নর্মদা তটের ঘনঘোর মুণ্ডমহারণ্যের উপান্তভাগের জঙ্গল পার করা শতগুনে কষ্টকর। তবুও সকালে যখন যাত্রা করেছিলাম অমরকন্টক থেকে, তখনও দেখেছি আমিই সবার আগে। সকলের শ্লথগতির তালে তালে হাঁটলে পা টেনে ধরে, কোমর ব্যাথা করতে থাকে। তাই এবারে কবীর-চবুতরা থেকে যাত্রার শুরুতেই শংকরনাথজীকে আমি বললাম - ঐতো আঁকাবাঁকা বনের রাস্তা দেখা যাচ্ছে, আমি যদি আমার স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে এগিয়ে যাই, তবে আপনার কি কোন আপত্তি আছে বা ভয়ঙ্কর কোন বিপদের আশঙ্কা আছে সামনে ?

মহাত্মা বললেন - ভয় আছেও বটে, নেই-ও বটে ! জঙ্গলে তো হিংস্র জন্তু আর বিষধর সাপের ভয় আছেই তবে পরিক্রমাবাসীকে মা নর্মদাই রক্ষা করেন। শুধু আমাদের এই দলটিই যে পরিক্রমা করছে তা তো নয়। আরও কত ঘাট থেকে জব্বলপুর ওঙ্কারেশ্বর মান্ধাতা প্রভৃতি স্থান থেকে পরিক্রমাকারীরা আসছেন অমরকন্টকের দিকে, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে বেশী এগিও না। আধমাইলটাক এগিয়ে গিয়ে বিশ্রাম কর। আমরা গিয়ে তোমার সঙ্গ ধরব। সামনে জঙ্গল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কোথায় রাত্রিবাস করতে হবে তোমার তো তা জানা নেই।

আমি নবীন উৎসাহে হাঁটতে লাগলাম। দুপাশে বড় বড় গাছের মাঝখান দিয়ে মানুষের পথচলার যে দাগ পড়েছে তা লক্ষ করে চলতে থাকলাম। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর একটা পাকদণ্ডী পেলাম, সেখান থেকে দেখলাম দুটো সংকীর্ণ রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন, কোন দিকে যে বাঁক নেব, স্থির করতে পারলাম না। গাছের ফাঁক দিয়ে উপরে তাকিয়ে সূর্যের আলো দেখে মনে হ'ল তখনও যথেষ্ট বেলা আছে। আমি শংকরনাথজীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেড় ঘন্টা কেটে গেল, কিন্তু কোথায় তাঁরা ? বনের মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখলাম একটা বড় সালাই গাছের ডালে একটা ভয়ঙ্কর পাইথন ঝুলে আছে। আমি ভীষন ভয় পেয়ে গেলাম, চিৎকার করে ডাক দিতে লাগলাম - হর নর্মদে হর। আশা এই যে আমার সাড়া পেয়ে হয়তো সাধুরা সাড়া দেবেন। কিন্তু হায়রে ! আমার কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধ জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হয়ে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিল। গলা শুকিয়ে আসতে লাগল, সাপটা সাড়া পেয়ে আমাকে লক্ষ করে এগোচ্ছে। আমি সেই সালাই গাছটাকে এড়িয়ে অন্য একটা বাঁক ধরে তারাতারি হাঁটতে শুরু করলাম। পথ ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। পাথরে হোঁচট খাচ্ছি, গাছে ধাক্কা খাচ্ছি, হাতের দণ্ডকে বাগিয়ে ধরে সেই পাহাড়ী রাস্তায় যতটা সম্ভব তারাতারি দৌড়তে লাগলাম। জঙ্গলে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, যতদূর চোখ যায় কোথাও কোনো আলোর নিশানা নেই। কমণ্ডলু থেকে একটু জল মুখে ঢাললাম। সহসা একটা গর্জনে হাত থেকে ছিটকে কমণ্ডলুটা বনের মধ্য গিয়ে পড়ল। শরীর থেকে কেউ যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে নিয়েছে, পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। দুর্জ্জয় ভয়ে মানুষের হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায় শুনেছি। কিন্তু ভয়ের মধ্যেও একটু স্থির হতে পারলে ধীরে ধীরে মনে সাহস ফিরে আসে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে উর্দ্ধাকাশে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত।

এতক্ষনে একটু ধাতস্থ হতে পারলাম, ঝোলা থেকে টর্চ বের করে খুঁজতে লাগলাম পথের নিশানা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, এক জায়গায় না থেকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এগুচ্ছি না পিছিয়ে অমরকন্টকের দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারলাম না। পাহাড়ী পথের একটা বাঁকের মুখে এসে দেখলাম লম্বা কুশগাছের আগাগুলো পাহাড়ের গা থেকে একটা আঁকাবাঁকা পথের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ফিকে জ্যোৎস্নার আলোতে সেই পথ দিয়েই হাঁটতে থাকলাম। ভাবলাম, এভাবে রাত-ভোর হাঁটবো নাকি, আর কিছুক্ষন হাঁটি, একটু পরিস্কার গাছের গোড়া দেখতে পেলে সেখানেই আশ্রয় নেব। খাবারের জন্য ভাবছি না তবে জল নেই। তেষ্টা মেটাব কিভাবে ? এখন বেশ শীত লাগছে। আকাশের হালকা মেঘ সরে যেতেই পথের চিহ্ন যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হচ্ছে। কিছুক্ষন পরে জলের একটা কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম। যাক্ তাহলে নর্মদার তীর ছেড়ে আসিনি। হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই শুনতে পেলাম জলের প্রচণ্ড গর্জন। জলের ফেনা ঠিকরে এসে গায়ে লাগছে। আলখাল্লার সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি নর্মদা প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাথরের ওপর। বুদবুদ, জলকণা, ফেনা এবং তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করেছে। উপরে জ্যোৎস্নার আলো আর নিচে জলের এই প্রচণ্ড হুঙ্কার ও ধোঁয়াশা - নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে যেন অপরূপ ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি, উঁচু নিচু পাথরের উপর দিয়ে বড় বড় গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে যেন একটা সিঁড়িপথ চলে গেছে নিচের দিকে। সেখানে আগুন জ্বলছে, কাঠের গুড়িতে। একটা ধ্বজাও উড়ছে বলে মনে হ'ল। শীতে থরথর করে কাঁপছি, তবুও মনে উল্লাস দেখা দিল, ঐ তো জীবনের আশ্বাস - মানুষ আছে তাহলে ওখানে, তিনি উপদেবতা অপদেবতা সাধু ঋষি কোনো আদিবাসী ডাকাত যেই হোন না কেন, কোনমতে ওখানে যেতে পারলে রাতের আশ্রয় পাবো, সব চেয়ে বড় কথা - এই হাড়কাপানো শীতের মধ্যে আগুনের তাপ পাবো, তেষ্টার জল পাবো। যে কোনভাবে ঐখানে পৌঁছুতেই হবে। পিঠের গাঁঠরী রেখে দিলাম একটা আমলকী গাছের ডালে। বাবাকে স্মরণ করে রেবা নাম জপ্ করতে করতে নামতে লাগলাম। পাথরের উপরেও পা রাখা যাচ্ছে না, হাড়হীম করা ঠাণ্ডা, হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড়। তবু যেতেই যে হবে, উবু হয়ে বসে বসে গাছের শিকড় ধরে নামতে লাগলাম। শিকড় ধরে উবু হয়ে বসে একটু নামি, নিচে পা রাখার জায়গা খুজি, আবার নামি, পা রাখাও কষ্টকর; লক্ষ লক্ষ জলকণা ছিটিয়ে পড়ায় পাথরের ছোট চাঙড় পিছলে গিয়ে হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ছে, আমিও সেই টানে গড়িয়ে পড়ছি। আবার জাপটে ধরে ফেলছি কোন গাছের শিকড় বা লতার ঝাড়। আবার অতি সাবধানে পা ঝুলিয়ে কোন পাথরে পা ঠেকলে, সাবধানে পা ফেলে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে নামার চেষ্টা করছি। সরীসৃপ পেটে বুকে ভর দিয়ে চলে, চড়াই এর দিকে ওঠার ব্যাপার হ'লে সেভাবেই চলতে হোত। কিন্তু এ তো নামছি খাঁদের দিকে। ভালো করে নিচের দিকে তাকানোর উপায় নেই, জলের কণা যেন অতি সূক্ষ্ম বরফের কুচির মতো চোখে মুখে ঝাপটা মারছে, তারই মধ্যে কোনমতে দেখতে পেলাম; একটা প্রকাণ্ড গাছের গুড়ি ধিকধিক করে জ্বলছে, তার কাছেই একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, ভিতরে বোধ হয় কোনো গুহা আছে তার মধ্যে ক্ষীণ প্রদীপের শিখা চোখে পড়ল। মনে হচ্ছে, আরও ত্রিশ চল্লিশ ফুট গেলে ঐখানে মানুষজনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারব। অসার হাত পা নিয়ে সমস্ত শরিরের শক্তি জড়ো করে গাছের একটা মোটা শিকড় ধরে ঝুলে পড়লাম, কিন্তু একি ! পায়ের আঙুলে তো কোন পাথরের ছোঁয়া পাচ্ছিনা। হাতের আঙুলগুলো ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে, হাত পিছলে যাচ্ছে, শেষ চেষ্টা করলাম শিকড় জাপ্টে ধরতে, পারলাম না.. অসার আঙুল শিকড় থেকে আলগা হয়ে গেল - আমি গড়িয়ে পরছি; কানে জলধারার ভীমগর্জন, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, শত শত মৃদঙ্গের তালে অপূর্ব মধুর বোল ফুটে উঠেছে - ওঁ ঐং হ্রীং - ওঁ ঐং হ্রীং - ওঁ ঐং হ্রীং *- জ্ঞান হারিয়ে অতল অন্ধকারে জগতে নিজেকে শপে দিলাম। আমার জ্ঞানে মনে তখন আর মহারণ্যের বিভীষিকা নেই, হিমশীতল ঠাণ্ডার স্পর্শানুভূতি নেই, নর্মদার ভীমগর্জ্জনের হুঙ্কার ধ্বনিও নেই, শুধু মৃদঙ্গের তালে বেজে চলেছে - ঐ মহামন্ত্রের ধ্বনি। ঘুমও নয় জাগরণও নয় একটা ঘোরের মধ্যে মনে হ'ল বাবার কোলে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। এক অপূর্ব অনুভূতি। চোখ খুলে আমার সেই আরাধ্য দেবতার মুখটা দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, পরমুহূর্তেই আর কিছুই মনে নেই।

---

* এই প্রকটিত বীজমন্ত্রটি মাতাপিতার বীজমন্ত্র। এই সিদ্ধমন্ত্রের প্রতি বর্ণের অর্থ এবং তার গভীর তাৎপর্য জানতে হ'লে লেখক প্রণীত 'পিতৃবো' বইটি পড়ুন।

যখন জ্ঞান হ'ল শুনতে পেলাম কেউ যেন বলছেন -
- ক্যা জটিয়া, ইএ লেড়কা পুয়াভর গরম দুধ পিয়ে হোঙ্গে ?
- 'নেহি জী ! আধ পৌয়া হোঙ্গ, লেকিন্ দাবা হম্ কোঙ্গি সুরতসে পিলা দিয়া।
- ঠিক হ্যায় আভি ইনকা চৌন্ আ যাবেগা। কোঙ্গি ফিকর নেহি জী।
আমি চোখ মেলে তাকালাম। শ্বেতশ্মশ্রু ও জটাধারী এক বৃদ্ধ মহাত্মা আমার বুকে হাত দিয়ে বলছেন - ক্যা, তব চার সালকা অন্দরহি আপ্ ইধর আ গয়া। বড়ী আনন্দী কী বাত্ হৈ। এ জটিয়া ইনকো পাকড়কে বৈঠা দেও। থোড়া শঙ্খিয়া ভি পিলা দেও।
শঙ্খিয়া হচ্ছে শঙ্খিনী সাপের বিষ, বাংলায় আমরা যাকে বলি সেঁকো বিষ। প্রয়োগের গুণে বিষকেই শ্রেষ্ঠ বৈদ্যরাজরা সঞ্জীবনী ঔষধে পরিণত করেছেন। হিমালয়ের শতপন্থ ভ্রমনের সময় আমি বড় বড় মহাত্মাকে শঙ্খিয়া খেতে দেখেছি। শঙ্খিয়ার গুণেই বরফের রাজ্যে তাঁরা অবলীলাক্রমে লেংটি পরে বসে থাকতে পারেন। ধুলি পরিমাণ একটুখানি শঙ্খিয়ার রেণু জটিয়াজী আমাকে খাইয়ে দিলেন। আমি বৃদ্ধ সাধুকে বললাম - এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি ত 'ঋষিবাবা'। 'আরে কৌন্ ঋষিবাবা হৈ, ঋষিত্ব কোঙ্গি মামুলি চিজ নেহি। হামারা গুরুজী নাম দিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারিয়া - ভকতলোগ ঋষিবাবা বোলকে পুকারতা হৈ।
এই ত কপিল আশ্রম - ঐ তো দুধধারার গর্জন শুনতে পাচ্ছি - তার মানে আমি রাতের অন্ধকারে 'দুধধারা' চিনতে পারি নি।
- আপকা হোস্ নেহি থা, আপনে গির গিয়া থা। শনিচর রাত মেঁ ইধর গির গিয়া, আজ সোমবার হৈ
তিনদিন হয়ে গেল। তাহলে কি আমার পরিক্রমা খণ্ডিত হয়ে গেল ? শংকরনাথজী বলেছিলেন পরিক্রমাকারীর এক রাত্রির বেশী কোথাও থাকতে নেই। আপ তো নর্মদা মায়ীকী গোদমেঁই হৈ। কপিলজীকা ইহ্ তপস্যাস্থল বড়া জাগ্রৎ হৈ। আপ পরিক্রমা খণ্ডন কে লিয়ে ফিকর মৎ করো। কোঙ্গি ডর নেহি। আভি দু-চার রোজ আপ্ ইধর ঠার যাও। আপকা শরীর বহুত্ দুবলা হৈ। হামারা ইধর দুধধারা কী ডাহিনা তরফ সে এক পরিক্রমা কী রাস্তা হৈ। লেকিন ইহ্ উত্তরতট হোগা। অতঃপর আপকো উত্তরতট পাকড়কে পরিক্রমা করনে পড়েগাজী; জটিয়া সাথ মে জাকর আপকো পথ বাতলা দেগা। যানে কা বখৎ হম্ আপকো একঠো পরিক্রমা কি চার্ট লিখ দুঙ্গা। অভি হমারা হাত পাকড়কে বাহারমে চলো। আমি ধীরে ধীরে তাঁর হাত ধরে আস্তে আস্তে বাইরে এলাম। সূর্যকরোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটায় চারিদিক ঝলমল করছে। প্রপাতশীর্ষ যেখান থেকে আমি রাত্রে নেমে এসেছিলাম, তা দেখে শিউরে উঠলাম। আশ্রম থেকে উপরে ওঠার একটা পথ আছে ঠিকই কিন্তু আমি অন্ধকারে না বুঝে ভুল রাস্তাতে পা বাড়াতে গিয়েই নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।
বাইরে পাহাড়ের গায়েই দেখলাম এক বীভৎস মূর্তি - মূর্তি ঠিক নয় মূর্তির আকার, আধখানা দেওয়াল জুড়ে সিঁদুর - লিপ্ত এক বিশাল মূর্তি বিকট্ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার এবড়ো খেবড়ো কপালের নিচে দুটো বড় চোখ, তার নিচে দুইটি বিশাল নাকের ফুটো। প্রায় চৌদ্দ-পনের ফুট লম্বা মোটা লোহার ত্রিশূল শক্ত করে পাথরে গভীর করে গোঁতা আছে।
মহাত্মা বললেন - ইনি কপিলাশ্রমের মহাভৈরব। মূর্তি দেখে আমি ভাবতে লাগলাম - চিত্রকূটে কামদগিরির পূর্বগাত্রে দেখেছি কামদ পাহাড়েরই একটা অংশ সমতলভূমি থেকে একটু উঁচুতে নৃসিংহ মূর্তির রূপ নিয়েছে। চিত্রকূটের সাধুরা বলেন - নৃসিংহশিলা, তাঁর আয়ত মুখগহ্বরের মধ্যেও কয়েকটি শালগ্রাম শিলা আছে। তাঁর নাম 'মুখারবিন্দ'। কপিলাশ্রমের এই মহাভৈরবকে মহানৃসিংহ বলেই আমার মনে হ'ল। সমগ্র নর্মদাতট জুড়ে শিবভূমি, তাই মহানৃসিংহ এখানে মহাভৈরব নামে পরিচিত হয়েছেন। মহাত্মাকে এসব কথা আমি খুলে বললাম না। মহাত্মা আমাকে ধরে আবার গুহার ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানাতে বসিয়ে দিলেন। রবিবার সকালেই পাহাড়ের উপরে আমলকী গাছের ডালে যে গাঁঠরী রেখে এসেছিলাম, জটিয়াজী তা নিয়ে এসেছেন। দরদী সাধুদের পরিচর্যায়, পথ্যের গুণে শঙ্খিয়ার প্রভাবে দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি গায়ে যথেষ্ট বল ফিরে পেলাম। এখন নিজে নিজেই কপিলধারা ও দুধধারার কাছে যেতে আসতে পারি।

এবারে পরিক্রমার পথে বেড়িয়ে পড়তে চাই। শংকরজী আমাকে একা আসতে কেন অনুমতি দিলেন, তাঁর ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সচ্চিদানন্দজী বললেন - তা নিয়ে তুমি মনে কোন ক্ষোভ রেখ না। তিনি নিজে কট্টর নাথপন্থী, প্রত্যেক যোগী সম্প্রদায়ের মত তাঁদেরও কিছু কিছু গুহ্য সাধন প্রণালী আছে, তোমাকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করা সুকঠিন। তিনি নিজের ভক্তমণ্ডলী নিয়েই দীর্ঘকাল ধরে নর্মদা-তট প্রতি বৎসরই পরিক্রমা করেন। তোমার পরিক্রমাপথে কিছুটা পথ তিনি অনুগমন করেই ছেড়ে দিয়েছেন নর্মদা মাতার হাতে। এ পথ কঠোর ব্রতধারী সন্ন্যাসীর পথ। যে মুহূর্তে কেউ পরিক্রমা শুরু করে সেই মুহূর্ত থেকেই নর্মদা মায়ী তাঁর পুত্রের ভার গ্রহণ করেন। একথা যে ধ্রুব সত্য তা শত বক্তৃতা দিয়েও বোঝানো যাবে না, যেমন কাউকে সাঁতার শিখতে হলে জলের ধারে বসে সাঁতারের বিষয়ে ব্যাখ্যা করলে হবে না, তাকে জলে ঠেলে ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে আপনা হতেই জলে হাবুডুবু খেতে খেতেই সে সাঁতার শিখে যাবে। শংকরনাথজী তোমাকে একা ছেড়ে দিয়েই পথের দুর্গমতা ভীষণতা এবং সহসা উৎপন্ন ভয়াল পরিস্থিতিকালে তোমার বুদ্ধি, ধৈর্য, তিতিক্ষা, সর্বোপরি ঈশ্বর নির্ভরতার প্রসন্ন আশির্বাদ কিভাবে তোমার মধ্যে স্বতঃই বিকাশ লাভ করে তা দেখতে চেয়েছেন। পরিক্রমাকালে পরিক্রমাকারীকে যেমন নর্মদা মাতাকে চোখে চোখে রেখে এগিয়ে যেতে হয়, মাতাও তেমনই তাঁর ভক্তকে সতত চোখে চোখে রাখেন। শংকরনাথজীর সে বিষয়ে দৃঢ় উপলব্ধি আছে। এছাড়া তাঁদের সাথে থাকলেও কি বরাবর একসঙ্গে থাকতে পারতে? যাঁরা তাঁর সঙ্গে রয়েছে, তাঁরাও কি একসঙ্গে থাকতে পারবে? নর্মদা মাতা তাঁদের প্রত্যেককে যে কোন ভাবে হোক, এক একবার বিচ্ছিন্ন করে দেবেন-ই। আবার দেখবে কোন না কোন স্থানে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এই বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনর্মিলনের খেলা নর্মদামায়ী খেলছেন আবহমান কাল থেকে। এইভাবে দুঃখ তাপ, ভয়, বিচ্ছেদ এবং কৃচ্ছ্রতাবরণের পুটপাকে নর্মদামায়ী তাঁর ভক্তের আধারকে যোগাগ্নি পরিপক্ব করে শিবচেতনার উপযোগী করে তোলেন।

রাত্রিবেলা এখানে আসার পথে হাত থেকে কমণ্ডলু পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। যখন বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম তখন তাঁর নিজের কমণ্ডলুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন - এই হালকা অলাবুর কমণ্ডলুটি তুমি নিয়ে যাও। শ সাল বীত গয়া, সত্তর সাল হম্ নর্মদাতট মেঁ হ্যায়। ঔর পরিক্রমা করনে কা ইচ্ছা নেহী, তবিয়ৎ ভি আভি ঢিলা হো গয়া।

একটু শঙ্খিয়া হাতে দিয়ে বললেন - এভি রাখ দো। যো শঙ্খিনী পিয়া উসমে এক মাহিনা ঔর লেনে কা জরুরৎ নেহি। জ্যায়াদা ঠাণ্ডা মালুম হোনেসে, তবিয়ৎ কোঈ গড়বড় করনেসে তনিকভর, য্যাতনা কম হো শখে মুঁহ্ মে ডাল লেনা। সব তকলিফ্ হঠ যাবেগা।

তাঁর সঙ্গে সেই পাতালস্থ আশ্রম থেকে প্রপাতশীর্ষে উঠে এলাম। জটিয়াজী সঙ্গে আছেন। ভোরের সূর্যের লাল আভা বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যশীর্ষে যেন আবীর আলোয় সাজিয়ে দিয়েছে। দুধধারার কাছে গেলাম, সেখানে নর্মদা বয়ে যাচ্ছে, জটিয়াজীকে বললেন, থোড়া দূর তক্ যাও বেটা, ইনকো জঙ্গলকা পথ, শর্যাতিজী ঘাটকা পথ বাতলা দেনা। পুনরায় প্রণাম করবার জন্য নিচু হতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চিবুকে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন - বেটা, হম হাত জোড়কে বিনতি করতা হু, হরবখৎ রেবা রেবা জপ্ কিয়া করো। তুম যব্ রাত্ মে গির গয়া থা, পথথলকে আওয়াজ সে হম্ নজর দিয়া গুফাসে। দেখা বিজলী খেল্ রহা হৈ, বিজলীকা অন্দরমে দেখা এক ত্রিশূলধারিণী জ্যোতির্ময়ী লেড়কী, তুমহারা হাত পাকড়কে আহিস্তা আহিস্তা তুমকো মেঝিয়া পর লেটা দেকর তুরন্ত অন্তর্ধান হো গয়া।

এইকথা বলতে বলতেই সাধুর ভাবাবেশ হয়ে গেল। ভাবাবেশেই তিনি মৃদুতালে নাচতে লাগলেন আমার চিবুক ধরে সুর করে বলতে লাগলেন -

রেবা রেবা জপ্ করো, তেরা ভালা কী কহু।
হরবখত রেবা রটতে রহো তেরা ভালা কী কহু।
রেবা মাঈকী ধ্যান ধরো দরশন উজ্জ্বল হোয়।
দরশন হো বৈ শিবকো, তিমির যায় সব খোয়।
তেরা ভালা কী কহু।

বৃদ্ধ সাধুর চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। বিদায় নিলাম।

জটিয়াজ্জীর সঙ্গে হেঁটে চলেছি নর্মদার ধার দিয়ে, চোখের সামনে বিন্ধ্যপর্বত, ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ, মাইল খানেক যাবার পরই বাঘের পায়ের ছাপ দেখলাম, একটু দূরে আরও কতকগুলো হিংস্র জন্তুর পদচিহ্ন। জটিয়াজ্জী বলছেন - এ হ্যায় চিতাকী, এ হ্যায় হিরণকী ইত্যাদি। ক্যা আপকা ডর লাগতা হৈ ?

বললাম - মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কি ঘটতে পারে ? মৃত্যুপণ করেই এগিয়ে যাবো, এতো আগের থেকেই সংকল্প করেছি।

সামনে যে উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে কলকল ধ্বনিতে একটি নদী পাথর ভেদ করে বয়ে চলেছে তা দেখতে পাইনি। পার্বত্য রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম নদীটিকে। জটিয়াজ্জী বললেন - এটি করগঙ্গা, ইসীকী কিনারমেঁ আপকো এক মহল্লা মিলেগা উসকা নাম করমণ্ডল। করমণ্ডলসে চার মিল যানে সে আপকো মিলেগা করঞ্জিয়া, করঞ্জিয়াসে চড়াই পড়েগা - উহ্ চড়াই আপকো মুড়িয়া মহারণকী (মুণ্ডমহারণ্য) অন্দরমেঁ লে যায়েগা। উধর নর্মদাজীকী যো ঘাট মিলেগা ওহি শর্যাতিকা ঘাট। ওহি ঘাটমেঁ দেখেগা করীব বারা ফুট লম্বে মোটাসা এক তিরশূল হ্যায় - গুরুপরম্পরা শুনতে হৈ উহ্ মহর্ষি চ্যাবনজীকা তিরশূল হৈ।

জটিয়াজ্জীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে করগঙ্গা, এটি আসছে কোথা থেকে ?

- ভৃগুকমণ্ডলু সে। নর্মদাকী উপনদী হৈ।

তিনি এবার বিদায় নিলেন, গুরুর হুকুম ছিল শর্যাতি ঘাটের পথ দেখানোর। তিনি গুরুর হুকুম পালন করে চলে গেলেন। এবার আমি একা। অনুমান করলাম বেলা দশটা-এগারটা হবে। দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলাম। এতক্ষন জটিয়াজ্জী অনর্গল কথা বলছিলেন, ভাববার সুযোগ পাইনি। এবার নানা ভাবনা এসে ভীড় করল। সত্তর বৎসরের বেশি নর্মদাতটবাসী সত্যাশ্রয়ী তপস্বী ভাবাবেশে বলে ফেললেন, আমি যখন গড়িয়ে পড়েছিলাম নীচে তাঁর আশ্রমে, আমার শরীরের চাপে যে সব পাথর হুরমুর করে গড়িয়ে পড়ছিল তার শব্দেই সচকিত হয়ে তিনি দেখতে পেলেন, "চরন্তীমিব বিদ্যুতম" - বিদ্যুৎবরণী ত্রিশুলধারিণী এক দেবী আমার হাত ধরে, মা যেমন আপন শিশুকে অবলীলাক্রমে শুইয়ে দেন, তেমনিভাবে আমাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন আশ্রমের প্রাঙ্গনে। আমি যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটাও দিনের বেলা দেখেছি। অলৌকিক কিছু না ঘটলে আমার আজ দাড়িয়ে থাকার কথাও নয়। সিদ্ধ তপস্বী, মিথ্যা ভাষন এবং মিথ্যাচার যাঁদের স্বপ্নের অগোচর, তিনি রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁর দিব্য দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রান্ত ক্লান্ত অসার দেহে আমি গড়িয়ে পড়তে পড়তে, জ্ঞান হারাবার পূর্বক্ষণে উদ্ভাসিত বিদ্যুতের চমক দেখেছি, ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেছিল বাবার জ্যোতির্ময় দেহ। কিন্তু আমি তো বাবা ছাড়া অন্য কোন জ্যোতির্ময়ীর এক লহমার জন্যও দর্শন পেলাম না ? ঋষিবাবার ভক্তিস্নিগ্ধ উচ্ছসিত বর্ণনার আভাসে ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল তিনি মহাকুমারী দিব্যা নর্মদা মাতার কথাই বলছিলেন। হয়ত আমি সর্বান্তকরণে এখনও রেবা নামকে মহাসিদ্ধ বলে মেনে নিইনি, কিংবা তপস্যার অঙ্গ হিসাবে নর্মদা পরিক্রমাকে ব্রত হিসাবেও গ্রহণ করিনি। আমি বাবার অদেশ পালনের জন্য বাবার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বশঃত, নর্মদা মাতার প্রতি ভক্তির টানে নয়। তাই কি মা দর্শন দিলেন না !

হাঁটছি আর ভাবছি। ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেছি।

সহসা কেকা..কেকা.. একটানা শব্দে চমকে উঠে দেখি, একদল ময়ুর কেকারব করে গাছ থেকে পার্বত্য পথে নেমে পড়ল। তাদের একটু দূরেই অপূর্ব সুন্দর কতকগুলি হরিণ চরে বেড়াচ্ছে।

একটু দূরেই পর্বতের ঢালে কতগুলি কুটির দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম, এই বোধ হয় করঞ্জিয়া গ্রাম। তখন বেলা একটা হবে।

খুব ক্ষুধা পেয়েছে, একটা বড় বটগাছের তলায় বসে গাঁঠরী রেখে বেশভুষা খুলে ফেললাম। ঝোলা থেকে সাগুদানা মিছরী বের করে একমাত্র সম্বল নারকেলের করঙ্গা তাতে জল ঢেলে ভিজিয়ে দিলাম। নদীর জলে স্নান করে নর্মদা মায়ের উদ্দেশ্যে তা নিবেদন করে খেয়ে নিলাম।

ধরাচূড়া পরে আবার যাত্রা করলাম। কিছুটা যাবার পরেই দেখতে পেলাম, একজন যুবক, গলায় উপবীত, কাঁধে কাঠের বোঝা, হাতে এক বিশাল টাঙ্গি, এই পথেই আসছে। গায়ের গৌরবর্ণ দেখে অনুমান করলাম যুবক গৌড় জাতীয় রাজপুত বা ব্রাহ্মন, কারণ সুমেরদাসজ্জী আমাকে জানিয়েছেন গায়ের বর্ণ গৌর, তাঁর ভাষায় 'পিলাসা' হলেই বুঝতে হবে গৌড় আর অবলুষ কাঠের মত কালো হলেই বুঝতে হবে ভীল বা অন্য কোন আদিবাসী বন্যজাতি।

যুবক কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন - আপ পরিক্রমাবাসী হ।

দূরের মহল্লাটি দেখিয়ে বললেন - করঞ্জিয়া হ, রাত মে উধর ঠার সকতে হ।

আমি শর্যাতি ঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বহু উঁচুতে পর্বত ও অরণ্যের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল - মূড়িয়া মহারণ হ।

নমস্কার করে হনহন করে চলে গেল তার নিজের পথে।

আমি হাঁটতে লাগলাম সামনের পর্বত ও গহন অরণ্য লক্ষ করে। এক ঘন্টা হাঁটার পর চড়াই, কিন্তু নর্মদার ধারাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না। পরিক্রমাবাসীর সংকীর্ণ পথ লক্ষ করেই হাঁটছি কিন্তু কোথায় গেলেন মা।

মনে পড়ল, প্রণয়লিপ্সু দেবতারা যখন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, তখন চোখের নিমেষে তিনি নদী প্রবাহরূপে কান্তারে পর্বতকন্দর ভেদ করে কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য ভীমবেগে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। দেবতারা কখনও দেখছেন চোখের সামনে, পরমুহূর্তেই দেখছেন এক যোজন দূরে কন্যা অবস্থান করছেন - পুনস্তাং দদৃশুঃ সর্বে যোজনান্তরধিষ্ঠিতাম্। মায়ের দেখছি স্বভাব এখনও যায়নি।

পরিক্রমার শপথ নিয়েছি, আমার ত আর থামলে চলবে না। যতই চড়াই-এর পর চড়াই অতিক্রম করতে থাকলাম পাকদণ্ডী বেয়ে ততই দেখছি অরণ্য ঘন হয়ে আসছে, আকাশচুম্বী সুবিশাল বৃক্ষের বলয় একটু একটু করে গ্রাস করে ফেলছে আমাকে। একবার পেছন ফিরে তাকালাম, যেখানে গৌড় যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে কত উঁচুতে উঠে এসেছি আমি। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় পর্বত, অরণ্য বৃক্ষরাজি এক অদ্ভুত সাজে সেজেছে। দু-ঘন্টা আগে ঐ পথ দিয়ে এসেছি আমি, কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য চোখে পড়েনি। আমি অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম - এঁকে বেঁকে গাছ ও পাথরের জাঙাল ডিঙিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছি। পথের যে আভাস বা অস্পষ্ট রেখা লক্ষ করে হাঁটছি, সে পথ যুগ যুগ ধরে পরিক্রমাকারীর পদচিহ্নের রেখা হতে পারে কিংবা এই পর্বতের সানুদেশ হতে যেসব আদিবাসী কাঠ সংগ্রহে এসেছিল, তাদের যাতায়াতের ফলেও এই পদরেখার সৃষ্টি হতে পারে। আমি ঢুকে গেলাম নিবিড় অরণ্যের গভীরে। বাইরে সূর্য অস্ত গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, আমাকে ঘিরে ধরেছে জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের রাক্ষস যেন মুখব্যাদন করে বসেছিল ওৎ পেতে, যে পথরেখা ধরে এসেছিলাম তা যেন এই রাক্ষসেরই মায়াজাল।

লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ সামনের ছোট গাছপালাগুলো যেন নড়ে উঠল, কোন একটা জন্তু দৌড়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁটতে লাগলাম, এত আস্তে আস্তে যে তাকে হাঁটা বলে না - অন্ধকারে অনুমানের ওপর পা দুটোকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছি মাত্র। লাঠি পাথরের গায়ে লাগলেই থমকে দাঁড়াচ্ছি, গাছের গায়ে লাগলেই একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। গা ছমছম করছে, আশ্বিন মাসে পাহাড়ে শীতের পরিবর্তে গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্ছে। ভাবছি করঞ্জিয়া গ্রামে গিয়ে থাকলেই ভাল হত। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে কাকজ্যোৎস্নার মত একটা আলোর আভাস জেগেছে। বড় বড় গাছের সারি, বড় বড় পাথরের চাঙড় অস্পষ্টভাবে দেখতে পারছি। এর কারণ কি, একি কোন **Twilight ?** অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পর্বতচূড়ায় যে দিনান্তের শেষ চুম্বন এঁকেছিল, বিশাল বিশাল বনস্পতি সোহাগভরে তা উল্লাসে ধরে রেখেছিল, তারই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিসরণ কি এই আলো? কিন্তু ভয়ার্ত পথিকের তা নিয়ে গবেষনা করার সময় কোথায়? আলো - আঁধারীর মায়াজাল যতক্ষন চোখে লেগে রইল সেই সময়টুকুতেই যতটুকু পারি এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক জীর্ণ অতি পুরোনো মন্দির। কোনো দরজা নেই। দেব-দেউলের ধারে দাঁড়ানো মাত্রই অতলান্ত অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। ঝোলা থেকে ছোট টর্চ বের করে মন্দিরের দিকে টিপতেই দেখতে পেলাম এক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই আশ্রয়স্থল ছাড়তে আর মন চাইল না। মন্দিরের ভেতর উঠে গেলাম। দরজা নেই, মন্দিরের জীর্ণ পাথর কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে, বাঘ, চিতা, নেকড়ে, সাপ - সকলের জন্যেই দ্বার অবারিত। কোনো নিরাপত্তার প্রশ্নই নেই, নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ঘুটঘুটি অন্ধকার-রাজ্যে ঐ মন্দিরকেই তখন আমার বড় নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হল।

শিবলিঙ্গের কেউ কোনদিন পূজা করেছে বলে মনে হ'ল না। এঁর পূর্বদিকে দেওয়াল ঘেঁসে আসন পাতলাম। মন্দির দ্বার দিয়ে ঢুকলেই সামনেই পড়বে শিবলিঙ্গ, শিবলিঙ্গই যেন আমার রক্ষক, অতন্দ্র প্রহরী। কমণ্ডলু থেকে একটু জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম কুশাসনে।

শুয়ে পড়লেই কি ঘুম আসতে চায়! ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। বিশ্বভুবন নিস্তব্ধ।

সহসা গুম্ গুম্ গুরগুর করে এক বিকট হুঙ্কার- কানের পর্দা বোধহয় ফেটেই যাবে এমন সেই গর্জন, সমস্ত বনকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে যেন। বনের মধ্যে জেগেছে বিরাট চাঞ্চল্য - দ্রুতবেগে মন্দিরের চারপাশ দিয়ে কতরকম বন্য জন্তু দৌড়ে পালাচ্ছে, তাদের পায়ের শব্দে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, স্তম্ভিতের মত বসে আছি। যেন কেউ আমাকে যাদুমন্ত্রে অবশ করে দিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, কোনরকমে কমণ্ডলুর জলটুকু গলায় ঢেলে কম্বলটা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে গুটিয়ে শুয়ে রইলাম, নিজেই ভেবে অবাক হলাম যেন কম্বলের নিচে কেউ আমাকে দেখতে পাবেনা।

ভয়ের চোটে এতদিন বৃদ্ধ মহাত্মাদের বারবার বলার পরও যা করতে পারিনি তাই করতে লাগলাম-সভয়ে জপ্ করতে লাগলাম - রেবা.. রেবা.. রেবা.. রেবা.. রেবা..।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল ভোর বেলা। চোখ মেলে দেখলাম, ভয়ের রাত্রি শেষ হয়ে গেছে; প্রাণপণে শিবলিঙ্গকে ধরে রাখার জন্য হাতের মুঠি আড়ষ্ট হয়ে গেছে, বাম হাত দিয়ে ডান হাতটাকে টিপে টিপে সচল করলাম। সূর্যোদয় হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। দুপুরবেলাও যেখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারেনা সেখানে ভোরের সূর্যের আলো দেখতে পাবার ইচ্ছা বাতুলতা মাত্র, ভেবে নিজের হাসি পেল। শুধুমাত্র রাত্রি শেষ হলে স্বাভাবিকভাবে যে স্বচ্ছ আলো দেখা যায় সেই আলো দেখা যাচ্ছে।

নর্মদা দর্শনের জন্য মন আকুল হয়ে উঠল। কম্বল, কুশাসন সব পড়ে রইল, কেবল কমণ্ডলু আর দণ্ডটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বড় বড় পাথরের চাঙর ও বিরাট শালাই, শাল ও হরিতকী গাছের মধ্যে দিয়ে প্রায় পাঁচশ গজ এগিয়ে যাবার পরই চোখে পরল নর্মদার স্বচ্ছ জলের ধারা। পশ্চিমগামিনী নর্মদা এখানে অনেক চওড়া প্রায় এক মাইল। নর্মদার ওপারে বড় বড় অনেক মন্দির দেখা যাচ্ছে। নর্মদার ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে লাল, নীল, সবুজ, হলদে স্ফটিক্ পাথরের স্তর। এর আগে জব্বলপুরে মার্বল পাথরের শোভা দেখে এসেছি, কিন্তু এখানে এই বৈদূর্যপর্বতের শোভার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। এদিকে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো ঢুকছে না, কিন্তু অপর পারে সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। স্ফটিক্ পাথরের রং নানা রকমের হওয়াতে সূর্যের আলোতে নানা রঙের আভা, তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এদিক-ওদিক তাকাতেই বামদিকে চোখে পড়ল বিরাট লম্বা ত্রিশূল পাথরের ভিতর খাড়াভাবে পোঁতা আছে। এই তাহলে সেই শর্যাতির ঘাট।

ঋষিবাবা বলেছিলেন, মোটা লোহার ত্রিশূল, একটু দূরে থেকে তাই মনে হয়, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম জ্যামিতিক মাপে কাটা পাথরের ত্রিশূল এটি। ত্রিশূলের পাশেই একটা সুবৃহৎ চওড়া পাথর জলের গায়ে ফেলা আছে, তার উপরভাগটা সমতল হয়ে চকচক করছে, নিশ্চিত হলাম এই জেনে যে, এখানে তাহলে এই পাথরের উপর বহুলোকের পায়ের ছাপ পড়েছে, বহু ব্যবহারে পাথরের এবড়ো-খেবড়ো ভাবটা সমতল হয়ে এসেছে।

নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলাম, প্রণাম করলাম ঐ ত্রিশূলকে। গঙ্গা যমুনার তীরে তীরে বর্তমান সভ্যতার পাপ স্পর্শ করায় অর্থাৎ হাজার হাজার কলকারখানা গড়ে ওঠায় জল কলুষিত হয়েছে কিন্তু নর্মদা এই পাপ কলুষ থেকে মুক্ত বলে জল সর্বদাই স্বচ্ছ। পেট ভরে জল খেলাম, একঘন্টা ধরে স্নান করলাম, সূর্যার্ঘ্য ও তর্পন সেরে ভাবতে লাগলাম ঐ বৈদূর্যপর্বত, এই নর্মদা এবং শর্যাতির কথা।

মহাভারতের বনপর্বে বেদব্যাস লোমশ মুনির মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন - দেখ রাজা, ভ্রাতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তুমি অতি অবশ্যই বৈদূর্য পর্বত দর্শন করতে যাবে এবং সেখানে মহানদী নর্মদাতে স্নান করবে। বৈদূর্যপর্বত দর্শন ও নর্মদাতে স্নান করে মানুষ দেবলোক ও রাজলোক লাভ করে -

দেবানামেতি কৌন্তেয়। তথা রাজ্ঞাং স লোকতাম্।
বৈদূর্যপর্বতং দৃষ্টবা নর্মদামবতীর্য চ॥

লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে সাধনার আরও একটি গুঢ় তত্ত্বের সংকেত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই বৈদূর্যপর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষনে সৃষ্টি হয়েছিল, সুতরাং এই পর্বত ও তৎসন্নিহিত মহাপুণ্যা নর্মদাতটে তপস্যা করলে সিদ্ধিলাভ হয়, সমূহ পাপ হতে মুক্তি ঘটে -

সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ~ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এতমাসাদ্য কৌন্তেয় । সর্বপাপৈ প্রমুচ্যতে ॥

শ্রেষ্ঠ তপস্বীগণ জানেন ক্ষণ কাল ও স্থান মাহাত্মের গুণে সিদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ক্ষণের মধ্যে সন্ধিক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যময়, সন্ধিকালে জপতপ করলে মন্ত্রচৈতন্য থেকে তপোসিদ্ধি সব ঘটে থাকে। মেহের কালীবাড়ীর সর্বানন্দ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে এই যুগেই যাঁদের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, সাধকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক সেই সময় অবশ্যই ক্ষণ, কাল ও স্থান প্রভাবের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটতে বাধ্য। এইজন্যেই এই বাংলায় দূর্গাপূজাকালে অষ্টমি তিথি শেষ হচ্ছে নবমী তিথি আসছে, সেই সন্ধিক্ষণটিকে এত গুরুত্ব দিয়ে সন্ধিপূজার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে যুগপ্রভাবে মানুষ তপস্যার ধার ধারে না। বহিরাচার নিয়েই মত্ত থাকে। ফলও হয় তথৈবচ। রাত্রি চলে যাচ্ছে, উষার সমাগম হচ্ছে - সেটি একটি ক্ষণ, সন্ধিকাল। মধ্যাহ্নকালও একটি ক্ষণ, দিনমণি অস্ত যাচ্ছেন, সন্ধ্যার সমাগম ঘটছে সেটিও একটি ক্ষণ, সন্ধিকাল। মধ্যরাত্রি অর্থাৎ মহানিশাও একটি মহাক্ষণ। ঐসব শুভক্ষণে কোন সিদ্ধক্ষেত্রে কিংবা কোন সিদ্ধ তপস্বীর সিদ্ধ তপস্যাস্থলীতে বসে গুরুপরম্পরাগত কোন সিদ্ধমন্ত্র কিংবা সিদ্ধ যোগপথকে আশ্রয় করে সাধনা করলে দ্রুত সিদ্ধিলাভ ঘটে। সহস্র সহস্র সিদ্ধযোগী মুনি ঋষির উপলব্ধ সত্য এটি।

যাক্ সে কথা। বেদব্যাস বলেছেন বলেই নর্মদার ওপারে সাতপুরা পর্বতমালার ঐ যে বৈদূর্যপর্বতে মহারাজ শর্যাতির যজ্ঞস্থলী তা আমার চোখে পূণ্যস্থলী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি ত নর্মদা লঙ্ঘন করে ওপারে যেতে পারব না, তাহলে পরিক্রমা খণ্ডিত হয়ে যাবে, নর্মদা পার হবার কোন ব্যবস্থাও ত চোখে পড়ছে না। তা না হোক্, এপারে বিন্ধপর্বতের পাদদেশে নর্মদার ঘাটে যেখানে বসে আছি, এই স্থানের গুরুত্ব ব্যাক্তিগতভাবে আমার কাছে অনেক বেশী। কারণ নিজে সাধনভজনহীন সর্বতোভাবে অকৃতী হলেও আমি যে পুণ্য ভার্গববংশে জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভার্গব বংশেরই পবরোক্ত নিত্যস্মরনীয় দ্বিতীয় পুরুষ জরামরণজয়ী মহাতপা চ্যবনমুনির সিদ্ধক্ষেত্র এই স্থান।

শাস্ত্রে আছে, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁর মা-কে পুলোমা নামে এক রাক্ষস অপহরণ করে শুণ্যপথে নিয়ে যাবার উপক্রম করে। গর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত শিশুর অগ্নিতেজে দূরাত্মা রাক্ষস সঙ্গে সঙ্গে ভষ্মীভূত হয়। চ্যু ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় করে (কর্তৃবাচ্যে) এই চ্যবন পদ সিদ্ধ হয়। চ্যু ধাতুর অর্থ স্খলন, ক্ষরণ বা গলন। মাতৃগর্ভ হতে চ্যুত বা স্খলিত হয়েছিল বলে স্থুল লৌকিক অর্থে তাঁর নাম চ্যবন কিন্তু সুক্ষ্ম অর্থে মহাতেজা ভৃগুর তপোবহ্নির ক্ষরিত বা গলিত ধারার নাম চ্যবন।

এই চ্যবন যখন এই নর্মদাতটে বসে তপস্যা করতেন তখন ঐ বৈদূর্যপর্বত এবং এই বিন্ধপর্বতাদি জুড়ে বিরাট অঞ্চল মহারাজা শর্যাতির রাজ্যভুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করতে করতে চ্যবন একটি বল্মীক স্তুপে পরিণত হন। একদিন মহারাজা শর্যাতি সপরিবারে এবং সসৈন্যে এসেছিলেন বিন্ধপর্বতের এই মনোরম অঞ্চলে প্রমোদভ্রমণে।

শর্যাতির একমাত্র কন্যা পরমা রূপসী সুকন্যা সখীদের সঙ্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে সেই বল্মীক স্তুপের কাছে গিয়ে তার মধ্যে পাশাপাশি দুটি ছিদ্র দেখতে পান। সেই দুটি ছিদ্র পথে হীরকের মত উজ্জ্বল বস্তু দেখে কৌতুহল বশত সুকন্যা চুলের কাটা দিয়ে সে দুটি হীরক বের করে নেবার জন্য বিদ্ধ করা মাত্রই বল্মীক স্তুপ ভেদ করেই উঠে দাঁড়ালেন কঙ্কালবৎ তপোক্লিষ্ট দেহধারী চ্যবন। বললেন - আমার চক্ষুকে বিদ্ধ করে আমাকে অবজ্ঞা করেছ কন্যা, আমাকে বিবাহ করে তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

হাহাকার করে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন সুকন্যা। বললেন - ঋষি আপনি জরাগ্রস্থ। আপনার দেহ আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। দাবদগ্ধ বৃক্ষের মত অঙ্গার হয়ে গেছে আপনার যৌবন, তবে কিসের আশায় আমাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছেন ঋষি ?

চ্যবন - তুমি আমার সেবা করবে। তোমার সান্নিধ্য আর স্পর্শসুখ ছাড়া আর কিছু ইচ্ছা করি না।
সুকন্যা - কুৎসিত আপনার ঐ ইচ্ছা। আপনার জরাগ্রস্থ প্রণয় নিবেদনের উৎসাহ সংবরণ করুন।
কঠোরস্বরে চ্যবন উত্তর দেন - তোমার ঐ রূপ ও যৌবনের অহংকার চূর্ণ করার শক্তি তপস্বী চ্যবনের আছে কিনা দেখ। যতক্ষণ না আমাকে পতিত্বে বরণ করবে, ততক্ষন তোমার পিতার বিপুল সৈন্যবাহিনীর মলমূত্রের দ্বার রুদ্ধ থাকবে।

অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্।
ততঃ শর্যাতিসৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ॥ (মহাভারত, বনপর্ব)

সৈন্যদের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা শুনে শর্যাতি ক্রমে সুকন্যা ও চ্যবনঘটিত ব্যাপার সব জানতে পারলেন। পিতার অনুরোধে সুকন্যা কাঁদতে কাঁদতে চ্যবনকে পতিরূপে বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন।
দিন যায় মাস যায়, বৎসর অতিক্রান্ত হয়, বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ ঋষির সেবা করে চলেন সুকন্যা। তাঁর যৌবন তাঁর কুন্দপুষ্পতুল্য দেহের লাবণ্য তাঁর যৌবনোচিত ক্ষুধা তাঁকে কাতর করে। অতৃপ্ত যৌবন বুকের মাঝে হাহাকার করে ফেরে। তপোমগ্ন ঋষির কঙ্কাল-দেহ যে দেববিগ্রহ - কঠিন শিলাময় বিগ্রহকে পূজা করে মানুষ যেটুকু তৃপ্তি পায় সেটুকু আনন্দও পায় না রাজকন্যা সুকন্যা। প্রেমহীন জীবনের আক্ষেপ ও নীরব ক্রন্দন প্রতিমুহূর্তে তাঁকে তিলে তিলে দগ্ধ করে চলেছে।
বসন্তের সমাগমে এই সময় একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে প্রেম নিবেদন করেন।
পরম রূপবান সুদর্শনকান্তি যুবকদ্বয়ের আহ্বানে সুকন্যার বুকে কামনার ঢেউ ওঠে।
সুকন্যা বলেন - আমি নিরুপায়। অন্তর্যামী ঋষির ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না আপনারা।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন - আমরা হীন প্রেমিক নই সুকন্যা। দেবতার প্রণয় কোন সুযোগের সন্ধান করে না, আমরা ক্ষীণ খদ্যোৎ নই যে দীপহীন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজবো। আমাদের মধ্যে কোন তস্কর বৃত্তি নেই। রূপের মোহে, তোমার অতৃপ্ত যৌবনক্ষুধাকে উদ্দীপ্ত করে তোমার জরাগ্রস্থ স্বামীর দুর্বল হস্তের মুষ্টিবন্ধন হতে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সম্ভোগ করতে চাই না।

তাবব্রূতাং পুনস্তেনামাবাং দেবভিষগ্বরৌ।
যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব
ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব বৃণীষ্বান্যতমং পতিম॥

কল্যানি! আমরা দেবচিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান; জরা দূর করে রূপ, স্বাস্থ্য, কান্তি ও পুষ্টি প্রদানের রহস্য আমাদের জানা আছে, আমরা তোমার স্বামীকে পুনর্যৌবন দান করে রূপবান করে তুলব; তারপর তিনি এবং আমাদের মধ্যে যাঁকে তোমার পছন্দ হবে, তাঁকেই তোমার স্বামীত্বে বরণ করে নিও।
মহাতপা চ্যবন কখন যে তাঁর কঙ্কালতনু নিয়ে সকলের অলক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা তা দেখতে পাননি। অশ্বিনীমুমারদ্বয়ের প্রস্তাব শেষ হওয়া মাত্র তিনি বলে উঠলেন -

তচ্ শ্রুত্বা চ্যবনো ভার্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি।
ভর্ত্রা সা সমনুজ্ঞাতা ক্রিয়তামিত্যথাব্রবীৎ॥

আপনারা তাই করুন। স্বামীর অনুমতি পেয়ে সুকন্যাও বলে উঠলেন - আপনারা তবে তাই করুন। চ্যবন বললেন, যদি আপনারা আমার জরা দূর করতে পারেন তাহলে আমি তুষ্ট হয়ে তপস্যার তেজে আপনাদের দুজনকে ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে সোমপানের মর্যাদা দান করব -

তস্মদ্ যুবাম্ করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপীথিনো।

চ্যবনকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নর্মদার জলে প্রবেশ করলেন।
এদিকে সুকন্যার বুকে তখন বিষম আলোড়ন, একদিকে বিশাল হৃদয় প্রেমিকের আহ্বান, অন্যদিকে জরাগ্রস্থ স্বামীর নিস্পৃহ মনোভাব, রূপযৌবন লাভ করেও তিনি বোধহয় তাঁকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখবেন না। সুকন্যা যদি অশ্বিনীকুমারদের যে কোন একজনকে বরমাল্য দান করেন, তাতেও বুঝি কঠোরতপা চ্যবনের বুকে বিন্দুমাত্র ব্যাথা লাগবে না; বিচলিত হয়ে উঠলেন সুকন্যা, মন তাঁর দুলে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে তিনজনই কুটিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে এসে চমকে উঠলেন সুকন্যা। তিনজনেরই সমান সুন্দর রূপ - একই বৃক্ষের তিনটি পূর্ণ বিকশিত পুষ্প যেন, একইরকম যৌবনদীপ্ত কান্তিমান দ্যুতিমান। অশ্বিনীকুমারদ্বয় উল্লাসে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু চ্যবনের মুখে কোন ভাষা নেই।

এক অকল্পনীয় দৃশ্য দেখছেন সুকন্যা। একটি পুষ্পমাল্যের বারেক আন্দোলনে এখনই তপস্বী চ্যবনের সকল অধিকার শুন্যে মিলিয়ে যাবে। সেইজন্যই বোধ হয় সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত ঋষির দুচোখে এক হতাশ ও অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। এক অসহ্য পুলকে কেঁপে উঠল সুকন্যার হৃদয়, আজ এতদিন পরে নিজেকেই যেন নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সুকন্যা, ঋষি চ্যবনের চক্ষুতে এই বেদনার আবির্ভাব দেখবার আশাতেই যেন এতদিন এক দুর্বহ প্রতীক্ষার ব্রত পালন করে এসেছে ব্রতচারিণী সুকন্যা। তিনি ধীরে ধীরে চ্যবনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন - কি ভাবছেন ঋষি ?

চ্যবন - প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

হেসে উঠলেন সুকন্যা - সুযোগ যখন পেয়েছি প্রতিশোধই নেব। এই বলে চ্যবনের গলায় বরমাল্য অর্পন করে জড়িয়ে ধরলেন চ্যবনকে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্তর্হিত হলেন।

এই শুভ সংবাদ পেয়ে শর্যাতি দেখতে এলেন আপন কন্যা এবং সদ্য রূপ-যৌবনপ্রাপ্ত ঋষিকে।

চ্যবন বললেন - বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করুন রাজা, এই যজ্ঞে ভিষগ্ বলে সোমভাগ হতে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমের ভাগ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চাই।

শর্যাতির সেই যজ্ঞানুষ্ঠান বিনা বাধায় করতে দেননি দেবরাজ ইন্দ্র। প্রথমে অনেক বিনয় করেও যখন চ্যবনকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন বজ্রপ্রহারে উদ্যত হলেন। কিন্তু দেবরাজের বিক্রম তপস্বীর তপোবলে ব্যর্থ হয়ে গেল, বজ্রধারীর উদ্যত বাহু মুহূর্তে হয়ে গেল স্তম্ভীভূত -

অস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস সর্বতঃ ॥

ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে 'মদ' নামের মারণ দেবতা সৃষ্টি করলেন চ্যবন। শত শত যোজন দীর্ঘ বিশাল ও ভয়ঙ্কর বেশধারী 'মদ' যজ্ঞাগ্নি হতে উদ্ভূত হয়ে চ্যবনের ইঙ্গিতে ইন্দ্রকে গ্রাস করবার জন্য বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ও লম্বিত জিহ্বা দ্বারা লেহন করতে করতে ভয়ঙ্কর শব্দ করে ধাবিত হল।

ইন্দ্র ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে চ্যবনের কাছে এসে বললেন - আজ হতে অশ্বিনীকুমারেরা যজ্ঞে সোমভাগী হলেন, আপনি প্রসন্ন হউন -

সোমার্হৌ অশ্বিনৈ এতৌ অদ্য প্রভৃতি ভার্গব !
ভবিষ্যতৎ সত্যমতৎ বচো বিপ্র ! প্রসীদ মে ॥

চ্যবন তুষ্ট হয়ে মদের করাল গ্রাস হতে দেবরাজকে নিষ্কৃতি দিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে সোমের ভাগ অর্পণ করে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করলেন।

সেই শর্যাতি ঘাটে বসে মহাতপা ভার্গব চ্যবনের কথা ঐভাবে ভাবতে ভাবতে কত বেলা যে হয়ে গেছে, এটা যে শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন মহারণ্য সে বিষয়ে কোন হুঁসই ছিল না। মহর্ষির উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে আমার ভয়ঙ্কর রাত্রির আবাসস্থল সেই জীর্ণ শিবমন্দিরের দিকে রওনা হলাম। সেই শিবমন্দিরে এসে দেখলাম, আমার কম্বল কুশাসন সবই যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনভাবেই পড়ে আছে। কিন্তু শিবলিঙ্গের মাথায় কেউ জল ঢেলে কিছু বনফুল দিয়ে পূজা করে গেছে। দেখে বড় অবাক হলাম, এখানে ত জনপ্রাণী নেই, এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কে এসে পূজা করে গেল। যদি কেউ এসেও থাকে অন্তত আমার কুশাসন, কম্বল দেখে একবার খোঁজ করার জন্য তো 'হর নর্মদে হর' বলে ডাকবে। এ কোন প্রহেলিকা !

মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে মন্দিরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক তন্ন তন্ন করে দেখলাম, কোথাও কোন লোকসমাগমের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। স্থানটি যেমন নির্জন তেমনি বিশাল অরণ্যে ঘেরা। নর্মদার গতিপথ একবার যদি হারিয়ে ফেলি সারাজীবন ঘুরলেও বেরিয়ে আসার পথ পাবো না। কাজেই কৌতূহল নিবৃত্তির দূরাকাঙ্খা ত্যাগ করে নর্মদা ও নর্মদাশংকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে রওনা হলাম।

বেলা তখন বোধ হয় দশটা বা এগারোটা হবে। পশ্চিমগামীনী নর্মদা, আমিও পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পাহাড় ও অরণ্য ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছে ভীম গর্জনে, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কচিৎ সাতপুরা পর্বতস্থিত সেই বৈদূর্যপর্বতের ঝিকমিক চোখে পড়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় পাথর ও কাঁটাঝোপে ভরা দৈত্যাকৃতি বিশাল বিশাল গাছের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরণের মোটা মোটা লতা ও বনের ফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, নিজের সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে যেন নিজেই মুগ্ধ, বাক্যহারা।

প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি কোন হিংস্র জন্তু ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি হঠাৎ যেন কোন শান্ত তপোবনে এসে পৌঁচেছি। ঝোপ ঝাড় কাঁটা কিছুই চোখে পড়ছে না, বড় বড় গাছের তলা একেবারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, দূরে নর্মদার ধার ঘেঁসে এক শিবমন্দির, একটু দূরে আর একটা, ওমা তার পরেও দেখছি প্রায় আধমাইল দূরে পাহাড়ের উপর আরও একটা। বিন্ধপর্বতের দেখছি সবই শিবময়। কতকাল আগে কারা যে ওইসব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কারও জানা নেই।

ভাবছি এই জঙ্গলের মধ্যে এই পরিচ্ছন্ন প্রায় সমতলভূমি কি করে এল! বনের পকৃতি যেন বলছে এমন জায়গায় আওয়াজ করা মানা, একটুও শব্দ না করে শুধু এই অদ্ভুত শোভা দেখে নাও দুচোখ ভরে। গাছের একটা পাতাও নরছে না, বাতাসও যেন সন্তর্পনে বইছে যাতে এমন পবিত্র পরিবেশে কোন শব্দের জন্য বিঘ্ন না ঘটে। প্রকৃতি যেন এখানে ধ্যানমগ্ন। নিস্তব্ধ পরিবেশের ইন্দ্রজালে সন্মোহিত হয়ে গেছি। একটু দূরেই চোখে পড়ল বড় বড় গাছের আড়ালে একপাল হরিণ চরে বেরাচ্ছে, কতগুলো হরিণ আবার তাদের শিং দুটোকে আমলকি ও ছোট ছোট হরিতকী গাছের ডালের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে দোল খাচ্ছে। সে দৃশ্য না দেখলে লিখে বর্ণনা করার মতো কোন ভাষা আমার জানা নেই। স্থির হয়ে দাড়িয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছি। বারেকের জন্য বাম কাঁধ থেকে গাঠরিটা ডান কাঁধে বদল করেছি, কোন শব্দ হয়ে থাকবে, আমি নিজেও সেই শব্দ ভাল করে শুনতে পারিনি কিন্তু বাতাসের এতটুকু স্পন্দনই যথেষ্ট, এতগুলো হরিণ যেন চোখের পলকে বিদ্যুত গতিতে দৌরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘনঘোর জঙ্গলে এতটা পরিস্কার সুন্দর জায়গা পেয়ে আমার বেশ ভালই লাগছিল। ভাবলাম হায় নর্মদার সমস্ত তটভূমিটাই যদি ভয়ঙ্কর জঙ্গল না হয়ে এমন সুন্দর হত। এমন জায়গা জ্যোৎস্নার আলোময় হয়ে রাতের বেলাতে যে দৃশ্যের অবতারনা হয় তা কল্পনা করে মনে হচ্ছিল যদি এখানে সারা জীবন থেকে যেতে পারতাম। থাকার কথা কল্পনাতে আসতেই মাথায় এল, বনের হরিণ যেখানে থাকে সে অঞ্চল এইরকমই পরিস্কার হয়। কিন্তু সেখানেই যে বাঘ-ও ওৎ পেতে থাকে। মনে হওয়া মাত্রই আগের দেখা তিনটি শিবমন্দিরের মধ্যে মাঝেরটি লক্ষ করে পাহাড়ের গা ঘেঁসে ঢালুর দিকে নেমে যেতে থাকলাম। এখান থেকে নর্মদা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মন্দির দেখা গেলেও পাহাড়ি অঞ্চলে যা খুব সামনে মনে হয় সেখানে পৌছনোর সময় বোঝা যায় তার আসল দূরত্ব। মন্দির লক্ষ করে আধমাইল হাঁটার পরই দেখলাম – প্রকৃতির নিজের হাতে গড়ে ওঠা এক সাজানো ফলের বাগান। বড় বড় কাঁঠালগাছে তিন চার ফুট বড় কাঁঠাল পেকে আছে, অজস্র কাঁঠাল-এর কোয়া পেকে নিচে পড়েছে। কলাগাছে বড় বড় কলা পেকে আছে, কিছু কলা নিচে পড়ে ফেটে গেছে। আরও অনেক রকম ফল দেখলাম তাদের নাম জানি না। চারিদিক ফলের গন্ধে ম্-ম্ করছে। তিন চারটা নীল গাই দেখলাম, তারা আমার শব্দ পেয়ে জংগলের দিকে চলে গেল।

জংগলের মধ্যে অন্ধকার কিন্তু এখানে দেখছি পর্বত ও মহারণ্যের উপর দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। আকাশে সূর্য দেখতে পারছিনা কিন্তু দুপুর বলেই মনে হচ্ছে। খুব খিদেও পেয়েছে, পেটভরে কলা আর কাঁঠাল খাওয়া গেল। কিছু কলা নিয়ে ঝোলাতেও রাখলাম।

বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে মন্দিরের পিছনে পৌছানোর পর মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সামনে গিয়ে দেখি বিশাল চেহারার বলিষ্ঠ ছয়জন লোক, তাদের কাঁধে বড় বড় টাঙ্গি, বর্শা এবং লম্বা লম্বা তীর ধনুক। গায়ের রঙ আবলুষ কাঠের মত। তাদের যোদ্ধাবেশ দেখে ভয় পেলাম। তাদের মধ্যে একজনই অল্প অল্প হিন্দী জানে। সেই জিজ্ঞাসা করল - আপ্ পরিক্রম্মা কর্ রহা হৈ ? ইহ্ হ্যায় করঞ্জেশ্বর মহাদেব। হম্ নিবাস করতা হুঁ বোদর মহল্লে মেঁ, কম্বা নদী কা কিনার। হমারা ইহ্ দোস্ত রহতা হৈ তুহার নদীকা কিনার মেঁ, হমারা মহল্লেসে চার মিল দূর হোগা। ঔর ইহ্ দোনো দোস্তকা ডেরা হৈ সরসূয়ামেঁ - তুহার গাওঁসে করীব ছয় মিল হোগা। হম্ সব গোঁড় রাজপুত বা।

সঙ্গের বাকী দুজনকে দেখিয়ে সকলের পরিচয় প্রদানকারী লোকটি বলল - ইহ্ লোগ ভীল হ্যায়, ইন্ লোগোকা বস্তী হ্যায় গাড়সরাইয়া মেঁ, হিঁয়াসে করীব দশ মিল হোগা, উধর এক ছোটাসা নদীভী হ্যায় - চিকরার, নর্মদামে যাকর ইহ্ নদী গায়ব হো গয়া। এহি মন্দিরসে উসতরফ্ পাহাড় কা উধার এক গাঁও হৈ, উসকা নাম - করঞ্জিয়া। করঞ্জিয়া কী নজদিগ্ হ্যায় ইহ্ শিউজীকী মন্দির, ইসলিয়ে শিউজীকা নাম হৈ - করঞ্জেশ্বর। হমলোগ্ ইধর পূজা করনেকা লিয়ে আনাজানা করতা হৈ। শিবরাত্রিকা বখৎ বিশ গাঁওকা হাজারো আদমী মাদল বাজা বাজাকর আতা হৈ পূজাকে লিয়ে।

আমি গাঁঠরীটা সেখানে রেখে সংকেতে জানালাম নর্মদা স্পর্শ করতে যাচ্ছি। কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে নদীর দিকে নামতে লাগলাম। লোকগুলির শরীরের গঠন দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি, এইরকম দৈত্যাকৃতি শরীর এবং ভীষণাকৃতি টাঙ্গি না হলে হিংস্র শ্বাপদসংকুল মহারণ্যে বিচরণ করা এবং টিকে থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাদের যে কেউ আমাকে ধরে একখণ্ড ঢেলা বা পাথর ছোঁড়ার মত করে নর্মদা গর্ভে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

বাঙালী কবি কাব্য লিখেছেন - মারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু এমনই স্বাস্থ্যপ্রদ যে এখানে নানা জটিল ব্যাধি বা মহামারীর করাল থাবা বসানোর সুযোগ নেই। এদেরকে বেঁচে থাকতে হয় বাঘ, ভাল্লুক, সাপ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে। কলা ও কাঁঠাল খেয়েছিলাম, উচ্ছিষ্ট হাত ধুয়ে, চোখে-মুখে জল দিয়ে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে ফিরে এলাম করঞ্জেশ্বর দর্শন করতে।

পাথরের কয়েকটা ধাপ অতিক্রম করে গর্ভগৃহে দেখলাম নর্মদামুখী শিবলিঙ্গ ঠিক যেন একটি কাঁচের বৃহৎ গোলকের মত। কাঁচ নয় শুভ্র স্ফটিক, মাঝখানে অতি উজ্জ্বল এক রক্তচ্ছটা, যেন এইমাত্র তাজা রক্ত দিয়ে কেউ ফোঁটা দিয়েছে। হাত দিয়ে দেখলাম ঐ লাল চিহ্ন বাইরের কোন বস্তু নয়, স্ফটিকের ভেতরে। রৌদ্রলিঙ্গের এটি শিব-চিহ্ন।

বাবা খুব যত্নের সঙ্গে আমাকে শিবলিঙ্গের বহুবিধ লক্ষণ ও পরিচয় শিখিয়েছিলেন। সাধারণতঃ আমরা শিবলিঙ্গ দেখলেই তাঁকে বানলিঙ্গ বলে আখ্যা দিই। কিন্তু বাণলিঙ্গের অনেক প্রকারভেদ আছে। বাণলিঙ্গ ছাড়াও নিম্নলিখিত অনেক প্রকারের শিবলিঙ্গের পরিচয় বীরমিত্রদ্বয়ধৃত কালোত্তর, হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ড, সিদ্ধান্তশেখর, মৎস্যসূক্ত, কালোত্তর, লিঙ্গ - পুরাণ এবং সূতসংহিতা প্রভৃতি পুঁথিতে পাওয়া যায়, যথা - রৌদ্রলিঙ্গ, শিবনাভিলিঙ্গ, দেবলিঙ্গ, আর্যলিঙ্গ, আগ্নেয়লিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, ঐন্দ্রলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ প্রভৃতি। এছাড়া যে কোন শিবলিঙ্গের মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ থাকলে তাকে জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয়।

এইমাত্র যে করঞ্জেশ্বর শিবলিঙ্গটি দেখলাম তাঁকে রৌদ্রলিঙ্গ বলে, কারণ আমার মনে হ'ল যে, তাতে রৌদ্রলিঙ্গের লক্ষণ দেখলাম। তদযথা -

নর্মদাসম্ভবাং রৌদ্রং শ্বেতং রক্তং গোলাকৃতি।
রৌদ্রলিঙ্গং তথা খ্যাতং সর্বজাতিষু সিদ্ধিদম্॥

নর্মদা তীরবর্তী, বোধহয় নর্মদা জলের বিঘর্ষণেই এঁর উৎপত্তি, শুভ্র গোলাকৃতি তাতে রক্তবর্ণের ফোঁটা, বিন্ধ্যপর্বতে নির্জন মহারণ্যের রুদ্রাত্মক পরিবেশে এঁর স্থিতি। কাজেই উপরে বর্ণিত রৌদ্রলিঙ্গের সমূহ লক্ষণই বর্তমান দেখছি।

এইমাত্র সঙ্গী সেই ভীমকায় ছয়জন শিবভক্ত গোঁড় বা ভীলকে এসব কথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম না। তারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, আমিও এই বিজন মহারণ্যে তাঁদের মত সাথী পেয়ে বর্তে গেলাম যেন। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, আমার কাজ শুধু ঘুরে ফিরে উঁকি মেরে নর্মদার জলধারা দেখা যাচ্ছে কিনা সেটা দেখা, ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম।

পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, জল প্রায় দুষ্প্রাপ্য, ঝরণা এক আধটা যদিও বা দেখা যায়, সে জল ছুঁতে হলে যত বড় বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ঘন ঝোপ আর কাঁটার আঁচড় খেতে হবে যে প্রাণের আশা ছাড়তে হবে। পর্বতের ঝরণা মানেই পাথরের আড়ালে কোন হিংস্র জন্তু নিশ্চয়ই ওৎ পেতে আছে, তাছাড়া আছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত বড় বড় বিষধর সাপের ছোবলের আশঙ্কা।

বেলা তখন বড়জোর তিনটা হবে। কিন্তু মুণ্ডমহারণ্যের ভিতর অন্ধকার ছেয়ে গেছে। সেই হিন্দী জানা লোকটি আমার বারবার হোঁচট খাওয়া দেখে আমার বামহাতটা জাপটে ধরে পাহাড়ের কোলে পশ্চিমদিকে বনজঙ্গল ভেদ করে নিয়ে চলেছে। এইভাবে প্রায় দুই মাইল যাবার পর আমাকে হতচকিত করে ছয়জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখতে পেলাম, একটা বিরাটকায় লোমশ ভালুক আমাদেরকে লক্ষ্য করে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে দেখলাম আরও একটা সাজা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

পাহাড়ীদের বিপদকালে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করে। তাদের মধ্যে দুজন একই সাথে দুটো তীর আকর্ণবিস্তৃত গুণ টেনে ছেড়ে দিল দুটো ভালুককে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য, দুটোই তীরবিদ্ধ হয়ে উলটে পড়ে বিকট শব্দে গোঁ গোঁ করতে লাগল। লোকটি আমাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল, তীরের মাথায় উগ্র বিষ আছে, ভল্লুক মহারাজদের ভবলীলা যে সাঙ্গ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে সে সুনিশ্চিত।

আমরা সেই পার্বত্য জঙ্গলে যত তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়, প্রাণপণে ততটা তাড়াতাড়িই হাঁটছি। বাঁদিকে মোড় ঘুরে একটা পথের ক্ষীণ রেখা দেখিয়ে বলল, পরিক্রমাকারীরা এই পথে হাঁটে, আমাদেরকে গাঁয়ে ফিরতে হবে তাই ঢালুর দিকের পথটা ধরলাম। এই পথেও পরিক্রমাকারীরা যান, কারণ তারা গোঁড় আর ভীলদের বস্তিতে গিয়ে মাধুকরী সংগ্রহ করেন। অন্ধকারে বাম ডান কোনদিকে পথই দেখতে পারছি না - কেবল মুখে বলছি হুঁ.. হাঁ..। ভালুক দেখার আতঙ্ক এখনও বুকের মধ্যে গুরগুর করছে। তাদের কাছে এটা কোন উদ্বেগের ঘটনাই নয়, সামনে বাঘ পড়লেও তারা তীর বা টাঙির ঘায়ে তাকে কাবু করেই এগিয়ে যেত তাদের গন্তব্যস্থলে। তাদের জীবন এমনই। মৃত্যুর সাথে প্রতিনিয়ত পাঞ্জা কষেই এইসব মহারণ্যে পর্বতচারী মানুষগুলি বেঁচে আছে। শুধু কোনমতে বেঁচে থাকা নয়, এইভাবে থেকেই তারা চাষবাস করে, ক্ষেতে কাজ করে, সংসার প্রতিপালন করে। ধর্মকর্মও করে থাকে।

অনেক্ষন পরে মহারণ্যের ভিতর দিকে পাহাড়ের নীচে এসে পৌছুলাম। সূর্যের অস্তরাগ দূরে পাহাড়চূড়ায় হাল্কা বোঝা যাচ্ছে। সামনে দূরের সমতল ভূমিতে মানুষের বস্তির আভাস। শীত লাগছে, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। পেছন দিকে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম - অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় পেছনের পাহাড় দেবলোকের কনক দেউলের মত বহুদূর নীল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি উত্তর-পশ্চিমদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল- উস্ তরফ্ করঞ্জিয়া। সোজা উত্তরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল - সামনে মেঁ যো গাঁও পড়েগা ওহি হমারা বোঁদর মহল্লা, অব্ হম্ চলেঙ্গে, আপ ইন্ লোগোকা সাথ যাইয়ে রাত মেঁ সরসূয়ামেঁ ঠাঁর সকতে হৈ, থক্ নাহি যায়েঙ্গে ত গাড়সরাইয়া তক্ যা সকতে হৈ।

আমি তার হাত দুটো ধরে বললাম- বহুত বহুত সুক্রিয়া। ভাল্লুক আক্রমণের স্মৃতি তখনও মন থেকে মুছে যায় নি, বললাম - তোমরা ত ভাই মৃত্যুকে কোন পরোয়া না করেই শিবদর্শন করতে যাও, তোমাদের ভক্তিনিষ্ঠা দেখে অবাক হচ্ছি। লোকটি বলল - দশ-বিশ গাঁও কী আদমী যাতা হৈ। ওহ্ শিউজী বহুত বহুত জাগ্রৎ হৈ। নামচি উনকা পূজা কিয়া থা, যো কুছ্ উনকা পাশ মাংগতে হৈ, উহ্ তুরন্ত মিল যাতা হৈ। এই বলে লোকটি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ত্রস্তপদে নিজের গাঁয়ের পথে পা বাড়াল।

আমি বাকি পাঁচ সঙ্গীর সঙ্গে পার্বত্য ঢালুতে মহারণ্যের কোল ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। সশস্ত্র সাথীরা আমাকে মাঝখানে রেখে হেঁটে চলেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে - বড় বড় গাছের আড়ালে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকলেও ফিকে জ্যোৎস্নার আলো বনভূমিতে ঠিকরে পড়ায় পথ চলতে বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছে না। হঠাৎ বামদিকে একদল শেয়াল একসাথে ডেকে উঠল।

ভাবলাম - সুলক্ষণ, এবারে নিশ্চয়ই পথ নিরাপদ কেননা খনার বচনানুসারে - 'বামশিয়ালী' যাত্রা পথের শুভ লক্ষণ। মনের মধ্যে নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে; 'নামচি উনকা পূজা কিয়া থা' -লোকটির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসা কথাটি মনে তোলপাড় তুলছে। করঞ্জিয়া মহল্লার নিকটবর্তী মহারণ্যের মধ্যে নর্মদাতটে শিব প্রকট হয়েছেন বলে তাঁর নাম হয়েছে করঞ্জেশ্বর। এই নামকরণের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু নামচি কেন ? তিনি পূজা করেছিলেন বলেই যদি ঐ শিব ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করে থাকেন, লোকটির কথামত যদি তাই হয়, তাহলে শিবের নামের সঙ্গে ঐ মন্দিরের কোন-না-কোন ভাবে নামচি নামটার সংযোগ থাকল না কেন ? অথচ ঐরকম একটি শক্তিশালী অপূর্ব রৌদ্রলিঙ্গ সত্যি তো নিজের চোখে দেখে এলাম।

সঙ্গের পাঁচটি লোক-তাদের ভাষাও আমি বুঝি না, আমার ভাষাও তারা বোঝে না, কাজেই তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যে কোন আলোচনা করব তার সুযোগ নেই। আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলেছি। সহসা 'নামচি -নামচি' ভাবতে ভাবতে স্মৃতিতে ঝিলিক্ খেলে গেল - নমুচি! নমুচি! নমুচির কথা পড়েছি ঋগ্বেদে, শতপথ ব্রাহ্মনে এবং মহাভারতে।

শতপথ ব্রাহ্মনে এবং মহাভারতে আছে - বিপ্রচিত্তি নামের এক দানবের পুত্র নমুচি তপস্যা করে মহাপরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। ইন্দ্র যখন যুদ্ধে সমস্ত অসুরদেরকে একের পর এক পরাজিত করছিলেন, তখন একমাত্র নমুচিই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে ইন্দ্রকে পরাস্ত করেন। পরে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। কিছুকাল পরে পুনরায় যখন দেবতাদের সাথে দৈত্যদের যুদ্ধ বাঁধে, তখন নমুচি যজ্ঞকালে ইন্দ্রের প্রাপ্য সোমরস অপহরণ করে তাঁকে হীনবল করেন এবং ইন্দ্রকে বন্দী করেন।

শিবের অনুরোধে শিবভক্ত নমুচি ইন্দ্রকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে ইন্দ্র নমুচিকে দিনে কিংবা রাত্রে, শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা নিহত করতে পারবেন না। আবার উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ইন্দ্র কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেন নি। সরস্বতীর উপাসনা করে তিনি নমুচি-বধের বরলাভ করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাহায্যে সমুদ্রফেনা দিয়ে এক বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করান।

নমুচি ইন্দ্রের এই দূরভিসন্ধি জানতে পেরে ভয়ে সূর্যরশ্মির মধ্যে প্রবেশ করেন -

নমুচির্বাসবাদ্ভীতঃ সূর্যরশ্মিং সমাবিশৎ।

ইন্দ্র তখন কপট বন্ধুত্বের ভান করে নমুচিকে বললেন - সখে অসুরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার কাছে পূর্বেই এই সত্য শপথ করেছি যে দিনে বা রাত্রিতে আর্দ্র বা শুষ্ক অস্ত্র দ্বারা তোমাকে বধ করব না -

ন চ আর্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি।
বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ। সখে ! সত্যেন তে শপে॥

(মহাভারত, শল্যপর্ব)

কাজেই তোমার ভয় পাবার বা আত্মগোপন করার কোন হেতু নাই। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র এই শপথ রাখলেন না। নর্মদাতটে একদিন নমুচিকে নীহারকণার মধ্যে স্থিত দেখে গোধুলিলগ্ন - যা দিনও নয়, রাতও নয় - এরকম সন্ধিক্ষণে, সমুদ্রের ফেনা - যা শুষ্কও নয়, আর্দ্রও নয় - এইরকম বস্তু নির্মিত সেই বজ্রাস্ত্র দিয়ে নমুচির মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন। নমুচির সেই ছিন্ন মুণ্ডও তো ! মিত্রহন্ পাপেতি 'তুই পাপিষ্ঠ, বন্ধুর মস্তক ছিন্ন করলি'- এই কথা বলতে বলতে ইন্দ্রকে তাড়া করে তার পেছনে ধাবিত হল। ইন্দ্র প্রাণভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

ব্রহ্মা বললেন - মিত্রহত্যা বা মিত্রদ্রোহিতা ব্রহ্মহত্যার সমতুল্য পাপ। যথাবিহিত যজ্ঞ করে অরুণা নদীতে স্নান করলে এ পাপ হতে মুক্ত হতে পারবে। ইন্দ্র অরুণা নদীতে স্নান করে স্বর্গে ফিরে গেলেন, নমুচির ছিন্ন মুণ্ডও অরুণার পুণ্যজলে পতিত হওয়ার ফলে সেও পরমগতি লাভ করল।

নর্মদাতটে যেখানে ইন্দ্র নীহারকণার মধ্যে নমুচিকে দেখতে পেয়ে নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলেন, সেইখানেই বরদ ভক্তবৎসল আশুতোষ রৌদ্রলিঙ্গরূপে ভক্তের সেই রক্তফোঁটাকে নিজ অঙ্গে ধারণ করেছেন। স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে ইনিই করঞ্জেশ্বর শিব। সেই শিবকেই দুর্গম অরণ্যে আজ প্রণাম করে এসেছি।

ইতিমধ্যে তুহার নদীর তীরে এসে আমাদের এক সাথী তার নিজের মহল্লায় চলে গেছে। আমার সঙ্গে আছে বাকী চারজন। অনুমান করলাম রাত্রি বোধহয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। আমার ঝোলা থেকে কলা বের করে পাঁচজনে ভাগ করে খেলাম।

হঠাৎ দেখলাম চার-পাঁচটা জন্তু আমাদেরকে যেন মহারণ্যের মধ্যে বড় বড় গাছের আড়ালে অনুসরণ করে আসছে। আমার সাথীরা দেখলাম টাঙি হাতে পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের পাতা থেকে টপটপ করে শিশির পড়ছে। যাদের বাড়ি সরসূয়াতে তারা বলল, আরও একমাইল গেলে সরসূয়াতে পৌছানো যাবে। তারা সঙ্গে সঙ্গে কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আগুন জ্বাললো। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে শিতও লাগছিল খুব। রাত্রি সাতটা সাড়ে সাতটাতেই মনে হচ্ছে যেন কত গভীর নিশুতি হয়ে গেছে। চারিদিক নৈঃশব্দের স্তব্ধতা। আমার সাথীরা চারিদিকে সূচ্যগ্র দৃষ্টি দিয়ে আঁতিপাতি করে দেখল, বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে কোন গন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর তাদের হাবভাব আর কথাবার্তায় স্বাভাবিক নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল। বনাঞ্চলের লোক বন্য জীবজন্তুর মতিগতি তারাই ভাল বোঝে। আমার হাত ধরে টান দিয়ে হাঁটিতে আরম্ভ করল। তাদের ইঙ্গিত বুঝে আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটিতে লাগলাম।

কিছুটা যাবার পর একটা ছোট্ট নদী দেখলাম বয়ে যাচ্ছে। একজন বলে উঠল 'সীবনী' আর কি বলল বুঝাতে পারলাম না। সাথীদের মধ্যে দুজন আমার হাত ধরে বলল - 'সরসূয়া'। তারা দুজন ভীলকেও তাদের ভাষায় কি যেন বলল, কিছুই আমার বোধগম্য হ'ল না। তবে এটুকু বুঝলাম, এই সরসূয়া মহল্লাতেই তাদের বাড়ী, তারা আমাকে এবং অপর দুজন ভীলকে তাদের গাঁয়েই আজকের রাতটা কাটাবার জন্য যেন অনুরোধ করল। কিন্তু ভীল দুজন কিছুতেই রাজী হ'ল না। তারা আমার হাত ধরে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করল, আমি তাদের সাথে যাবো, না কি, ঐ সরসূয়া গাঁয়েই থাকব ? রাত্রি যতই হোক আমি ভাবলাম, ভীলরা যদি এই শীতের মধ্যে জঙ্গল রাস্তায় হেঁটে যেতে পারে তাহলে আমিই বা পারব না কেন ? আমি ভীলদের হাত ধরে ইঙ্গিতে বুঝালাম, আমি তাদের সঙ্গেই যাবো। তাদের হাবভাবে মনে হ'ল,তারা খুশী হয়েছে। সরসূয়া গাঁয়ে দুজন আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমাকে মাঝখানে রেখে আমার সামনে একজন পিছনে একজন, এইভাবে হাঁটতে তারা হেটে চলল। হিমেল হাওয়া সিরসির করে বইছে। এবারে চড়াই রাস্তা। আমার ঝোলা থেকে টর্চ বের করে আমাদের সামনে যে, তার হাতে দিলাম। দুজনেই টর্চটা টিপে টিপে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল; তাদের খুশী খুশী ও অবাক হওয়া ভাব দেখে মনে হ'ল, ও জিনিষ তারা এর আগে দেখে নি।

জঙ্গল থেকে নানা বিচিত্র শব্দ মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে। কোন দিকে যাচ্ছি, রাত্রি কত হ'ল, এসব কোন চিন্তাই আমার আসছে না, আমার মনে ভাসছে শর্যাতি ঘাটের কথা, করঞ্জেশ্বর শিবলিঙ্গের কথা। শর্যাতিঘাটের শিক্ষা হ'ল, মহামুনি চ্যবন দেখিয়েছেন কৃতজ্ঞতার পারাকাষ্ঠা ! উপকারীর প্রত্যুপকার করে কিভাবে ঋণ শোধ করতে হয়, আর করঞ্জেশ্বরের ঘাটে শিখলাম - মিত্রদ্রোহিতা কত বড় পাপ ! নমুচির সঙ্গে যেভাবে ইন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ হয়েও তাঁকে সেজন্য ধিক্কৃত হতে হয়েছিল। ব্রহ্মা ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন - মিত্রদ্রোহিতা, বন্ধু হয়ে বন্ধুর সঙ্গে ছলনা, ব্রহ্মহত্যার মত অতি ঘৃণ্য পাপ।

এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির সুমহতী শিক্ষা হ'ল -

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে নরাঃ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরাঃ নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক - এই তিন প্রকৃতির লোকই হ'ল প্রকৃত চিহ্নিত পাপিষ্ঠ। যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্যথাকবেন, ততদিন ঐ তিন প্রকৃতির পাপিষ্ঠকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ বন্ধুর বিরুদ্ধাচারণ করতে নেই। মত ও আদর্শে যদি কোনদিন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, সসম্মানে দূরে সরে থাকা ভাল, তবুও তার কোনদিন অনিষ্ট করতে নেই। উপকারীর উপকার স্মরণে না রাখলে কিংবা প্রত্যুপকারের পরিবর্তে তার কোনদিন অপকার করার প্রবৃত্তি জন্মালে, তার নাম কৃতঘ্নতা। মহাপাপ এটি। কেউ বিশ্বাস করে কোন গোপন কথা বললে বা বিশ্বাস করে কোন দ্রব্য জমা রাখলে, প্রাণপন চেষ্টায় মন্ত্রগুপ্তির মত সেই বিশ্বাস রক্ষা করে চলতে হবে।

হঠাৎ পেছনের লোকটি হুড়মুড় করে আমাকে নিজের কোলের দিকে টেনে নিল। সামনের লোকটিও থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনেই পথের পাশে এক পাথরের গায়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু হয়ে ফনা তুলে দাঁড়াল। বোধহয় ছোবল মারবার আগে সাপটা এক সেকেণ্ড দেরী করে ফেলেছিল। সেই সময়টুকুর মধ্যেই আমাদের ভৈরবমূর্তি পথপ্রদর্শক ভীলটির টাঙ্গি সাঁই করে ঝলকে উঠল।
সঙ্গে সঙ্গে অতবড় সাপটা দু টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। দু টুকরো হয়েও সাপটা ফুঁসে আসতে চায়। দুদিক থেকে দুজনের টাঙ্গি সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল।

এতক্ষন শীতে কাঁপছিলাম, পথের পাথরও পায়ে খুব ঠান্ডা মনে হচ্ছিল কিন্তু এই ঘটনার পর কপালে হাত দিয়ে দেখি বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাত যে কত হয়েছে আন্দাজ করতে পারছি না, ঘনঘোর মুণ্ডমহারণ্যের ভয়াল রূপ যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

ভীলবন্ধু দুজন পুনরায় আমাকে মাঝখানে রেখে হাঁটিতে আরম্ভ করেছে। এইমাত্র যে ঘটনা ঘটে গেল, এ যেন তাদের কাছে কিছুই নয়, যেন হামেশা ঘটেই থাকে, তাদের আরণ্যক জীবনে এতে যেন ভয় পাবার বা চমকে ওঠার মত কোন কারণই ঘটেনি।

শীতের রাতে হাওয়া দিচ্ছে সোঁ সোঁ করে, তিনটি প্রাণী চড়াই উৎরাই - এভাবে আরও দুঘন্টা চলার পর জলের কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পেলাম। কুলুকুলু ধ্বনি মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে। ভীল দুজন সমস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠল - চিকরার ! চিকরার ! বুঝলাম এই সেই নর্মদার উপনদী চিকরার, যার তীরে তাদের গাড়সরাইয়া মহল্লা, রাতের বেলা কোথায় কি আছে দেখতে পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না, একসময় তারা আমার হাত ধরে কুটীরের দাওয়ায় তুলল।

তাদের শব্দে কুটীরের ঝাঁপ উঠল, তিন-চারজন মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। একটি খাটিয়া বের করে এনে দাওয়ায় পাতলো, হিমেল বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য আমার খাটিয়ার চারদিকে চট টাঙ্গিয়ে দিল। আমার গাঁঠরী খুলে একটা মোটা চাদর পাতলাম খাটিয়ায়। এরই মধ্যে একটি মেয়ে এক হাঁড়ি গরম জল এনে আমার সামনে রাখল, দুজন লোক একটা মোটা গাছের গুঁড়ি দাওয়ার কাছে টেনে এনে তাতে আগুন ধরাল।

কেরোসিনের ডিবা জ্বেলে ঘর আলো করার ব্যাবস্থা নেই, হয়ত অরণ্যচারী এইসব ভীলরা কেরোসিনের কোন ব্যবহারই জানে না, কাঠের আগুনই তাদের আলোর কাজ করে, তাপ দিয়ে শীত থেকে রক্ষা করে।

হাঁড়ির জলে হাত দিয়ে দেখলাম ঈষদুষ্ণ, হাত পা মুখ ধুয়ে ফেলার উপযোগী করেই জল গরম করেছে। হাত পা ধুয়ে খুব আরাম পেলাম, মনে হল অনেকটা ক্লান্তি দূর হল। কম্বলটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় একটা জামবাটিতে গরম দুধ এনে সামনে রাখল। ভীল দম্পতি যুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে হাসি। নীরবে দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়লাম, গায়ে মুখে কম্বল সবেমাত্র ঢাকা দিয়েছি, হঠাৎ অন্ধকারেই মনে হল কেউ যেন আমার পা দুটো ধীরে ধীরে টিপে দিচ্ছে। কম্বল থেকে মুখ বের করে দেখলাম এতখানা পথ যারা আমার সঙ্গে হেঁটে এসেছে, তাদেরই একজন ভীল, শ্রান্ত অতিথির, পরিক্রমাবাসীর সেবার জন্য কুণ্ঠাহীন কারুণ্যে সহজাত সংস্কার ও শ্রদ্ধার টানে প্রসারিত করে দিয়েছে তার নীরব দুটি হাত।

আকারে ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলাম কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বন্য আদিবাসীর মধ্যেও এই ধর্মবোধ ও সেবানুখী বৃত্তি আমাদের ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি ! ঘুম ভাঙল যখন, তখন সমগ্র অরণ্য প্রান্তর সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। তাড়াতাড়ি উঠেই কমণ্ডলুস্থিত নর্মদার জল স্পর্শ করলাম, গাঁঠরীটা গুছিয়ে বেঁধে ফেললাম। দাওয়া থেকে নেমে দেখলাম, বিরাট বিরাট গাছের আড়ালে ভীলদের কতকগুলি কুটীর যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। সূর্য প্রণাম করতে গিয়ে প্রার্থনা করলাম - এই দরিদ্র অতিথিপরায়ণ ভীলদের মঙ্গল কর প্রভু, এরা সবাই সুখী হোক। এছাড়া আমার মত আকাশবৃত্তিধারী নিঃস্ব পরিক্রমাবাসীর আর কি দেবার আছে। বাড়ীর সকলে এসে চত্বরে দাঁড়ালো, আমি হাতজোড় করে তাদের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম।

চিকরার নদীর কিনারে কিনারে হাঁটতে লাগলাম, খুঁজতে লাগলাম রৌদ্রভাসিত পথে, মহারণ্যের ধারে পরিক্রমাবাসীদের পথের ক্ষীণ নিশানা - পথের চিহ্ন।

রাত্রিতে চিকরার নদীর কলকল ধ্বনি শুধু শুনেছিলাম, দিনের বেলা দেখলাম নদীটি ছোট হলেও খরস্রোতা। বড়জোর ষাট ফুট প্রশস্ত হবে। কিন্তু তার স্রোতের টানে বড় বড় পাথরও গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমেইনদীর গতিপথ মহারণ্যের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে। নদীকে আর দেখতে পেলাম না, কিন্তু একটা পথের ক্ষীণ অস্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়ল। শুরু হ'ল ঘন জঙ্গল, অতি কষ্টে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে আবলুষ কাঠের মতো গায়ের রঙ, একজন বিবস্ত্র মানুষ এসে পথ আটকে দাঁড়াল। তার হাতে টাঙ্গি, কাঁধে কাঠের বোঝা। পথ কিছুতেই ছাড়ে না, আমার গাঁঠরী ও ঝোলা টেনে দেখতে লাগল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম কম্বলাদি হয়তো কেড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই করল না। যেমন আচম্বিতে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আচম্বিতে পথ ছেড়ে দিল। গাঁঠরীটি কাঁধে তুলে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করছি, দেখলাম আমার চারদিকে সেইরকম আরও পাঁচজন কৃষ্ণকায় দৈত্যাকৃতি মানুষ টাঙ্গি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সবার কাঁধেই কাঠের বোঝা। যে আমার গাঁঠরী অনুসন্ধান করেছিল, সে তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতে লাগল। তারা সন্তর্পণে মাথা নুইয়ে নুইয়ে, আমার পথ করে দিল। বনের মধ্যে আধ মাইলটাক্ যাবার পরেই মা নর্মদার দর্শণ পেলাম। জলে নেমে স্নান করলাম, কমণ্ডলুতে জল ভরে আবার জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। অনুমান তখন বেলা বারটা হবে।

মনে ভয় হচ্ছিল, জলপ্রাণীর চিহ্ন নেই, পাখীর কোন সাড়া নেই, যদি রাত্রে এখানে থাকতে হয় তাহলে ত সমূহ বিপদ। হঠাৎ দেখলাম গাছপালাগুলো নড়ে উঠছে, কয়েকটা হরিণ দ্রুত দৌড়ে পেড়িয়ে গেল। তাদের পেছনেই তাড়া করে এসেছে একদল ভীল যুবক। টাঙ্গি ও তীর ধনুকে সকলেই সুসজ্জিত। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। আমি হাতের ইশারা করে পথের নিশানা জানতে চাইলাম। তারা নিজেদের মধ্যে দু চারটে কথার আদান প্রদান করে তাদেরকে অনুসরণ করতে সংকেত জানাল। তাদের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। ঘন্টাখানেক এভাবে হাঁটার পর পাহাড়ের কোলে বহুদূরের সমতলভূমিতে একটা মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়ে তারা বাঁদিকের জঙ্গলপথে চলে গেল, আমিও মন্দিরের সেই ধ্বজা লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকলাম। পাহাড়ী ঢালের রাস্তা পথ যেন শেষ হতেই চায় না। কোনমতে সেই মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন সন্ধা হয় হয়। মন্দিরের চারদিকে গৌড়দের বাস, গৌড়দের নিবাস থেকে আরও দূরে ভীলদের কুটীর দেখা যাচ্ছে। মাঠে জোয়ার ও গমের গাছে ভর্তি।

জীর্ণ মন্দির, মন্দিরের মধ্যে এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ, কালোজামের মত রঙ। মন্দিরের পুরোহিত বললেন - ইহ্ হ্যায় ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেওজী। খুদ্ শংকরাচারিয়ানে ইনকো ইধর প্রতিষ্ঠা কিয়ে থে। এহি মঠ কুকুরামঠ নামসে প্রসিদ্ধ হৈ। পরিক্রমাবাসী ইধর ঠারতে হৈ। আপভি আরামসে ইধর ঠার সকতে হো। বগলমেঁ এক কুঠিয়া হ্যায়, চলিয়ে উধর আপকো সামান উমান রাখ দেগা। আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর সঙ্গে পাশের কুটীরে গিয়ে গাঁঠরী রেখে এলাম। সেখানে একটা খাটিয়াও পড়ে আছে।

জলের খুব সুব্যবস্থা - কুঁয়া আছে। কুঁয়ার জলে হাত-মুখ ধুয়ে মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গ দর্শন করে এলাম।

পুরোহিতমশাইকে বললাম - মুণ্ডমহারণ্যের ভিতর নর্মদাতে স্নান করে যাত্রা আরম্ভ করতে গিয়ে আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। দুজন ভীল যুবক আমাকে এখানে আসার রাস্তা দেখিয়ে দিল, তাদের পরনে নেংটি পায়ে চট ও তুলো মিশিয়ে একরকম জুতো, অবলুষ কাঠের মত কালো তাদের গায়ের রঙ। কিন্তু তার আগে পাঁচ-ছয়জন লোক দেখলাম যারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাদের কাঁধে তীর ধনুক এবং হাতে টাঙ্গি, তারা কারা?

তিনি উত্তর দিলেন - ওরা বাইগা। আপনি শাডোল জেলা অতিক্রম করে মান্দালা জেলায় প্রবেশ করেছেন। এই মান্দালা জেলাতে মুণ্ডমহারণ্য অঞ্চলে বাইগাদের দেখা পাওয়া যায়। এরা কোনো কাপড় পরে না, অরণ্যচারী, কৃষিকাজ করে না। পশুশিকার এবং বন্য ফলমূল এবং নানাজাতীয় লতাপাতা খেয়েই জীবনধারণ করে। এরা খুবই হিংস্র প্রকৃতির, আপনার কাছে টাকা পয়সা থাকলে লুট করে নিত। সহজাত সংস্কারবশে এরা পরিক্রমাকারীকে হিংসা করে না। এই বাইগা ছাড়া আর দুই শ্রেণীর লোক এখানে দেখতে পাবেন - গৌড় এবং ভীল। ভীলরাও হিংস্র প্রকৃতির, তারাও পশুশিকার করে, তবে তারা কৃষিকাজও শিখে নিয়েছে। গৌড়রাই ভদ্র ও শিক্ষিত। আমিও গৌড় শ্রেণীভুক্ত, আমরা রাজপুত ব্রাহ্মন, একসময় বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছিল গণ্ডোয়ানা রাজ্য,

রানী দুর্গাবতীও ছিলেন আমাদেরই শ্রেণীর। মান্দালার দুর্গ বা জব্বলপুরের মদনমহল প্রাসাদ দেখলে বুঝতে পারবেন একসময় গৌড়রা কত উন্নত ছিল; আমরা এক মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। আমরা নিজেদেরকে কখনো গৌড় বলিনা, এ নাম সনাতনী হিন্দুদের দেওয়া। আমাদের আদি নাম কৈতুর বা কোই। গৌড়ের মূল শব্দ খোণ্ড বা খোঁড় - এটি তেলেগু শব্দ, যার অর্থ পাহাড়। স্মরনাতীতকাল পূর্বে আমাদের আদি বাসভূমি ছিল বস্তারের দক্ষিণে তেলেগু অঞ্চলে। আমরা পূর্বঘাট পাহাড়ের আদিম পাহাড়ী জাতি। কালক্রমে হিন্দু জাতির সঙ্গে মিশে গেলেও আমরা এখনও পার্বত্য অঞ্চলেই বাস করতে ভালবাসি। সাধুজী, আপনি আমার 'মেহমান'। এখানে যে দুই-একদিন থাকবেন, আমিই আপনাকে ভিক্ষা দেব।

- আমি সাধু বা সন্ন্যাসী নই। বাবার হুকুমে নর্মদা পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি মাত্র। ভিক্ষা বা মাধুকরী সন্ন্যাসীর কৃত্য। পরিক্রমার নিয়মানুসারে যতক্ষন ঝোলাতে কিছু খাদ্যবস্তু থাকবে ততক্ষণ ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। আমার ঝোলায় সাগুদানা ও মিছরী আছে তাতেই আজ আমার চলে যাবে।

-পরিক্রমাবাসী মাত্রই সন্ন্যাসী। নর্মদা মায়ী না টানলে কেউ এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথে আসতে পারে না। নর্মদা মায়ী আপন ভক্তকে রক্ষা করেন। আজ রাতে আপনি সাগু খেয়েই থাকুন, কিন্তু কাল শিবজীর প্রসাদ পেতেই হবে। স্রেফ বাজরার রোটি ঔর অড়হরকী ডাল। এখানে ভক্তরা মন্দিরে পূজা দিতে এসে দের সের অড়হর ডাল দিয়ে যায়। এখানকার এই বিধি। শিবজী ঋণমুক্তেশ্বর ত, মানবজীবনে কর্মঋণ শোধ করার প্রতীক এইটি। আপনি কুঠিয়ার আগল বন্ধ করবেন, মুণ্ডমহারণ্যের কোলেই আছেন, শের ভাল্লুকা বহুত উৎপাত।

কমণ্ডলুর নর্মদা জল দর্শন ও স্পর্শ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘরে আগুন জ্বালার ব্যাবস্থা নেই, শীতের চোটে মাঝে একবার ঘুম ভাঙলেও সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য উঠে গেছে।

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম, প্রায় চার মাইল হাঁটতে হ'ল পাথর ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। স্নান করে এসে দেখলাম, মন্দিরে পূজো হয়ে গেছে। দেড় সের করে অড়হর ডাল হাতে নিয়ে বেশ কিছু ভক্তের ভীড়।

ভক্তদের ভীড় কমে যেতে আমি পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম শিবলিঙ্গের আকৃতিতে পাথরের তৈরী এক লিঙ্গের উপর একটি বড় জামফল যেন বসানো আছে। তার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গোটা শিবলিঙ্গটির রঙ করা হয়েছে। দূর থেকে একই রকম মনে হলেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে পৃথকত্ব ধরা পড়ে। আঙুল বুলিয়ে যখন দেখছি, তখন ঐ গৌড় পুরোহিত বললেন - আমরা পুরুষাণুক্রমে শুনে আসছি, ঐ ছোট আকারের কালো শিবটিই নর্মদা থেকে কুড়িয়ে এনে আচার্য শংকর এখানে স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরে আমারই কোন পূর্বপুরুষ বড় শিবলিঙ্গ তৈরী করে তার উপর শংকর সংগৃহীত শিবকে বসিয়ে দিয়েছেন। ছোট শিবলিঙ্গ দেখে বা পূজা করে এখানকার অশিক্ষিত আদিবাসীদের মন কি ভরে !

আমি বললাম - আচার্য শংকর যেটি নর্মদা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন সেটি মহাশক্তিধর বানলিঙ্গ।

- ক্যায়সে মালুম হুয়া ?

আমি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা থেকে শোনালাম -

প্রশস্তং নর্মদা লিঙ্গ পক্ক জম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্ ॥
হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়ং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংশ্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্মদাজলে ॥
পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্মদাতটে।
অবিবশং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহপজ্জিগতীতলে ॥
অন্যেষাং কোটি লিঙ্গাণাং পূজনে যতফলং লভেৎ।
তৎফলং লভতে মর্ত্যে বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ ॥

স্বয়ং মহেশ্বর, দেবীকে বলেছিলেন যে - বাণাসুরের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছিলাম যে পর্বত ও নর্মদা জলের বিঘুর্ণন ও বিঘর্ষণে আমি লিঙ্গরূপে সতত নর্মদার জলে বিরাজমান থাকব। শত সহস্র লিঙ্গের মধ্যে যেগুলির আকৃতি পাকা জাম বা হংস ডিম্বের মত হবে, বর্ণ হবে পাকা জামের মত কিংবা মধুবর্ণ, শ্বেত, নীল ও মরকতের মত দ্যুতিসম্পন্ন, সেইগুলিকে আমার বাণলিঙ্গরূপ বলে জানবে। এ মন্দিরে হংসডিম্বাকৃতি বাণলিঙ্গ স্থাপনই প্রশস্ত। অন্যান্য কোটি কোটি লিঙ্গ পূজার যা ফল, একটি বাণলিঙ্গ পূজা করলে তার সমস্ত সুফলই পাওয়া যায়।

পুরোহিত বললেন - আমি পুরাণের গল্প শুনেছি, আমাদের এই নর্মদা তীর্থেই ছিল বলিরাজার পুত্র বাণাসুরের সাম্রাজ্য। সাতপুরা পর্বতের শিখরদেশে ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর কন্যা উষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেম জন্মে। অনিরুদ্ধ উষাকে অপহরণ করতে এলে বাণাসুর তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করে অনিরুদ্ধকে মুক্ত করেন এবং উষার সঙ্গে অনিরুদ্ধর বিবাহ দিয়ে দ্বারকাতে নিয়ে যান।

আচ্ছা, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন, আমাদের এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ কোন যোনিপীঠের উপর স্থাপিত নাই। শুনেছি শংকরাচার্য স্বয়ং ঐ পাথরের বেদী স্থাপন করে গেছেন। এইজন্য অনেক পরিক্রমাবাসী এই নিয়ে সমালোচনা করে থাকেন।

আমি বললাম - জ্ঞানগুরু শংকরাচার্য কোন ভুল করেন নি। যদি বাণলিঙ্গ হয়, যোনিপীঠ ছাড়াও বেদীর উপরেও তা স্থাপন করা চলে। নর্মদাতে প্রাপ্ত এই শিবলিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলে চিনতে আচার্যের বিন্দুমাত্র ভুল হয় নি। তাই তিনি পাথরের বেদীর উপর স্থাপন করে গেছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন হচ্ছে -

তাম্রী বা স্ফটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্তব্য তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ ॥
প্রত্যহং যোঽর্চয়েল্লিঙ্গং নর্মদা ভক্তিভাবতঃ।
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥

তামা, স্ফটিক, স্বর্ণ, প্রস্তর বা রৌপ্য দিয়ে নির্মিত যোনিপীঠও যেমন বাণলিঙ্গের আধার, বেদীও তেমনি প্রশস্ত আধার। প্রতিদিন যে নর্মদা-জাত বাণলিঙ্গের অর্চনা করে, ঐহিক সম্পদের কথা আর কি বলব, সুদুর্লভ মুক্তিও তার করতলগত হয়।

বিশালধী এবং বিশাল হৃদয় আচার্য এতদঞ্চলের অধিবাসীদের কল্যানের জন্যই এই বাণলিঙ্গ স্থাপন করে গেছেন। যেসব পরিক্রমাবাসী বেদীতে স্থাপন করা নিয়ে আচার্যের প্রতি কটাক্ষ করেন, তাঁরা ভুল করেন।

বলাবাহুল্য, আমার কথা শুনে পুরোহিতমশাই খুব খুশীই হলেন। দুপুরে রুটি, অড়হর ডাল এবং খোয়া দিয়ে শিবের প্রসাদ পাওয়া গেল।

বিকেলে তিনি তাঁর 'ঘর-গৃহস্থী' দেখানোর জন্য বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দু-তিনটি কুটীর নিয়ে তাঁর বাস। স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুটি কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। এতদঞ্চলের মধ্যে তাঁকে এক সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই মনে হল। সন্ধ্যার সময় খাটিয়াতে বসে গল্প করতে করতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - পূজার সময় শুনি, আপনি বারবার বলেন 'সিদ্ধিনাথায় নমঃ'। সিদ্ধিনাথ শিবের বিশেষন - না - এখানকার শিবের নাম সিদ্ধিনাথ ?

-শংকরাচারিয়া ইনকো নাম দিয়া থা সিদ্ধিনাথ।

- তবে ঋণমুক্তেশ্বর বা কুকুরামঠ বলা হয় কেন ?

পুরোহিতজী বলে চলেছেন - শ সালকী পুরাণী এক কহানী হ্যায়। আমাদের এই নর্মদাতটে গৌড় ভীল বাইগা ছাড়াও বাঞ্জারা নামে আর এক উপজাতির লোককে দেখা যায়। তারা ভবঘুরে, কোথাও ডেরা বাঁধে না। পশুপালক যাযাবর জাতি। গরু এবং ভেড়ার পাল নিয়ে তারা মহারণ্যের ধারে ধারে, বিশেষত যেখানে প্রচুর ঘাস জন্মে, সেইসব স্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা বুনো কুকুরকে পোষ মানায়। সেইসব প্রভুভক্ত কুকুররাই মাঠে তাদের গরু ভেড়াকে পাহারা দেয়। স্ত্রী-পুত্র পরিবার তাদের সঙ্গেই থাকে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই তাদের প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে। তাদের মেয়েরা গরু ভেড়ার দুধ থেকে খোয়া তৈরি করে, দুধ ও খোয়া বেচেই তারা গম, যব, জোয়ার কেনে রুটির জন্য। চাষবাসের কাজ তারা জানে না, করেও না। যেমনই সাদামাটা তাদের জীবন, মনটাও তেমনই সাদামাটা। মিথ্যাচার বা বেইমানি - তারা জানে না। একবার ঘুরতে ঘুরতে একদল বাঞ্জারা তাদের গরু ভেড়া ও কুকুরের পাল নিয়ে এখানে এসে ডেরা বাঁধে। বাঞ্জারাদের যে প্রধান, তার ঐ সময় কিছু টাকার প্রয়জন হয়। সে এখানে কোথাও টাকা না পেয়ে এখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দুরের এক মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে যায়।

- মহাজন তাকে বলে - তোমরা ত যাযাবর, কোথাও তোমাদের স্থায়ী আস্তানা নেই।
কোন ভরসায় তোমাকে টাকা দেব ?

বাঞ্জারা সর্দার তখন তার সবচেয়ে প্রিয় বাঘা কুকুরটিকে তার কাছে বন্ধক রেখে বলল, বর্ষাকাল কেটে গেলে দুধ ও খোয়া বেচে দু-তিন মাসের মধ্যেই সুদসহ তোমার টাকা ফেরৎ দিয়ে কুকুরটাকে আমি ফেরৎ নিয়ে যাব। আমার এই বাঘা বাঘের সাথেও মহড়া নিতে পারে। ও যতক্ষণ থাকবে ততক্ষন চোর-ডাকুর সাধ্য নেই তোমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঢোকে।

যাইহোক মহাজন তাকে টাকা ধার দেয়, টাকা নিয়ে আসার সময় সর্দার কুকুরটিকে আদর করে বলে
- প্রাণ দিয়েও এর বাড়ীঘর পাহারা দিবি, টাকা শোধ দিয়েই তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

কিছুদিন পরে কুকুরটাকে গোপনে কোন লতাপাতার রস খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে ডাকাত এসে রাতের বেলা মহাজনের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে গেল। সোনারূপা ও টাকার শোকে মহাজন হাহাকার করতে থাকল। ভোরে কুকুরটার ঘুম ভাঙল, পরিবারস্থ নারী পুরুষের কান্না কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষন, তারপরেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেই ঘরের মধ্যে ঢুকে এটা ওটা শুঁকতে লাগল, তারপরেই মহাজনের কাপড় ধরে টানাটানি করে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কুকুরের সংকেত বুঝতে পেরে মহাজন এবং আরো কিছু স্থানীয় লোক কুকুরটাকে অনুসরণ করল। কুকুরটা দৌড়াতে লাগল। একবার মাটি শোঁকে, একবার দৌড়ায়, এইভাবে অনেকটা দূর গিয়ে কুকুরটা একটা বড় শাল গাছের গোড়ায় পায়ে করে মাটি আঁচড়াতে লাগল। সেখানকার মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল মহাজনের সমস্ত সোনারূপো ও টাকার থলি।

মহাজনের আনন্দের সীমা নেই। কুকুর ও তার মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে উঠল। সে সমস্ত ঘটনা একটা চিঠিতে লিখে তা কুকুরটার গলায় ছোট্ট করে মুড়ে বেঁধে দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলল - বাঘা তোর মালিকের কাছে ফিরে যা। তোকে আমি মুক্তি দিলাম।

এদিকে বাঞ্জারা সর্দার বাঘাকে ফিরে আসতে দেখে রাগে জ্বলে উঠল। ভাবল তার কুকুর মহাজনের সঙ্গে বেইমানী করেছে, কথার খেলাপ করেছে। সরল আদিবাসীদের কাছে বেইমানীর কোন ক্ষমা নেই। হাতের কাছে একটা বর্শা ছিল, সে ছুঁড়ে মারল বাঘার দিকে। রক্তাক্ত দেহে বাঘা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর সর্দারের নজর পড়ল গলার চিঠিটার দিকে। খুলে পড়ল, মহাজন লিখেছে - তোমার কুকুরের জন্যই চোরের কবল থেকে আমার লুণ্ঠিত সোনাদানা ফিরে পেয়েছি। তোমার সমূহ টাকা সুদসহ পরিশোধ হয়ে গেল। কুকুরটাকে মুক্তি দিয়েছি।

চিঠি পড়ে সর্দার কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। এইখানে এই মন্দিরের কাছে সে তার কুকুরকে কবর দিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত কাঁদতে কাঁদতে শোকে সর্দার অসুস্থ হয়ে প্রিয় কুকুরের কবর আঁকড়ে পড়ে রইল। যে কটা দিন বাঁচল সে শিবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদত আর বলত - ঠাকুর, আমার কুকুর প্রাণ দিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করে গেছে। সর্দার অল্পদিন পরেই মারা গেল।

বাঞ্জারারা চলে গেল এখান থেকে, কিন্তু এই কাহিনী বাঞ্জারাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তারা দলে দলে এসে ঐ শিবের উপর আর কুকুরের কবরের উপর ফুল চাপাতে লাগল। এখনও বাঞ্জারারা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এলেই এই মন্দিরে পূজা দেয়। এটা তাদের মধ্যে রেওয়াজ হয়ে গেছে। সেই থেকে এই মন্দিরের শিবের নাম হয়েছে ঋণমুক্তেশ্বর। আর ইমানদার প্রভুভক্ত কুকুরের নামানুসারে এই মঠের নাম হয়েছে - কুকুরামঠ।

কুকুরামঠে দুদিন থেকে বিদায় চাইলাম পুরোহিতমশাইয়ের কাছে। তাঁর আতিথেয়তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে পথের কিছু নির্দেশ চাইলাম। তিনি বললেন - এখান থেকে আঠের মাইল কোণাকুণি পার্বত্য পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে ডিনডোরিতে পৌঁছোতে পারবেন, সেখানে বাস রাস্তা সবেমাত্র খোয়া ও পাথর ফেলে তৈরী হয়েছে। যদি বাস চালু হয়ে থাকে তবে সেখান থেকে চাবি ও রামনগর পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন। সেখান থেকে মানোট, মানোট থেকে আঠের মাইল দূরে নর্মদার উত্তরতটে মান্দালা। মান্দালা পৌঁছতে পারলেই আপনি জানবেন মুণ্ডমহারণ্যের ভয়ঙ্কর দুর্গম জঙ্গল আপনি অতিক্রম করলেন। ডিনডোরী এখন শহর হয়ে উঠছে। কিন্তু ডিনডোরী তো নর্মদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আপনি উত্তরতট দিয়ে নর্মদা পরিক্রমা করছেন। বাস রাস্তা দিয়ে গেলে নর্মদাকে চোখে দেখতে পাবেন না। নর্মদাকে আড়াল করে রেখেছে বিন্ধ্য পর্বতের নীলাভ ধূসর প্রাচীর। এটা পরিক্রমাবাসীদের পথ নয়, আপনি আজকের দিনটা মঠে থেকে যান।

আজ আমার কিছু জরুরী কাজ আছে। কাল ভোরেই আমি আপনাকে পরিক্রমাবাসীদের পথ চিনিয়ে কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসব। সেই পথ দিয়ে গেলে আপনি সহজেই মুণ্ডমহারণ্যের মধ্যে নর্মদাতটে পরাশর তীর্থে পৌঁছে যাবেন, এতদিন ধরে মুণ্ডমহারণ্যের যে ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, এরপর দেখবেন মুণ্ডমহারণ্যের শতগুন বেশী ভয়ঙ্করী রূপ, পদে পদে বিপদের ভয়াবহতা বেড়ে যাবে।

তা হোক, নর্মদা পরিক্রমার এ ঝুঁকি নিতেই হবে। সাধু - মহাত্মাদের মুখে শুনেছি নর্মদা পরিক্রমা স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধনার পথ। কবীর বলে গেছেন - গগন দামামা বাজিয়া পড়্যা নিশানৈ ঘাব, অর্থাৎ সাধন জগতে প্রবেশ করেই শোনা গেল আকাশে ডঙ্কা বাজছে, বাজছে গম্ভীর রণ-দামামা, তারই তালে তালে মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

কবীর নিজ ঘর পরেমকা মাগর অগম অগাধ।
সীস উতারি পগ তলি ধরৈ তব নিকটি প্রেমকা স্বাদ॥

সাধনার পথ অতি দুর্গম ও অগাধ। তবু সাধকের দল এই পথে চলতে কখনও ভীত হন নি। নর্মদা পরিক্রমার পথে যাঁরা আসবেন তাঁদেরকে অশেষ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করতে হয়। প্রেমের ঘরে পৌঁছতে হলে অগম্য অগাধ পথে চলতেই হবে। যে আপন মাথা মা নর্মদার চরণতলে ডালি দিতে পারে সেই পায় প্রেমের স্বাদ।

অগত্যা কি আর করি। সেদিন থেকেই গেলাম। বেলা তিনটা নাগাদ এক পরিক্রমাবাসী মহাত্মা মঠে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই নিজের জিনিষপত্র মন্দিরের বারান্দায় ফেলে রেখে মন্দিরে ঢুকে কমণ্ডলুর জলে ঋণমুক্তেশ্বরের পূজা করলেন, পূজা করে একটা শুধু ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গাঁয়ের দিকে মাধুকরীতে। ঘন্টাখানিক পরে, ফিরে এসেই রুটি পাকাতে বসলেন। পুরোহিতমশাই কিছু কাঠ এনে আগুন ধরিয়ে দিলেন। বেলুন, চাকি ও দুটো থালা এনে দিলেন। এতক্ষণ তিনি কথা বলেন নি, এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন

- আপ্ পরিক্রমাবাসী বা? হমারা সাথ ভোজন করেঙ্গে?

পুরোহিতমশাই জানালেন - ইনকো লিয়ে ভোজনকা প্রবন্ধ হম কর চুকা।

- বহুত আচ্ছা।

আমি তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। মুখে নিরন্তর রেবা জপ্ করছেন। রুটি তৈরী পর্বও চলছে।
হাতমে কাম, মুহমেঁ রাম।

সন্ধ্যার পর নর্মদা মায়ীর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করেই ভোজন পর্ব শেষ করলেন। বিছানা পেতে গঞ্জিকা সেবনে তৎপর হলেন। পুরোহিতমশাইও দেখলাম ঐ রসের রসিক। তিনিও প্রসাদ পেলেন। উভয়েরই বয়স বছর পঞ্চাশেক বলে মনে হল। গাঁজায় দম্ দিতে দিতেই পরেরদিন ভোরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমার পথে যাবেন আশ্বাস দিলেন। শেষ সুখটান দিয়ে নাকে-মুখে ধুম্রজাল উদগীরণ করতে করতেই সাধু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন -

বড়ী খুশীসে আপকো সাথমে লে চলুঙ্গা। হম্ ভি পরাশর তীর্থকী তরফ্ যাত্রা করেঙ্গে।

পরের পর্ব খুবই ছোট, গাঁজা পর্ব শেষ করেই শয্যায় শয়ন করলেন কম্বল মুড়ি দিয়ে, তারপরেই নাসিকা গর্জন।

সকালে উঠেই সাধু যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, আমিও গাঁঠরী পিঠে ঝুলিয়ে পুরোহিতমশাই-এর সঙ্গে দেখা করে এসে তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। যাত্রা শুরু হল। প্রায় দু ঘন্টা হাঁটলাম পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের জঙ্গল। একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে, সামনেই বিন্ধ্য পর্বতের ঢাল। একটা গাছের গোড়ায় গাঁঠরী ফেলে সাধু দ্রুত জঙ্গলের আড়ালে গেলেন। বুঝলাম পায়খানা করতে গেলেন। প্রায় আধঘন্টা বাদে ফিরে এলেন, শৌচাদি সেরে। আরও ঘন্টাখানিক চলার পরি সাধু পুনরায় গাঁঠরী ফেলে বনের দিকে ছুটলেন। সৌচাদি সেরে এসে বললেন - পেটমেঁ গড়বড়ি হুয়া।

এই তিনঘন্টা পরে তাঁকে কথা বলতে দেখা গেল। নতুবা অহরহ দেখছি তাঁর ঠোঁট নড়ছে, বোধহয় অনবরত তিনি রেবা মন্ত্র জপ্ করছেন। হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে একটা সংকীর্ণ রাস্তার চিহ্ন ধরে আরো তারাতারি হাঁটতে লাগলেন। আমিও চলার বেগ বাড়ালাম। ঘন্টাখানেক চলার পর দেখলাম, কাঁটালতা জড়ানো একটা আবলুস গাছের কিনার দিয়ে তৃণহীন প্রস্তর টিলার গা দিয়ে একটি ঝরণা নেমে এসেছে, পথ পার হয়ে নেমে গেছে ওপারের প্রস্তরাকীর্ণ সমতলক্ষেত্রর দিকে। ঝরণার পাশ দিয়ে সাবধানে পেছল পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে একস্থানে পৌঁছে সঙ্গী সাধু দূরে পর্বতের গা ঘেঁষে পতপত করে ওড়া ধ্বজা দেখিয়ে বললেন -

ওহি মঠমেঁ হমলোগ আজ ঠারেঙ্গে। হমারা তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায়।

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে সেই মঠে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা হয়তো বারটা বাজে।

মঠ বলতে একটি ছোট্ট একতলা পাথরের বাড়ী, একখানা বড় ঘর, একটি বারান্দা। বাড়ীর পেছনে পরচালা নামিয়ে আর একটি ঘর, সেইটি মঠের ভাঁড়ার ঘর, তার ভার যাঁর উপর তাকে বলা হয় কোঠারী। আরও তিনটি আলাদা কুটীর আছে, পরিক্রমাবাসীদের থাকার জন্য মঠবাড়ীতে পৌঁছেই সঙ্গী সাধুজী আওয়াজ দিলেন - 'হর নর্মদে হর'। শশব্যস্তে কোঠারী দৌড়ে এলেন, দুখানা কুটীর খুলে দিলেন। সাধু একটি কুটীর দখল করেই তাঁর ঝোলা হাতড়ে কিছু জড়ি-বুটি বের করে খেয়েই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আর একটি কুটীরে নিজের গাঁঠরী রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এই ভেবে স্বস্তিবোধ করলাম যে গঞ্জিকাসেবী সাধুর সঙ্গে একঘরে থাকতে হবে না।

মঠ-বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখলাম - মার্বল পাথর দিয়ে তৈরী এক তপস্বিনী মূর্তি - মূর্তির সম্মুখভাগে বিরাট পাথরের কুণ্ড ছাই-এ ঢাকা। কোঠারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বদৃষ্ট পর্বতগাত্রস্থিত ঝরণায় স্নান করাতে নিয়ে চললেন। বললেন - আপনি 'বদরপাচন' তীর্থে এসে পৌঁচেছেন, ভরদ্বাজ কন্যা শ্রুবাবতীর তপস্যাস্থল। আমাদের এখানে পরিক্রমাবাসী সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা আছে। এতদঞ্চলের কৃষিজীবী গোঁড় এবং ভীলদের কাছ হতে গম যব বাজরা ভেটস্বরূপ আসে পরিক্রমাবাসীদের ভাণ্ডারার জন্য। শ্রুবাবতীর তপস্যার প্রভাবে কামগামিনী নর্মদা পর্বত-কন্দর ভেদ করে ঝরণারূপে এখানে ঝরে পড়ছে। বিকেলে আপনাকে এই মঠের পূর্ণ বৃত্তান্ত শোনাব।

স্নান করে মঠ বাড়ীতে পৌঁচেছি এমন সময় একটা ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। ব্যস্ত হয়ে কোঠারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে মঠ বাড়ীর উত্তরদিকে চললেন। বড় বড় গাছের সারি এবং লতাগুল্মের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরেই দেখলাম পাথরের আর একটি একতলা বাড়ী, প্রায় একশ গজ লম্বা। তার পাঁচ ভাগের এক ভাগে ছোট ছোট তিনটি গুহার মত ঘর, আর বাকী অংশে গম যব ডাল বাজরা রাখবার জন্য পৃথক পৃথক ভাগ। ঠিক একটি ব্যারাকবাড়ীর মত দেখতে। রান্না করার জন্য আলাদা লম্বা ঘরও ঐ অংশে আছে।

দেখতে পেলাম, গেরুয়াধারী তিনজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাকেও শালপাতায় ডাল রুটি শব্জী এবং দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে, 'হর নর্মদে হর, শ্রুবাবত্যৈ নমো নমঃ' বলে সব ভোজনে বসা হল। খাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীটি বললেন - বিকেলে আলাপ করব।

বেলা প্রায় চারটায় কোঠারী আমাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে চললেন। গাছের সারি পেরিয়েই দেখলাম, চারজন ভীল বালক একপাল গরু নিয়ে ব্যারাকবাড়ীর কাছে এসেছে। গরু-বাছুর মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটি।

তিনজন সন্ন্যাসীই বসে আছেন, সকলেই জপ্ করছেন 'রেবা রেবা'। এখন কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা ভাবছি, এমন সময় সেই বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুটি হেসে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন কুশাসনে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - এত অল্প বয়সে নর্মদাতীরে তপস্যা করতে এসেছ, তোমাকে দেখে খুশী হলাম।

আমি বললাম - তপস্যা করতে আসিনি। বাবার আদেশ ছিল অমরকণ্টক থেকে সমুদ্র-সংগম পর্যন্ত নর্মদা পরিক্রমা করতে হবে, তাই এসেছি।

- পিতার আদেশ পালনই তো তপস্যা, শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এতে নর্মদা এবং নর্মদেশ্বর উভয়েই তুষ্ট হবেন। পিতা হি পরমং তপঃ।

বললাম - সন্ন্যাসীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নেই, অথচ আপনাদের বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করছে।

তিনি বললেন - তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পার। আচার্য শংকর প্রতিষ্ঠিত গিরি, পুরী, বন, পর্বত, অরণ্য, ব্রহ্মচারী, ভারতী, তীর্থ, আশ্রম এবং সরস্বতী - আমরা এই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত নই। গেরুয়া শংকরাচার্যের একচেটিয়া সম্পত্তি বা তার নিজস্ব ধন নয়। বৈদিক ভারতের আবিস্কার এই গৈরিক বস্ত্র - ত্যাগ ও তপস্যার প্রতীক। শংকরাচার্যের সময়ের বহু বহু পূর্বেও বৈদিক ঋষিরা গেরুয়া বস্ত্র পরতেন। ব্রহ্মচর্য এবং গার্হস্ত অন্তে বৈদিক ঋষিরা কেবল তপস্যাকেই যখন মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতেন, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গেরুয়া পরতেন। আমরা শংকর পন্থী নই, শ্রুবাবতী পন্থী। আমার নাম শ্রুবানন্দ, দ্বিতীয় জনের নাম নর্মদানন্দ এবং ঐ যে তৃতীয়জন বসে আছেন, ওঁর নাম অনীহানন্দ শ্রুবাবতী। এই মঠের কার্যাধ্যক্ষের নাম সবসময় হবে শ্রুবানন্দ। আমার পূর্বেও অনেক শ্রুবানন্দ ছিলেন, পরেও অনেক শ্রুবানন্দ হবেন।

এমন সময় কোঠারী আমাকে বললেন - আমার সামনে যে তিনজন বসে আছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স শতাধিক।

মহাত্মা শ্রুবানন্দ আমাকে প্রশ্ন করলেন - তুমি শ্রুবাবতীর উপাখ্যান জান ? তাঁর নাম কোনদিন শুনেছ ? তোমার সঙ্গে যে সাধু এসেছেন, তিনিও কি তোমাকে কিছু বলেন নি ?

আমি বললাম - আসার পথে সাধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই তিনি কিছু বলতে পারেন নি, তাছাড়া সাধুজী খুব স্বল্পভাষী, আপনি দয়া করে বলুন।

তিনি বলে চললেন - ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা শ্রুবাবতী 'স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হোন' - এই কামনা করে কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এইখানে এই মুণ্ডমহারণ্যের কোলে তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন -

তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা।
ভর্ত্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভাবিনী॥

কোন অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য আজকাল মানুষ নানা উপায় অন্বেষণ করে, নানারকম উদ্যোগ চেষ্টা এবং তদবির করে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরা তপস্যাকেই সর্ববস্তু প্রাপ্তির মূল উপায় বলে জানতেন। ঐহিক ধনসম্পত্তি, পুত্র-কন্যা লাভ, মনোমত পতি, স্বর্গলাভ, শত্রুজয়, রোগমুক্তি সব বিষয়ে তপস্যাকেই তাঁরা অমোঘ বলে মানতেন।

ঋষিকন্যা শ্রুবাবতীও তাই ইন্দ্রকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যার পথ বেছে নেন। বহু বৎসর কেটে গেল। অবশেষে দেবরাজের টনক নড়ল। তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করে এইখানে শ্রুবাবতীর তপস্যাস্থলে এসে পৌঁছুলেন। তখন শ্রুবাবতী পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করে ঋষির ছদ্মবেশে সমাগত ইন্দ্রকে বললেন- ঋষিবর! আপনি আমার অতিথি, আমার শক্তি অনুসারে আমার যা কিছু বস্তু আছে, চাইলে তৎসমুদয়ই আপনাকে দিতে পারব, ইন্দ্রের প্রতি প্রেমবশতঃ কেবল পাণি দিতে পারব না, অর্থাৎ আপনি আমাকে বিবাহ করতে পারবেন না।

সর্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত !
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন॥

ছদ্মবেশী ইন্দ্র শ্রুবাবতীর নিষ্ঠা এবং পাতিব্রত্য দেখে তুষ্ট হলেন বটে তবুও ধরা দিলেন না। বললেন - বৃহৎ বস্তু পেতে হলে বৃহৎ তপস্যা এবং কৃচ্ছসাধন প্রয়োজন। তুমি তপস্যায় লেগে থাক। আমি পাঁচটি বদরীফল দিয়ে যাচ্ছি। এগুলি পাক করতে থাক। এগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলেই তোমার তপস্যাতে সিদ্ধি আসবে, ইন্দ্রের দর্শন পাবে। স্বর্গে যেসব দিব্যস্থান আছে, তপস্যা দ্বারা সে সমস্তই লাভ করতে পারা যায়। তপস্যার ফলে মহাসুখ হয় -

যানি স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে !
তপস্যা তানি প্রাপ্যানি তপোমূলং মহৎসুখম্॥

শ্রুবাবতী মহানন্দে উনুন জ্বেলে একটি পাত্রের মধ্যে সেই পাঁচটি বদরীফল পাক করতে লেগে পড়লেন। ইন্দ্র আপন শক্তি দ্বারা ঐ ফলগুলিকে অপাকযোগ্য করেছিলেন শ্রুবাবতীকে পরীক্ষা করার জন্য। তাই যুগ যুগ কেটে গেল। দিনরাত আগুনে সিদ্ধ করেও তিনি বদরীফল নরম করতেই পারলেন না। সংগৃহীত সমূহ কাঠ নিঃশেষ হয়ে গেল। উপায় না দেখে শ্রুবাবতী নিজের পা দুটিই উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। একটু একটু করে পা দুটো যতই দগ্ধ হতে থাকল, তিনি ততই আরও বেশি করে পা দুটো জ্বলন্ত আগুনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন - দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদৌ উপবর্তয়ত অনঘা।

পা দুটো সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেল, তথাপি তাঁর মুখে চোখে কোন বিকৃতি বা যন্ত্রনার চিহ্ন ফুটে উঠল না, মনে তাঁর দৃঢ় সংকল্প, বশিষ্ঠের দেয়া বদরীফল সিদ্ধ করতেই হবে।

ইন্দ্র শ্রুবাবতীর এই ঘোরতর উগ্র তপস্যা এবং ব্রাহ্মীস্থিতির চেয়েও উচ্চতর অবস্থা দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি স্বরূপে দেখা দিয়ে বললেন - তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে,

মৃত্যুর পর তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে বাস করবে -
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে। ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি।

আজ থেকে এই স্থান সর্বপাপহর 'বদরপাচন' নামের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হল।

আমি বললাম - আহা! দেবতার কি দয়া! এত উগ্রতম তপস্যার ফলশ্রুতি, মৃত্যুর পর শ্রুবাবতী স্বর্গে যাবেন। এতো দেখছি পর্বতের মুষিক প্রসব ! তাছাড়া কোন তপস্বী বা তপস্বিনী দুর্লভ ঈশ্বর-সাযুজ্য বা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা না করে কোন দেবকন্যা বা দেবতাকে পত্নী বা পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করছেন, এদৃশ্য হাস্যকর !

মহাত্মা শ্রুবানন্দের চোখে মুখে ক্রোধের আভাস দেখলাম। তিনি তাঁর স্বরগ্রাম উচ্চে উঠিয়েই বললেন - উমা শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, একথা কি তুমি শোন নি ?

শুনেছি এবং পড়েছিও। আপনার কাছে তপস্বিনী শ্রুবাবতীর কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে পড়েছে, মহাভারতে বদরপাচন তীর্থের কথা আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে বলরাম সেখানে ছিলেন। পূর্বকালে অরুন্ধতী সেখানে তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু বেদব্যাসের উক্তি অনুসারে সেত হিমালয়ে।
নর্মদাতটে 'বদরপাচন' তীর্থ একথা মহাভারতে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি।

মহাত্মা শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন - মহাভারতের মূল অংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিসন্ধিতে কতবার যে সংযোজিত বিবর্ধিত হয়েছে, কত শ্লোক বাদ দিয়ে কত নূতন শ্লোকের প্রক্ষেপ ঘটেছে, তার হিসাব বা সন্ধান তুমি জান কি ? কিন্তু আমাদের শ্রৌতধারা হাজার হাজার বছর ধরে গুরুপরম্পরা অবিকৃতভাবেই চলে আসছে। কত শত শ্রুবানন্দ এলেন আর গেলেন, শ্রুবাবতীর সেই ধূনি অর্থাৎ বদরপাচনের অগ্নিকুণ্ড আজও অনির্বান। তুমি ত বিশ্বাস করতেই পারবে না যে বিনা কাষ্ঠে ঐ ধূনি জ্বলছে। ঐ ধূনি কখনও নেভে না। আমাদের গুরুদেব পূর্ববর্তী আচার্য শ্রুবানন্দের আমলে এই নর্মদাতীরে একবার তিনদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি এবং সাইক্লোন হয়েছিল, ঐ পাথরের মঠবাড়ী সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।
তবুও ঐ বদরপাচন কুণ্ডের ধূনি নিভে যায়নি। এই বৃদ্ধ বয়সে সারাজীবন নর্মদাশ্রয়ী হয়ে, নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে কোন মিথ্যাচার করছি না। আমরা বেদপন্থী, নিত্য অগ্নিসেবা এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই আমাদের তপস্যা।

আর কোন তর্ক করলাম না। মঠে সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে, সূর্য অস্তমিত। তিনজন সন্ন্যাসীই মঠবারীতে এলেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে এলাম। আমার সঙ্গী সেই সাধুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

তিনি চুপিচুপি বললেন - ভবিষৎ আচ্ছা হো গঙ্গী। কাল সবেরে যাত্রা করেঙ্গে।

বিচিত্র আরতি। কোন ধূপ ধূনা নেই, পঞ্চপ্রদীপ নেই, কোন কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি নেই। তিনজন মহাত্মা ধীরে ধীরে মন্দিরে ঢুকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সকালে যেমন দেখেছিলাম এখনও তাই, কুণ্ডের মধ্যে শুধু সাদা ছাই। শ্রুবাবতীর মূর্তিতে প্রণাম করতে গিয়ে শুধু কুণ্ডের তাপ অনুভব করেছিলাম। বুঝেছিলাম কুণ্ডের মধ্যে আগুন আছে ছাই চাপা ।

মহাত্মারা প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দুহাত তুলে উদাত্তকণ্ঠে আরম্ভ করলেন -

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১/১২/১)

দীর্ঘ স্তব। বেদমন্ত্রের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য - সুর, ছন্দ ও স্বরের ঐক্যতানে শুধু মন্দিরের ভেতর নয়, সমস্ত মুণ্ডমহারণ্যই যেন গমগম করছে। কুণ্ডের ছাই চাপা আগুন ধীরে ধীরে উদ্দীপিত হয়ে ধক্ করে জ্বলে উঠল। অপূর্ব সুগন্ধে ভরে উঠল চারিদিক। তাঁরা আবার প্রণাম করে তাঁদের গুহার দিকে চলে গেলেন।

কোথা থেকে এল এত সুগন্ধি! কোথা থেকেই বা এই আগুন বিনা বাতাসে বিনা চেষ্টায় হঠাৎ জ্বলে উঠল! সঙ্গী সাধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন - বেদমন্ত্রকী প্রভাও সে এ্যায়সা হোতাই হৈ।

যে যার কুটীরে গিয়ে ঢুকলাম কোঠারী এসে আমাদেরকে দুধ ও খোয়া দিয়ে গেলেন। আহারান্তে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছিল না। সন্ধারতির অভিনবত্ব আমার মনকে আপ্লুত করে রেখেছে। শ্রুবানন্দজীর তপোশক্তির কথাই ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমাদের ঋষি সেবিত ভারতবর্ষের কোথায় কি আছে, আমরা তার কতটুকু বা জানি ? শাস্ত্রমুখে বর্ণিত তত্ত্ব ছাড়াও আরও কত তত্ত্ব ও রহস্য যে অব্যাহত ধারায় গুরুপরম্পরারূপে আমাদের দেশে গুপ্ত অবস্থায় পরে আছে, কতজনই বা তার খবর রাখে ! সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে শ্রুবাবতীর উপাখ্যান বিষয়ে তপস্বী শ্রুবানন্দজীর সঙ্গে তর্ক না করলেই ভাল ছিল। তাঁকে যেভাবে প্রশ্ন করেছিলাম, সেটাকে পরিপ্রশ্ন বলা চলে না। মন অনুশোচনায় ভরে গেল।

হঠাৎ মুণ্ডমহারণ্যের মধ্য থেকে এক বিকট গর্জন ভেসে এল, গুম্ গুম্ ধ্বনিতে সমগ্র পাহাড় এমনকি মন্দিরের তলদেশ পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে আমার বিছানার নিচেও গুম্ গুম্ করে আওয়াজ হচ্ছে। ভয় পেয়ে উঠে বসলাম।

পাশের কুটীর থেকে সাধুজী সাড়া দিলেন

- কোই ডর নেহি, মুড়িয়া মহারণমেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ।

তাঁর সারা পাবার পর আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এরপর কখন যে ঘুম চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি। ঘুমের মধ্যে দেখেছি, আমি মুণ্ডমহারণ্যের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, নর্মদার জল সূর্যকিরণে ঝিকমিক করছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাজ্জা, শালাই, শাল, প্রভৃতি বড় বড় গাছগুলো ক্রমশ বড় হয়ে আকাশ স্পর্শ করল। চোখের নিমেষে তাদের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। মনে হ'ল সেগুলো গাছ নয়, লম্বা লম্বা পা ফেলে কতগুলো দীর্ঘদেহী দৈত্য আমাকে ধরতে আসছে। একটা বিরাট বাঘও আমার পেছনেই দ্রুত তাড়া করে আসছে।

'বাবা বাবাগো বাঁচাও...'

বাবা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। দৈত্য বাঘ যত ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল সব সাথে সাথে মিলিয়ে গেল। বাবা আমাকে বললেন - মহাত্মা শংকরনাথ তোকে বলেছিলেন - তর্কবুদ্ধি ছাড়। মহাত্মা শ্রুবানন্দজীর সঙ্গে তাঁদের ধারনা ও বিশ্বাস নিয়ে তর্ক করা উচিত হয় নি। ভাগবত পথে যাত্রা করার ব্রত যে নিয়েছে, তার পক্ষে বিতণ্ডা করা অশোভন। ব্রত পালন সম্পূর্ণ করতে হলে চাই নিষ্ঠা, চাই শ্রদ্ধা। আমি কি তোকে শিখাইনি শুক্ল যজুর্বেদের সেই (১৯/৩০) মন্ত্র যেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে -

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥

অর্থাৎ ব্রতের পথে আসে দীক্ষা, অটুট বিনম্র চিত্তে ব্রতচারণ করতে পারলে তবেই আধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ ঘটে। দিক্ষা দেয় দাক্ষিণ্য - আধ্যাত্ম সুষমা ও মাধুর্য। দক্ষিণায় জাগে আস্তিক্য বুদ্ধি, জাগে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই পরিণতি লাভ করে সত্যলাভে। সত্যই জ্ঞান, সত্যই পরম ব্রহ্ম। তোর অভিদৃপ্ত যৌবন অপরকে বিপর্যস্ত করার জন্য যেন জিগীষু না হয়ে ওঠে, সে জিগীষু হোক হোক না কেন সত্য লাভের জন্য।

বাবার জ্যোতির্ময় দেহ ধীরে ধীরে যেন কোন পর্দার আড়ালে সরে গেল। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। বাবার উচ্চারিত বেদমন্ত্রের ধ্বনি তখনও কানে প্রতিধ্বনি তুলছে, মনে হচ্ছে আমাদের *কালিয়াড়ার বাড়ীতে বেলগাছের তলায় বেদীতে বসে বাবা আমাকে বেদের পাঠ দিয়ে ঠাকুরঘরে উঠে গেলেন।

পাশের ঘর থেকে সাধু সাড়া দিলেন - উঠিয়ে জী, নর্মদা তীর্থ মে এ্যায়সা হোতাই হৈ। বিস্তারা বাঁধ লিজিয়ে, আভি যাত্রা করেঙ্গে।

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে গাঁঠরী বেঁধে ঝরণার জলে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। শ্রুবাবতীর মন্দিরে প্রণাম করে এলাম। শ্রুবানন্দজীর সাথে দেখা করে আসতে চাইলাম।

সাধু বললেন -

- ছোড়িয়ে জী। উহ্ লোগোনে আভি ভজনমেঁ বৈঠা হৈ। আপকা শিষ্টাচার প্রদর্শনকে লিয়ে থোড়ি খাড়া হৈ।

ঝরণার ধার দিয়ে যখন চড়াই এর রাস্তা ধরলাম, তখন পূর্বাকাশে সূর্য লাল হয়ে উদিত হচ্ছেন। শ্রুবাবতির মঠ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে তিন সাধুর সমস্বর মন্ত্রধ্বনি ভেসে আসছে -

ওঁ যন্মণ্ডলং গূঢ়মতিপ্রবোধং ধর্মস্য বৃদ্ধি কুরুতে জনানাম্।
যৎ সর্বপাপক্ষয়কারণঞ্চ পুণাতু মাম তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥
ওঁ যন্মণ্ডলং সর্বগতস্য বিষ্ণোঃ আত্মা পরং ধামং বিশুদ্ধতত্ত্বম্।
পুণাতু মাম্ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥

---

* লেখকের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া গ্রাম

সাধু বললেন - উনোনে সূরযনারায়ণকো বন্দনা কর রহা হৈ। আমি বললাম - এটি ভর্গ স্তব। সাধুর তৎক্ষণাৎ উত্তর - হাঁ হাঁ উহ্ একই বাত হৈ। চলিয়ে না এ্যায়সা কেতনা দেখেগা - মহাত্মালোগ্ বেদগান জাগাহ্ জাগাহ্ মেঁ কর-রহা হৈ - নর্মদা মেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ।

আমরা দুজনে অনেকখানি চড়াই অতিক্রম করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। পথের কোন চিহ্নই নেই। চোখের সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেছে। যতই উপরে উঠছি, জঙ্গল ততই আরও গভীর হচ্ছে, ঘন অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। বেলা হয়েছে, রোদ উঠেছে, অথচ সূর্যের আলো ঢোকেনি জঙ্গলের মধ্যে - আকাশই চোখে পড়ছে না, সূর্যের আলো কোথা থেকে ঢুকবে !

অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে, হাত দিয়ে লতা গাছ সরিয়ে সরিয়ে প্রায় দুঘন্টা হাঁটলাম। চড়াই-এর পথে উঠবার কষ্টে দুজনেরই হাঁফ ধরে গেছে। একটা বড় পাথরের উপর সাধুজী বসে পড়লেন, আমিও বসলাম অন্ধকার জঙ্গলে আধঘন্টা বসার পর আবার দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু পরেই পাহাড়ের ঢাল পাওয়া গেল। গাছের ডাল আর গুঁড়ি ধরে ধরে, কখনও শক্ত মোটা কোন লতাগাছ ধরে উৎরাই পথে নামতে লাগলাম। ক্রমে মনে হ'ল জঙ্গল যেন অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়ে আসছে, বড় পাথরের চাঙড়ও আগের থেকে অনেক কমে এসেছে। সাধু বললেন - অভি নর্মদা মায়ীকা দর্শন মিলেগা। সত্যি ডানদিকে বেঁকে কিছুটা এগুতেই শাল, সাজা, হরতকী গাছের আড়ালে নর্মদার দেখা পাওয়া গেল - রূপালী তট চিকচিক করছে। এইবার একটা সরু পথের চিহ্নও দেখা গেল। সেই পথে এগিয়ে যেতেই নর্মদার তীরে পৌঁছে গেলাম। একটু উপরেই পাথরের এক মন্দির, মন্দিরে গিয়ে দেখলাম এক ঘোর লাল রঙের একহাত উঁচু শিবলিঙ্গ এবং প্রস্তরময়ী এক অষ্টভূজা দেবীমূর্তি। দেবদেবী উভয়েই ধূলি ধূসরিত। গর্ভগৃহের পাশেই ঢাকা বারান্দা। বারটি পাথরের ধাপ পেরিয়ে এই মন্দিরে উঠতে হয়েছে।

সাধু বললেন - এহি পারেশ্বর তীর্থ হৈ। পরাশরজীবে সর্বশাস্ত্রবিদ্ পুত্র লাভ করনেকে লিয়ে নর্মদাকি এহি ঘাটমেঁ তপস্যা কিয়ে থে। ইহ্ দেবীমূর্তি পরাশর পূজিত নারায়ণী গৌরী হৈ। শিউজীকা নাম-পারেশ্বর।

তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই কতগুলি ছোট ছোট গাছের ডাল ঝাঁটার আকারে লতা দিয়ে বেঁধে মন্দিরের চারপাশ পরিস্কার করতে শুরু করলেন। আমাকে কিছুতেই হাত লাগাতে দিলেন না। মন্দিরের চারপাশ পরিস্কার করে দুজনে নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পন জপ সেরে মন্দিরে যখন ফিরলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা।

কিছু বনফুল সংগ্রহ করে তিনি পারেশ্বর লিঙ্গ এবং গৌরীমূর্তির পূজা করলেন নর্মদার জল দিয়ে। মন্দিরের নিচেই একটা পাথরের উনুন এবং অনেক কাঠ পড়েছিল। উনুনে পোড়া দাগ ও পোড়া জ্বালানী কাঠের অংশ দেখে বুঝলাম, এখানে পরিক্রমাবাসীদের যাতায়াত আছে, নর্মদামুখী মন্দিরের চত্বরে রোদ এসে পড়েছে, শীতকালে বড় আরাম লাগছে। বদরপাচন তীর্থে আমি যখন ধ্রুবানন্দজীর সঙ্গ করছিলাম সেই সময় তিনি কোঠারীর কাছ থেকে অনেক আটা এবং অড়হর সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আগুন জ্বেলে তিনি রুটি করতে বসলেন। আমাকে বললেন রেবাখণ্ডম্ পড়ে পারেশ্বর তীর্থের কথা শোনাতে।

আমি পড়তে শুরু করলাম - ঋষি পরাশরের কঠিন তপস্যায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণী গৌরী তাঁকে নর্মদার এই ঘাটে দর্শন দিয়ে বর দিতে চাইলে পরাশর প্রার্থনা করেন -

পরিতুষ্টোহসি মে দেবি যদি দেয়ো বর মম।
দেহি পুত্র ভগবতী সত্য শৌচগুণান্বিতম্ ॥
বেদাভ্যসনশীলণগ হি সর্বশাস্ত্র বিশারদম্।
তীর্থে চাত্র ভবেৎ দেবি সন্নিধান বরেন তু ॥
লোপকারহেতোশ্চ স্থীয়তাং গিরিনন্দিনি।
পরাশরাভি বানেন নর্মদোত্তরে তটে ॥

দেবি ! আপনি আমাকে এই বর দান করুন যেন আমার সত্যশৌচগুণান্বিত, বেদাভ্যসনশীল, সর্বশাস্ত্রবিশারদপুত্র লাভ হয় আর আপনি লোকহিতের জন্য নর্মদার এই উত্তরতটে চিরকাল প্রকট থাকুন। আমার পরাশর নামানুসারে আপনি পারেশ্বরী নামে বিখ্যাত হোন।

দেবী ! 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হবার পর ঋষি নর্মদার জল থেকে প্রাপ্ত এই অষ্টভূজা গৌরীমূর্তি এবং সুরাসুর নমস্কৃত অচ্ছেদ্য অপ্রতর্ক্য দেবগণেরও দুরাসদ শংকর-লিঙ্গ স্থাপন করলেন।

এই বর লাভের পরই পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জগৎ প্রসিদ্ধ স্বয়ং বেদমূর্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন।

সাধুজীর রান্নাপর্ব শেষ হল। ভোগ নিবেদন করে উভয়ে প্রসাদ পেলাম। তিনি তাঁর কাছেই শোয়ার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু গাঁজা সেবনের কথা স্মরণে রেখে আমি অন্য পাশে শোবার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন সাধু নর্মদা থেকে একটি শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে এনে দেখালেন - একটি নাতিবৃহৎ চ্যাপ্টা শিবলিঙ্গ, তাতে ত্রিশূলের চিহ্ন। আমাকে বললেন - দেখিয়ে নর্মদা মাতাকী কৃপা। হমারা এক গৃহী শিষ্ হৈ। শিউজীকা ভক্ত। এক নর্মদা-লিঙ্গ লে যানেকে লিয়ে বহুত বিনতি কিয়ে থে। অব্ মিল গয়া।

আমার বাবা সারা জীবন শিবলিঙ্গের নানা চিহ্ন ও প্রকারভেদ নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। তাঁর সেই গবেষনার ফল একটি খাতাতে লিপিবদ্ধ আছে। সেই খাতাটি আমার সাথে ছিল। আমি খাতাটি পড়ে সাধুর প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের লক্ষণ মিলিয়ে বললাম - সাধুজী এই শিবলিঙ্গটির পূজা আপনার গৃহী-ভক্তের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। কারণ এই কর্কশ চ্যাপ্টা শিবলিঙ্গ গৃহীর সর্বনাশ ডেকে আনবে। শাস্ত্রবাক্য সত্যি হলে তবে এই লিঙ্গ পূজার ফলে তার স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু হবে, তার গৃহ ভূমিস্যাৎ হবে। কারণ, এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ -

কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারোক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপ্পিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গোভবেৎ ধ্রুবম ॥ **(বীরমিত্রোদয় কৃত কালোত্তর)**

এই কথা শোনামাত্র সাধু তাঁর হাতের শিবলিঙ্গটিকে নর্মদা গর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নর্মদার দিকে চোখ রাঙিয়ে গর্জে উঠলেন - কেয়া মাতাজী! শোভানন্দকা সাথ দিল্লাগী কর রহা? বিড়বিড় করে আরও তিরস্কার করতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব খোড়িবালি দেহাতি হিন্দীতে, যা আমার বোধগম্য হল না। সেই সময় তাঁর ভাবভঙ্গী এবং ক্রুদ্ধ ভ্রুভঙ্গি দেখে মনে হল, তাঁর সামনে যে নদী বয়ে যাচ্ছে, তা যেন কোন নদী নয়, স্বয়ং নর্মদা মাতাই যেন তাঁর দিব্যমূর্তি নিয়ে উপস্থিত এবং তিনি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হলেন। তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - আপনার নাম কি শোভানন্দ ? বললেন - হাঁ..হাঁ, হমারা নাম হৈ শোভানন্দ। হম্ আওঘড়ী সম্প্রদায় কি হুঁ।

আমি ধাঁধায় পড়লাম - 'যতিধর্মনির্ণয়' নামক গ্রন্থে কুটীচক, বহুদক, হংস, পরমহংস, অবধূত প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের কথা পড়েছি। তাছাড়া দশনামী দণ্ডী, শৈব, বৈষ্ণব, লিঙ্গায়েৎ, নাথপন্থী, কবীরপন্থী, উদাসী, পল্টুদাসী এবং নাগাদেরও বহু সম্প্রদায়ের কথা শুনেছি, দেখেছি, কিন্তু অওঘড় সম্প্রদায়ের কথা কখনও শুনিনি।

আমাকে চুপ করে ভাবতে দেখে তিনি নিজেই বললেন - আমাদের অওঘড় নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রহ্মগিরি নামক একজন দশনামীভুক্ত সন্ন্যাসী। তিনি দৈবক্রমে গুরু গোরক্ষনাথজীর কৃপালাভ করে অওঘর নামে এক মতের প্রবর্তন করেন। গুজরাট অঞ্চলে আমাদের মুল গদ্দী আছে, আমি ব্রোচ থেকেই আসছি। শিব আমাদের উপাস্য দেবতা, তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন আমাদের অবশ্য আচরণীয় ব্রত। অওঘড়ের আরও তিনটি শাখা আছে - গুদর, রুখড়, এবং সুখড়। তারা কাষায় বর্ণের খেলকা পরিধান করে। রুখড় ও সুখড়েরা দুই কানে তামা বা পিত্তল-নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করে। আর গুদড়েরা এক কানে কুণ্ডল আর দ্বিতীয় কানে অওঘড়ের পদচিহ্নযুক্ত তামার তক্তি রাখে। আমি মূল অওঘড়ী। আমার গলায় শুধু অওঘড়-গুরুর পদচিহ্নযুক্ত তক্তি আছে। সাধ্যে কুলালে অওঘড়ী ও গুদরীরা নর্মদার তটে তটে ঘুরে বেড়ায়।

এইসব কথা বলার পরেই তিনি আরও বলতে লাগলেন - নর্মদার যখন যে ঘাটে থাকবে, সেইখানকার শিবপূজা, রেবামন্ত্র জপ, ইষ্টধ্যান বা সেই ঘাট যাঁর নামে, সেই ঋষির স্মরণ মননের মধ্যেই দিনটি উদযাপন করবে। এই ঘাট পরাশর মুনির তপস্যাস্থল। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র তিনি। বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির ঔরষে, অদৃশ্যন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। পরাশর বৈদিক ঋষি, বেদের অনেক মন্ত্রের তিনি দ্রষ্টা। তাঁর রচিত সংহিতার নাম পরাশর-সংহিতা। ইক্ষাকু বংশীয় এক রাজা কল্মাষপাদ, শক্তির অভিশাপে রাক্ষসরূপে পরিণত হন।

রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েই তিনি শক্তিকে ভক্ষণ করেন। পরাশর সেই সময় মাতৃগর্ভে। পুত্রশোকে অধীর হয়ে বশিষ্ঠদেব বারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু প্রতিবারেই তিনি ব্যর্থ হলেন। শোকার্ত হৃদয়ে তিনি যখন আশ্রমে ফিরে আসছিলেন, তখন পেছন থেকে বেদধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠেন, পেছন ফিরে দেখেন তাঁর পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী তাঁকে অনুসরণ করছেন। বেদমন্ত্রের উৎসস্থল জানতে তিনি অদৃশ্যন্তী কে জিজ্ঞাসা করলে, অদৃশ্যন্তী বলেন যে তাঁর গর্ভস্থ শিশুই বেদপাঠ করছে। এই শিশুই পরাশর। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখন বশিষ্ঠ নিজের জীবন 'পরাসু' (পর অর্থাৎ গত, অসু মানে প্রাণ) অর্থাৎ জীবন বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন বলে শক্তি পুত্রের নাম হয়েছিল - পরাশর।

শোভানন্দজী পরাশরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেই আমাকে বললেন - দেখিয়ে ত ইহ্ শিবলিঙ্গ কৌন হৈ, ক্যায়সা হৈ ?

আমার হাত ধরে তিনি মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের কাছে নিয়ে গেলেন। এখানে দুদিন এসেছি, আমি পূজা করিনি, তিনিই শিবের পূজা করেছেন। লিঙ্গের কাছে বসে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গের মধ্যে ত্রিপুণ্ড্র বর্তমান। কে যেন রক্তিম শিবলিঙ্গের মধ্যে ত্রিপুণ্ড্রের আকারে টিনটি রেখা টেনে দিয়েছেন। কৃত্রিম অর্থাৎ শোভানন্দজীরই রক্তচন্দনের টান কিংবা স্বতোৎপন্ন স্বাভাবিক কিনা তা দেখবার জন্য লিঙ্গে হাত দিতেই তা গরম মনে হল। বাবার খাতা দেখে আমি সাধুজীকে বললাম - ঋষি প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গটি আগ্নেয় লিঙ্গ। এই লিঙ্গের সেবা পূজা করলে তেজ ও জ্যোতির অধিপতি হওয়া যায় -

আরুণং হিত্য কীলালমুষ্ণংস্পর্শং করোত্যলম্।
আগ্নেয়ং তচ্ছশক্তি নিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্।
ইদং লিঙ্গবরং স্থাপ্য ভেজসাধিপতির্ভবেৎ ॥

বীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্তর নামক প্রাচীন পুস্তকে ' আগ্নেয় লিঙ্গ লক্ষণম্ ' প্রকরণে এই কথা লেখা আছে। রক্তিম বর্ণ উষ্ণতা চিন্ময়ী শক্তির প্রতীক। আমি এই রকম অত্যাশ্চর্য শিবলিঙ্গ এর আগে কোথাও দেখিনি। সাধু বললেন - নর্মদামে এ্যায়সা হোতাই হৈ।

এই পরাশর ঘাট বা পারেশ্বর তীর্থে আমরা দুদিন থেকে তৃতীয় দিনে সকাল সাতটা নাগাদ যাত্রা করলাম। অত্যন্ত শীতের জন্য কেউ স্নান করলাম না, নর্মদা স্পর্শ করে এগিয়ে চললাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। নর্মদার উপর কুয়াশার ঘন আবরণ, জঙ্গলের গাছপালাও ঘন কুয়াশায় ঢাকা, গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। শোভানন্দজী চলেছেন আগে আমি পেছনে। বনের মধ্যে বিরাজ করছে এক অপার্থিব স্তব্ধতা, বাতাস বইছে তার কোন শব্দ নেই, পাখীর কূজন বা মানুষের সাড়া তো নেই-ই, কোন জন্তু জানোয়ারেরও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শীতকালে বাংলা, কাশী, বিহার, হরিদ্বার, হৃষিকেশ সব জায়গাতেই দেখেছি কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে, কোথাও একটু কম কোথাও বেশী, কুয়াশাতেও ঢেকে যায়, কিন্তু যতই সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে কুয়াশাও আকাশে মিলিয়ে যায়, কনকনে ঠাণ্ডাভাব একটু কমে আসে, কিন্তু এখানে দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত, যতই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি ততই ঘন কুয়াশার অন্ধকার আমাদের ঢেকে ফেলছে, পাথরে পা দেওয়া যাচ্ছে না। সাধুজীকে বললাম - আর একটু বেলা হলে, চনমনে রোদ উঠলেই যাত্রা করলে হ'ত।

তিনি বললেন - সুরযদেব কি কিরণ দোপহরমেঁ ভি ইয়ে জঙ্গলমে ঘুযেগা নেহি।

প্রায় আড়াই-তিন ঘন্টা এভাবে হাঁটার পর আমার শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল, আমি একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। সাধুজীও বসলেন, পাঁচ মিনিট পরেই এদিক ওদিক তাকিয়ে, গাছের শুকনো ডাল ভেঙে এনে আগুন জ্বালালেন।

আধঘন্টা ধরে আগুন পোয়ালাম, শীতের জড়তা অনেকটা কাটল। আবার হাঁটতে লাগলাম, এবারে ঢাল বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক শিবমন্দিরে এসে পৌঁছুলাম। শোভানন্দজী বললেন - ইহ্ হ্যায় ভীমেশ্বর তীর্থ, ভীমব্রতধারী ঋষিরা ভীমেশ্বরের সতত সেবা করেন। যে ভীমেশ্বর তীর্থে স্নান করে উপবাস করে উর্ধ্ববাহু হয়ে একাক্ষর মন্ত্র জপ্ করে তার জন্মার্জিত পাপ সাথে সাথে বিনষ্ট হয়।

ইধর শিবলিঙ্গ প্রকট নেহি হ্যায়, কুণ্ডকা অন্দরমেঁ ঘুষ গয়া।

আমি বললাম - আজ পর্যন্ত নর্মদার তীরে যত শিবমন্দির দেখেছি, প্রত্যেক শিবমন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে আপনিও বলেছেন, আরও অনেক মহাত্মাও বলেছেন যে 'এখানে স্নান করলে জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়, ওখানে স্নান করলে বা জপ্ করলে জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় ইত্যাদি', তাহলে আর পাপ কোথায় যে তা আর নূতন করে নষ্ট হবে? প্রতিদিনই তো নর্মদাতে স্নান করছি, শিবমন্দিরও তো কম দেখা হ'ল না। আজ স্নানই করব না। শীতও বেশ পড়েছে, পরিক্রমার ব্রত রক্ষার জন্য নর্মদার জল স্পর্শ করব মাত্র। সাধু কোন উত্তর দিলেন না কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হ'ল তিনি বেশ রাগ করেছেন। জরাজীর্ণ মন্দিরের পৈঠায় গাঁঠরী ফেলে তিনি অতি সাবধানে পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে কাঁটালতা এড়িয়ে নর্মদাতে স্নান করতে নামলেন। বেলা তখন প্রায় দশটা সাড়ে দশটা হবে অনুমান করলাম। নর্মদার উপর কুয়াশার আবরণ কেটে গেছে। স্নান করে এসে শিবপূজার জন্য সাধু এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুলের সন্ধান করলেন, পেলেন না। অগত্যা কুণ্ডের মধ্যে কুণ্ডস্থিত শিবের উদ্দেশ্যে কমণ্ডলুর জল ঢেলে, পৈঠার উপর দাঁড়িয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে জপ্ করতে লাগলেন, দু-ঘন্টা কেটে গেল।

বুঝতে পারলাম, তিনি এই তীর্থের নিয়ম পালন করছেন। কারণ ভীমেশ্বর তীর্থের অবশ্য পালনীয় কৃত্য সম্বন্ধে মহামুনি মার্কণ্ডেয়র নির্দেশ - জপেৎ একাক্ষরং মন্ত্রমূর্ধবহুদ্ধিবাকরে। যেন তাঁকে তুষ্ট করার জন্যই ধীরে ধীরে নর্মদাতে নামলাম স্নান করতে। স্নান করে এসে আমিও 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্রকে মনে মনে নির্বাচন করে নিয়ে উর্দ্ধবাহু হয়ে আধ ঘন্টা জপ্ করলাম। এবারে দেখলাম সাধুর মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল।

আমাকে বললেন - শাস্ত্রে কোন তীর্থ বা দেবতার মহিমা বর্ণনাকালে ফলশ্রুতি হিসেবে এমন অনেক কথা থাকে, যা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়, কিন্তু বাক্যের সরলার্থের অন্তরালে এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব থাকে যা গভীর মননের দাবী রাখে। পূর্বজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় মানে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল নষ্ট হয়। কর্মফল নষ্ট হলেও আত্মা নির্মেঘ আকাশের মত শুদ্ধসত্ত্বান্বিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, কর্মফল অপসারিত হবার পরেও তার ওপর মায়িকমল ও আণবমলের আবরণ থাকে। তা দূর করার জন্য তপস্যা প্রয়োজন। তপস্যার অনুকূল স্থান তীর্থ, কারণ বহু সন্তের তপস্যার প্রভাবে তীর্থের পরিমণ্ডল বিশুদ্ধ থাকে। সেইজন্য এক বা হাজার তীর্থে তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করলেও অন্য তীর্থে তপ জপ স্নানাদি করার প্রয়োজন ফুরায় না।

আমি বললাম - তীর্থে অমুক নদীতে স্নান করলে অমুক দেবতার পূজা করলে পূর্বজন্মার্জিত পাপ, সপ্তজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় ইত্যাদি যে সব কথা শাস্ত্রকাররা বড় বড় মুনি ঋষির মুখ দিয়ে বলে গেছেন, তাতে যেমন একদিকে বহির্মুখ জীবকে তীর্থকৃত্য ও দেবপূজায় প্রচোদিত করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এর একটা খারাপ দিকও আছে। অভিসন্ধিপরায়ণ দুষ্ট লোকেরা ত এই ভেবে পাপ করতে প্ররোচিত হতে পারে যে দরিদ্র ও দুর্বলকে যতই শোষন করি, জালিয়াতি করি বা অবাধে লুন্ঠন ও অনাচার ব্যাভিচার করি না কেন, সবকিছু পাপাচারণ করে অমুক তীর্থে গিয়ে স্নান করে অমুক দেবতার পুজা করলেই আমি পাপমুক্ত হয়ে যাব !

নেহি জী এ্যায়সা নেহি। জান্-বুঝকে যো পাপ করেগা, উসকো জ্যাদা ভুগনে পড়েগা।

মার্কণ্ডেয় মুনিনে বোলা -

> ন দৈববলং আশ্রিত্য কদাচিৎ পাপমাচরেৎ
> অজ্ঞানাং নশ্যতে ক্ষিপ্রং নোত্তরং তু কদাচন ॥

অর্থাৎ দৈববল আশ্রয় করে কদাচ পাপ করা কর্তব্য নয়। পাপ অজ্ঞানকৃত হলে তবে তা জপ্ তপ্ ক্রিয়াদির দ্বারা নষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হলে তা শত ধর্মানুষ্ঠানেও ধ্বংস হয় না। তার ফল অবশ্যই ভুগতে হবে।

শৈলেন্দ্রনারায়ণজী আজ আমাদের ঝুলি শুন্য, নর্মদা মাতা আজ আমাদের ভাগ্যে আহার রাখেন নি, এখন চল পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়ি। প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে গেলে সন্ধার পূর্বেই আমরা নারদেশ্বর ঘাটে পৌছে যেতে পারব। ভীমেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমরা হাঁটিতে আরম্ভ করলাম। পথ একই, সেই দূর্ভেদ্য জঙ্গলের পথ, কখনও চড়াই কখনও উৎরাই। প্রায় ঘন্টাখানিক হাঁটার পর কানে ভেসে এল শত শত শিঙা ও ডম্বরুর গুরু গম্ভীর ধ্বনি, তার সাথে শত শত কণ্ঠের আওয়াজ - 'হর নর্মদে হর'।

সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে আমরা হাঁটিতে লাগলাম, অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শোভানন্দজী বললেন - কাছেই কোন পরিষ্কার উপত্যকা নিশ্চই আছে, সেখানে পরিক্রমাকারী সাধুদের জমায়েৎ এসে ছাউনি ফেলেছে। শিঙা ও ডম্বরুর শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এ তাদেরই কণ্ঠস্বর। আজ থেকে দুশো বছর আগে কমলভারতীজী নামে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ নর্মদা মাতার কৃপা লাভ করে বৈদিক ও পৌরানিক যুগের প্রচলিত নর্মদা পরিক্রমার লুপ্ত-প্রায় ধারাকে পুনরায় জাগ্রত করেন। সারা ভারতের হাজার হাজার সাধু তাঁর জমাতে যোগ দিয়ে নর্মদা-পরিক্রমা করতেন। রেওয়া ও ইন্দোরের মহারাজারা ছাড়াও আরও অনেক ধনী শেঠ চাল ডাল আটা ঘি, কম্বলাদি ভেট দিয়ে এই জমাতের সেবা করতেন। কমলভারতীজীর প্রভাবেই নর্মদার তীরে স্থানে স্থানে সদাবর্তও গড়ে উঠেছে। বহু জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দিরের সংস্কারও তিনি করে গেছেন। ১৮৫৬ সালে তাঁর নর্মদা প্রাপ্তির পর গৌরীশংকর ব্রহ্মচারী নামে আর এক সিদ্ধ তপস্বী এই জমাত পরিচালনার ভার পান। তিনি একবার ক্ষিপ্ত হয়ে নর্মদা তীরের শিবলিঙ্গ ভাঙতে থাকেন, ঐ সময় ঘোর উন্মাদ অবস্থায় স্বয়ং মাতা নর্মদা তাঁকে দর্শন দিয়ে বিভূতি দান করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে নীরোগ হন। ঐ বিভূতি সর্বরোগহরা। বিভুতির প্রভাবে তিনি মৃতপ্রায় রোগীকেও রোগ মুক্ত করতে পারতেন। বাংলা ও বিহারের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা বালানন্দ ব্রহ্মচারী, গৌরীশংকরজীর জমাতে যোগ দিয়ে নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন। গৌরীশংকরজীরও নর্মদাপ্রাপ্তি ঘটেছে ১৮৮৮ সালে। এখন এই জমাত পরিচালনার ভার পেয়েছেন আমার 'দোস্ত' কাশিকানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। তিনি ওঙ্কারেশ্বরে থাকেন, চল দেখি গিয়ে তিনি নিজেই জমাতের সাথে এসেছেন কিনা।

ডম্বরু ধ্বনি অনুসরণ করে হাঁটিতে হাঁটিতে অন্ধকারময় জঙ্গল অতিক্রম করে সত্যি আমরা ছোট একটা উপত্যকায় এসে পৌছুলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর মহারণ্যের মধ্যেই যে এমন একটা মনোরম স্থান দেখব তা কল্পনাও করতে পারিনি। নানা সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার সাধু, তার সঙ্গে তাঁবু ও খাদ্যসম্ভার বহনকারী প্রায় শতাধিক গোঁড় ভীল প্রভৃতি পাহাড়ী লোক, সবাই সশস্ত্র। একটা বেদীর উপর নর্মদা মাতার বড় একটি ছবি এবং শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে। ধুপ-ধুনার গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক।

দূর থেকে জমাত লক্ষ্য করে শোভানন্দজী বললেন - হমারা দোস্ত কাশিকানন্দ ব্রহ্মচারী নেহি আয়া। উনকা এক চেলা কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীকো দেখতা হুঁ। সাধুরা তখন ভোজনে বসেছেন। ভোগারতির সময় যে শিঙা ডম্বরু বেজেছিল আমরা জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেই শব্দই শুনতে পেয়েছিলাম।

আমরা জমাতের ধারে পৌছতেই কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী শোভানন্দজীকে দেখতে পেয়ে শশব্যস্তে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁর হাত ধরে একটা তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। পরস্পর কুশলবার্তা বিনিময়ের পর, তাঁবুর ভিতরেই আমাদের দুজনের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পুরী, লাড্ডু, অড়হরের ডাল এবং মালপুয়া - এই দিয়ে রাজকীয় প্রসাদ।

ভোজনের পর আমরা কালিকানন্দজীর সাথে বাইরে এসে বসলাম। সব সাধুরাই মণ্ডলীর আকারে বসে আছেন, শীতের মধ্যে রোদ ভালই লাগছে। হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে কালিকানন্দজী প্রশ্ন করলেন - আপ্ বঙ্গালকা রহনে বালা হো ?

আমি 'হাঁ' বলতেই বললেন - বঙ্গালী লোগ মছলী খাতা হৈ। শোভানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন - ইনকো ত হম্ জমাত্ কা সাথ লেঙ্গে নেহি। জমাত্ কা সাধু লোগ্ পসন্দ নেহি করেগা।

শোভানন্দজী - ইনোনে আপকা সাথ থোড়ি যায়েঙ্গে। আপকা জমাত্ যাতা হৈ অমরকণ্টক কা তরফ ঔর ইয়ে ত আতা হৈ অমরকণ্টক সে। হামরা সাথমেঁ ইনকো আভি লে চলেঙ্গে নারদেশ্বর তীর্থ।

কালিকানন্দজী পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - আপ্ মছলি খাতা হৈ ?

- নেহি জী।

আমার উত্তর শুনে সাধুদের মধ্যে হাস্যরোল উঠল। কয়েকজন বলে উঠলেন - ইহ্ লোগ ঝুট বোলতা হৈ। বাঙালীলোগ্ বাচপনসে মছলি খাতা হৈ।

কালিকানন্দজী - আপ্ ত পরিক্রমা কর্ রহা হৈ। ক্যা আপ্ বিশোয়াস্ করতা হৈ যো, নর্মদা মাতাজী সরিদ্বরা ? সব নদীয়োঁ সে ইনকা মহত্ত্ব জ্যায়দা হৈ।

সাধুদের জমাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ পেয়ে মনে আমার খুব বিরক্তি জন্মেছে। শোভানন্দজী আমার মুখ চোখের প্রথমে উত্তেজিত ভাব দেখে উঠে পড়লেন। বললেন, অব্ চলিয়ে হমলোগ যাত্রা করেঙ্গে।

আমি তাঁকে হাতজোড় করে মিনতি করে বললাম - পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি কিছুটা কালিকানন্দজীর শাস্ত্রমুখে সেবা করে যাই।

কালিকানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললাম - যাঁরা নর্মদা-পরিক্রমাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বেষবুদ্ধি দেখতে পাবো আশা করিনি। আপনাদের বোধ হয় ধারণা, মছলিখোর বাঙালী জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া কঠিন, তাদের আস্তিক্য-বুদ্ধিও কম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ভারতের দ্বিতীয় শংকরাচার্য, অতীশ দিপঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষের নাম কি মহাশয়ের শোনা আছে ? আদি বিদ্বান মহর্ষি 'কপিলও' মছলিখোর বাঙালীজাতি অধ্যুষিত বাংলা দেশের সাগর - সংগমকেই তাঁর শেষ তপস্যাস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

নর্মদাকে আমি রুদ্রতেজাৎ সমুদ্ভূতা সরিদ্বরা বলে ভাবি কি না তার বিচারক আপনারা নন, নর্মদা মাতাই তা বিচার করবেন। আর যদি তা নাও ভাবি তাতে দোষ কি ? মুনি ঋষিরা যখন যে নদীর প্রশংসা করেছেন, তখন সেই নদীকেই ত তাঁরা 'সর্ব পাপঘ্না সরিতাং শ্রেষ্ঠা' বলে বন্দনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বেদব্যাসের কথাই বলি। তিনি একই মহাভারতে বনপর্বে নর্মদাকে লোমশ মুনির মুখ দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা নদী বলেছেন আবার শল্যপর্বে দধীচি মুনির মুখ দিয়ে সরস্বতী নদীকেই সরিৎ শ্রেষ্ঠা বলেছেন -

প্রসৃতাসি মহাভাগে। সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা।
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে ! মনুয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ **(১৯ শ্লোক, শল্যপর্ব)**

অর্থাৎ হে মহাভাগে ! নদীশ্রেষ্ঠে ! তুমি পূর্বকালে ব্রহ্মার মানসরোবর হতে নির্গত হয়েছিল। দৃঢ়ব্রত মুনিরা তোমাকে পরম পবিত্র বলে জানেন।

আপনাদের বিচারের মানদণ্ডে স্বয়ং বেদব্যাসও কি তাহলে অপরাধী? একটু আগেই যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছি তার উনিশটি শ্লোক পরেই তিনি আবার যে ভয়ানক কথা বলেছেন তা শুনলে তো আপনারা মূর্চ্ছা যাবেন।

এমন কি, তিনি যদি এ যুগে জন্মিয়ে দৈবাৎ নর্মদা পরিক্রমা করার জন্য আপনাদের এই জমাতের সঙ্গে আসতেন তাহলে তো তাঁকে আপনারা নর্মদার জলে ডুবিয়েই মারতেন। কেননা, তিনি দেখিয়েছেন, একবার দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হবার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, মুনি ঋষিরা দিক্ দিগন্তর হতে সরস্বতী নদীর তীরে ক্ষুধার্ত হয়ে সমবেত হন। সরস্বতীর পুত্র সারস্বত মুনি তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্যের অন্বেষণে অন্যত্র যাবার সংকল্প করলে সরস্বতী নদী দিব্য মূর্তি ধারণ করে তাঁদের কাছে আবির্ভূত হন এবং বলেন -

ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র ! তবাহারমহং সদা। দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানদ্যতামিতি ভারত্ ॥
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৃণ্ দেবতাস্তথা। আহারমকরোন্নিতং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্ ॥

অর্থাৎ পুত্র। এস্থানে হতে এঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কোথাও যেতে হবে না। আমি তোমাকে খাদ্যের জন্য উত্তম উত্তম মৎস আজ হতেই দিতে থাকব। তাই ভোজন করতে থাক। সরস্বতী এই কথা বললে সারস্বত মুনি অপর মুনিগণসহ দেবতা ও পিতৃগণের তর্পন করতে লাগলেন এবং প্রাণ এবং বেদধারণ করার জন্য প্রত্যহ সরস্বতী-প্রদত্ত মৎস ভোজন করতে থাকলেন।

কালিকানন্দজীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেসব মুনি ঋষিরা সরস্বতী নদী তীরে সে সময় ছুটে এসেছিলেন, তারা কেউ বাঙ্গালী ছিলেন না। অন্ততঃ ব্যাসদেব ঐ সব মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণকে গৌড়ীয় বলে মহাভারতে উল্লেখ করেন নি। আপনারা মনে রাখবেন, খাদ্যের উপর ধর্মাধর্ম নির্ভর করে না। যার পক্ষে যে খাদ্য সহজপাচ্য হবে অর্থাৎ যার পেটে যা সইবে, সেই খাদ্যই তার পক্ষে উপযোগী। যার পেটে দুধ সহ্য হয় না, তার কাছে দুধ সাত্ত্বিক শ্রেণীভুক্ত হলেও তাকে তামসিক খাদ্য বলেই ধরতে হবে। আমিষ নিরামিষ শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা আপনারা জানেন বলে মনে হয় না।

বেদের গোলাধ্যায়ে আছে - বিষয়াভিলাষং আমিষং, তদরাহিতাং নিরামিষংবা। বিষয়াসক্তিই যথার্থ আমিষ ভোজন। বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি জন্মালে তবেই তাকে নিরামিষাশী বলা হয়। দুধ, তুলসীপাতা বা ফলাহার করে থাকলেও যদি বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে, সে যদি অর্থগৃধ্নু ও প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয় তবে তাকে আমিষভোজীই বলা হবে; আর যদি মৎস মাংসভোজী হয়েও কেউ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয় তবে সে লোকই যথার্থ নিরামিষাশী বলে গন্য হবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

সাধুরা তুষ্ণীভূত হয়ে বসে থাকলেন, শোভানন্দজী আমার হাত ধরে জমাতের বাইরে টেনে আনলেন। আমাকে বললেন - বহোৎ আচ্ছা কিয়া, ইনলোগোকো আচ্ছিতরেসে দাবা দিয়া। সাধুয়োঁকে ভেষধারী ইনলোগোনকা হালৎ দেখ কর মেরা মন মেঁ বহোৎ দুখ ঔর শরম আতি হৈ।

যাই হোক আমরা বামদিকে মোড় ঘুরে ধীরে ধীরে পর্বতের ঢাল লক্ষ্য করে নামতে লাগলাম। চারিদিকেই বড় বড় গাছের সম্ভার, আর সব গাছেরই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একরকমের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমন নিবিড়ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে গাছগুলোকে জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রঙ দেখা যাচ্ছে না। সেই রাস্তায় উৎরাই-এর পথে আধঘন্টা হাঁটবার পরেই দেখলাম বড় বড় গাছের জটলা ক্রমেই ফাঁকা হয়ে আসছে। ঢালুপথে দেখলাম বড় বড় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ফল পেকে আছে, কলা ও কাঁঠাল গাছ, পেঁপে, পেয়ারা, আম গাছও আছে অজস্র। নর্মদাকেও দেখতে পেলাম - পর্বতগাত্র ভেদ করে বয়ে চলেছেন। খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো আছে। সাধুজী তাঁর ঝোলাতে কয়েক কাঁদি কলা আমলকী এবং জিসম্ বলে একরকম ফল ভরে নিলেন। তাঁর দেখাদেখি আমার ঝোলাতেও কিছু ভরলাম। জিসম্ দেখতে ন্যাসপাতির মত, কামড় দিলে দুধের মত সাদা মিষ্টি রসে মুখ ভরে যায়। এর আগেও আমি নর্মদা তীরে প্রাকৃতিক ফলের বাগান দেখেছি, কিন্তু নর্মদা মাতার সেই বাগিচাতে জিসম্ আমার চোখে পড়ে নি।

হঠাৎ শোভানন্দজী 'হর নর্মদে হর' বলে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি একটি বহু পুরানো মন্দিরের চুড়া দেখতে পেলাম। মন্দিরে যাবার রাস্তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নর্মদার তীর ঘেঁষে এই পাথরের মন্দির। আমরা মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। নারদেশ্বর তীর্থ - দেবর্ষি নারদের তপস্যাস্থল। কয়েকটি শালখুঁটি বেঁধে মন্দিরের প্রবেশ পথে একটা আগড় দেয়া আছে, সেই আগড়ই দরজার কাজ করছে। বেলা তখন বোধহয় চারটা সাড়ে চারটা হবে।

দুজনেই মন্দির দ্বারে গাঁঠরী ফেলে রেখে নর্মদা স্পর্শ করে জল আনলাম, মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করলাম, মন্দিরের ভেতরটা তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। শিবলিঙ্গের দুপাশে দুটি ঘর, একটিতে আমি ও অন্যটিতে শোভানন্দজী বিছানা পাতলাম। আজ রাতে আমাদের আর খাবার প্রয়োজন হবে না। জমাতের প্রসাদ বিশেষত আমার পেটে তখনও নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। সূর্য অস্ত গেছে। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে শোভানন্দজী গাঁজা টেনে এলেন, তারপর শাল কাঠের আগড়টা ঠেলে দিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন - দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র, ত্রিকালজ্ঞ। নার শব্দের অর্থ জল, অর্থাৎ রস। রস হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ। উপনিষদে আছে - রসো বৈ সঃ - রসহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতী। তিনি এই রস অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ দান করেন বলে তাঁর নাম - নারদ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন - দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ।

ঋষি এইখানে বসে কঠোর শিব-তপস্যা করেছিলেন। শিব তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বর দেন, স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে স্বৈরগতি হবে - স্বর্গ মর্ত্য পাতালে তোমার অবাধ গতি। সপ্তস্বর, তিনগ্রাম, একবিংশতি মুর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তান - আমার প্রসাদে সকলই তোমার আয়ত্ত হবে সন্দেহ নেই।

শোভানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন - মহাদেব তাঁকে আরও একটি বর দিয়েছিলেন যে - কলিঞ্চ পশ্যসে নিত্যং দেবদানবকিন্নরৈঃ - অর্থাৎ তুমি সতত দেব-দানব-কিন্নরদের মধ্যে কলহ দেখতে পারবে এবং তাদের মধ্যে কলহ লাগাতেও পারবে।

যুদ্ধবিগ্রহ বা দেবদানবদের মধ্যে যেখানেই কলহ, তার মূলে নারদ থাকবেনই। দক্ষ প্রজাপতির দর্পনাশে, নহুষ এবং ত্রিপুরাসুর প্রভৃতির বিনাশের মূলেও নারদ। আবার ধ্রুব এবং সহস্র সহস্র তপস্বীদের মন্ত্রদাতা গুরুও ইনি।

শোভানন্দজী নীরব হলেন, তিনি জপে বসলেন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পাথরের মন্দিরে শীতে ঘুম আসছে না, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। কুশাসন ও তার উপরের গরম কাপড়ের চাদরটা মনে হচ্ছে ভিজে গিয়েছে। উঠে বসলাম। টর্চ টিপে দেখলাম, মন্দিরের এক কোণে কিছু কাঠ জড়ো করা আছে, পোড়া কাঠের অবশেষ। পরিক্রমাবাসীদের কেউ হয়ত এনেছিলেন, রাতের বেলা জ্বালিয়েছিলেন। দেশলাই জ্বেলে অনেক কষ্টে সেগুলোতে আগুন ধরালাম। একটু একটু করে কাঠে আগুন ধরে গনগনে হয়ে উঠল। শোভানন্দজী আগুনের কাছে এসে হাত পা সেঁকে গেলেন।

ধীরে ধীরে মন্দিরের ভেতর গরম হয়ে উঠল। আবার শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে দেবর্ষি নারদের কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের বহু ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে নারদের কথা আছে, কিন্তু তা অধিকাংশ জায়গাতেই বিকৃত। নারদ বলতেই সাধারণ মানুষের মনে ভেসে ওঠে - শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব দিবানিশি বীণা নিয়ে হরি গুণগান গেয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর বাহন ঢেঁকি। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে তিনি অত্যন্ত নিপুণ। তাঁর ঢেঁকি বাহনের কথা কোন ধর্মগ্রন্থে নেই তবুও সাধারণ মানুষের মনে তাঁর বাহন বলতে ঢেঁকির কল্পনা আছে।

রামায়ণে দেখি, তিনি ক্রান্তদর্শী ঋষি। তমসার তীরে ব্যাধের তীরে নিহত ক্রৌঞ্চকে ঘিরে ক্রৌঞ্চীর হাহাকার দেখে যখন বাল্মীকির মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তিনি কিছুতেই তা প্রকাশ করতে পারছেন না, তখন সেখানে নারদ এসে উপস্থিত হয়েছেন। আদিকবি বাল্মীকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন - ভগবান্, আপনি সর্বজ্ঞ, সকল দেশের সকল মানুষের কথাই আপনি জানেন, আপনি বলতে পারেন এমন কোন দেবতা বা মানুষের কথা যাঁকে কেন্দ্র করে আমার অন্তরের এই ব্যথা, এই অলৌকিক সুরকে উৎসারিত করে দিতে পারি ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম।

নারদ বাল্মীকিকে বললেন - তুমি যেসব গুণের কথা বলছ সে তো কোন দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে এই নরলোকেই একজন নর-চন্দ্রমা আছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে তোমার ভাবের জোয়ারকে উদ্ঘাটিত করতে পারো। বাল্মীকি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন -

কহ মোরে সর্বদর্শি হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম' ॥

মহাভারতে দেখি নারদের অন্যরূপ। তিনি সেখানে রাজনীতি ও রাজধর্মের একজন কুশলী প্রবক্তা যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ে বহুতর উপদেশ দিয়ে প্রশ্নচ্ছলে বলেছেন - কচ্চিত্তে সফলং ধনং কচ্চিত্তে তে সফলং শ্রুতম - তোমার ধন সফল হয়েছে ত ? এ কথার সঠিক মর্ম না বুঝে যুধিষ্ঠির বললেন - কথং বৈ সফলং ধনং, কথং বৈ সফলং শ্রুতম ? দেবর্ষি উত্তর দেন - দত্তভুক্তফলং ধনম্, শিলবৃত্তফলং শ্রুতম্। অর্থাৎ ধন সফল হয় দানে, আত্মভোগে নয়। ধনে যদি লোকসেবা হয় তবে তা সার্থক, নইলে অর্থ অনর্থের কারণ। বিদ্যা যদি আচরণে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে বিদ্যা নিস্ফল। অধীত বিদ্যা যদি চরিত্রে পরিস্ফুট না হয়, পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের সেবায় তার প্রকাশ যদি না ঘটে তবে সে বিদ্যার কোন মূল্য নেই।

বৈদিক সাহিত্যে নারদকে দেখি অন্যরূপে। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে দেখেছি তিনি ব্রহ্মবিদ্যার একজন জিজ্ঞাসু সাধকরূপে উপস্থিত হয়েছেন ব্রহ্মবিদ্যার জীবন্ত বিগ্রহ ভগবান সনৎকুমারের ব্রহ্মবিদ্যা-আশ্রমে। প্রণত হয়ে বিনম্র কণ্ঠে বলছেন - ভগবন্ আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরন, গণিতবিদ্যা, বেদাঙ্গাদি সকল লৌকিক শাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছি। এইভাবে সকল শব্দার্থময় শাস্ত্র জেনে মন্ত্রবিৎ হয়েছি, কিন্তু আত্মবিৎ হতে পারি নি - সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদ্ এবাস্মি, নাত্মবিৎ। তাই আমার চিত্তে শান্তি নেই, আনন্দ নেই। এই শোক এই মনস্তাপ বলুন ভগবন্, আমি কি করে দূর করি ! জ্ঞানীপুরুষদের মুখে আমি শুনেছি - তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। সেই আত্মজ্ঞানের অভাবে আমার সকল সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। আপনি দয়া করে আমাকে আত্মজ্ঞানের পথ দেখান।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা এবং সাধনার ধারাই ছিল যে আচার্য উপদিষ্ট বিষয়ে শিষ্য বা ছাত্রকে যথোচিত স্বাধ্যায় মনন ও ধ্যানে বসিয়ে উপদিষ্ট তত্ত্বের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন, আজকের মত কেবল লেকচার করেই ক্ষান্ত হতেন না। তাঁরা যখন যে তত্ত্বের উপদেশ দিতেন সেই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অধিগত না হলে কিংবা সেই তত্ত্বের ভূমিতে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র বা শিষ্যকে অন্য তত্ত্বের উপদেশ দিতেন না।

ভগবান সনৎকুমার সেই ধারাতেই ক্রমে নাম, বাক্, মন, সংকল্প, চিত্ত প্রভৃতির উপদেশ দিলেন, তা যখন নারদের আয়ত্ত হয়ে গেল তখন ধ্যানের উপদেশ দিলেন। বললেন - দেখ নারদ চিত্ত হতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। দেখ দেখ পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, দ্যুলোক ধ্যান করছে, জলরাশি ধ্যান করছে, পর্বতরাজি ধ্যান করছে, দেবসদৃশ মনুষ্যগণ, তাঁরাও যেন ধ্যান করছেন - ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবন্তরীক্ষং। তুমি ধ্যানের উপাসনা কর। ধ্যানেও যখন নারদ পূর্ণ শান্তির সন্ধান পেলেন না, তখন সনৎকুমার বললেন -

- সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।

সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন নারদের কিছুটা জ্ঞান হ'ল তখন সনৎকুমার তাঁকে বললেন - দেখ নারদ, যা ভূমা তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই - যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত, আর যা অল্প তাই মর্ত্ত অর্থাৎ মরণশীল।

এই ভূমাতত্ত্বের সন্ধান, মনন ও স্বাধ্যায় করতে করতে নারদ অবশেষে আত্মভূমিতে অধিরূঢ় হলেন। তিনি সেই অচ্যুতভূমিতে উঠে অনুভব করতে পারলেন যে - আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সন্মুখে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই দক্ষীণে, আত্মাই এই সকল হয়েছেন। আত্মজ্ঞান যাঁর হয় তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হয়ে যান, তিনি নিজেই স্বরাট হন, সকল লোকে তাঁর স্বচ্ছন্দগতি - স স্বরাট ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

ভগবান সনৎকুমারের উপদিষ্ট পন্থায় তপস্যা করে নারদ তমসার পরপারে সেই মহাজ্যোতিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

দেবর্ষি নারদের সেই তপস্যাস্থলে বহু সুকৃতিবশে বাবার আশীর্বাদে আসতে পেরেছি। বাবাকে প্রণাম, দেবর্ষিকে প্রণাম।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। শোভানন্দজীর ডাকে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল।

উভয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম। শোভানন্দজী অনেকক্ষণ ধরে নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে জপ্ করতে লাগলেন। স্নানের পর আমি শীতে কাঁপছিলাম, তাই মন্দিরে ফিরে এলাম। মন্দিরে প্রায় সন্ধ্যাবেলায় পৌঁচেছিলাম, ভাল করে মন্দিরের ভেতরটা দেখা হয় নি। মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গ দেখে আমি চমকে উঠলাম। প্রায় সাড়ে তিনহাত শিবলিঙ্গ তাতে নানা বর্ণের সমাবেশ, লাল, নীল, শ্বেত ও কালো বর্ণের অজস্র ফুল লিঙ্গের মধ্যে যেন ফুটে আছে। শিবলিঙ্গের সমূহ চিহ্ন স্পষ্ট করে দেখার জন্য তা জল ঢেলে ভালভাবে পরিষ্কার করার ইচ্ছা হ'ল। শিবলিঙ্গের গায়েই এক মোটা ত্রিশূল, কিন্তু তাতে কোন মরচে ধরে নি। শিবলিঙ্গের পেছনে একটা ছোট কুঠুরীর মধ্যে একটা তামার কলস, তার গলা অবধি পোঁতা; মন্দিরের নৈঋত কোণে একটা মাটির কুঁদাও পড়ে আছে, ধুলায় ভর্তি।

আমি সেই কুঁদাটি নিয়ে ঘাটে নামলাম, শোভানন্দজী তখনও বসে 'রেবা' মন্ত্র জপ্ করে চলেছেন। চার-পাঁচবার যাতায়াত করে তামার কলসীতে জল ভরলাম খাবার জন্য। জল দিয়ে শিবলিঙ্গটিকে ধুলাম। হাতে করে ভালভাবে মার্জনা করতে করতে দেখলাম, লিঙ্গের ভিতরে একটি ত্রিশূল ও পিঙ্গলাভ জটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এমন সময় শোভানন্দজী কোথা হতে আট দশটি বুনোফুল হাতে নিয়ে ঢুকলেন। শিবলিঙ্গটিকে ভালভাবে পরিস্কার করা হয়েছে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন, পূজা জপের শেষে আমাকে কাছে ডেকে বললেন -

-দেখিয়ে মার্কণ্ডজীনে ইনকো নাম দিয়া শূলীলিঙ্গ। নারদজীনে ইধরই তপস্যা কিয়ে থে। লে আইয়ে ত আপকা পিতাজীকা খাতা, লকছন মিলা মিলাকর বাতাইয়ে ত মুঝে উস্ শিউজী কোনসা হৈ !

আমি খাতাটি নিয়ে এসে লক্ষণ মিলিয়ে তাঁকে বললাম, মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কি কোন ভুল হবে ? বাবার খাতাতেও শূলীলিঙ্গের লক্ষণ হিসেবে যা বর্ণনা আছে, তা এই শিবলিঙ্গের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ড হ'তে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বাবা লিখে গেছেন যে - শূলীলিঙ্গের গাত্র নানা বর্ণময় হবে, তার মধ্যে ত্রিশূল ও পিঙ্গলাভ জটার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান থাকবে -

নানাবর্ণ সমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্।
শূলীলিঙ্গং সমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্॥

শোভানন্দজী বললেন - একে ত নর্মদার উত্তরতট তার উপর স্বয়ং দেবর্ষি নারদের তপস্যাস্থল, উপরে মায়ের বাগিচাতে কলা, কাঁঠাল, আমলকীরও অভাব নেই - দু-বার নর্মদা পরিক্রমা করেছি, বয়সও হয়েছে, এখানেই যতদিন পারব থাকব বলে ঠিক করেছি। তোমার সামনে এখনও দীর্ঘপথ রয়েছে - দু - তিনদিন থেকে নর্মদা মায়ীকে স্মরণ করে বেরিয়ে পড়, এখনও বোধ হয় পঁচিশ মাইল পথ গেলে তুমি মান্দালাতে পৌঁছুতে পারবে, তারপরেই মুণ্ডমহারণ্য শেষ হবে। কাল যে ফল এনেছি তাই ভোগ দিয়ে আমরা প্রসাদ পাবো। কেবলমাত্র ফলাহার করেই এখানে থাকতে হবে। নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ।

আমি বললাম - আমার কোন অসুবিধা হবে না। দুজনে মিলে পূর্বদিনের সংগ্রহ করা ফলগুলি নর্মদাতে ধুয়ে এনে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হল। প্রসাদ পেয়ে মন্দিরের ধাপে বসে গল্প করছি, এমন সময় তিনজন বিকট দেহধারী নাঁগা এসে পৌছল। তাদের বেশভুষা বিচিত্র, কপালে ত্রিপুণ্ড্রের আকারে কয়লার কালি দিয়ে আঁকা তিনটি রেখা, একটা টাকার আকারে বড় সিঁদূরের ফোঁটা, বাঁহাতে চিমটা এবং লৌহশলাকা, ডান হাতে বহুছিদ্রযুক্ত একটা মাটির পাত্র। তাতে জ্বলন্ত অঙ্গার, একটা পাতার ওপর পাত্রটা ধরে রেখেছে, তাতে মাঝে মাঝে ঘি বা তেল এক ফোঁটা করে ফেলছে, প্রত্যেকেরই কোমরে মোটা শিকল জড়ানো আছে। তাদেরকে দেখেই শোভানন্দজী মন্দিরের ভেতর গিয়ে চার পাঁচটা ফল যা ছিল, তা তাদের আগুন-ভরা মৃৎপাত্রে 'নমো ভৈরবায়' বলে ভিক্ষা দিলেন। তারা নেমে গেল নর্মদার দিকে। বোধহয় বেলা তখন সাড়ে এগারোটা বারটা হবে।

তারা ঘাটের দিকে চলে যেতেই শোভানন্দজী বললেন - এইসব উগ্রমূর্তি নাঁগা ঠিকরনাথী সম্প্রদায়ের, এরা ভৈরবের উপাসক। গির্ণার পাহাড়ে গঙ্গাগিরি অবধূতানী নামে এক অবধূতানী ছিলেন, তার শিষ্য ছিলেন ঠিকরনাথ। ঠিকরনাথ থেকেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, গির্ণার, আবু, কচ্ছ গুজরাট অঞ্চলেই এদের দেখা যায়। এরা মদ্য মাংস সবই খায়, সব জাতিরই অন্ন ভক্ষণ করে। সাধু সন্ন্যাসী বা গৃহী সকলের পক্ষেই এরা উৎপাত স্বরূপ। যদি কেউ ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে বা বিলম্ব করে তাহলে চিমটার আঘাত দিয়ে নিজের শরীরকেই ক্ষত বিক্ষত করতে থাকে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে নাচতে থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এদের ভূতপ্রেত তালবেতাল প্রভৃতি পিশাচসিদ্ধি করায়ত্ত, তাই সকলেই এদেরকে ভয় করে।

আধঘণ্টা পরেই তারা ফিরে এল, এসে সিঁড়ির ধাপে বসে একটা ছোট ধুনুচির আকারের কল্কেতে গাঁজা সেজে তিনজনেই আমাদেরকে প্রায় ডিঙিয়ে 'ভেরোঁনাথ ভেরোঁনাথ' বলে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে মন্দিরে ঢুকে শিবকে নিবেদন করে প্রথমেই গাঁজার প্রসাদ দিলেন শোভানন্দজীকে, তারপর তিনজনে পর্যায়ক্রমে গাঁজা টানতে থাকলেন।

গঞ্জিকা সেবনের পর তাদের মধ্যে একজন আমাকে দেখিয়ে শোভানন্দজীকে বলল - উস্ রোজ্ ইন্ লেড়কাকো হম্ জমাত্ মেঁ দেখা থা, আচ্ছিতরেসে ইনোনে কালিকানন্দকো ডাঁট দিয়া। ইহ্ ক্যা আপকে সাথমে পরিক্রমা কর রহা হৈ ?

সাধু উত্তর দিলেন - নেহি জী। ইহ্ একেলা পরকরমা কররহা হৈ, হমারা সাথ কুকুরামঠ তীর্থ মে ভেট হুয়া। আপ ঠারতা হ্যায় কঁহা ?

সেই নাঁগা পাহাড়ের উপর দিকে ঈশান কোণে আঙুল বাড়িয়ে বলল - উধর এক শিউজীকা মন্দির হৈ। হম্ লোগকা সাথ মেঁ ঔর এক নাঁগা হৈ, উহ্ হমারা গুরুভাই হৈ। সামান্ উমান্ লেকর উহ্ উধারই ঠারতা হৈ। আপকো ইহ্ ফল কাঁহাসে মিলা ?

শোভানন্দজী তাদেরকে সেই মায়ীকী বাগিচা দেখাতে চললেন, আমিও সাথে গেলাম। পাহাড়ের উপর এই ফলের বাগান দেখে তাদের উল্লাস দেখে কে! পুরো দুটো কলার কাঁদি এবং এক ঝোলা পেঁপে ও পেয়ারা নিয়ে তারা চলে গেল - 'ভৈঁরো ভৈঁরো ঠিকরনাথ' বলতে বলতে। আমরাও কিছু ফল নিয়ে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম।

নারদেশ্বর তীর্থে তিনদিন কেটে গেল ফলাহার করে। চতুর্থ দিনে শোভানন্দজী আমাকে বিদায় দিলেন। নর্মদাতে স্নান সেরে বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ্ তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে উৎরাই-এর পথে সেই নর্মদা মায়ের ফলের বাগিচা পর্যন্ত এলেন, বাগানটা বোধহয় নর্মদা তীরে একমাইল চলে গেছে সোজা পূর্ব থেকে পশ্চিমে। গোটা চারেক বড় বড় কলা এবং ছয়টা 'জিসম' আমার ঝুলিতে দিয়ে বললেন-সামনের রাস্তায় যে অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, ঐ পথের রেখা ধরে চলে যাও, খুব সাবধান, মুণ্ডমহারণ্যে যার চলার অভ্যাস নেই, সে পদে পদে পথ হারিয়ে ফেলে। অনেক পরিক্রমাবাসী বেঘোরে মারা পড়ে, তুমি সর্বদা রেবা মন্ত্র জপ্ করতে করতে হাঁটিবে, মা রেবাই তোমাকে রক্ষা করবেন।

আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আমি প্রণাম করে আর তাঁর চোখের দিকে তাকালাম না, আমার নিজের চোখ-ই জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে স্মরণ করে এগিয়ে চললাম পাথর ডিঙিয়ে। অনেকটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। যেন অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারের রাজত্বে ঢুকছি। চোখের সামনে শুধুই বড় বড় পাথর আর গাছের গুঁড়ি। কোথা থেকে জল আসছে কে জানে। পায়ের নিচের পাথর ভেজা এবং পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই শেওলা ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নিচে পড়ে পাথরের ঠোক্করে হাড়-পাঁজরা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

এইভাবে প্রায় তিন ঘন্টা হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম যেখানে ঝরা পাতার রাশির মধ্যে পা দুটো ভুস্ ভুস্ করে ডুবে যেতে লাগল। হাতের লাঠি দিয়ে দেখে দেখে পাতার গভীরত্ব বুঝে এদিক ওদিক সুবিধামত পা ফেলে এগোতে লাগলাম। টর্চের ব্যাটারী শেষ হয়ে গেছে, কাছে ঘড়ি নেই। তবুও অনুমান করলাম, এখনও সন্ধ্যা হয় নি। বড় বড় পাথরের চাঙড় এবং ঝরা পচা পাতার রাশি দেখে মুহূর্তের জন্য গাড়সরাইয়ার সেই সাপের কথা মনে পড়ল। বাঘ সাপ যে কোন জীবন্ত মৃত্যুই এ জঙ্গলে কোথায় যে ওৎ পেতে বসে আছে জানিনা।

মনে ভয় দেখা দিল, আমি প্রাণপণে বাবাকে স্মরণ করতে করতে ইষ্টমন্ত্র জপ্ করতে লাগলাম। মাত্র দু বছর আগে বাবা আমাকে ছেড়ে গেছেন, মন এমনিতেই খুব উদাস, তার উপর ঘনঘোর জঙ্গলে একা এই বিপদসংকুল পথে হাঁটছি, নিজের একাকীত্ব ও অসহায়বোধ বড় বেশী করে অনুভব হচ্ছিল। বাবা আমাকে নর্মদা পরিক্রমা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এই পরিক্রমার besic condition হ'ল প্রবৃত্তি নিবৃত্তির উর্ধ্বে উঠতে হবে, নর্মদার কাছে কিছু চাইতে নেই, নর্মদাকে কেবল বলতে হয়-আমার জীবনে শিবদর্শন ঘটুক, আমার মনুষ্যজীবন ধন্য ও সার্থক হোক। কখনও দল বা 'জমাতের' সঙ্গে পরিক্রমা করতে নেই। কুম্ভমেলা বা অন্যান্য বড়বড় মেলায় যে সাধুদের জমায়েৎ হয়, তাদের মধ্যে বিষয়ীর চেয়ে আরও উৎকট বিষয় চিন্তা, সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাদি বিষয় নিয়ে আরও অনেক অবান্তর ব্যাপার থাকে। বাবার কথা যে কত রূঢ় সত্য তা আমি নিজেও তীর্থভ্রমণকালে উপলব্ধি করেছি। তবুও এই মুহূর্তে মনে হ'ল, কোন জমায়েতের সঙ্গে থেকে পরিক্রমা করলে বোধহয় ভাল হ'ত, অন্ততঃ নিরাপত্তা থাকত। অজানা পথে, ঘোর জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে এত অসহায় মনে হ'ত না। হাঁটছি আর ভাবছি।

কতক্ষণ পরে একটা আওয়াজ কানে ভেসে এল 'হর নর্মদে হর'। বড় গাছের ফাঁকে যেন মশালের শিখা দেখতে পেলাম বলে মনে হ'ল। আমি শুনেছি - মুণ্ডমহারণ্যে সাধু সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ মশাল জ্বেলে দিনের বেলাতেও যাতায়াত করেন, বাঘ ভালুক হয়েনা ও নেকড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের পথে মশালের আলো পথ চলতে সাহায্য করে। আলোর শিখা এবং 'হর নর্মদে হর' শব্দ শুনে মনে অনেকখানি ভরসা দেখা দিল - প্রবল উৎসাহে হাঁটিতে লাগলাম আওয়াজ ও আলোর শিখা লক্ষ্য করে। যখন শিখা গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজ শুনবার চেষ্টা করি। দুর্গম পথে অসহায় পরিশ্রান্ত পথিকের কানে মানুষের কণ্ঠস্বর যে কতখানি সাহস দেয়, ভরসা দেয়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাউকে বোঝানো যাবে না।

পা আর চলছে না, বারবার ঠোক্কর খাচ্ছি, কখনও বা ঝরাপাতার মধ্যে পা দুটো ভুস্ করে ডুবে যাচ্ছে। তবুও মনে ভরসা - ঐতো আর কিছুটা গেলেই মানুষের মুখ দেখতে পাবো। তারা আসছে। আশায় আশায় প্রায় আরও একঘন্টা হাঁটা হয়ে গেল, সমানে আমি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে কম্পমান মশালের আলোর শিখাও বড় বড় গাছের ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি। এতখানা হেঁটে এসেও তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না কেন, তাঁরাও ত এগিয়ে আসছেন। ভাবলাম তাহলে সাধুরা বোধহয় হাঁটছেন না, জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ডেরা বেঁধেছেন। শীত ও হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বালিয়েছেন এবং সেখান স্থির হয়ে বসে শিব ও নর্মদার পবিত্র নাম করছেন।

কিন্তু না, তাঁদের কাছাকাছি হতে পারলাম না, কিছুক্ষন ধরে আর কোনও কণ্ঠস্বর কানে আসছে না, মশালের ক্ষীণতম আলোও দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতেই যেই একটা মোড় ঘুরলামদেখলাম জঙ্গল ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এল, লোকজন মশাল কোথাও কিছুই নেই। কতকটা সমতল উপত্যকার মত, একটা ভাঙা জীর্ণ মন্দির ভূতুড়ে বাড়ীর মত দাঁড়িয়ে আছে, মাথার উপর আকাশে তাকিয়ে দেখলাম, সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। পাহাড়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকের ঢালের কাছে পাঁতি পাঁতি করে দেখলাম - কোথাও কেউ নেই। চারদিকে বড় বড় শাল সাজা শালাই গাছ দাঁড়িয়ে আছে, মন্দির থেকে প্রায় শ দুই হাত দূরে একটা বটগাছও আছে। মন্দির ও বটগাছের পাশ দিয়ে পরিস্কার একটা চলার পথের দাগ রয়েছে। নারদেশ্বর তীর্থ হতে আমি এই পথেও আসতে পারতাম, আমি বোধহয় পথ হারিয়ে নিবিড়তম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। কিন্তু আলো এবং আওয়াজ কোথা থেকে এল, আমি তো মশালের আলো এবং মানুষের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করেই এখানে এসে পৌঁছুলাম - পাহাড়ের উপর শুষ্ক পার্বত্য পথে হেঁটে এলাম, কোথাও কোন ঝর্ণা দেখলাম না, জলা বা জল কোথাও নেই। তাছাড়া এখনও সন্ধ্যাই হয় নি। তাহলে আলেয়া কোথা থেকে দেখব! ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আগের দেখা আলোর শিখা এবং সুস্পষ্ট 'হর নর্মদে হর' ধ্বনিকে আমার উপর কোনও অলৌকিক অদৃশ্য শক্তির অহৈতুকী করুণার প্রকাশ বলে মনে হ'ল। আনন্দ ও উচ্ছাসে আমি পথের উপর শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। বাবা এবং নর্মদা মাতার উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম করতে থাকলাম।

সহসা শুনতে পেলাম 'ভৈরোঁ ভৈরোঁ ঠিকরনাথ' - 'ভৈরোঁ ভৈরোঁ ঠিকরনাথ' - 'হর নর্মদে হর'। চমকে উঠে পড়লাম, মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখলাম, নারদেশ্বর ঘাটে যাদেরকে দেখেছিলাম সেই ভীষনদর্শন চারজন নাঁগা বীরদর্পে এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়েই একসঙ্গে বলে উঠল - আরে পণ্ডৎ, তুম ক্যায়সে ইধর আ গয়া। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। আমার সঙ্গে তারা আর কোন কথা বলল না। পাথরের উপর তাদের মোটঘাট রেখে ঝোলা থেকে মদের বোতল বের করে ঢকঢক করে প্রত্যেকেই কতকটা করে গলায় ঢাললো। আমাকে জিজ্ঞাসা করল - ক্যা পণ্ডৎ, আপকে পাশ রুপেয়া হৈ ? উত্তর শোনার তর সইলো না, আমার ঝোলা ও গাঁঠরী খুলে পাতি -পাতি করে সব খুঁজলো। টর্চটা নিয়ে নিজেদের ঝোলায় রাখল।

ভাবলাম - এরা সাধু না ডাকাত ?

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে নিজেদের বিছানা পেতে ফেলল। আমাকে বলল - ইধর আউর ত জাগাহ্ নেহি হৈ। তুম্ উধর ঠারো। 'উধর' বলতে যেদিকের দেওয়াল কতকটা ধ্বসে গিয়ে পাথরগুলো ভেঙে পড়েছে। টাঙি নিয়ে দুজন কতকগুলো শুকনো কাঠ ও ডালপালা কেটে আনল। কাঠের আগুন জ্বেলে এবার বসল তারা রুটি তৈরী করতে। সূর্য সবেমাত্র তখন অস্ত গিয়েছে। সমগ্র পাহাড় ও বনভূমি নিথর অন্ধকারে ঢেকে গেল। আমি অগত্যা ভাঙা দেওয়ালের দিকে গিয়ে পাথরে ঠেস্ দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম। তাতেও নিষ্কৃতি পেলাম না। আমি সন্ন্যাসী নই বলে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে লাগল। নারদঘাটে শোভানন্দজীর কাছে যে লোক আমার তারিফ করেছিল, কালিকানন্দকে সমুচিত জবাব দেবার জন্য। তাকেই দেখলাম অসভ্য ব্যঙ্গ বিদ্রুপে অতিরিক্ত মুখর হয়ে উঠতে। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল -

> পঢ়ি পঢ়িকে পণ্ডৎ পাত্থর ভয়ে,
> লিখি লিখি ভয়ে ইঁট !

অর্থাৎ পণ্ডিতরা পড়ে পড়ে পাথর হয়েছে, লিখে লিখে হয়েছে ইঁট।

> বেদ পুরাণ মেঁ ন পাবে কোই
> ঠিকরনাথ মানো পাবে সোই।

বেদ পুরাণে বৃথা খুঁজে মরছো, ঠিকরনাথকে মানো তবে কিছু বস্তুর সন্ধান পেতে পারো।

কিছুক্ষণ এইভাবে জ্বালাতন করে তাদের ভোজন বানানোর কাজ শেষ হ'ল। তখন তারা মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ ও যোনিপীঠের ওপর তাদের সেই বহুছিদ্রযুক্ত ঠিকরাগুলি সাজিয়ে রাখল। তারপর যে যার ঠিকরায় ফোঁটা ফোঁটা মদ ঢেলে - ভৈরোঁ ভৈরোঁ ঠিকরনাথ। ভৈরোঁ ভৈরোঁ ঠিকরনাথ - এই বলে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আরও কত রকম দুর্বোধ্য রহস্যমন্ত্র তালে তালে উচ্চারণ করতে থাকল, তার বিন্দু-বিসর্গও আমার বোধগম্য হ'ল না।

বসে বসে তাদের তাণ্ডব নৃত্য দেখছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আলোর ঝলক্ তারপরেই বনভূমি কম্পিত করে গুড় গুড় কড়াৎ করে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হ'ল। মেঘের শব্দ, বাইরে সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দে ঝড়ের আভাস পেলাম। একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। ভাঙা মন্দির কাজেই যেখান সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল মন্দিরের মধ্যে। চার ভৈরবের মধ্যে এবার চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাণ্ডব নৃত্য থামিয়ে এবার যে যার বিছানা কম্বল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নাচের সময় মদের ঘোরে বোধহয় তারা আমার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু মন্দিরের যে কোণটাতে আমি বসেছিলাম সেই কোণটুকুতে বৃষ্টি পড়ছে না দেখে আমার দিকে চারজনই তেড়ে এসে বলল - শালে লোগ্ ভাগো হিঁয়াসে, আভি নিকালো।

তাদের মারমুখী রুদ্রমূর্তি দেখে আমার কম্বল, বইপত্র ঝোলা কোনমতে কুশাসনে জড়িয়ে দণ্ডটি হাতে করে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের বাইরে আসতে বাধ্য হলাম। শীতকালের বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে যেন ছুরির খোঁচা লাগার মত বিঁধছে বলে মনে হ'ল। আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, সেই আলোতে সামনের বটগাছটা চোখে পড়ল। বৃষ্টির চেয়ে মেঘের গর্জন অনেক বেশী, মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে। আমি কোনমতে বটগাছের গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। বৃষ্টির হিমশীতল ফোঁটা গায়ে পড়ে তীরের মত বিঁধছে। লাঠি এবং হাত দিয়ে ঝুরি ঠেলে ঠেলে গুঁড়ির কাছাকাছি বটের কোলে গিয়ে বসলাম। সম্পূর্ণ ভিজে গেছি, কাঁপছি শীতে। মাঝে মাঝেই বজ্রপাতের শব্দ। মনে হচ্ছে আজ রাত্রেই যেন প্রলয় ঘটবে। মড়্ মড়্ শব্দে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে, বড় বড় গাছ পড়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছি। বৃষ্টি আরও যেন ঝেঁপে এল। একটু পরেই কড়্..কড়্..কড়াৎ চোখের সামনে হঠাৎ লক্ষ সূর্যের আলো জ্বলে উঠল, মনে হ'ল আমার আশ্রয় এই বটগাছটার ওপরেই বাজ পড়ল - কানের পর্দা বোধহয় ফেটেই গেল.. দুহাত দিয়ে চোখ টিপে ধরেছি। মুহূর্তের মধ্যে আবার বজ্রপাত - দুড়দাড় শব্দে কোথায় যেন কি ভেঙে পড়ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর গর্জন ভেসে আসছে। প্রায় দুঘন্টা পরেই বৃষ্টি থেমে গেল, ঝড়ের বেগও শান্ত হয়ে এল। এখনও আমার হাত পা অসাড়, আর বসে থাকতে পারলাম না, সেইখানে ভেজা পাথরের উপরেই গড়িয়ে পড়লাম।

যখন চেতনা এল, তখন বুঝতে পারলাম সকাল হয়ে গেছে। মনে হ'ল, আমি বাবার কোলে মাথা দিয়ে এতক্ষন ঘুমিয়েছিলাম, ধড়ফড় করে উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মনে পড়ল - নর্মদা তীরে ভাঙা মন্দিরে ঝড়ের রাতে আশ্রয়, চারজন ভীষণমূর্তি সাধুর আমাকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেয়া প্রবল ঝড় জলের মধ্যে।

বটের ঝুরির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঝড়ের ভয়াবহতা বুঝতে পারলাম। বহু বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে, পাথরের মন্দিরটার দিকে তাকিয়েই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল, দেখি মন্দিরটা ভেঙে পড়েছে, একদিকের যেটুকু দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তাতে পোড়া দাগ, যেন গোটা মন্দিরে আগুন লাগানো হয়েছিল। দৌড়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম, একজনের দুটো পা পাথর চাপা দেখে বুঝতে পারলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে। উঁকি দিয়ে চারজনেরই বীভৎস দশা দেখে শিউরে উঠলাম। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল, জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, এ অবস্থায় আমি আর কি করতে পারি। নতজানু হয়ে বিদেহী আত্মার প্রতি প্রার্থনা করলাম।

এখানে আর অপেক্ষা করা চলে না। ভিজা কম্বল কুশাসনের গাঁঠরী বেঁধে ঝড়ে-পড়া গাছ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটিতে লাগলাম। নর্মদা যেদিকে আছে সেই দিকটা আন্দাজে অনুমান করে। শরীর আর চলে না, পা দুটো অবশ, তবুও এই মৃত্যুপুরী থেকে দূরে পালাতেই হবে। এদিকটায় শাল ও আবলুষ কাঠের জঙ্গল, খুব বেশী ঘন বলে মনে হচ্ছে না, মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা ভেদ করে সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে। ঝড়ে অনেক গাছের মাথার দিক ভেঙে বাতাসে উড়ে গেছে, এইজন্য সূর্যরশ্মির ছিটে ফোঁটা ভেতরে এসে পড়ছে। সূর্যের আলো দেখে পশ্চিম দিক আন্দাজ করে এগিয়ে যাচ্ছি। কারণ নর্মদা পশ্চিমগামিনী, পশ্চিমে গেলে তবেই তাঁর দেখা মিলবে, প্রায় দু ঘন্টা হাঁটার পর একটা পরিষ্কার জায়গা পেলাম, এদিকটায় বোধহয় গত রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডব হয়নি, প্রায় চল্লিশ হাত জায়গা জুড়ে রোদ পড়েছে। সমস্ত ভেজা কাপড়, কম্বল, কুশাসন রোদে মেলে দিলাম, নিজেও রোদ পোয়াতে বসলাম।

প্রায় আধঘন্টা কেটে গেছে, এমন সময় বনপথে একটা ঝমঝম শব্দ, তার সঙ্গে আলেখ্ আলেখ্ ধ্বনি শুনতে পেলাম। একটু পরেই দেখতে পেলাম পাঁচজন সাধু আসছেন, তাঁদের সঙ্গে বাঘা বাঘা কুকুরও পাঁচটা। তাঁদের পরিধানে সিল্কের খেলকা, ভেতরে গেরুয়া রঙের সোয়েটার, কপালে বিভূতি, গলায় রুদ্রাক্ষ। কারো পায়ে ঘুঙুর, কারো পায়ে তোড়া, প্রত্যেকের আঙুলে কারও সোনা, কারও রূপা, কারও বা তামার আংটি। হাতেও নানা রকমের অলঙ্কার, বাম কাঁধে বড় বড় ঝুলি, বাম হাতে ভিক্ষাপাত্র - নারকেলের করঙ্গা, ডান হাতে পাঁচনরী সাতনরী হারের মত বড় জিঞ্জির, তাতে রূপা, পিতল ও তামার বড় বড় চাকতি লাগানো। চলতে চলতে সেই জিঞ্জিরগুলি দুলিয়ে দুলিয়ে নাড়াচ্ছে আর তালে তালে বলে চলেছে - আলেখ্ আলেখ্। তাঁদের কোমরে জড়ানো আছে পাঁচ থাক করে ঔর্ণ রশ্মি (ঔর্ণ - পশম, ভেড়ার লোমে তৈরী)। কাছাকাছি হতেই আমি তাঁদেরকে নমস্কার করলাম। আমার পরিশ্রান্ত মুখ চোখ দেখে তাঁদের বোধহয় দয়া হ'ল। আমার কাছেই তাঁরা রোদে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন - আমরা আলেখিয়া, আমাদের উপাস্য অলখ্ নিরঞ্জন। কাঁধের যে ঝুলি, এর নাম ভৈরব ঝুলি, কোমরের এই যে রশ্মি, এর নাম মাতঙ্গা। তীর্থভ্রমণ আমাদের ব্রত, ভিক্ষা আমাদের প্রধান বৃত্তি। ভৈরব - ঝুলি আমাদের কাছে পরম পবিত্র, এর মধ্যেই আমাদের ঋদ্ধি থাকে। এই ঝুলিতে আমাদের যে ভিক্ষা জোটে তাই দিয়ে আমরা যতজনকে পারি, নিরন্ন গৃহী বা অভুক্ত সাধু তাদেরকেই আগে ভোজন করাই, তারপর ভুক্তাবশিষ্ট থেকে প্রসাদ গ্রহণ করি। এই নিরন্ন নর-নারায়ণের সেবা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন-চর্যা।

আমি সশ্রদ্ধভাবে বললাম - আপনাদের আদর্শ মহান।

এতো কোঈ নয়া চিজ্ নেহি হ্যায়, শাস্ত্রকা নির্দেশ পর হমলোগ্ চলতা হৈ। মার্কণ্ডেয় মুনি রাজা উত্তানপাদকে উপদেশ দিয়েছিলেন -

দরিদ্রান্ ভর ভূপাল মা সমৃদ্ধান কদাচন।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ **(রেবাখণ্ডম্, পঞ্চাশ অধ্যায়)**

হে রাজন! দরিদ্রদের ভরণপোষণ কর, কদাচ ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তিকে দান করবে না। দেখ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরই ঔষধের প্রয়োজন হয়, যে নীরোগ তার ঔষধে কি দরকার? অর্থাৎ যার নেই যে অভুক্ত তাকেই দান করতে হয়, যার কোন অভাব নেই, তাকে দান করার কি প্রয়োজন ?

আমি তাঁদের এই মহান ব্রতের পুনরায় উচ্ছসিত প্রশংসা করে কোন পথ দিয়ে নর্মদায় পৌছব তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন - চল, পাঁচ মিনিট সঙ্গে গিয়ে তোমাকে পথটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। মাত্র একমাইল হেঁটে গেলেই নর্মদার দর্শন পাবে। আর সবাই বসে রইলেন, তিনি একাই আমাকে পথ দেখাতে চললেন, সঙ্গে তাঁর কুকুরটিও চলল। বনের মধ্যে পাথরের উপর দিয়ে একটা রাস্তার চিহ্ন দেখিয়ে বললেন - এই পথে গেলে নর্মদার মহান তীর্থ গঙ্গাবাহ ঘাটে গিয়ে পৌছতে পারবে। ভৃগুতীর্থে সঙ্গমের কাছাকাছি নর্মদার দক্ষিণ - তটেও গঙ্গাবাহ তীর্থ আছে। শাস্ত্রে আছে, প্রসিদ্ধ মহাযোগেশ্বররাও বলে গেছেন, এই ঘাটে গঙ্গা প্রত্যহ আসেন নর্মদা-স্নানে।

সাধু ফিরে গেলেন সঙ্গীদের কাছে, আমি তাঁর দেখান পথে হাঁটতে লাগলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম সাধুর কথা। যে দেশে শত শত বৎসর পূর্বে ঋষির মুখে উচ্চারিত হয়েছিল 'দরিদ্রান ভর ভূপাল!' সেই দেশে আজ বিদেশ থেকে আমদানী করা বিজাতীয় ক্রুর পন্থায় সর্বহারার দুঃখ দূর করার ছলনা চলছে।

আমি ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর বনে প্রবেশ করছি বুঝতে পারলাম। বিশাল বিশাল আকাশছোঁয়া গাছের ডালপালা মিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের পথ। বড় বড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, কখনো উবু হয়ে বসে কখনো বা শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে নর্মদার ঘাটে পৌছে গেলাম। নর্মদাকে দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাছগুলো এখানে এত বড় যে তাদের বড় বড় শাখা নর্মদার কতকটা জলকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। গতকাল থেকে সম্পূর্ণ অভুক্ত, রাত্রের লোমহর্ষক ঝড়ের দাপট সহ্য করতে হয়েছে। সমস্ত স্নায়ু শিরা বিপর্যস্ত, পেট ভরে নর্মদার জল খেয়ে ঘাটের পাথরের উপরেই শুয়ে পড়লাম, শুয়ে পাহাড়ের উপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, একটু দূরেই বনের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকারে এক বিশাল মন্দির দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ শুয়ে অয়েল ক্লথের থলি থেকে রেবাখণ্ডম্ বইটি বের করে গঙ্গাবাহ তীর্থের কথা পড়তে লাগলাম। মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন - পূর্বকালে মহাপুণ্যা গঙ্গা এইস্থানে নারায়ণের উদ্দেশ্যে উগ্র তপস্যা করেছিলেন।

নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন -

তপসা তব তুষ্টোহহং মৎপাদ্যম্বুজ সম্ভবে।
মত্তঃ কিমিচ্ছসে দেবি। ব্রূহি কিং করবানি তে॥

আমার পাদপদ্ম হতে উদ্ভূতা দেবি! তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। বল, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি? গঙ্গা উত্তর দিলেন - ভগীরথের তপস্যার প্রভাবে আমি তোমার এবং গঙ্গাধরের কথায় এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছি, আমাকে তোমার পাদোদ্ভূতা জেনে আমার জলে ব্রহ্মঘাতী, গুরুনিন্দুক, পিতৃমাতৃত্যাগী, অগম্যাগামী, মিথ্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, দানে নিষেধকারী, ব্যভিচারী প্রভৃতি সকল রকমের পাপিষ্ঠগন নিত্য অবগাহন করে পাপমুক্ত হচ্ছে। আমি তাদের পাপরূপ ক্ষারে নিত্য দগ্ধ হচ্ছি। যাতে আমি তাদের পাপের জ্বালা এবং স্পর্শ হতে রক্ষা পাই তার উপায় বলুন।

ভগবান বিষ্ণু বললেন - তুমি এইস্থানে নিত্য নর্মদা জলে প্রবেশ করবে। আমি এবং মহেশ্বর সতত এখানে বিরাজ করব। লোককৃত দুঃসহ পাপের জ্বালা তোমার দূরীভূত হবে, আজ হতে এই তীর্থ গঙ্গাবাহ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হল। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ঋষি পরম্পরা সকলেই এই তীর্থের সেবা করবেন।

আমার মনে পড়ল, এই তাহলে সেই ঘাট যেখানে যোগেশ্বর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, মা গঙ্গা কৃষ্ণা গাভীর রূপ ধারণ করে নর্মদা জলে স্নান করলেন এবং শ্বেতবর্ণ ধারণ করে মহারণ্যের মধ্যে অন্তর্হিতা হলেন।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নর্মদাতে নেমে স্নান করলাম। তর্পণাদি সেরে মন্দির লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। ভাবলাম, এই মন্দিরেই কিছুদিন বিশ্রাম করব। খুব খিদে পেয়েছে, আর হাঁটতে পারছি না।

মন্দিরের পৈঠায় গাঁঠরী রেখে কমণ্ডলু হাতে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। একটু ঠেলতেই আবলুষ কাঠের বহু পুরোন মোটা দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। মন্দির বেশ বড়, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, মন্দিরের ভেতরে এক অপূর্ব সুগন্ধ। শিবলিঙ্গটিও অদ্ভুত। লিঙ্গের অর্ধভাগ রক্তিমবর্ণ, বাকি অর্ধভাগ শুভ্র। ভেতরে সুস্পষ্ট ত্রিশূল ও ডম্বরু চিহ্ন অঙ্কিত আছে। প্রায় এক ফুট উঁচু। খাতাতে লেখা লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারলাম যে ইনি অর্ধনারীশ্বর। এঁর পূজা করলে মানুষের আর কথা কি, দেবতাদেরও অভিষ্ট সিদ্ধি হয়। দেবতারাও মহাদেবের এই রূপের পূজা করেন।

ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্ররক্তার্ধভাগতঃ।
অর্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্বদেবৈরভীষ্টদম্॥

আরও কোন লক্ষণ চোখে ধরা পড়ে কিনা তা দেখার জন্য কমণ্ডলুর জল ঢেলে হাতে করে ঘষে ঘষে লিঙ্গটিকে দেখতে লাগলাম।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে পেছন ফিরতেই দেখতে পেলাম, জটাধারিণী এক বৃদ্ধা আমার পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন। হয়ত কোন ভক্ত-মা পূজা করতে এসেছেন, এইভেবে আমি শিবলিঙ্গের কাছ হতে সরে এলাম। তাঁর হাতে একটি বড় মাটির ঘট, তিনি তা হতে শিবলিঙ্গের উপর কিছুটা ঢেলে ঘটটা আমার সামনে মেঝেতে রেখে দুধটা পান করার ইঙ্গিত করেই মন্দিরের ধাপ অতিক্রম করে নেমে গেলেন। দ্রুতপদে। কোনদিকে যাচ্ছেন তা দেখার জন্য মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি ঘাটের পাশ দিয়ে নর্মদার কিনার ধরে পূর্বদিকে হেঁটে যাচ্ছেন। ক্রমে তিনি বন ও পাহাড় পথে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখি, শালপাতা দিয়ে কিছু ঢাকা আছে। পাতা খুলতেই চোখে পড়ল - আটখানা গরম পুরী এবং লাড্ডু। অনুমান করলাম, আমি যখন তন্ময় হয়ে শিবলিঙ্গের মধ্যে লক্ষণ খুজছিলাম, তখন প্রথমেই হয়ত খাবারটা এককোণে রেখে দিয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ধারে কাছে নিশ্চয়ই কোন গোঁড় পল্লী আছে, শিবপূজা করতে এসেছিলেন, মন্দিরে যদি কোন পরিক্রমাবাসী সাধু থাকেন, তার সেবার জন্য পুরী লাড্ডু সঙ্গে এনেছিলেন।

দুদিন ধরে কিছু খাইনি, ক্ষুধার্তের আর বেশী কিছু চিন্তা করার সময় কোথায়, সামনেই যখন সুখাদ্য উপস্থিত। আমি পরিতৃপ্ত সহকারে খেতে লাগলাম। পুরী লাড্ডু জীবনে অনেক খেয়েছি কিন্তু এমন সুঘ্রাণযুক্ত সুস্বাদু পুরী লাড্ডু জীবনে আর কখনো খাইনি। খাবার শেষ করে দুধের ঘট থেকে দুধ মুখে ঢেলে কতকটা খেয়েছি এমন সময় দেখলাম বিরাট জটাজুট এক সাধু ঝড়ের বেগে মন্দিরে এসে ঢুকলেন এবং আমার হাত থেকে ঘটটা কেড়ে নিয়ে শূণ্যে তুলে নিজের মুখে ঢেলে ঢকঢক করে বাকী দুধটুকু শেষ করলেন। ঘটটা হাতে নিয়েই তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নর্মদার দিকে। এঁটো পাতা হাতে নিয়ে আমি নর্মদার ঘাটে গেলাম, পাতাগুলো ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুতে। দেখলাম সেই সাধু ঘটসহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন নর্মদার জলে। নর্মদার বুকে একটা আলোড়ন উঠল মাত্র। বেলা তখন বড়জোর একটা, এখানে অন্ধকার কিন্তু ওপারে সাতপুরা পর্বতমালা রোদে ঝলমল করছে। আধঘন্টা দাঁড়িয়েও সাধুর কোন পাত্তা পেলাম না।

মন্দিরে ফিরে গেলাম, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, একধারে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম দরজাটা বন্ধ করি কিন্তু তখনই মনে হল - খোলাই থাক, যদি কোন ভক্ত শিবপূজা করতে আসে।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সূর্য অস্ত গেছে। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেছে সমগ্র মহারণ্য। গাছপালা, পাহাড়, নর্মদা কোন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করলাম।

বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম নানা কথা। গত রাত্রির সেই ঝড়ের তাণ্ডব, ঠিকরপন্থী চার সাধুর শোচনীয় মৃত্যু, আলেখপন্থী সাধুদের সদাশয়তা, জটাধারিণী ভক্তমার খাদ্য ও দুগ্ধদান, জটাজুট সাধুর বিস্ময়কর প্রবেশ এবং প্রস্থান, ঘট নিয়ে নর্মদায় ঝাঁপ দিয়ে আর না ওঠা - একের পর এক সব এসে মাথায় ভীড় করল।

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর গর্জন ভেসে এল। বুঝতে পারলাম বাঘের হুঙ্কার। বাঘ শিকার ধরলে মনের আনন্দে গর্জন করে। মন্দিরের গা দিয়ে দুড়দাড় শব্দ, বন্য জন্তুরা দৌড়ে পালাচ্ছে, অরণ্য ভেদ করে বুনো কুকুরদের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এল। কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ। ভাবছি মন্দিরের মধ্যে আজ আমি নিরাপদ, দরজা বন্ধ আছে তাছাড়া এখানে বরাভয় শিব বিদ্যমান আছেন।

শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। হঠাৎ শুনি ফিসফাস শব্দ, যেন হাজার হাজার লোক অত্যন্ত চুপিসারে কথা বলছে। তাদের গুজ্ গুজ্ ফিসফিস শব্দ মন্দির গাত্রে যেন স্পন্দন তুলছে, দেওয়াল ভেদ করে আমার কানে এসে বিঁধছে। উঠে বসলাম। একটা Uncanny feelings-এ মনটা কেমন করে উঠল। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম, সেই শব্দের কোন কথা বুঝতে পারি কিনা। যেন হাজার হাজার লোকের শহরে আমি বসে আছি, সেই হাজার হাজার লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, যে যার নিজের কাজে যাচ্ছে, তাদের পদধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি। শহরের জনারণ্যে মানুষজনকে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মহারণ্যের এই অদৃশ্য জনতার কাউকে দেখতে পারছি না।

শুয়ে শুয়ে শুনতে পারছি অরণ্য-প্রকৃতির সোঁ সোঁ শব্দ ওঁকার-নাদে পরিণত হয়ে গেল।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই, সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি মন্দির দ্বারে বসে সেই জটাজুট সাধু এক বাণ্ডিল কাগজ নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছেন। মন্দির খুলে বেরিয়ে আসতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর নেমে গেলেন ঘাটে। আমিও স্নান করতে ঘাটে নামলাম।

স্নান করে মন্দিরে সবমাত্র ঢুকেছি দেখলাম গোটা কয়েক বনফুল হাতে নিয়ে সেই সাধু পুনরায় মন্দিরে এসে ঢুকলেন। তাঁর জটা থেকে জল ঝরে পড়ছে। হাতে করে নিজের জটা নিংড়ে শিবের মাথায় দিয়ে বললেন - লেও, ফুল চড়াও। ফুলগুলো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন -

ওঁ শুভঙ্করায় নর্মদা-শংকরায় তে নমঃ শিবায়। ১

ও কর্মপাশ-নাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়॥ ২

ওঁ শর্মদে নর্ম-ভস্মকণ্ঠ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়। ৩

ওঁ সংসার-ঘোরদুঃখহারিণে তে নমঃ শিবায়। ৪

ওঁ অন্তশ্চিন্ম্যত্রৈক লিঙ্গরূপদেহম্ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়॥ ৫

এহি হ্যায় মহামুনি মার্কণ্ডেয়জীকা সিদ্ধ মন্ত্র। এহি মন্ত্র সে নর্মদা লিঙ্গকা পূজা করনেসে সিদ্ধি আতী হৈ। এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলেন না। নর্মদাঘাটে নেমে জলে ডুব দিলেন।

মন্দিরের বাইরে এসে বসে মন্ত্রগুলি লিখে রাখলাম। এখানে আসার সময় পায়ে ঠোক্কর লেগে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা উড়ে গেছে। ভাবছি, পায়ের ব্যাথা সম্পূর্ণ না সেরে ওঠা পর্যন্ত এখানেই থাকব। শুধু জল খেয়ে তিন-চারদিন কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারব। চলার পথে দুর্গম মহারণ্যের মধ্যে আর কোথাও যদি এমন নিরাপদ স্থান না মেলে! এইসব ভাবছি, এমন সময় বনপথে মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে কেউ যেন আসছেন বলে মনে হল। 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি শুনতে পারছি। মন্দিরের ধাপের কাছাকাছি আসতেও তাঁর মুখ দেখতে পেলাম না। দুই হাত কাঁধ মুখ তাঁর ঝোলা কম্বল, আসবাবপত্রে ঠাসা। ধাপের উপর তাঁর বোঝা নামাতে দেখলাম সৌম্যকান্তি এক সাধু, বয়স মনে হয় পঞ্চাশ, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং একটি শিবলিঙ্গ, পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল। ত্রিশূলের সঙ্গে একটি টাঙিও দড়ি দিয়ে বাঁধা।

তিনি নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান করলেন, ধড়াচুড়া আঁটিলেন, বা হাতের উলটো পিঠে গলার শিবলিঙ্গটি স্থাপন করে ডানহাতে কমণ্ডলুর জল ঢেলে পূজা করলেন। তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্তব করতে লাগলেন -

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুর-তরুবর-শাখাসু লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।

(পুষ্পদন্তকৃত শিব-মহিম্ন স্তোত্রম্, শ্লোক ৩২)

অর্থাৎ সাধু কাঁদতে কাঁদতে বলছেন - নীলপর্বত যদি কালি হয়, সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লিখবার পাত্র হয় আর এই সমস্ত বস্তু দিয়ে স্বয়ং সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে তোমার মহিমার কথা লিখতে থাকেন তবুও হে শিবসুন্দর! তোমার গুণাবলীর শেষ কখনও হবে না।

সাধুর কান্না আমার মনকেও বিচলিত করল। নর্মদার ঘাট থেকে উঠে এসেই মন্দিরে ঢুকে শিবের সামনে হাতে তালি দিতে দিতে নেচে নেচে সাধু বলতে থাকলেন -

চলহ্ সাধ, চলহ্ সন্ত, রেবা-নদীমে নাহাইয়ে।
দর্শন করো নর্মদেশ্বর ফের না বাহোরী জগ্ আইয়ে ॥

সাধু সন্ত তোমরা সবাই চলো রেবা নদীতে স্নান করতে। নর্মদেশ্বর দর্শন করো, তাহলে তোমাকে আর এই দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যুর গোলকচক্রে আসতে হবে না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই চত্বরের এক কোণে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ দেখেই তিনি চমকে উঠলেন বলে মনে হ'ল। আমাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন - এ কাঁহাসে আয়া ?

আমি বললাম - আজ সকালেই এক জটাজুট সাধু নর্মদা-গর্ভ থেকে উঠে এখানে বসে এই কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছেন।

শুনেই বললেন - ধন্য হো, ধন্য হো, আপকা ভাগ্ আচ্ছা হৈ, উহ্ মহাসিদ্ধ মহাত্মা হৈ; ত্রৈলঙ্গস্বামীকা মাফিক উনোনে কভি পানি মে, কভি জঙ্গলমেঁ নিবাস করতা হৈ। উনকা নাম হৈ দরিয়াইজী, কাগদ্ ঔর পেড়কা পত্রী হরবখৎ ছিঁড়তা হৈ, ইসলিয়ে কোঈ কোঈ আদমী উনকো বোলতা হৈ - দরশীবাবা।

দরিয়া অর্থাৎ নদী ভালবাসেন, নদীতে ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকেন, এজন্য তাঁর নাম দরিয়াইজী। আর ফারসীতে দরশী মানে কাগজ। এইজন্য দরশীবাবা নামও সার্থক।

সদ্য-আগত ঐ সাধু আমাকে বললেন - দেখিয়ে ত এ কাগদ্ হঠাকর, কুছ হ্যায় কি নেহী। ছেঁড়া কাগজের মধ্যে আবার কি রত্ন থাকবে, যত্ত সব পাগলের কাণ্ড। আমি হাত দিতে চাইলাম না, কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করতে শুরু করায় অগত্যা কাগজের টুকরোগুলো ঘাঁটতে লাগলাম। ওমা ও কী! কাগজের টুকরোগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি দু'ইঞ্চি লম্বা অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণাভ শিবলিঙ্গ। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন - ইয়ে হ্যায় দরিয়াইজীকা বিভূতি। উনকী যব কিসীকা উপর কিরপা হোতি হৈ, ত উনোনে কাগদকা টুকরাকী অন্দর নর্মদা লিঙ্গ প্রকট কর দেতা হৈ। আপ এহি শিউজীকো রাখ্ দো, ইনকো পূজনসে আপকা মঙ্গল হোগা। ইনকো বারে মেঁ আপকো কোঈ বখৎ বহোৎসা কিসসা বাতায়েঙ্গে।

এই বলে তিনি মন্দিরের পেছন দিকে টাঙ্গিটি হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অগত্যা আমাকে তখনকার মত কৌতূহল চেপে রাখতে হ'ল। পনের কুড়ি মিনিট পরেই তিনি এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে হাজির হলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গনে ছোট ছোট পাথরের তেউড়ী সাজিয়ে রান্নার আয়োজন করতে বসলেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও আর বললেন না। আমি দরিয়াইজী সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাইলুম কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। অস্ফুট স্বরে জপ্ করতে করতে তিনি রান্না করতে লাগলেন।

আমি ঝোলা থেকে বাবার খাতাটি বের করে ছেঁড়া কাগজের টুকরো থেকে পাওয়া শিবলিঙ্গটি পর্যবেক্ষণ করতে বসলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শিবলিঙ্গটিকে অনেক সময় ধরে দেখেও আমি স্থির করতে পারলাম না - এর রঙ ঘন কৃষ্ণ, নাকি ঘন নীল। মনে মনে ধার্য করলাম - এর রঙ ভ্রমরের মত, লিঙ্গ থেকে দ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছে। খাতাতে দেখলাম, হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ড এবং হরকুমার ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' থেকে বাবা একটি উদ্ধৃতি লিখে রেখেছেন - যে সব লিঙ্গের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, বক্র কিংবা ছিদ্রযুক্ত, অতি স্থূল বা অতি কৃশ - গৃহী বিবর্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনোহিতম্ -গৃহীদের পক্ষে ঐ সব লিঙ্গের অর্চনা করা অনুচিত। ঐসব লিঙ্গ পূজায় মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীর মঙ্গল হতে পারে কিন্তু গৃহীর সর্বনাশ হবে। গৃহীর পক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ শিবলিঙ্গ সর্বদা মঙ্গলকর। এই রকম নর্মদালিঙ্গ যোনিপীঠে স্থাপন করে, যোনিপীঠ তৈরী করতে না পারলে যেখানে হোক রেখে, মন্ত্রসংস্কার না হলেও পূজা করা গৃহীর পক্ষে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ -

পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎ সপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জিতম্।
সিদ্ধিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং সর্ববর্ণং সুপীঠগম ॥

শিবলিঙ্গটি মহাপুরুষের দান ভেবে শ্রদ্ধাসহকারে ঝোলার মধ্যে রাখলাম।

সাধুর ভোগরান্না শেষ। টিকিয়া, অড়হর ডাল এবং কড়াই (আটা ঘৃত চিনি সমভাগে দিয়ে জলে সিদ্ধ) দিয়ে তিনি মন্দিরে ভোগ নিবেদন করতে বসলেন। তাঁর ভোগ নিবেদনের মন্ত্রও বিচিত্র -

মেরে আখন কে দৌতারে,
কর্পূরধবল সুতা নীলা জ্যোতির্ময়ী
ইহ্ দৌরূপ উজারে।
শিবসুন্দর নর্মদা মনোহর
কৈলাস ভৃগুমণ্ডল বাঢ়ে।
শুক শারদ নারদ বলিহারী।
মহিমা বর্ণতহারে ॥

অর্থাৎ আমার চোখের দুই তারা নর্মদেশ্বর এবং তার দুহিতা নর্মদার রূপ সর্বদাই দেখুক। শিব কর্পূর-ধবল এবং তাঁর কন্যা নীলাঙ্গী জ্যোতির্ময়ী। কৈলাস এবং ভৃগুমণ্ডলে এঁদের বাস। শুকদেব, সরস্বতী এবং নারদও এঁদের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে হেরে যান।

সাধু সুর করে এই মন্ত্র বারবার বলতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরছে। ভোগ নিবেদনের পর দুজনে খেতে বসলাম। আমি ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে অনেক সত্তাদরের মৌখিক ভদ্রতার বুলি শিখেছি, যাকে বলা হয় Lip-Courtesy; তারই ঘোরে বলে বসলাম -

হমারা লিয়ে আপনে বহুৎ তকলিফ্ উঠায়া।

তিনি মৃদু হাসলেন, কথার কোন উত্তর দিলেন না।

খাওয়ার পর মুখ ধুয়ে আমাকে বললেন - আপকা সাথ হমারা পূরব জনমকা সম্বন্ধ হৈ। হম্ আপকো লুকেশ্বর লে চলুঙ্গা। উধর নর্মদাকে পানিমেঁ মনিময় জ্যোতির্লিঙ্গ আভি তক্ সদৈব বিরাজমান হৈ।

সাধুর কথা শুনে আমি ধাঁধায় পড়লাম। এঁরা কি রহস্যময় ভাষায় ছাড়া কথা বলতে পারেন না! প্রথম থেকেই দেখছি এঁর প্রত্যেকটি আচার আচরণ রহস্যময়। 'পূরব জনম কা সম্বন্ধ' বিষয়ে কোন কৌতূহল না দেখিয়ে আমি তাঁর কাছে দরিয়াইজী বা দরশীবাবা সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাইলাম। তিনি যুক্তকরে দরশীবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললেন - অভি হম্ বাহার যায়েঙ্গে, সামকা বখৎ আকর্ আপকো সবকুছ্ বাতায়েঙ্গে। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঝোলাটি কাঁধে ফেলে দ্রুত জঙ্গলের রাস্তায় চলে গেলেন। আমি চত্বরে বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি বিকেল পেরিয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। সামনে কেবল নর্মদার জল চিকচিক করছে। ঘাটে গেলাম নর্মদা-স্পর্শ করতে। ফিরে এসে দেখি সাধু এসে গেছেন। তাঁর হাতে একটি বড় পাথরের প্রদীপ, একটি শিশিতে রেড়ির তেল। নেকড়ার সলতে পাকিয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রদীপটি জ্বালালেন। প্রদীপে সমস্ত রেড়ির তেলটা ঢেলে দিয়েছেন। শিশিটা ছুঁড়ে দিলেন মন্দিরের বাইরে। মন্দিরের মধ্যে আলো দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঝোলা থেকে দুটি তাজা পাতা বের করে হাতে দলে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুললেন না। প্রবীণ সাধু হিসেবে তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম, প্রণামও করতে দিলেন না, হাত দুটো ধরে ফেললেন। আমার পায়ে ক্ষত দেখে নিজেই বন থেকে ঔষধি পাতা সংগ্রহ করে এনেছেন। এই রকম দরদী সাধুর সঙ্গে থাকতে পেলে অরণ্যবাসও সুখের হয়।

সাধু নিজের থেকেই আমাকে দরিয়াইজীর প্রসঙ্গে বহু কথা শোনালেন। তিনি জানালেন - দরিয়াইজী আজ থেকে দেড়শ বছর আগে দ্বারভাঙ্গা জেলার লাহেরিয়া-সরাই এর কাছে গুল্লপাড়া নামের এক পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁর গুরুলাভ হয়। গুরুর নির্দেশ মত তিনি কঠোর সাধনা করেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে পাঁচ দিকে পাঁচটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার মধ্যে বসে পঞ্চতপা করেছেন, আবার পৌষ মাঘ মাসে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে তিনি জলাধারী সাধনাও করেছেন। আশী বছর এইভাবে কঠোর সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করে নাঙ্গা হয়ে দ্বারভাঙ্গার যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সেই থেকে তিনি মৌনী। তবে প্রয়োজনে তিনি দু'চারটি কথা বলতেন। কখনো কোন মন্দিরে কখনো কোন গাছতলায় বা কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়ে থাকতেন। দরিয়াইজীর প্রধান শিষ্য রাজেশ্বর দয়াল দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সঙ্গ করেছেন। এখন তিনি থাকেন মান্দালায়, ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটি কুটীর বেঁধে। দরিয়াইজী মাঝে মাঝে গিয়ে সেখানে আবির্ভূত হন। খবর পেলে মান্দালা শহর এবং আশেপাশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গোঁড় ভীল সবাই গিয়ে তাঁকে দর্শণ করবার জন্য উপস্থিত হয়।

রাজেশ্বরের কাছে শুনেছি, লাহেরিয়া-সরাইতে থাকতে থাকতেই তাঁর বহু অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। দারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং - এর বয়স যখন মাত্র দশ, তখন তার একবার কলেরা হয়। টাকা পয়সার অভাব নেই, কাজেই রাজমাতা বহু বড় বড় বৈদ্য এবং দেশী বিদেশী চিকিৎসককে এনে ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু কোন সুফল দেখা দিল না। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখন দেখা গেল অর্ধোন্মাদ নাঙ্গা সাধু মহারাজের প্রাসাদের চত্বরে বসে ইঙ্গিতে কিছু পুরাণো কাগজ চেয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলেন। প্রাসাদে তখন কান্নার রোল উঠেছে, ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছেন। রাজকুমারের সর্বাঙ্গে তখন কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়ে গেছে। নাঙ্গা সাধু চিৎকার করে উঠলেন - বাঁচ গয়া, বাঁচ গয়া। রোরুদ্যমান দেওয়ান সাহেবকে তিনি বললেন- যাকর রাণীমাকো বোল্ দেও, উনকা লেড়কা জিন্দা হো গয়া। দেওয়ান গিয়ে রোগীর ঘরে দেখেন, রোগী নিজেই মুখের কাপড় ফেলে দিয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সাধুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেখানে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তিন বছর পরে আবার সাধুকে দেখা গেল লাহেরিয়া - সরাই এর যত্রতত্র হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল অঞ্চলেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দ্বারভাঙ্গা জেলাতে এমন রেওয়াজ হয়েছিল যে, তিনি কোনো বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেই বাড়ীর লোকজন তাঁকে কিছু খবরের কাগজ অভাবে কিছু শুকনো গাছের পাতা এগিয়ে দিত। তিনি সেগুলি টুকরো টুকরো করে উঠে পড়তেন। সকলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতেন, তাদের বিপদ কেটে গেছে।

কারও আপনজন হয়ত বিদেশে আছেন, অনেকদিন হয়ত কোন খবর পান নি, সকলেই চিন্তায় আকুল, উনি গিয়ে হাজির হলেই বুঝতেন, আর চিন্তার কোন কারণ নেই, সংবাদ মঙ্গল। হয়ত তার পরদিনই কুশল সংবাদ দিয়ে চিঠি এসে যেত। উনি এইভাবে নীরবে বসে কাগজ ছিঁড়তেন বলে সমগ্র দ্বারভাঙ্গা জেলায় উনি 'দরশীবাবা' নামে প্রসিদ্ধ হন।

দ্বারভাঙ্গার ফৌজদারী আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার বাবু রামেশ্বর দয়াল এই দরশীবাবার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে ইনি দেহত্যাগের অভিনয় করেন। সাধুর দেহান্তের পর মোক্তারবাবু তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে সাধুর স্থূলদেহ সমাধিস্থ করে তার উপর একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। সে মন্দির এখনও আছে। দেহান্তের এক বছর পরে সেই মোক্তারবাবুর পুত্র রাজেশ্বর দয়াল স্বপ্নে সাধুর কাছে পর পর তিনদিন নির্দেশ পান - হম্ আভি তক্ জিন্দা হু, নর্মদা কিনারমেঁ মান্দালাকা জঙ্গলমেঁ হমারা দর্শন মিলেগা, তুম তুরন্ত আ যাও। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজেশ্বর মান্দালাতে এসে দরশীবাবার দর্শন পান। সেই একই দেহ, একই মূর্তি। সেই থেকে রাজেশ্বর মান্দালাতেই আছেন। আমি তোমাকে লুকেশ্বর যাবার পথে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আজ পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মহাত্মা নর্মদা তীরেই আছেন, সেই আগের মত কাগজ বা পাতা - ছেঁড়ার খেলা তিনি করে চলেছেন, তবে এখানে এসে বেশিরভাগ সময় লোকে দেখে তিনি নর্মদাতে ডুব দিয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন, কিছুদিন পরে ভুস্ করে নর্মদার গর্ভ থেকে উঠে আসছেন। সেইজন্য দারভাঙ্গার দরশীবাবা নর্মদাতীরে দরিয়াইজী নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এমনকি রেওয়ার মহারাজা এবং ইন্দোরের মহারাণীও এঁর পরম ভক্ত। এই কায়কল্পধারী শিবসিদ্ধ মহাযোগীর দর্শন পাওয়া মহাভাগ্যের কথা।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমি দরিয়াইজীর কথা শুনলাম। সাধু আর কথা বললেন না। জপে বসলেন। আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। প্রদীপটি জ্বলছে, সাধু দেখছি তখনও একাসনে বসে। প্রচণ্ড শীতের জন্য ঘুম ভেঙে গেছে, বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে অনুভব হ'ল, বাইরের জঙ্গলের সোঁ সোঁ ধ্বনি ক্রমে ওঁকারনাদে পরিণত হ'ল। জাগরণও নয় নিদ্রাও নয় এমন একটা অবস্থার মধ্যে দেখতে পেলাম, মন্দিরের দরজা ঠেলে, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে বাবা ঢুকলেন, শিবলিঙ্গে জল ঢাললেন। পরে আমার হাতে কমণ্ডলু দিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে হুকুম করলেন। বললেন - আজ থেকে নর্মদাতটে যত শিবমন্দির পাবি, প্রত্যেক শিবলিঙ্গের অর্চনা করবি। জলেও পূজা হয়, ফুলেও পূজা হয়, বেদমন্ত্রেও পূজা হয়। প্রণামও পূজা।

মগ্নচৈতন্যের ভূমি থেকে জাগ্রত চেতনায় ফিরে এলাম। দেখলাম ভোর হয়ে গেছে, সাধু গভীর নিদ্রামগ্ন। শিবলিঙ্গের উপরে সদ্য জল ঢালা হয়েছে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পড়ে গেলাম। মূর্চ্ছা যখন ভাঙলো, তখন দেখি সাধুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। শুনতে পাচ্ছি, সাধু বলছেন - ক্যা হুয়া থা ? সাধুর কথার উত্তর দিলাম না। সাধুর হাত ধরে ধীরে ধীরে বাইরে এসে বসলাম। সাধু আগুন জ্বেলে জল গরম করে এক ভাঁড় খেতে দিলেন। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। সেই কুয়াশার মধ্যেই সাধু কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমি মন্দিরের মধ্যে আবার ঢুকে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, গতরাত্রে বাবা এসে বলে গেলেন শিবপূজা করতে, দরিয়াইজী এসেও পূজার সিদ্ধ মন্ত্র শিখিয়ে গেছেন। আজ থেকেই তাহলে শুরু করি। পূজার রুচি নেই, বাবা তা ভালভাবেই জানেন। তাই আমার মত ভক্তিহীনকে শিবপূজার সহজতম পদ্ধতি বলে গেলেন - জলেও পূজা হয়, ফুলেও পূজা হয়, বেদমন্ত্রেও পূজা হয়, এমনকি কিছু না পারলে শুধু একটি প্রণাম করলেও পূজা প্রভু গ্রহণ করবেন। এইজন্যেই বোধহয় তাঁর নাম আশুতোষ, তাঁকে দীনবন্ধু বলা হয়, ধনীবন্ধু অর্থাৎ যার প্রচুর আছে, বিপুল আড়ম্বরে পূজা করতে পারে তিনি শুধু তারই পূজা যে গ্রহণ করেন এমন তো নয়। তাঁকে ঋষিরা একটি বিশেষণ দিয়েছেন - পতিত-পাবন, পুণ্য-পাবন তো বলেন নি।

পুণ্যবানে দয়া সে তো দয়া তব নয়
পাপীরে যে দয়া সেই তো দয়ার পরিচয়।

শিব এমন দেবতা যিনি পাপীতাপী ভূত প্রেত পিশাচ কাউকে বাদ দেন নি, ত্যাগ করেন নি, সাপ আর হাড়মালা সেগুলিকেই তিনি সমাদরের সঙ্গে নিজ অঙ্গে ধারণ করেছেন। কোন অলংকার তিনি ধারণ করেন নি, শ্মশানের ভস্মই তাঁর বিভূতি।

সর্বত্যাগী শংকর, ভোলা মহেশ্বর।

আমি নিজেকে কোনদিন পাপীতাপী বলে ভাবতে পারিনি, তাই জীবনে উচ্চারণ করিনি - পুরোহিতদের নিত্য উচ্চার্য সেই মন্ত্র - পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। কিন্তু বাবার দেহান্তের পর থেকে মাঝে মাঝে মনে উঁকি মারে, নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কর্ম খারাপ ছিল নতুবা অল্পবয়সেই ঋষি পিতাকে হারালুম কেন ? তাছাড়া আমার হৃদয়ে ভক্তি নেই। ভক্তিহীনতাও ত পাপ। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, কুয়াশা কেটে গেছে। কমণ্ডলু নিয়ে স্নান করতে গেলাম। দরাফ খাঁ কৃত সেই বিখ্যাত গঙ্গাস্তবের শেষ মন্ত্রটির অনুকরণে মনের মধ্যে গুনগুন উঠতে লাগল -

নর্মদে ত্বং শিবকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্বম্।
যদি গতিবিহীনং তারয়ে পাপিনং মাম্
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্বম ॥

মা শিবকন্যে নর্মদে! তুমি যদি শুধু পুণ্যাত্মাকেই উদ্ধার করে থাক, তাতে তোমার বৈশিষ্ট্য কি, মহত্বই বা কি ? পুণ্যবান বা তপস্বী যাঁরা, তাঁরা ত নিজ পুণ্যবলে বা তপস্যার প্রভাবে আপনা হতেই মুক্ত হবে। আমার মত গতিহীন ভক্তিহীন জনকেও যদি তুমি কর্ম ও ক্লেশ থেকে উদ্ধার করতে পার, সেটাই হবে তোমার মহত্ত্ব এবং মহিমার পরিচয়।

আমি জলে ডুব দিলাম। ডুব দিয়েই বাংলাদেশের ছেলে! অভ্যাসবশে, বলে উঠলাম - গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নেবার জন্য দ্বিতীয়বার ডুব দিয়ে উচ্চারণ করলাম - নর্মদা, নর্মদা, নর্মদা। শীতে কাঁপছিলাম মনে হল যেন শীতটা হঠাৎ করে কমে গেল।

স্নান করে পূজা করতে বসলাম অর্ধনারীশ্বর উজ্জ্বল শিবলিঙ্গকে। শিবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মনে পড়ল বাবার কথা, তিনি তাঁর এই অভাগা সন্তানকে ভোলেন নি, গতরাত্রেও প্রকট হয়েছিলেন শিবপূজা শেখাতে। পূর্বেও যেমন পূজা হোম্ হাত ধরে শেখাতেন, গতরাতেও তেমনি শিখিয়ে গেলেন। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না, চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা জল ঝরে পড়তে লাগল শিবের মাথায়। প্রণাম করে উঠে দেখি সাধু এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর হাতে একটি পুরানো লোহার কড়াই। বললেন - ইস্ মেঁ লকড়ী দেকর্ রাতমে আঁগ জ্বালায়েঙ্গে। ঠাণ্ডামেঁ আরাম মিলেগা। জিজ্ঞাসা করলাম - কাঁহাসে আপ হররোজ গেঁহু, বাজরা, আটা বগেরা লে আতে হৈ, আজ লে আয়া কড়াই, উসরোজ লায়ে থে রেড়ীকা তেল, কাঁহাসে এতনা সামান মিলতা হৈ ? ইধর কোঈ সদাব্রত, দুকান হ্যায় ক্যা?

ইহ্ মুণ্ডমহারণ্ হৈ, ইহ্ জঙ্গলমেঁ শের ভাল্লু বাগেরা জানোয়ার হৈ। দশবিশ মিলকা অন্দরমেঁ এক ইনসান ভি নেহি।

ব্যস, এতটুকু বলেই তিনি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আর কোন কথা বলা বৃথা। রুটি ও ডাল তৈরী করে ঠাকুরঘরে রেখে আমার কাছে এসে বসলেন। আমাকে বললেন - কোঈ সংকোচ মৎ করনা। আপ্ মুঝে বেদমন্ত্র শোনাতা হৈ, হম্ থোড়া সেবা করতা হু, উসসে কোঈ কিসীকা পাস ঋণী নেহি। প্রতিগ্রহ্ কা কোঈ সাওয়াল বিলকুল নেহি আতী।

তখনও দুপুর হয় নি, দুপুর ছাড়া ইনি ভোগ নিবেদন করেন না। সুযোগ পেয়ে আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন - সূরযনারায়ণ।

- আপ্ কণ্ঠমেঁ লিঙ্গ ধারণ করতা হৈ। আপ্ ক্যা লিঙ্গায়েৎ হো ?

- নেহি জী, হম জঙ্গম সম্প্রদায়কা বীরশৈব হুঁ। হমারা বড়া ভাই ঔর গুরুদেব থে মহর্ষি মধুমঙ্গলজী, দরিয়াইজীকী মাফিক উনোনে শিবসিদ্ধ মহাযোগী থে, মুড়িয়ামহারণ সে ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি, রেবা-সংগম তক্ উনোনে লোক-প্রসিদ্ধ বেদবিৎ মহাত্মা থে। লাখো আদমী উনকো মানতে থে। লুকেশ্বর মেঁ উনকা তপোবন আভি তক্ বিরাজিত হৈ। তপোবন কা নাম জঙ্গম-মঠ। যব লুকেশ্বর পৌছেগা, উনকী সারি কিসসা আপকো হম্ শুনায়েগা।

মহর্ষি মধুমঙ্গল সম্বন্ধে আমি কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বীরশৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে এবং তিনি কেন নর্মদাঘাটে বসে তাঁর কণ্ঠস্থ শিবলিঙ্গকে হাতের উপর রেখে পূজা করেন, সে সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। সাধুর মেজাজ ভাল ছিল, তিনি সানন্দে বলতে লাগলেন - আমরা শৈবধর্মাবলম্বীরা শিবকেই অনাদিকারণ পরমব্রহ্ম, আদি ভগবান বলে মানি। লিঙ্গায়েৎ, লিঙ্গবন্ত, জঙ্গম, বীরশৈব, পাশুপাত, মহাপাশুপাত প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও আমরা সবাই শৈব, শিবই আমাদের পরম উপাস্য দেবতা। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং বাহ্যবেশ ধারণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। কণ্ঠেশিবলিঙ্গ ধারণ সকলেই করেন। শৈবধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁদের ব্রাহ্মনকুলে জন্ম তাঁরা শিখা, যজ্ঞোপবীত, লিঙ্গ, রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারণ করেন, পাশুপত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তাঁরাই বীরশৈব নামে পরিচিত।

ব্রাহ্মণ্য বীরশৈবস্থা শিখা যজ্ঞোপবীতিনঃ।
লিঙ্গ-রুদ্রাক্ষ-ভস্মাঙ্কা ব্রহ্মকর্ম সমাশ্রিতাঃ॥ (পারমেশ্বর আগম)

বীরশৈব বসভেশ্বর ১১৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের বলগম অঞ্চলে বীরশৈব তথা জঙ্গম-সম্প্রদায়ের উজ্জীবন ঘটান। তাঁর পূর্বে শিবাচার্য অপ্পর মহাস্বামী (৬০০ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁর গুরু শিবাচার্য মাণিক্যবাচক মহাস্বামী সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই পাশুপাত ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আমার গুরু মহর্ষি মধুমঙ্গলও ছিলেন একজন 'শিবাচার্য মহাস্বামী'। বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রধান সিদ্ধাচার্যের উপাধি হয় শিবাচার্য মহাস্বামী। মাণিক্যবাচক প্রণীত 'তিরুবাচকম' নামক মহাগ্রন্থে শৈবসাধনার গূঢ় সংকেত, ভক্তি ও দার্শনিকতার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। শিবসাধকের জীবনে স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ও শিবচেতনার যে জাগৃতি ঘটে তারই অপরূপ ব্যঞ্জনা ঐ পুস্তক। এছাড়াও শ্রীকরভাষ্যম শৈবাগম, সিদ্ধান্তচিন্তামণি, শিবাদ্বৈতমঞ্জরী, লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা প্রামাণিক বলে মনে করি। আমাদের তত্ত্ব এবং দর্শনকে 'শিবাদ্বৈতবাদ' বলা হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিছু কিছু বাহ্যিক সম্প্রদায়গত আচার এবং তিলকধারণাদির নিয়ম বাদ দিয়ে বিষ্ণুর স্থানে শিবকে বসিয়ে দিলেই শিবাদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্বয়ং মহেশ্বরের আদেশে বীরভদ্র, নন্দী, ভৃঙ্গী, বৃষভ এবং স্কন্দ এই পাঁচজন পাশুপত ধর্মের সুরক্ষা এবং সুপ্রতিষ্ঠার জন্য জ্যোতির্লিঙ্গ হতে আবির্ভূত হন। ক্রমানুসারে তাঁদের নাম হয় - (১) রেণুকাচার্য, (২) দারুকাচার্য, (৩) একোরামারাধ্যাচার্য, (৪) পণ্ডিতারাধ্যাচার্য, (৫) বিশ্বারাধ্যাচার্য। মহীশূরে ভদ্রানদীর তীরে মলয় পর্বতের সানুদেশে ভগবান রেণুকাচার্যের আশ্রমেরই নাম - বীরপীঠ। উজ্জয়িনী তে মহাকাল মন্দিরের কাছে ভগবান দারুকাচার্যের যে আশ্রম তার নাম-সদ্ধর্মপীঠ। ভগবান একোরামারাধ্যজীর আশ্রম হিমালয়ের গৌরীকেদারে তার নাম - বৈরাগ্যপীঠ। যাঁকে গৌরীকেদার বলা হয় সেই শিবলিঙ্গের প্রকৃত নাম - রামনাথ। শ্রীশৈলক্ষেত্রে ভগবান পণ্ডিতারাধ্যের যে আশ্রম তার নাম - সূর্যপীঠ। কাশীতে শিবলিঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান বিশ্বারাধ্যাচার্য - তাঁর আশ্রমের নাম জ্ঞানপীঠ। এখন জঙ্গমবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চাচার্যই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পাশুপত ধর্ম তথা শৈবধর্ম প্রচার করেন। ভগবান রেণুকাচার্য মহামুনি অগস্ত্যকে এবং ভগবান দারুকাচার্য বশিষ্ঠদেবকে শিব-সাধনার গুহ্য রহস্য শিখিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত-শিখামণি এবং শ্রীকরভাষ্যে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সাধু সূর্যনারায়ণজী আরও জানালেন - আমরা বীরশৈবরা নর্মদা লিঙ্গকে করতলে বা করপৃষ্ঠে স্থাপন করে পূজা করি, কারণ এই পদ্ধতিতেই দ্রুত শিবসিদ্ধি ঘটে থাকে। শ্রীনন্দীকেশ্বর বিরচিত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঈশ্বর শিবকুমার মিশ্র কর্তৃক ব্যাখ্যাত 'লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা' নামক আমাদের সাধনগ্রন্থে এই গূঢ় সংকেত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে -

তদেবহস্তাম্বুজপীঠমধ্যে নিধায় লিঙ্গং পরমাত্মচিহ্নং।
প্রপূজয়েৎ ঐক্যধিয়ো পচারৈ নরস্তবাহ্যান্তর বেদ ভিন্নৈঃ॥
বাহ্যপীঠার্চনাৎ এতৎ করপীঠার্চনং বরং।
সর্বেষাং বীরশৈবানাং মুমুক্ষুণাং নিরন্তরং॥

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, মহাত্মা নর্মদা স্পর্শ করে এসে ভোগ নিবেদন করতে বসলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানাসনে জপ্ করে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নৃত্যের তালে তালে তিনি বলতে লাগলেন -

ভোগকরণ জাগরনাথ স্বামী
যোগকরণ রামনাথ হ্যায়।
রাজকরণ রণছোড় টিকম্
তপকরণ নর্মদেশ্বর হ্যায় ॥

আজ তাঁর ভোগ নিবেদনের ভাষা আলাদা। অর্থাৎ ভগবান শিবসুন্দর জগন্নাথরূপে ভোগ করছেন, কেদারে রামনাথরূপে যোগমগ্ন, দ্বারকাতে রণছোড়জীরূপে রাজত্ব করছেন আর নর্মদাতে সেই একই প্রভু তপস্যাতে রত আছেন।

উভয়েই তৃপ্তি করে প্রসাদ পেলাম। আজ পাঁচদিন ধরে দেখছি রোজই প্রসাদ পাবার পরই সাধু এখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও চলে যান, কিন্তু আজ তিনি কোথাও নড়লেন না। বললেন - হম্ লেটতা হুঁ। আপ্ ভি লেট্ যাইয়ে। আজ ইস্ পুনীত্ অওসর পর আপসে এক দো বেদমন্ত্র শুনেঙ্গে। আমি শুয়ে পড়লাম, তাঁকে বললাম এক ঘন্টাকা বাদ কৃপা করকে মুঝে জাগা দেনা, কেঁও কি আপলোগকে পাশ জ্যায়সা বহোৎ ঋদ্ধি-সিদ্ধি হ্যায়, হমারা পাশ ভি এক সিদ্ধি হ্যায় - নিদ্রাসিদ্ধি। হম্ নিদ্রাসিদ্ধ হৈ, ন জাগানেসে রাত মে ভি হমারা কোঈ চোঈন ন রহেগী। সাধু হাসতে লাগলেন।

বেলা প্রায় চারটা নাগাদ তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন, শীতকালের বেলা তার উপর চারদিকে মহাজঙ্গল, দিনের বেলাতেই গাছের ছায়ায় অন্ধকার লাগে। মন্দিরের মধ্যে থেকে মনে হল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু নর্মদার ওপারে সাতপুরা পর্বতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, তখনও বেলা আছে।

মন্দিরের মধ্যে প্রদীপটি জ্বলছে। সাধু সূর্যনারায়ণজী সেই যে রেড়ির তেল এনে প্রদীপটি জ্বেলেছিলেন, সে প্রদীপ দিনরাত্রে একইরকমভাবে জ্বলে যাচ্ছে। সাধুকে এর মধ্যে আর আমি তেল ঢালতে বা সলতে বদলাতে দেখিনি। প্রদীপে তেল ভরে শিশিটি নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তা নিজের চোখে দেখেছি। তিনি বরং মন্দির থেকে মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যান, কিন্তু আমি ত দিনরাত মন্দিরেই পড়ে আছি। দু-একবার মনে কৌতূহল হয়েছিল যে সাধুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এইভেবে চেপে গেছি যে, কি হবে জিজ্ঞাসা করে, ইনিও তো হয়ত সেই আলেখপন্থী মহাত্মার মতন উত্তর দেবেন - সাধুয়োঁকা ঝুলি মেঁ যো ঋদ্ধিসিদ্ধি রহতা হৈ, ইস চেরাগ উসিকা প্রভাও সে অনির্বান জ্বল রহা হৈ।

তবুও শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চাপতে পারলাম না, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - মহাত্মা পল্টুদাসজী দশম দুয়ার বা আজ্ঞাচক্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন - উলটা কুঁয়া গগনমেঁ জ্বলে চেরাগ কী জ্যোত - অর্থাৎ সেখানে সেই দ্বিদলপদ্মে সূক্ষ্মাকাশে এক উলটানো কুঁয়ো আছে, তার মধ্যে এক অনির্বান দ্বীপশিখা দিবারাত্র জ্বলছে, 'বিন্ তেল বিন্ বাতি', - কিন্তু সাধুজী আপনি যে এই মাটির পৃথিবীতেই বিন্ তেল, বিন্ বাতি এক আশ্চর্য প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন মন্দিরের মধ্যে, তা কিছুতেই নিভছে না। ইহ্ ক্যা আপকা ঋদ্ধিসিদ্ধিয়োঁ কা প্রভাও সে ?

নেহি জী, ইহ্ হমারা গুরু মহর্ষি মধুমঙ্গলজীকি নামকা প্রতাপ সে।

আমরা দুজনেই বেরিয়ে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। সাধুজী সেই ভাঙা কড়াই-এর উপর কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালালেন। কড়াই এর দুদিকে দুজনে বসে আগুন পোয়াতে লাগলাম।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - এই আজব ও অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি কোথা থেকে এল ? এই যে জীবজগতের লক্ষকোটি প্রাণী তাদের আলাদা আলাদা প্রকৃতি কি কি উপাদানে তৈরী হয়েছে ! এই যে দিনরাত্রি, সূর্যের উদয় ও অস্ত - কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কিভাবেই বা সকল কিছুর মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে - এ সম্বন্ধে বেদ কি বলেন?

আমি বললাম - বেদে কোথাও সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃজন প্রণালী নিয়ে কোন বিস্তৃত তথ্য নেই। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনে বরং এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে আদিতত্ত্ব পুরুষ, পুরুষ থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎতত্ত্ব - মহৎতত্ত্ব থেকে বুদ্ধি, সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত - ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চীকরণের নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা এ বিষয় নিয়ে কোন মাথা ঘামান নি। বেদের বাণী

হ্ল অমৃতের বাণী - মানুষের চেতনায় সে জাগাতে চেয়েছে - লিকোত্তর বীর্য, মানুষের প্রাণে জাগাতে চেয়েছে স্বাধিকারের চেতনা, তার কৃতিকে করতে চেয়েছে দিব্য ক্রতুর জ্যোতিতে দীপ্ত, দ্যুলোক হতে আনতে চেয়েছে অমৃতের স্পন্দন, মর্ত্যবাসীর কাছে ঘোষণা করেছে যে তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ এক মহান্ পুরুষ আছেন, তাঁকে জানলেই জীবনে কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

বৈদিক ঋষিদের ধ্যান-চেতনায় স্বতই উদ্ভাসিত হয়েছিল যেসব মন্ত্র - সেইসব মন্ত্রের দ্রষ্টা, স্রষ্টা নন। আপনার মত বৈদিক ঋষিরাও একদিন সেই সুদূর অতীতে প্রশ্ন তুলেছিলেন -

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

কুতঃ অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ? (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৬)

কেই বা জানে, কেই বা বলতে পারবে এই বিসৃষ্টি, এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টি কোথা হতে এসেছে? তাঁদের মনে হয়েছে, কোথায় এই সৃষ্টির উৎস, হয়ত দেবতারা জানেন। কারণ তাঁরা ত প্রায় সর্বজ্ঞ। কিন্তু সেখানেও শঙ্কা জেগেছে - দেবতারাই বা জানবেন কি ভাবে? তাঁরা ত সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন না।

অর্বাক দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন

অথো কো বেদ যত অবভুব ? (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৬)

তবে কি যিনি আদিদেব, যিনি এই বিশ্বের কর্তা ধাতা ও নিয়ন্তা, যিনি প্রপঞ্চের অতীত পরমধামে অধিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মণ্যদেবই হয়ত জানেন, এই নানা বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি কোথা হতে এল, কার থেকে এল, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, একমাত্র তিনিই জানতে পারেন অথবা তিনিও হয়ত জানেন না -

সো অঙ্গ বেদ, যদি বা ন বেদ (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৭)।

অতএব সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্যই (Mystery) থেকে গেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সব-জানতা সাহেব বাবুরা law of Creation কে রহস্য (The Riddle of the Universe) বলতে শুরু করেছেন। বৈদিক ঋষি অঘমর্ষণ এবং সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্ব উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন - হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষদের তপস্যা হতে এই বিশ্বভুবন জাত.

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত।

ততো রাত্রি অজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ॥ ১

সমুদ্রাৎ অর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ২

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বসকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চন্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৩

তাঁর তপস্যা হতে ঋত এবং সত্য জন্মগ্রহণ করল। ঋত বলতে বুঝায় সৃষ্টির অন্তরালে সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে যে শৃঙ্খলা নিয়ম ছন্দ ও সুষমা। ঋত ও সত্যের পর রাত্রি জন্মাল, তারপর সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হতে সম্বৎসর, তারপরেই দিন রাত্রি। সৃষ্টিকর্তা যথা সময়ে সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টিকরলেন - তরপরেই প্রকট করলেন - স্বর্গ পৃথিবী এবং আকাশকে।

কথা বলতে বলতেই দেখলাম সাধু সূর্যনারায়ণজী নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একেবারে স্থির হয়ে গেছেন। আর কোন কথা বলা বৃথা, কাজেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, সাধুর শয্যা শূন্য, তিনি যথারীতি সকালে উঠেই কোথাও চলে গেছেন। সকাল দশটা নাগাদ ফিরে এলেন, এসেই রান্নার কাজে বসলেন। মন্দিরের পেছন দিকে খস্ খস্ শব্দ শুনে পা টিপে টিপে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, একপাল বুনো মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। সাধুকে বলতেই তিনি দুহাতে দুখণ্ড জলন্ত কাঠ নিয়ে মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দুহাতে দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন - হঠ হঠ হিঁয়াসে। আগুন দেখে মহিষগুলো বনের দিকে দৌড়ে চলে গেল।

'নর্মদা মে এ্যায়সা হোতাই হ্যায়' - শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখি মহাত্মা শোভানন্দজী মন্দিরের ধাপ বেয়ে উঠে আসছেন। দুই সাধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে চোখে তাঁদের কি কথা হল জানিনা। আমার মনে পড়ল কবীরজীর জীবনের একটি ঘটনা। সমরখন্দ থেকে এক সিদ্ধ ফকির এসেছিলেন কবীরের সাথে দেখা করতে। কবীর তখন কাশীতে।

তিনি তা জানতে পেরে সশিষ্যে গিয়েছিলেন বোম্বাই। তখন ট্রেন ছিলনা। প্রায় একমাস কাল উটের পিঠে চড়ে কবীর গিয়ে পৌঁছুলেন বোম্বাই, ফকিরের জন্য অপেক্ষা করতে সমুদ্রের ধারে জাহাজঘাটায়। ফকিরের সঙ্গেও কয়েকজন শিষ্য ছিল। ফকির জাহাজ থেকে নেমেই দ্রুতপদে এসে কবীর সাহেবের কাছে বসলেন। উভয় মহাত্মার শিষ্যরা আশা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উঁচুদরের তত্ত্ব বা যোগরহস্য নিয়ে আলোচনা হবে, তাঁরা তা শুনতে পাবেন। কিন্তু হায়, ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁরা নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। পরে সহসা উঠে ফকির ফিরে চললেন জাহাজের দিকে, আর কবীর উঁটে চড়ে বোম্বাই ত্যাগ করলেন, ফিরে চললেন কাশী। এই ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য কিনা আমার জানা নেই, তবে এইরকম বিস্ময়কর ভেট ও আলাপের ধারা থেকে বোঝা যায়, মুখের ভাষাই একমাত্র বাক্যালাপের বাহন নয়, উচ্চকোটির মহাত্মাদের কাছে মৌনতাও আলাপনের অধিকতর জীবন্ত মাধ্যম - **Silence is sometimes more eloquent than speach.** সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশে মৌনতাই বেশী মুখর হয়।

পাঁচ মিনিট ধরে স্তব্ধ থাকার পর উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। শোভানন্দজী আমাকে বললেন - নারদঘাটে প্রায় দশজন পরিক্রমাবাসী এসে ডেরা নিয়েছেন, তাই চলে এলাম। মান্দালা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। তারপর একলা ফিরে আসব এখানে। সারাদিন তিনজনে খুব আনন্দেই কাটল। গঙ্গাবাহ তীর্থে প্রায় সাতদিন থাকা হল। সাধু সূর্যনারায়ণজী ঘোষনা করলেন - বিহান মেঁ যাত্রা করেঙ্গে। বেশ তাই হোক।

এক ফাঁকে শোভানন্দজীকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলাম - প্রদীপে একটা মাত্র সলতে আর একটুখানি রেড়ির তেল ঢালা হয়েছে, আজ সাতদিন ধরে জ্বলছে, এটা কি ব্যাপার? শোভানন্দজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলাম - নর্মদামে এ্যায়সা হোতাই হ্যায়। ইহ্ সূর্যনারায়ণজীকা বিভূতিকা খেল হ্যায়।

পরদিন সকালে কুয়াশার মধ্যেই আমরা নর্মদার তট ধরে পশ্চিমদিকে যাত্রা করলাম। আজ আমার মনে কোন অজানা আশঙ্কা এসে দানা বাঁধছে না, ভুল পথে গিয়ে মহারণ্যের মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয় নেই, আমার আগে পিছে দুজন নর্মদা তীর্থের অভিজ্ঞ মহাত্মা। পথের প্রকৃতি একই, সেই দুর্গম জঙ্গল, সাজা, আবলুষ, বহেরা, হরিতকী, বট, অশ্বত্থের গায়ে গায়ে জড়ানো দুর্ভেদ্য পাহাড়ী পথ, কাঁকরময়। প্রায় তিনঘন্টা হাঁটার পর মনে হল অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হয়ে আসছে। নিস্তব্ধ বন আরও যেন নিস্তব্ধ হল, নিজেদের শ্বাস প্রশ্বাসও যেন শুনতে পাচ্ছি। আকাশে বাতাসে যেন একটা ভয়ের আভাষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে, দুজন সাধুই চাপা গলায় বলে উঠলেন - 'শের'। বুনো কুকুর ও কতগুলো বুনো শেয়ালের আর্তনাদ শুনতে পেলাম, শের শুনেই আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল। তার সাথে কুকুর আর শেয়ালের কান্না একটা অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শরীর থেকে কেউ যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। একাও বনের মধ্যে দিয়ে এসেছি, তাই মনকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম। গাছপালার ভেতর একটা আলোড়ন দেখা দিল। ভাবলাম বাঘটা বুঝি বেড়িয়েই এল, নাহ্ বাঘ নয়, বাঘের গন্ধে বনের অন্য জীবজন্তুরা পালাচ্ছে।

দুজন সাধু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মাঝখানে রেখে একটা গণ্ডী টানলেন। - গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনেই জপ্ করতে লাগলেন - রেবা রেবা। আধঘন্টা থাকার পরে দুজনেই একসাথে বলে উঠলেন - কোঈ ডর নেহি। দুসরা রাস্তা সে শের চলা গিয়া। আবার হাঁটতে লাগলাম। ক্রমে দেখলাম, জঙ্গল যেন পাতলা হয়ে আসছে। কুয়াশাও ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। নর্মদার স্বচ্ছ ধারাও স্পষ্ট হয়েছে। প্রচণ্ড শীতের জন্য জলের উপর সরের মতন আস্তরণ পড়েছে। ঘোর মহারণ্যের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এমন এক জায়গায় এসে পরলাম, এখানে জঙ্গল তো দুরের কথা ক্রমেই পাতলা হতে হতে এ অঞ্চল যেন বৃক্ষ শূন্য হয়ে গেছে। তবে কঙ্করময়, গাছপালা না থাকায় বিন্ধ্যপর্বতের পাথুরে রূপ বড় বেশী প্রকট হয়ে পড়েছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ জঙ্গলের মধ্য পাথরের উপর পাতার স্তূপ পড়ে থাকায় পাথরগুলো পায়ে তেমন বিঁধত না। কিন্তু এখন খালি পায়ে পাথরের খোঁচা বেশী করে বুঝতে পারছি। বেশীক্ষণ কষ্ট করতে হল না, অল্পকিছুক্ষণ পরেই একটা পরিক্রমাবাসীদের চলার পথের চিহ্ন দেখতে পেলাম। পায়ে চলার পথ, খুবই হাল্কা হলেও বোঝা যায়, আর পথের ওপর পাথুরে ভাবটা একটু মসৃন হয়ে এসেছে। খুব বেশী পার্থক্য না হলেও এটুকুই যেন আমার কাছে অনেক বলে মনে হচ্ছিল।

চলতে চলতে বেলা প্রায় দুটো নাগাদ দেখলাম পাহাড় থেকে একটা ছোট নদী ঝর্ণার আকারে এসে নর্মদার সাথে মিলেছে। শোভানন্দজী বললেন - ইয়ে হ্যায় কানাইয়া নদী, নর্মদামেঁ আকর সংগত হুয়া। ইসলিয়ে ইয়ে জাগাহ্ কা নাম - কানাই সংগম। দূর মে পাহাড় কা উপর যো মন্দির দিখাই দেতা হৈ, ওহি হ্যায় দশাশ্বমেধিক তীর্থ। সাধু সূর্যনারায়ণজী বললেন - হমলোগ আজ উধারই ঠাঁরেঙ্গে।

মনে অনেক প্রশ্নই আসছে, কিন্তু পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে এখন একটু পা ছড়িয়ে বসবার আস্তানা পেলেই বেঁচে যাই। যাই হোক একটু পরেই নর্মদার ঘাটের উপরে সেই শিবমন্দিরে এসে পৌঁছলাম। আসামাত্রই মন্দিরের সিঁড়িতে গাঁঠরী ফেলে সাধু সূর্যনারায়ণজী কাঠকুটো সংগ্রহ্ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শোভানন্দজী গেলেন নর্মদাতে স্নান করতে। একটু পরে সূর্যনারায়ণজী ফিরলেন এক বোঝা কাঠ নিয়ে। কাঠ ফেলে দিয়েই তিনিও নর্মদাতে নামলেন। শোভানন্দজী স্নান করে এসে রুটি তৈরী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সূর্যনারায়ণজী তাঁকে নিরস্ত করে নিজেই তাঁর ঝুলি থেকে গম, জোয়ার, মকাই - এর দানা বের করে খিঁচুড়ীর মত কোন বস্তু রান্না করতে বসলেন। আমিও স্নান করে এলাম। মন্দিরে ঢুকে দেখি শোভানন্দজী এর মধ্যেই মন্দিরের ভেতর পরিষ্কার করে তিনজনের আসন মন্দিরের তিন কোণে পেতে ফেলে এখন শিবলিঙ্গের কাছে বসে জপ্ করছেন। আমি শিবের মাথায় নর্মদার জল ঢেলে প্রণাম করলাম।

ভোগ নিবেদন এবং প্রসাদ পাবার পর সূর্যনারায়ণজী তাঁর অভ্যাসমত পার্বত্যপথে কোথাও দ্রুত চলে গেলেন। শোভানন্দজী মন্দিরের বাইরে বসে গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পায়ে গায়ে খুব ব্যথা। যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙলো বুঝলাম, অনেক রাত হয়ে গেছে, দুই সাধুই নিজেদের বিছানায় বসে জপ্ করছেন। যথারীতি একটি প্রদীপ জ্বলছে। গঙ্গাবাহ্ ঘাটের সেই ভাঙা কড়াইটিতে কাঠের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

আমি উঠে বসলাম। একটু পরেই দুই সাধুরও জপ্ শেষ হল। সূর্যনারায়ণজীকে জিজ্ঞাসা করলাম -কাশীতে দেখেছি দশাশ্বমেধ ঘাট। ব্রহ্মা নাকি সেখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে কোন মহাত্মা বা মহারাজা দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, দয়া করে বলুন।

নেহী জী, ইধর কোই অশ্বমেধ যজ্ঞকা অনুষ্ঠান নেহি হুয়া। তবে এখানে স্নান করলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়, এইজন্যে নর্মদার এই ঘাটকে বলা হয় দশাশ্বমেধিক তীর্থ। যুধিষ্ঠির তীর্থ ভ্রমনকালে নর্মদাতটের এই ঘাটের মহিমা শুনে মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলেছিলেন - অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ব্যয়বহুল, এর দক্ষিণাও বহু, সাধারণ লোকের পক্ষে এই অনুষ্ঠান অসম্ভব। তারা এখানে এসে স্নান করলে কিভাবে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাবে তা শুনতে অদ্ভুত লাগছে

- অত্যাশ্চর্যমিদং তত্ত্বং ত্বয়োক্তাং বদতা সতা।

তার উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁকে জানালেন - তোমার মত এই প্রশ্ন স্বয়ং গৌরী জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহেশ্বরকে। মহেশ্বর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমন করতে করতে এই দশাশ্বমেধিক তীর্থে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এই তীর্থকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে থাকেন -

দশাশ্বমেধিকং তীর্থং দৃষ্ট্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
তীর্থং প্রত্যঞ্জলিং বদ্ধা নমশ্চক্রে ত্রিলোচনঃ॥ (রেবাখণ্ডম ১৮০ অধ্যায়)

তা দেখে মা গৌরী অতি বিস্মিত হয়ে বলেন - আপনি স্বয়ং চরাচরের নমস্য পরম দেবতা হয়ে এই তীর্থকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করছেন, এতো বড় আশ্চর্যের কথা।

দেবাদিদেব বলেন - বিস্মিতা হয়ো না স্বয়ং তুমি এর তীর্থফল প্রত্যক্ষ কর।

এই বলে তিনি একজন রুগ্ন শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ঘাটের কাছে উপস্থিত হয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ঐ ঘাটে তখন অনেক ব্রাহ্মণ স্নান তর্পনাদি করছিলেন। শিবের উদাত্ত বেদধ্বনি শুনে এক ব্রাহ্মণের খুব ভক্তি হ'ল। তিনি তাঁর গৃহে তাঁকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী শিব তাঁকে বললেন, দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল দক্ষিণাস্বরূপ না দিলে কারও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্বীকার করি না। এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে শাস্ত্রবাণী ও ঋষিমুনিদের

প্রসঙ্গ তাঁর মনে পড়ল। তিনি দেবাদিদেবকে বললেন - হে ব্রাহ্মণ! আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন। এইকথা বলে তিনি দশাশ্বমেধিক তীর্থে বসে জপ্ হোম দান পূজাদি সেরে এসেই ছদ্মবেশী শিবকে বললেন - দয়া করে আপনি গাত্রোত্থান করুন, আমি দশাশ্বমেধ সম্পন্ন করে এলাম, আপনি দয়া করে ভোজন করবেন চলুন, আমি দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল আপনাকে দক্ষিণা স্বরূপ সমর্পন করব।

শিব বললেন - আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার কাছে ফিরে এলেন, এর মধ্যেই আপনার দশাশ্বমেধ যজ্ঞ হয়ে গেল ? আমাকে কি পরিহাস করছেন ?

ব্রাহ্মণ বললেন - নর্মদা পরিক্রমাকারী বিভিন্ন ঋষিদের আপ্তবাক্য ও পুরাণ বাক্য যদি মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চিতই আমি দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পেয়েছি। কারণ তাঁরা একবাক্যে সবাই বলে গেছেন, এই তীর্থে যথাবিধি তীর্থকৃত্য করলে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের এই জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং অবিচল নিষ্ঠা দেখে মহাদেব তাঁকে স্বরূপে দর্শন দিয়েছিলেন।

সাধু সূর্যনারায়ণজীর মুখে এতদূর শুনে আমি বললাম, আমাদের বাংলাতেও এইরকম একটি লোককথা আছে, একবার চূড়ামণিযোগে হাজার হাজার লোককে গঙ্গাস্নান করতে দেখে দূর্গার মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, - এই যে হাজার হাজার লোক গঙ্গাস্নান করছে, তাদের সবাই কি পাপমুক্ত হবে।

উত্তরে মহাদেব বলেছিলেন - না, একজন দুজনই মাত্র পাপমুক্ত হবে, সবাই নয়।

তাঁর এই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার জন্য দূর্গাকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর রূপ নিতে বললেন আর নিজে শব সেজে তাঁর কোলে মাথা দিয়ে পড়ে রইলেন। মা দূর্গা কেঁদে কেঁদে সবাইকে বলতে লাগলেন -

হায়! হায়! তোমরা দয়া করে কেউ আমাকে আমার স্বামীর মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য কর। আমি বৃদ্ধা হয়েছি, আমি একা এই মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া সামান্যমাত্র পাপ করেছে এমন লোক যদি আমার স্বামীর মৃতদেহ স্পর্শ করে তবে তার সর্বনাশ হবে। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বিলাপ শুনে অনেকেই সাহায্য করতে এল কিন্তু শর্ত শুনে সবাই চলে গেল।

এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ যুবক এগিয়ে এসে তাঁর শর্ত শুনে বললেন -

মা আমি নিষ্পাপ নই, জীবনে অনেক দুরাচার এবং ব্যভিচার করেছি। তবে আজ ত চূড়ামণিযোগ, গঙ্গাতে স্নান করলেই মুহূর্তে আমি নিষ্পাপ হয়ে যাবো। একটু অপেক্ষা করুন মা, আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসি। যুবক গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন এবং শিব-দূর্গাও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। শিব বললেন - দেখলে, এই লোকটাই কেবল তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের গুণে গঙ্গাস্নানের সদ্যফল প্রাপ্ত হবে। অন্য কেউ নয়, কারণ গঙ্গার সর্বপাপহারিণী মহিমায় তাদের ধ্রুব নিষ্ঠা নেই -

তেষাং সিদ্ধি র্ন বিদ্যতে আস্তিক্যাং ভবতে ধ্রুবম্।

আমি এই ঘটনা বলে বললাম, আপনাদের দশাশ্বমেধিক তীর্থের কাহিনীই বলুন কিংবা বাংলাতে প্রচলিত এই কিংবদন্তিটির কথাই বলুন, এগুলি সব রোচক বাক্য।

শোভানন্দজী সূর্যনারায়ণজীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন - শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকা পুরাণ কা বারে মেঁ শ্রদ্ধা থোড়া কম্ হৈ।

আমি বললাম - পুরাণে যখন যে তীর্থের কথা বলা হয়, তখন সেই তীর্থকেই অনেক বড় করে দেখানো হয়। অতিরঞ্জনের কোন মাত্রা থাকে না। পরস্পর বিরোধী কথাতেও পরিপূর্ণ থাকে। আমি শুনেছি, এই নর্মদাতটেই কোথাও নাকি হত্যাহরণ নামে এক তীর্থ আছে। মাতৃহত্যার অপরাধে পরশুরামের কুঠারের দাগ এই তীর্থে আসাতেই নাকি মুছে যায়। আমি নৈমিষারণ্যেও একটি হত্যাহরণ তীর্থ দেখেছি, আসামেও পরশুরাম কুণ্ড দেখে এসেছি, সব স্থানেই একই লোককথা প্রচলিত। এই একটি স্থানকে বিশ্বাস করলে অপরগুলি মিথ্যা হয়ে যায়।

এই পরশুরামকে নিয়ে মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে নানা আখ্যায়িকা বর্তমান। তিনি যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন একথা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা পুরাণের কল্যানে জেনে গেছেন। ইক্ষাকু বংশের মহারাজা সগরের (৫০২০ খ্রীঃ পূঃ) আমলে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। আবার সগর হতে ছাব্বিশ পুরুষ অধঃস্তন রামচন্দ্রকে (৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ) হরধনু ভঙ্গের অপরাধে দণ্ড দিতে রামচন্দ্রের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছেন , রামায়নে বাল্মীকি তা বর্ণনা করেছেন। ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন - কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের (৩৯০০ খ্রীঃ পূঃ) মহারথী ভীষ্মের সঙ্গে এই পরশুরাম যুদ্ধ করেছিলেন, মহাবীর কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে পরে অভিসম্পাতও করেছিলেন।

এই তিনটি ঘটনা সত্য হলে পরশুরাম (৫০২০ - ৩৯০০) = ১১২০ বৎসরেরও অধিককাল বেঁচেছিলেন, একথা বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু কোন নরদেহধারী জীবের পক্ষেই এতকাল বেঁচে থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। যদি বলা হয় যোগবলে সব অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়, তবে এ কথাও মনে জাগে, এইরকম মহাযোগেশ্বরের পক্ষে কি সবসময় রণং দেহি ক্রুদ্ধমূর্তি নিয়ে বারবার আবির্ভূত হওয়া সম্ভব ? যোগ আর যুদ্ধ - দুটি বিপরীত মেরুর বস্তু।

আমি মহাত্মাদের বলতে থাকলাম - পুরাণের গল্পাংশের মধ্যে যা কিছু কুসুমিত পল্লবিত তার প্রতিটি অক্ষরকেই আপনারা মানেন আর আমি মানতে পারি না বলেই আপনাদের মনে হচ্ছে পুরাণের ওপর আমার শ্রদ্ধা কম। গল্পাংশের গভীরে প্রবেশ করে তার তাৎপর্য মনন করলে পুরাণের ফেনানো গল্পের মধ্যেই অনেক সত্যকে আবিষ্কার করা যায়। মেধা ও মননশক্তির অভাবে আমি সর্বাংশে সব বিষয়ের তাৎপর্য উদ্ধার করতে না পারলেও, সারং ততো গ্রাহ্যমপ্রস্য ফল্গুং - অর্থাৎ অসার অংশ ডাল পালা বাদ দিয়ে সারবস্তু গ্রহণ-এর কৌশল বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন। এই যেমন ধরুন উদাহরণ স্বরূপ পরশুরামের কথাই বলছি। তিনি ১১২০ বৎসরের অধিককাল বেঁচেছিলেন এ কথা ভক্ত সরল বিশ্বাসী ছাড়া আর কারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি পরশুরামকে একটি ধর্মমত বা একটি বিশিষ্ট পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী ধারা বলে ধরা হয়, তাহলে পরশুরামের অনুবর্তী পরশুরামগণের পক্ষে সহস্রাধিক বৎসর বেঁচে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ কোন ধর্মমতের তথা ধর্মসম্প্রদায়ের পরমায়ু সহস্র বৎসর হতে কোন বাধা নেই।

আধুনিক কালের কোন লেখক যদি খ্রীষ্টধর্মের বা ইসলাম ধর্মের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে লেখেন যে- খ্রীষ্টের বা হজরত মহম্মদের বয়স যথাক্রমে ২০০০ ও ১৪০০ বৎসর হয়েছে, তাহলে এযুগের লোকদের মনে যেমন কোন সন্দেহ বা বিস্ময়ের সঞ্চার হবে না - সেকালেও তেমনি পরশুরাম রাবণ নারদ প্রভৃতির দীর্ঘজীবিতায় কেউ কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করবেন না। কারণ, তাঁদের প্রত্যেকেই যে এক একটি ধর্মমত বা পূর্বাপর ঐতিহ্যের ধারক মাত্র, তা সকলে ভালভাবেই বুঝতে পারবেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরশুরামের একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন বা নিঃশেষের গূঢ়ার্থ এই যে- পরশুরাম অর্থাৎ গুরুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কোন পক্ষ দ্বৈততন্ত্র, কোন পক্ষ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন। পরশুরাম ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষীয় ক্ষাত্রতন্ত্রের সঙ্গে পরশুরামগণের যে ধর্মযুদ্ধ চলেছিল তার ফলে বারবার ক্ষাত্রনিয়ন্ত্রণ - ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও বিলুপ্তি ঘটেছিল। এ ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলেই সেকালের পুরাণকারেরা নানা রোমাঞ্চকর গল্পের মাধ্যমে বলে গেছেন যে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এই দশাশ্বমেধিক তীর্থের যে কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে আমাকে শোনালেন বা আমিও যে বাংলাতে প্রচলিত শিবদুর্গার কাহিনী শোনালাম, তার গল্পাংশ বাদ দিয়ে এই শিক্ষাটুকুই নিতে হবে যে ধ্রুবনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের শক্তিতেই দেবতার আসন টলে, তাঁর করুণাধারায় মানুষের জীবন ধন্য হয়।

ব্যস করো জী, ব্যস করো, - আভি লেট্ যাইয়ে- এই বলে দুজনেই শুয়ে পড়লেন। আমিও শুলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলাম - দুজন মহাত্মাই আমাকে স্নেহ করেন। এই দুর্গম অরণ্যযাত্রার দুঃখ বহুলাংশে লাঘব হয়েছে - এঁদের স্নেহ ও সাহচর্যে। এঁদের মনে কোন দুঃখ না দিলেই হ'ত।

মনে গ্লানি নিয়ে শুয়েছিলাম, শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। এই অঞ্চল তো আর মুণ্ডমহারণ্য নয় যেখানে কোন পাখী দেখিনি। পাখী সেখানে ডানা মেলে উড়তেই পারেনা, ত পাখী থাকবে কি করে? কিন্তু এখানে পাখী আছে, নামমাত্র গাছ আছে, কঙ্করময় উপত্যকা। দূরে বনমুরগীর ডাক শুনতে পাচ্ছি। সূর্যনারায়ণজীর কাছে শুনেছি এ অঞ্চলে কোথাও গৌড় ও রাজপুত ব্রাহ্মণদের বাস আছে। কাজেই বনমুরগীর পরিবর্তে হয়ত কোন ঘরের পোষা মুরগীরই ডাক শুনতে পেলাম। সাধুরা যোগাশনে বসে আছেন। মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম কুয়াশায় ঢাকা ভোরের অপূর্ব দৃশ্য।

আমি নর্মদা স্পর্শ করে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৫ সুক্তের মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি দৃষ্ট উষার বন্দনাগীতি গাইতে লাগলাম -

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভা
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ এবা রাত্রি উষসে যোনিমারৈক ॥ ১
রুশদ্বৎসা রুশতি শ্বেত্যাগাদারৈগ্ কৃষ্ণা সদনানি অস্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃতে অনুচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতি দেবশিষ্ঠে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥ ৩
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাম্ অচেতি চিত্রা বা দুরো না আবঃ।
প্রার্প্যা জগদব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা অজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪
জিহ্মশেচরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম্।
দভ্রং পশ্যদভ্য উর্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৫
ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা আজীগ র্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৬

"জ্যোতির মাঝে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি নামল উষা ঐ গগনে,
বিচিত্রতার দীপ্ত কিরণ ছড়িয়ে পড়ে সব ভুবনে।
সবিতা সে অন্তরালে জাগায় তিমির রজনীরে,
দ্যুতিমতী উষায় তথা রাত্রি জাগায় ধীরে ধীরে ॥ ১
শুভ্র বরণ দীপ্ত মোহন উষা এল সূর্যসনে,
কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি পালায় তিমিরঘেরা নিজসদনে।
রাত্রি উষা অমৃতময় সূর্যসখা তারা দোঁহে,
একের বরণ অন্যে নাশে দীপ্ত হয়ে জগৎ মোহে ॥ ২
অনন্ত পথ উভয় বোনের বিধান করেন দেবতারা,
সেথায় নিত্য ভ্রমণ করে একের পরে অন্য তারা ॥
ভিন্নরূপা নক্ত উষা চিত্ত তাদের সমান তবু,
দেয়না বাধা পরস্পরে চুপটি করে রয়না কভু ॥ ৩
সুনৃত বাক তারই দেওয়া প্রভাময়ী জানি তারা,
চিত্র তিনি খোলেন দ্বারে তিমির ভরা অন্ধকারে।
সর্বজগত আলোয় ভরি প্রকাশ করি দিলেন ধনে,
জাগিয়ে দিলেন জ্যোতির্ছটায় বিশ্ববাসী সকল জনে ॥ ৪
বক্র হয়ে ছিল শুয়ে উষা তাদের দিলেন ডাকি,
কেউ বা জাগে কেউ বা ভোগে কেউ বা কাজে মাতলো হাঁকি।
উষা তাদের দৃষ্টি বাড়ায় অল্প যারা দেখতে পারে,
দীপ্ত উষা জাগান হেসে বিশ্বজগৎ পারাবারে ॥ ৫
কেউ বা জাগে ধনের লাগি কেউ বা জাগে অন্ন তরে,
কেউ বা জাগে যজ্ঞ তরে কেউ বা ইষ্ট যাচঞা করে।
প্রকাশ করেন বিশ্বভুবন বিশ্বজনের হিতের লাগি,
চলেন সবাই আপন কাজে তন্দ্রা হতে ভোরে জাগি ॥ ৬

প্রাণভরে ঊষা-বন্দনা করে পেছন ফিরে দেখি দুই সাধুই আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনো চারদিক কুয়াশায় ঢেকে আছে কিন্তু তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁদের মনের কুয়াশা কেটে গেছে। গতরাত্রে তাঁদের যে থমথমে ভাব দেখেছিলাম তা আর নেই। সূর্যনারায়ণজী বললেন - চলিয়ে অব নাহায়েঙ্গে। আকর হম্ আগ-কা ইন্তেজাম কর দেগা। কাফি ঠাণ্ডা হ্যায়। তাঁদের পরে আমি স্নান করতে নামলাম, স্নান করে এসে দেখি, মন্দিরের বাইরে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে সূর্যনারায়ণজী রোজের মত ঝুলি কাঁধে নিয়ে কোথাও চলে গেছেন। আগুনে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে শোভানন্দজী গাঁজাতে দম দিচ্ছেন।

আমি কিছুক্ষণ আগুনে হাত-পা সেঁকলাম, পাহাড়ের উপর সূর্য উদিত হচ্ছেন, সমগ্র পাহাড় অরুণাভায় ভরে গেছে, নর্মদার ওপারে সাতপুরা পর্বতেও যেন রামধনুর শোভা। মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম। গতরাত্রে প্রদীপের আলোয় এই দশাশ্বমেধিক তীর্থের শিব ভালভাবে দেখতে পারিনি। এখন দেখে অবাক হলাম। কমণ্ডলুর জল ঢালতে ঢালতে 'ইয়ে রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে (ঋ ১ম। ১১৪ সূক্ত) ইত্যাদি কুৎস দৃষ্ট মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে বারবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পরের লাইনগুলো কিছুতেই স্মরণে এল না। যেন বুক ঠেলে আবেগে বেরিয়ে এল -

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্ধ্বলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥

হে রুদ্র তুমিই পরমব্রহ্ম, তুমি ঋতকে প্রকাশ কর - তোমার দৃপ্তিচ্ছটা ঋতম্-এর আলোকে দ্যুতিমান, তুমিই সত্যস্বরূপ। আমি জানি, সন্ধ্যা বন্দনায় এটি রুদ্রোপস্থানের মন্ত্র, এই মন্ত্রে রুদ্রকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু এখন ত আমি সন্ধ্যা করতে বসিনি, শিবপূজা করতে চাইছি, কেন যে এই মন্ত্রের গুঞ্জরণ মনে জেগে উঠল, বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে লাগলাম, হে প্রভু, তুমিই সূর্যরূপে, অগ্নিরূপে বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করে আছ -

চক্ষুর্নো বেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ
সং চেদং বি চ পশ্যেম॥ (ঋ ১০।১৫৮।৪)

আমার চোখে দাও জ্যোতি, সকল অঙ্গে দর্শনশক্তি দান কর - আমি দেখব তোমার দিব্যরূপের শোভা - দেখব বিশেষ করে, ব্যক্ত করে এবং বিশদ করে।

প্রণাম করে পূজা সাঙ্গ করলাম। লিঙ্গটি বেশ বড় পীতের আভাযুক্ত ঘন নীল, দু-হাত দূর থেকে দেখলেই খুব কালো দেখায়। লিঙ্গের মধ্যে যেন জটা জড়িয়ে আছে, খুবই জ্বলজ্বল করছে। শোভানন্দজী লক্ষ করেছিলেন যে আমি শিবলিঙ্গটির চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলাম।

তিনি বলে উঠলেন - আপকা পিতাজীকা উস্ খাতা লে আইয়ে, দেখিয়ে ত এ কোনসা শিউজী হ্যায়, বিগ্রহকা ক্যা নাম হো সকতা হৈ।

আমি খাতা খুলে অনেক খুঁজে দেখলাম, পরিস্ফুট চিহ্নাদি থেকে এঁকে কালাগ্নিরুদ্র লিঙ্গ বলা যায়। হেমাদ্রিধৃত হতে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বাবা লিখে গেছেন -

জ্বলৎপিঙ্গং জটাজুটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্বসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্॥

পীতের আভাযুক্ত ঘন নীলকেই পিঙ্গ বা পিঙ্গল বর্ণ বলা হয়। এই শিবলিঙ্গ সেইরকমই দেখতে। বেলা নয়টা নাগাদ সূর্যনারায়ণজী ফিরে এলেন, ঝুলি ভর্তি আটা, ডাল, নানাবিধ শব্জী, পেপে, আমলকী, কলা কি নেই তাতে! তিনি ভোগ প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। ধ্যান-ধারণার অন্তরালে তাঁর এই নীরব সেবা এবং পরিক্রমাবাসীর সর্ববিধ যত্নবিধানে নিরলস পরিশ্রম দেখে তাঁর স্নেহশীল সাধু চরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করা যায়। একমাস আগেও কারও সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পথের পরিচয় হয়ত পথেই মিলিয়ে যাবে। তবুও আমাদের মত পরদেশী লোকের যত্ন করতে তাঁর গরজ বা আগ্রহ চিরকাল স্মরণে রাখার মত। নিঃস্বার্থ সেবা কাকে বলে সূর্যনারায়ণজী তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

মন্দিরের চত্বরে রোদ এসে পড়েছে। আমরা তিনজন খাবার পর মন্দিরের বাইরে এসে বসলাম। শোভানন্দজী গত রাত্রির জের টেনে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন - পুরাণ কা বারে মেঁ আপকো যো অনুভব, উহ্ মনমেঁ দুখ দেতা হৈ জরুর, তব্ হি বুরা নেহি লাগতা। দ্রৌপদীজীকো যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন বাগেরা পাঁচো ভাই যো সাদি কিয়ে থে উসকা বারে মেঁ আপকা ক্যা বিচার হৈ ?

আমি বললাম - মহাভারতের ঋষি-কবি দ্রৌপদীর জন্ম বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রোণের শত্রুতাচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে দ্রৌপদীর উদ্ভব হয়। যজ্ঞ হতে উৎপন্ন বলে দ্রৌপদীর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন মৎস্যচক্র ভেদ করে দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন এবং মাতা কুন্তীর আদেশে পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। পাঁচ ভাই একত্রে কেমন করে একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে লাগলেন এবং কুন্তীই বা কি করে এইরকম একটা অসামাজিক অশোভন এবং উদ্ভট প্রস্তাব করতে পেরেছিলেন - এই জাতীয় নানা প্রশ্ন পরবর্তীকালের মানুষের মনে জাগবে বলেই মহাভারতের মধ্যে মৎস্যচক্রের যৌগিক ব্যাখ্যাসহ আরও নানারকম ব্যাখ্যা সম্বলিত অভিনব ঘটনার প্রক্ষেপ বা সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু যে সময়ে মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল সেই যুগের মানুষ পুরাণের কাহিনীকে রূপক আখ্যান হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন ঋষিরা কোন বিশেষ শিক্ষা বা ধর্মনীতিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলবার জন্য এইরকম রূপকের আশ্রয়ে মনোজ্ঞ গল্প রচনা করতেন। সেই যুগের মানুষের মানসিকতাই এইরকম ছিল। সেইজন্য পঞ্চ পাণ্ডবের এক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে বা কুন্তীর ওইরকম উদ্ভট আদেশে বিচলিত হন নি। কারণ তাঁরা নিঃসংশয়ভাবে জানতেন যে যাজ্ঞসেনী বা দ্রৌপদী নাম্নী মহাভারতের স্ত্রী চরিত্রটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রচলিত ধর্মমতের স্ত্রী বা কন্যারূপ মাত্র - যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞীয় মতবাদই প্রধানতম উপাদান ছিল। বস্তুতঃ দ্রৌপদী আখ্যায় আখ্যাত নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে মহাভারতকার প্রধানভাবে যজ্ঞধর্মের (যার নামান্তর বৈদিক ধর্ম) ইতিবৃত্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন বলেই তাঁর আর এক নাম দিয়েছিলেন 'যাজ্ঞসেনী'। যজ্ঞে যজমান ছাড়াও পাঁচজন সাধারণত অংশগ্রহণ করেন - হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু এবং ঋত্বিক। এই পাঁচজনই পঞ্চপাণ্ডব এবং যজ্ঞাগ্নি বা অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিধিই দ্রৌপদীর রূপকে গল্পের মাধ্যমে মহাভারতে পরিবেশিত হয়েছে।

এইরকম আর একটি রূপক আখ্যানের বর্ণনা ঐ মহাভারতেই আছে। সেখানে 'বিশ্বামিত্র-গালব' উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে গালব ছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। তিনি শিক্ষা ও সাধনার অন্তে দক্ষিণা দিতে চাইলে বিশ্বামিত্র অতি অদ্ভুত রকমের আটশত অশ্ব চেয়ে বসলেন। নিরুপায় গালব প্রথমে কাশীশ্বর যযাতির নিকট প্রার্থী হন। কিন্তু যযাতি প্রার্থিত অশ্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে সমর্পণ করেন। গালব মাধবীকে পর পর তিনজন রাজার সঙ্গে (অযোধ্যার রাজা হর্যশ্ব, কাশীর রাজা দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনর) বিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে প্রত্যেকের নিকট হতে বিশ্বামিত্রের চাহিদা অনুযায়ী দুইশত করে অশ্ব শুল্ক হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই তিনজন রাজার প্রত্যেকেই মাধবীর গর্ভে একটি করে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্রকে কাছে রেখে অশ্বসমেত মাধবীকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন বলেই এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। তিন রাজার নিকট হতে প্রাপ্ত ছয়শত অশ্ব এবং বাকী দুইশত অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করে গালব গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করেছিলেন। অবশ্য বিশ্বামিত্রও মাধবীতে একটি পুত্রোৎপাদন করে তাঁকে গালবের হাতে ফেরত দেন, গালবও প্রয়োজন সিদ্ধির অন্তে যযাতির নিকট তাঁর কন্যাকে প্রত্যার্পণ করেন। এই আখ্যান বর্ণিত মাধবীকে যতক্ষণ মানবীয় জীব এবং রক্তমাংসের দেহ বিশিষ্টা নারী বা কন্যা মনে করা যায় ততক্ষণ আখ্যায়িকাটিকে সম্পূর্ণ উদ্ভট, এমনকি এক গঞ্জিকাসেবীর আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখনই জানা যায় যে মাধবী বস্তুতঃ একটি ধর্মমতের বা ধর্মীয় মতবাদের স্ত্রী বা কন্যারূপ মাত্র, তখন গল্পটির মধ্যে ন্যক্কারজনক কোন কিছু ত থাকেই না বরং মনে হয় যে, তিনজন রাজা এবং একজন ঋষি ত ভাল কথা, পঁচিশজন রাজা এবং পঞ্চাশজন ঋষির হস্তেও মাধবীকে সমর্পণ করতে পারতেন; বিষ্ণুর অপর নাম যে মাধব, একথা সকলেরই জানা। মাধবী হলেন বিষ্ণুভক্তির প্রতীক। একথা মনে রাখতে হবে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রীর দ্রষ্টা। তাঁর শিষ্য গালবও অথর্ববেদের বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা। গালব রাজকন্যা মাধবীকে তিনজন রাজা এবং একজন ঋষির হস্তে সমর্পণ করার তাৎপর্য হল, তিনজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী রাজা এবং বিশ্বামিত্রের মত মহর্ষিও বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসনার ধারাকে গ্রহণ, প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন। বাবা আমাকে এইভাবে পুরাণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণ করতে বলেছেন, নির্বিচারে প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্বাস করতে বলেন নি।

বেলা বোধহয় চারটা বেজে গেছে, শীতকালের বেলা, এখনই সন্ধ্যা হবে। সূর্যনারায়নজী কড়াইতে কাঠের আগুনকরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ঝমঝম শব্দ করতে করতে একজন সাধু এসে পৌছঁলেন। তাঁর সঙ্গে আছেন একজন গৃহী গোঁড়ভক্ত। সাধুর বেশভুষা বড়ই বিচিত্র। তাঁর বুক পিঠে রজ্জুবদ্ধ, মণিবন্ধে এবং পায়েও দড়ির পাট্টি, গলায় রুদ্রাক্ষ, কাঁধে একটি ছোট্ট ঝুলি। হাতে একটি বড় লোহার চিমটা। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়েও শীত অনুভব করছি, কিন্তু ঐ সাধুর গায়ে কোন কোর্তা বা কম্বল নেই। মন্দিরের ধাপে গলার রুদ্রাক্ষ, ঝুলি, চিমটা এবং বুক, পিঠ, পা ও মণিবন্ধের দড়ির বন্ধনিগুলি খুলে রেখে স্নান করতে ঘাটে নেমে গেলেন। ঘাটে গিয়ে পরিধেয় বস্ত্র যখন উন্মুক্ত করলেন তখন দেখা গেল তাঁর শিশ্নদেশ লোহার বলয় দিয়ে দুই দিকেই বিদ্ধ আছে।

শোভানন্দজী সাধুর সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, এই ঘাট থেকে একমাইল দুরেই গোঁড়দের পল্লী। বহু গোঁড় ঐ সাধুর শিষ্য। সাধু কুকাপন্থী। শোভানন্দজী আমাকে জানালেন - কুকাপন্থীরাও শিবভক্ত। তাঁরা শিবের পূজা করেন তবে তাছাড়াও তাঁদের অনেক সাম্প্রদায়িক গোপন আচার অনুষ্ঠান আছে। কুকাপন্থী গুরু যখন শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন দীক্ষার পরেই শিষ্যের শরীরে উন্মাদ লক্ষন দেখা দেয়। তিন-চারদিন পরেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। নর্মদাতে ডুব দিয়ে এসেই সাধু ধাপের উপর বসেই ঝুলি থেকে তিলকমাটি বের করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কপালে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা অতি যত্নে আঁকলেন। তাঁর বিভূতি ধারণের মন্ত্র যেমন অদ্ভুত তেমনই রহস্যময় -

আদকা যোগী অনাদকী বিভূত। সতকা নাতি ধরমকা পুত।
অম্বর বর্ষে, ধরতী করে। সো ফূল মাতা গায়ত্রী চরে।
সূর্যমুখ মুখৈ অগ্নিমুখ জ্বলে, চন্দ্রমুখ শিতলে,
সো ভস্মবন্তী মায়ী অনন্ত কোট সিদ্ধোকে হস্তকলে মস্তক চঢ়ে।
চড়াই খাক, হুয়া দেলপাক, অলখ নিরঞ্জন আপই আপ।
ভস্মবন্তী মায়ী যাঁহা পাই, তাহা রামাই।

তিলক কেটে তিনি নর্মদার দিকে যুক্তকরে প্রণাম করলেন। এইবার রুদ্রাক্ষমালা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নুইয়ে গলায় পরতে পরতে বলতে লাগলেন -

ওঁ গুরুজী। রুদ্র রুদন্তি কায়া রুখন্তি, মূলে ব্রহ্মা মধ্যে বিষ্ণু লিঙ্গে লিঙ্গ সর্বদেব লিঙ্গে,
রুদ্রদেও নমস্কার

মন্দিরস্থ শিবের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। আসার পর বা যাবার সময় তিনি কারও সঙ্গে কোন কথা বললেন না, শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

মন্দিরে ঢুকে শোভানন্দজী ও সূর্যনারায়ণজী যে যাঁর আসনে জপে বসে গেলেন। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে যতটুকু পারলাম ডায়েরীতে নোট নিলাম, পরে শুয়ে পড়লাম। গভীর রাত্রে আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মন্দিরের অভ্যন্তর মৃদু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোতে ভরে গেছে। মন্দিরের মধ্যে জ্যোৎস্না কোথা থেকে আসবে একথা মনে আসামাত্র দুই সাধুর দিকে তাকিয়ে দেখি শোভানন্দজী কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিজের আসনে বসে আছেন আর সাধু সূর্যনারায়ণজী পদ্মাসন অবস্থাতেই শূণ্যে ভাসছেন। এই রকম অত্যাশ্চর্য দৃশ্য আগে কখনও দেখি নি, কেবল বই-এ পড়েছি, মহাত্মা রামঠাকুরের (কৈবল্যনাথ) দেহ ধ্যানাবস্থাতে শূন্যে ভাসত। আমি অপলকনেত্রে এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা পরে সূর্যনারায়ণজীর দেহ সেই অবস্থাতেই নিজ আসনে নেমে এল।

আমার বিস্ময়ের অন্ত নাই। আমার কাছে এটা একটা startling revelation ! যে মানুষটাকে আজ প্রায় পনের দিন ধরে দেখছি, অতি সাধারণ মানুষের মত, নিজের একান্ত আপনজনের মত আমার সুখ-সুবিধার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, রান্না করা, শীতে আরাম ও উত্তাপ দেবার জন্য আগুন জ্বালা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কাজ নীরবে করে চলেছেন, তিনি যে কতবড় উচ্চকোটির যোগী তা নিজের চোখে দেখলাম।

অসাধারণ হয়েও সাধারণভাবে থাকতে ও মিশতে পারাটাই প্রকৃত সাধুর লক্ষণ। আজকাল দেখি, ছিটেফোঁটা অনুভূতি বা সামান্য বিভূতি প্রাপ্ত হলেই সকলেই 'মহাত্মা' বনে যান, প্রচারে গগন কম্পিত করেন, কিন্তু সেই প্রচার ও প্রতিষ্ঠালিপ্সাই সাধুবেশী 'মহাত্মা'দের' অন্তঃসারশূন্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বাবা বলতেন - ভক্ত হবি তো গুপ্ত হ। ধর্মানুভূতি যতই গোপন করা যাবে, ততই তা বৃদ্ধি পাবে। প্রকাশ করলেই বিকাশ রুদ্ধ হবে।

এ বিষয়ে মহর্ষিদের উপদেশ -

কীর্তনাৎ নশ্যতে ধর্মো বদ্ধতেহসো নিগহণাৎ
ইহলোকে পরে চৈব পাপস্যমপি এবমেব চ॥

অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে দিব্যানুভূতির কীর্তন বা প্রচারে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর সম্যক গোপন করতে পারলেই তা বর্ধিত হয়। ইহলোক বা পরলোক, ধর্মের কীর্তনে যেমন অপচয় এবং গোপনে উপচয় হয়, পাপেরও সেইরকম ব্যবস্থা। অর্থাৎ পাপের কীর্তনে ক্ষয় এবং গোপনে বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

সকালে উঠে নর্মদা স্নান ও শিবপূজার পর আমরা মান্দালা অভিমুখে যাত্রা করলাম। প্রায় তিন মাইল রাস্তা গাছ বিহীন, পাথরময় উপত্যকায় তিন-চারটা গৌড় ও রাজপুতদের পল্লী অতিক্রম করে কানাই সঙ্গমে পৌঁছলাম। কানাই সঙ্গম থেকে চড়াই শুরু। শোভানন্দজী বললেন - ইহ্ হ্যায় মুড়িয়া মহারণকা আখেরী ভাগ। করীব পাঁচ মাইল ঘোর জঙ্গলকা অন্দর পরিক্রমা করনে পড়েগা। উসকা বাদ হমলোগ মান্দালা মেঁ পৌঁছ যায়েগা।

চড়াই-এর পথে আবার সেই ঘনঘোর মুণ্ডমহারণ্যে শাল, সাজা, আবলুষ, বহেড়া, হরিতকীর জটলার মধ্যে দিয়ে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে হাঁটতে থাকলাম। এই পথে আমার আগে আছেন সূর্যনারায়ণজী, পেছনে শোভানন্দজী। একবার পিছন ফিরে অতিকষ্টে সাতপুরা পর্বতকে দেখতে পেলাম। তার সুউচ্চ পর্বতচূড়া যেন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। এ পথে লক্ষ্য করলাম, বনের মধ্যে গাছপালার যেন তিনটে চারটে স্তর। সকলের উপরের স্তরে শুধুই পরগাছা আর শেওলা, মাঝের স্তরে ছোটবড় গাছ, নীচের স্তরে ঝোপঝাড়, ছোট গাছ। বনের মধ্যে সূর্যের আলোর বালাই নেই। আমার সঙ্গী দুই সাধুই এ পথে অনেকবার যাতায়াত করেছেন, কাজেই আমাকে আগের মত পথ হাতড়ে যেতে হচ্ছে না। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম কুশগাছের মত একরকম লম্বা লম্বা ঘাসের বন, খুবই ধারালো। তার মধ্য দিয়ে যাবার সময় আমরা তিনজনের কেউই নিজেদের নিরাপদ বলে ভাবতে পারছি না। দুহাত তফাতে কি আছে দেখা যাচ্ছে না, সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই এখানে প্রবল। বাঘ, বুনো মোষ, বিষাক্ত সাপ কোনটাই থাকা বিচিত্র না। বেলা বারোটা নাগাদ আমরা মান্দালাতে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার উত্তরতটে মান্দালা। আমরা নর্মদা তীরের একটা পরিত্যক্ত মন্দিরে এসে উঠলাম। শোভানন্দজী সূর্যনারায়ণজীকে বললেন - হম্ ইধরসে বাহার নেহি যায়েগা। তবিয়ত ভি ঠিক নেহি হৈ। আপতো সবকুছ পহচানতে হো! আপ শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকো রাজরাজেশ্বরী মন্দির, মান্দালা দুর্গ বগেরা সবকুছ দিখলা দিজিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - নর্মদা-পরিক্রমার প্রধান ও প্রথম পরীক্ষার স্থল মুণ্ডমহারণ্য তোমার অতিক্রম করা হয়ে গেল। এদিকে আর কোন ভয় নেই। লোকালয় আছে, দোকানপসারও অনেক। এখানকার আধিবাসীরা যার অধিকাংশই গৌড় ও রাজপুত, তারা সবাই সাধু ও পরিক্রমাবাসীদেরকে ভক্তি করে। সেবা করতে সবাই উন্মুখ। এখানে ধীরে ধীরে শহর গড়ে উঠছে। মান্দালা জেলার জেলা শহর এই মান্দালা থেকে জব্বলপুর জেলা, তারপরে নরসিংহপুর জেলার মধ্যে কোথাও আর ঘোর জঙ্গল নেই। বিন্ধ্যপর্বতের এই বিরাট উপত্যকা এবং সমতলভূমি জুড়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট মনোরম অরণ্য ছাড়া সর্বত্রই কৃষিক্ষেত্র এবং মানুষজনের বাস দেখতে পাবে। যতদিন ইচ্ছা মান্দালাতে বিশ্রাম করে তোমার গন্তব্যপথে রওনা হবে। এখন তুমি সূর্যনারায়ণজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়।

কিছুক্ষন বিশ্রাম করার পর সূর্যনারায়ণজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নর্মদার ধার ধরে প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে বাঁদিকে মোড় নিতেই চোখে পড়ল বিরাট মন্দির। সূর্যনারায়ণজী জানালেন- এহি হ্যায় রাজরাজেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দির দ্বারের মুখোমুখি সাদা পাথরের বৃহৎ মন্দির। একপাশে একটি বাঁধানো ইঁদারা, খুব গভীর। ইঁদারার অন্যদিকে একটি ধর্মশালা। সেখানে আট-দশজন সাধু তাঁদের বিচিত্র বেশভূষা নিয়ে কেউ বসে আছেন, কেউ ঘোরাফেরা করছেন, সকলেরই ঠোঁট নড়ছে, বোধহয় জপ্ করছেন। মন্দিরের চারদিকে বহির্গাত্রে অনেকগুলি পাথরের তৈরি বিগ্রহ।

সূর্যনারায়ণজী আমাকে মন্দির প্রদক্ষিণ করালেন। আগে প্রদক্ষিণ করে তবেই নাকি মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করতে হয়। এটাই নাকি এখানকার রীতি। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার মুখে দেখলাম শশব্যস্তে একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে সূর্যনারায়ণজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে সূর্যনারায়ণজী আমাকে বললেন - ইনিই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে দেখলাম শ্বেতপাথরের অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী দূর্গামূর্তি। পাশেই চতুর্ভুজ মহাদেব, কোলে পার্বতী। মন্দিরের মধ্যে দুজন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যারতির আয়োজন করছেন। প্রধান পুরোহিত দেখালেন - সিংহবাহিনী এবং শিবমূর্তির মধ্যস্থলে এক স্ফটিকলিঙ্গ। তাঁর নাম ব্যাস-নারায়ণ। প্রধান পুরোহিত বললেন - আরতি দেখে যাবেন। আরতির পর ভালভাবে বসে আলাপ করব।

অনেকক্ষণ ধরে বাদ্য সহকারে আরতি হ'ল। গোটা মন্দির ধূপ-ধূনার গন্ধে সুরভিত। ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন যেসব সন্ন্যাসী তাঁদের কেউ শিবের কেউ অম্বিকার কেউ বা মা নর্মদার স্তব পাঠ করলেন। প্রসাদ বিলির পর যে যার স্থানে ফিরে গেলেন। প্রধান পুরোহিত আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসলেন। তিনি বলতে লাগলেন - কলচুরি বংশের পর মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে গৌড়রাজা মদনসিংহ গণ্ডোয়ানা রাজ্য স্থাপন করেন। জব্বলপুরের মদনমহল প্রাসাদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। জব্বলপুর, মান্দালা এবং রামনগর এই তিনস্থানে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর চতুর্দশ উত্তরপুরুষ ছিলেন রাজা সংগ্রামসিংহ। এখানকার মান্দালা দূর্গ তিনিই নির্মাণ করান। বহু মঠ মন্দির অট্টালিকা এবং সমৃদ্ধ গৌড়-জনপদ তৈরি করেন।

বর্তমানে ভাগ্যহত গৌড়রা বিরাট হিন্দুসমাজের সঙ্গে মিশে গেলেও গৌড়দের একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তোলার পেছনে তারই অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনিই নর্মদা তীরের এই ব্যাসতীর্থে রাজরাজেশ্বরী মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তি সময়ে তারই বংশের ইতিহাস বিখ্যাত গণ্ডোয়ানা-রানী দূর্গাবতীও এই মন্দিরের অনেক সংস্কার করে গেছেন।

আকবরের মুসলমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে রাণী দূর্গাবতীর সেই বিখ্যাত গণ্ডোয়ানা তথা গৌড় -রাজবংশ ধ্বংস হলেও সংগ্রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত এই রাজরাজেশ্বরী মন্দির স্বমহিমায় এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু তার বহু পূর্বেও স্মরণাতীত কাল থেকে নর্মদাতটে স্বয়ম্ভু ব্যাসনারায়ণ বিরাজমান ছিলেন। এই স্থানের নাম ব্যাস-তীর্থ, ব্যাসের তপস্যাস্থল। রেবাখণ্ড এবং বশিষ্ঠ-সংহিতাতে এ বিষয়ে মনোজ্ঞ বিবরণ আছে তা হ'ল-

সেই প্রাচীনকালে নর্মদা ভগবান বেদব্যাসের এই তপস্যাস্থলীর উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। একদিন পরাশর মনু অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য উশনা অঙ্গিরা এবং সংবর্ত প্রভৃতি ঋষিগণ ব্যাসের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বেদব্যাস তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে আসন পাদ্য অর্ঘাদি নিবেদন করলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন - আমি আপনাদেরকে আরণ্য শাক এবং বন্য ফলমূলাদি দিয়ে ভোজন করাতে চাই। আপনারা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। কিন্তু ঋষিরা তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁদের হয়ে পরাশর জানালেন - পুত্র! তোমার এই আশ্রম নর্মদার দক্ষিণতটে। ঋষিরা ব্রতভঙ্গের ভয়ে দক্ষিণকূলে বসে তোমার শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করতে চাইছেন না -

নোচ্ছন্তি দক্ষিণে কূলে ব্রতভঙ্গভয়াদথ।
ভোক্তুকামাস্তে শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষতঃ॥

এই কথা শুনে ব্যাসদেব নর্মদার গতি পরিবর্তনের জন্য উগ্র তপস্যায় বসলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মাতা নর্মদা দর্শন দিয়ে বললেন - তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি, কি বর চাও বল। ব্যাসদেব বললেন - আপন দয়া করে আপনার গতি পরিবর্তন করুন, যাতে আপনার উত্তরতটে আমি অতিথি ঋষিদেরকে বসিয়ে ভোজন করাতে পারি -

আতিথ্যমুত্তরে কূলে ঋষীণাং দাতুমর্হসি।

মাতা নর্মদা বললেন - ইন্দ্র চন্দ্র যম প্রভৃতি দেবতগণও আমাকে মার্গ পরিবর্তন করাতে পারবেন না। গতি পরিবর্তনের অনুরোধ করা তোমার পক্ষে অনুচিত হয়েছে -

অযুক্তং যাচিতং ব্যাস বিমার্গে মৎপ্রবর্তনম্।

এই বলে নর্মদা মাতা অন্তর্হিতা হলেন। ব্যাস তখন আশুতোষ মহেশ্বরের তপস্যায় বসলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-ব্যাসনারায়ণ প্রকট হয়ে নর্মদাকে হুকুম করলেন - সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্মদে! ব্যাস নিজের জন্য নয়, ব্রাহ্মণ-ঋষিদের জন্য এত ক্লেশ সহ্য করেছে -

ব্রাহ্মণার্থে চ সংক্লিষ্টো নাত্মহেতোঃ সরিদ্বরে।

নর্মদা মহাদেবের মনোগত ইচ্ছা বুঝতে পেরে ব্যাসের আশ্রমকে উত্তরে রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হলেন। অবশ্য কিছুদূর যাবার পর আবার উত্তরাভিমুখী হয়েছেন।

সূর্যনারায়ণজী এবার যাবার জন্য উঠে পড়লেন। পুরোহিতমশায় বললেন - যে কয়দিন মান্দালায় থাকবেন, মাঝে মাঝে আসবেন। নমস্কার করে আমরা আমাদের ডেরায় ফিরে চললাম। রাস্তায় আসতে আসতে সূর্যনারায়ণজী জানালেন - পুরোহিতের নাম নীলকণ্ঠ চতুর্বেদী, কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

এসে দেখি শোভানন্দজী জপে বসেছেন। ধুনি জ্বলছে।

পরদিন সকালে উঠেই সূর্যনারায়ণজী বললেন - চলিয়ে আজ সহস্রধারা লে চলেঙ্গে। তখনও কুয়াশার চাদর সম্পূর্ণভাবে সরে যায়নি। তবে নর্মদাতীরে প্রাণের সাড়া জেগেছে। সাধু সন্ন্যাসী ছাড়াও কিছু কিছু গোঁড় ও ব্রাহ্মণ গৃহী পরিবার নদীর ঘাটে স্নান করতে নেমেছে। দু একটি নৌকাকেও দেখলাম মাঝ নদীতে ভেসে ভেসে অন্য কোন ঘাটের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় তিনমাইল হেঁটে যাবার পর একটি বিরাট জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নদীর মাঝখানে পর্বতমালার আড়ালে। পর্বতের একদিকে আছড়ে পড়ছে জলস্রোত, তারপর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে গা বেয়ে সহস্র ছোট ক্ষীণ ধারায় ঝরণা হয়ে ঝরে পড়ছে - আবার সব কটি ধারা এক হয়ে চলেছে পশ্চিমাভিমুখী। এই ধারার নাম - সহস্রধারা।

এমন মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত সারা ভারত ঘুরেও আর কোথাও আমি দেখতে পাইনি। স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারার বিপুল গর্জন, বিন্ধ্যপর্বতের এক অপূর্ব রূপ। সূর্যনারায়ণজী বললেন - ভগবান দত্তাত্রেয়ের বরে মাহিষ্মতিরাজ কার্তবীর্যার্জুন সহস্রবাহু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একদিন এখানে যখন রানীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছিলেন, তখন ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণ এসে তাঁকে হয় বশ্যতা স্বীকার নতুবা যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। কার্তবীর্য সহস্রবাহু দিয়ে বিংশতিবাহুধারী দশাননকে জাপটে ধরে বগলদাবা করেন এবং তাঁর আস্ফালন স্তব্ধ করে দেন। পরে অবশ্য পুলস্ত্য ঋষি তাঁর পৌত্র রাবণকে মুক্ত করে দেবার অনুরোধ করলে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

দেবতা বা ঋষি কাউকে যতই আশীর্বাদ করুন সেই আশির্বাদের জোরে কোন মানুষের সহস্রবাহু গজিয়ে ওঠে কিনা তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে কোন কোন মানুষ এমনই বীর হন যে তিনি অবলীলাক্রমে সাধারন বলের অধিকারী পাঁচশত (সহস্রবাহু) জনকে পরাজিত করতে পারেন। যিনি পাঁচশত জনের বলবিক্রমকে হেলায় চূর্ণ করতে পারেন, তাঁর পক্ষে দশজন (কুড়িবাহু ধারি) লোকের সমান শক্তিবিশিষ্ট কোন বীরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারাটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সহস্রবাহু ও বিংশতিবাহুর রূপক অর্থ যাইহোক এই সহস্রধারা প্রপাতকে অমিত পরাক্রমশালী সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন বলে কল্পনা করতে কোন বাধা নেই।

প্রপাত থেকে একটু দূরে নেমে আমরা স্নান তর্পণাদি সেরে ডেরায় ফিরে এলাম। এসে দেখি, শোভানন্দজী ঘি মাখানো চাপাটি এবং ডাল তৈরী করে ফেলেছেন, শালপাতায় পাকা পেপে কেটে রেখেছেন। আমাদেরকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন-আপলোগ হমারা মেহমান, আজ হম খিলায়েঙ্গে। রাজরাজেশ্বরী মন্দরকা চতুর্বেদীজী বহোৎসা ভোজনকা সামগ্রী ভেজ দিয়া।

সবেমাত্র খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় চতুর্বেদীজী ছুটতে ছুটতে এসে জানালেন - দরিয়াইজী ইধর্ আ গয়ে। আপলোগ দর্শন করনে চলেঙ্গে ত চলিয়ে। আমাকে বললেন - এ্যায়সা মহাত্মা কলিযুগমেঁ মিলনা বহোৎ দুর্লভ হৈ। ঋদ্ধিসিদ্ধি উনকা পিছে পিছে দৌড়তা হৈ। এক মাহিনা উননে নর্মদা পানিমেঁ থে। আমি যে গঙ্গাবাহ ঘাটে এর আগেই তাঁর দর্শন পেয়েছি, সে কথা বলা নিস্প্রয়োজন মনে করলাম।

চারজনই একসঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের ডেরা থেকে বায়ুকোণে মাইলখানেক যাবার পরেই নর্মদা তীরে একটি ছোট মনোরম শালবনের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক লোক সাধু-গৃহী নির্বিশেষে সবাই গোল করে বসে আছেন। একটি শালগাছের তলায় মহাপুরুষ বসে বসে আপনমনে কাগজ ছিঁড়ছেন। পাশেই স্তূপীকৃত কাগজ। যারাই এসেছেন তারাই পুরোনো কাগজ ভেট হিসাবে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দুপাশে বাঘা বাঘা ছয়টা বুনো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত সাধু ! এই সাধুর কাছে টাকা পয়সা ফুল ফল বস্ত্রাদি ভেট দিতে হয় না। তাঁর ছিঁরবার জন্য পুরাতন কাগজ দিলেই তিনি তুষ্ট।

সাধু কেবল কাগজ ছিঁড়ছেন আর মাঝে মাঝে কুকুরগুলোকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর তিনি ছিন্ন কাগজের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক একটি নর্মদা লিঙ্গ টেনে এনে ভীরের মধ্য থেকে হাতের ইশারায় দশ-বার জনকে কাছে ডেকে সেইসব লিঙ্গ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পূজা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন - কল্যাণ হোগা। তাঁর ডান দিকে আর একটি গোটা কাগজের বাণ্ডিল টেনে তাঁর সামনের একটা পরিস্কার স্থানে পাথরের উপর কাগজ ছিঁড়ে জমা করতে লাগলেন। সেও ধীরে ধীরে স্তূপের আকার নিল। এবার তিনি সেই স্তূপের তলা থেকে আরও দশ-বারটা শিবলিঙ্গ টেনে এনে আগের মত হাতের ইশারায় আরও দশ-বার জনকে দিলেন আবার আগের মতই বললেন - কল্যান হোগা।

শোভানন্দজী চুপি চুপি আমাকে বললেন যে যাঁদেরকে উনি শিব দান করলেন, তাঁদের পরিবারে হয়ত কোন মুমূর্ষু রোগি অথবা আশু কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে। ওঁর শিব দানের ফলে তাদের বিপদ কেটে যাবে। দরিয়াইজীকে যাঁরা জানেন, তাঁদের জীবনে এইরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। মহাপুরুষের পেছনদিকে একজন মুণ্ডিত মস্তক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়ে বললেন - ঐ লোকটিই রাজেশ্বর দয়াল, স্বপ্নে দেখা দিয়ে ওঁকেই দ্বারভাঙ্গা থেকে এখানে টেনে এনেছিলেন দরিয়াইজী।

শিবদানের খেলা বা লীলা শেষ হবার পরেই দরিয়াইজী কুকুরগুলোকে হাতের ইশারায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তিনি কুকুরদের পদতলে ভূলুণ্ঠিত হলে সমগ্র জনতা যিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই ধূল্যবলুণ্ঠিত হলেন। প্রণত অবস্থাতেই দরিয়াইজী বলছেন- নমঃ শ্বভ্যঃ নমঃ শ্বভ্যঃ নমঃ শ্বভ্যঃ। ধূল্যবলুণ্ঠিত জনতাও সমস্বরে বলছেন - নমঃ শ্বভ্যঃ নমঃ শ্বভ্যঃ নমঃ শ্বভ্যঃ।

আমিই কেবল প্রণাম করিনি। আমি বসে বসেই এই মজার দৃশ্য দেখছিলাম।

প্রণাম পর্ব শেষ হবার পরেই দরিয়াইজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - যো গোলি ভরি হুই হ্যায় উসকো ছোড় দো।

আমি হাতজোড় করে মহাপুরুষকে বললাম - আমার অপরাধ নেবেন না। কুকুরকে প্রণাম করতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। আপনারা সবাই হয়ত প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানের ষোল আনা প্রকাশ অনুভব করেছেন, তাই কুকুরকেও সানন্দে শ্রদ্ধায় প্রণাম করতে পারছেন, কিন্তু আমার সেই অনুভূতি লাভের সৌভাগ্য হয়নি। আর তা না হওয়া পর্যন্ত,'যত্র জীব তত্র শিব' এই ভেবে কুকুর শূকরাদি ইতর প্রাণীর চরণ তলে বৈষ্ণব-মার্কা প্রণাম নিবেদন করা সম্ভব হ'ল না, আমি পুনরায় সকলের কাছেই মার্জনা চাচ্ছি।

হঠাৎ একটি হুঙ্কার উঠল - আপ্ বেদপাঠী হো। বেদ নাহি মানতা হ্যায়? যজুর্বেদকা ষোড়শ অধ্যায় মেঁ অষ্টাদশ মন্ত্রকা অংশ হৈ - নমঃ শ্বভ্যঃ অর্থাৎ কুকুরকো নমস্কার। তাকিয়ে দেখলাম - মহাত্মা শংকরনাথ। সাধুদের ভীড়ের মধ্যে বসেছিলেন, দেখতে পাইনি। তাঁকে দেখে মনে খুব সঙ্কোচ হ'ল। আমার নর্মদা -পরিক্রমা ব্রতের ইনিই অগ্রপথিক। এঁর সঙ্গেই যাত্রা শুরু করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত সংকোচ জয় করে উঠে দাঁড়ালাম। তখনও শংকরনাথ বলে চলেছেন - তুমি এই মন্ত্রের মহীধর-ভাষ্য পড়লে দেখতে পাবে, তিনি এই মন্ত্রের অর্থ করেছেন- শ্বনেঃ কুক্কুরাস্তদ্ রূপেভ্যো নমঃ অর্থাৎ কুকুররূপী যে ভৈরব - তাঁকে নমস্কার।

আমি বললাম- মহীধর প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নিজে তান্ত্রিক ছিলেন বলে লৌকিক শব্দকোষের সাহায্যে বেদের তান্ত্রিকী ব্যাখ্যা করেছেন। লৌকিক শব্দকোষের সাহায্যে বেদের মন্ত্রার্থ সঠিকভাবে বোঝা যায় না। লৌকিক ব্যাকরণ ও বৈদিক ব্যাকরণ যেমন পৃথক, লৌকিক শব্দকোষ এবং বৈদিক শব্দকোষও তেমন পৃথক। লৌকিক সংস্কৃতের জন্য যেমন অমরকোষ, বৈদিক সংস্কৃতের জন্য তেমনি নিঘণ্টু।

নিঘন্টুর রচয়িতা কশ্যপ। যাস্ক নিরুক্ত নাম দিয়ে নিঘন্টুর টীকা লিখে নিঘন্টুর বহুল প্রচার করেছিলেন বলে নিঘন্টু ও নিরুক্ত দুটি গ্রন্থই যাস্কের নামে চলছে। লৌকিক শব্দকোষের সাহায্যে বেদভাষ্য করতে গিয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়। যেমন, লৌকিক শব্দকোষ অনুসারে 'নমঃ শ্বভ্যঃ' এই বেদমন্ত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে - কুকুরকে নমস্কার। কেমন করে বেদে কুকুরকে নমস্কারের বিধান রাখা হয়েছে - তাঁর মনে এই সন্দেহ দেখা দেওয়ায় কুকুরকে ভৈরবরূপ দিয়ে নমস্কার করেছেন। কিন্তু নিঘন্টুর সাহায্যে অর্থ করলে এই বিপত্তি দেখা দিত না। নিঘন্টু অনুসারে 'নম' শব্দের এক অর্থ অন্ন। নমঃ শ্বভ্যঃ এর অর্থ - কুকুরকে অন্ন দিবে। এই অর্থই বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কারণ ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী (১০ম / ১১৭ / ৬)। যে একা একা খায়, নিজের স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ছাড়া অন্য কোন ক্ষুধার্ত জীবকে অন্নদান করে না, সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে। কাজেই 'নমঃ শ্বভ্যঃ'। এই মন্ত্রাংশে বেদ নির্দেশ দিয়েছেন কুকুরকেও অন্ন দিবে।

দরিয়াইজী চুপ করে আমার বক্তব্য শুনলেন, পরে সবাইকে চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। সভা ভঙ্গ হ'ল। আমি মহাত্মা শংকরনাথকে প্রণাম করলাম। তিনি উপদেশ দিলেন - পরিক্রমায় যে ব্রত নিয়েছ প্রাণপণ চেষ্টায় তা প্রতিপালন করবে, এখন অগ্রহায়ণ মাস চলছে, ফাল্গুন মাসের শেষ অবধি পরিক্রমা করবে। যখন 'লু' বইতে থাকবে তখন এবং ঘোর বর্ষাকালে পরিক্রমা বন্ধ রেখে কোথাও বিশ্রাম করবে, শরিরের যত্ন নেবে, সতত নর্মদা মা-কে স্মরণ করবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। একটু আগে যে বেদার্থ নিয়ে সামান্য বিতণ্ডা হয়ে গেল, সে নিয়ে তাঁর হাবভাবে বিন্দুমাত্র উত্তাপ দেখলাম না, কিভাবে এখানে এলাম, তাঁর সঙ্গ ছাড়া হয়ে কোন ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলাম কি না, এখানে কোথায় বা কার সঙ্গে আছি - এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই করলেন না। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব, নয়ত মনে হয় তিনি সবই জানেন।

ভক্তরা দরিয়াইজীর জয়ধ্বনি করতে করতে যে যার স্থানে ফিরে গেলেন। আমরা আমাদের ডেরায় ফিরলাম, চতুর্বেদীজী গেলেন রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে। আমাকে বললেন - যে কয়দিন এখানে আছেন মাঝে মাঝে মন্দিরে যাবেন। দুজনে বসে শাস্ত্রালাপ করব, নর্মদা মাঈর গল্প শোনাব। সূর্যনারায়ণজী স্বভাবতই স্বল্পভাষী, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া একটি বাক্যও ব্যয় করেন না, কেবল শোভানন্দজী একবার আপনমনে বলে উঠলেন - নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হ্যায়।

একদিন চতুর্বেদীজী আমাকে মান্দালা শহর এবং মান্দালা দূর্গ দেখাতে নিয়ে গেলেন। শহর বলতে দুধারে কাঁচাপাকা বাড়ী, একতলা পাকা বাড়ীই বেশী, রাস্তা সরু, রাস্তার দুধারেই সারি সারি দোকান, লোকজনের বেশ ভীড় আছে। রাস্তায় দু-চারটে রিক্সাও চোখে পড়ল। শহর দেখে ফিরে আসার পথে চতুর্বেদীজী আমাকে এক বিধ্বস্ত পরিখার উপরে দাঁড় করালেন। সামনেই গড়হা-মান্দালা রাজবংশের ঐতিহাসিক মান্দালা দূর্গের ধ্বংসাবশেষ। বিশাল উঁচু গম্বুজটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে, মূল প্রাসাদের অধিকাংশই ভেঙে গেছে, চারদিকে ছড়িয়ে আছে বড় বড় লাল পাথরের চাঙড়। অন্ততঃ পনের কুড়ি হাত চওড়া পরিখাও ভেঙে মাটির ঢিবির সঙ্গে মিশে গেছে। মাটিতে মিশে যাওয়া একাংশের উপর দিয়েই এখন রাস্তা হয়েছে - সেই রাস্তা চলে গেছে নর্মদার তীর পর্যন্ত। চতুর্বেদীজী বললেন - মূল দূর্গের অভ্যন্তরভাগ তৈরি হয়েছিল মার্বেল পাথর দিয়ে। কালের প্রভাবে দূর্গ ভেঙে পড়ার পর বেছে বেছে মার্বেল পাথরের চাঙড়গুলো লোকে নিয়ে গেছে। গম্বুজের পাদদেশে নীল এনামেলের একটা প্ল্যাকার্ড লাগানো আছে - পড়ে দেখলাম সেটি পুরাকীর্তি সংরক্ষণের একটি সরকারী নোটিশ। দূর্গের ইতিবৃত্ত শোনালেন চতুর্বেদীজী। প্রাচীন গণ্ডোয়ানা রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা সংগ্রামশাহ ছিলেন এই দূর্গের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই দূর্গ ছাড়াও তার রাজত্বে আরও বাহান্নটি গড় নির্মান করান। প্রতিটি গড়ের ধারে ধারে গৌড় ও হিন্দুর অসংখ্য বসতি স্থাপনও তারই কীর্তি। রাজ্যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কোন অভাব ছিল না। গৌড় ও হিন্দু প্রজারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। নর্মদার স্থানে স্থানে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্রও রাজার প্রত্যক্ষ সাহায্যে এবং প্রজাদের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল। সে সব কৃষিক্ষেত্রে এখনও ফসল ফলছে। সংগ্রামশাহ নিজের নামে স্বর্ণ মুদ্রারও প্রচলন করেছিলেন, যাতে হিন্দী এবং তেলেঙ্গী উভয় ভাষাতেই তাঁর নাম খোদাই থাকত। শিব ছিলেন তাঁর উপাস্য দেবতা। পূর্বেই বলেছি রাজরাজেশ্বরী মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই গড় ও দুর্গের ডানদিকে একটু হেঁটে আমরা রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে ফিরে এলাম। ভগ্ন প্রাসাদের এত কাছে মন্দির যে পাঁচ মিনিটেরও কম হাঁটলে এই দুর্গ দেখা হয়ে যেত, কিন্তু প্রথম শহর দেখিয়ে পরে এখানে নিয়ে এসেছিলেন চতুর্বেদীজী।

আমি মাঝে মাঝেই চতুর্বেদীজীর কাছে যাই। এই সদালাপী পণ্ডিতের মুখে বাংলা কথা শুনে তৃপ্তি পাই। একদিন তাঁর কাছে নর্মদা তীরবর্তী সাধুসন্ন্যাসী এবং নর্মদা মায়ীর মহিমা বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন - নর্মদা পরিক্রমা করতে করতেই আপনার নিজের থেকে অভিজ্ঞতা জন্মাবে। নানাবিধ অকল্পনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে নর্মদা মায়ীই আপনাকে যা জানাবার তা জানিয়ে দেবেন, অন্যের কাছে জেনে লাভ নেই।

- তবুও আপনার মত প্রবীন সুপণ্ডিতের কাছে শুনলে অনেক প্রকৃত তথ্য জানতে পারব। সাধু সন্ন্যাসীরা যা বলেন তার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব সংস্কার এবং ধর্মমতের অনেক ফেনানো কথা মিশে থাকে।

আমার এই কথা শুনে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন - আমি কিরকম সুপণ্ডিত, সেই সম্বন্ধেই বরং একটা গল্প বলি শুনুন। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের রাজসভা যখন মহাকবি কালিদাসের অলৌকিক প্রতিভায় আলোকিত, সেইসময় কর্নাটের রাজসভার সভাপণ্ডিত ছিলেন বল্লন। তিনি সর্বত্র বলে বেড়াতেন যে তিনি নাকি কালিদাসের চেয়ে বড় কবি। বল্লনের বাগাড়ম্বরে কর্ণাটরাজ বল্লনকে বড় কবি বলে ভাবতেন। একদিন কর্নাট থেকে এক দূত এসে বিক্রমাদিত্যের কাছে এই কথাটা জানিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন যে কর্নাটের অধিবাসীরা বল্লনের আস্ফালনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তাঁর নবরত্নের জ্যোতি বল্লনের পাণ্ডিত্যের আলোয় ম্লান হয়ে গেছে। তাই শুনে বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে কর্নাট পাঠালেন বল্লনের দর্পচূর্ণ করতে। কালিদাস নিজের আত্মপরিচয় দিলেন না। সাধারণ ব্রাহ্মণের বেশে কর্নাটের রাজসভায় গিয়ে রাজাকে জানালেন তিনি তাঁকে স্বরচিত কবিতা শোনাতে চান। রাজা বললেন - আজ রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত আছি, আগামীকাল সভায় আসবেন, আপনার কবিতা আমরা সবাই মিলে শুনবো। বল্লনের উপর অতিথি সৎকারের ভার দিলেন। ছদ্মবেশী কালিদাসের আয়ত চক্ষু এবং প্রশস্ত ললাটে কী যেন দেখলেন বল্লন, তাঁর মনে ভয় দেখা দিল, কেন না, তিনি নিজে যে অন্তঃসারশূন্য বাক্যবাগীশ তা ভালভাবেই জানতেন। ব্রাহ্মণবেশী কালিদাসকে বল্লন জিজ্ঞাসা করলেন - রাজার সঙ্গে দেখা করবে শ্লোক লিখতে পার তো ? রাজপ্রশস্তি লিখতে পারবে? কালিদাস বল্লনের চাতুরী বুঝতে পারলেন। তিনি উত্তর দিলেন - লিখিনি ত কোনদিন। তুমি যদি শিখিয়ে দাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। কবিতা লেখা খুব শক্ত কি? বল্লন বললেন - না শক্ত আর কি? দুটো পদের অক্ষর সমান থাকবে, আর ছন্দের মিল থাকবে, তাহলেই ত পদ্য হ'ল।

- অক্ষর যদি সমান না হয় !

- তবে চ, বৈ, তু, হি এইসব অব্যয়গুলো যোগ করে সমান করে দেবে। নাও, এখন বেশ ভাল দেখে একটা শ্লোক রচনা করত !

বল্লনের কথায় কালিদাস ভাবেন - শ্লোক যদি ভাল হয়, তবে রাজসভায় কবিতা পাঠের আশা নেই। বল্লন নানা অজুহাতে বাগড়া দেবে। তাই অনেক ভেবে, যেন কত কষ্টে তিনি শ্লোক বানাবার চেষ্টা করছেন, এইরকম ভান করে শেষে কালিদাস শোনালেন -

প্রাতরুত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ
নগরে ভাষতে কুক্কু চবৈতুহি চবৈতুহি ॥

অর্থাৎ সকালে উঠে হে রাজা কর মুখ প্রক্ষালন (ধাবনট)। নগরে ডাকে যে কুক্কু চবৈতুহি চবৈতুহি।

- কি হ'ল ঐ ধাবনটের মানে ?

বল্লনের প্রশ্নে কালিদাস দেখিয়ে দিলেন তাঁর শ্লোকের প্রথম চরণে একটা অক্ষর কম আর দ্বিতীয় চরণে একটা অক্ষর বেশী হয়ে গেছে বলে কুক্কুটের 'ট' প্রথম চরণের শেষে জুড়ে দিয়ে মিল বজায় রাখা হয়েছে।

- ঠিক হয়েছে, চমৎকার হয়েছে - শ্লোক শুনে বল্লন মহাখুশী। এমন কবিকে রাজসভায় কবিতা পড়ার সুযোগ দিতে আপত্তি নেই। ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগানো মূর্তির দিকে তাকিয়ে তবুও বল্লনের মন হতে সন্দেহ যায় না। পথে যেতে যেতে বললেন - ওহে কবি! আর একটা পদ্য রচনা করত! পথে একটা ষাঁড় শুয়েছিল। তাই দেখে কালিদাস বললেন -

গোরপত্যং বলীবর্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গশ্চাপি চ বর্ততে॥

অর্থাৎ গরুপুত্র বলীবর্দ মুখে খালি ঘাস খায়। লাঙ্গুল রয়েছে তার শৃঙ্গ দুটি শোভা পায়।

- বাহ্ খাসা হয়েছে - হাসি চাপতে পারেন না বল্লন। ব্রাহ্মণ যে রাজসভায় হাস্যাস্পদ হবেন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। রাজা ভুলবেন না ঐ চবৈতুহি আর গরুপুত্রের কবিতায়। নিশ্চিন্ত মনে বল্লন ব্রাহ্মণকে রাজসভায় উপস্থিত করলেন।

কর্ণাটরাজ ব্রাহ্মণবেশী কালিদাসকে বললেন - আপনার কবিতা শুনে আমি বা আমার সভাসদবর্গ যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে কি রকম পুরস্কার প্রত্যাশা করেন ব্রাহ্মণ ? তিরস্কারের সুরে তখন কালিদাস একটি শ্লোক বললেন -

মা গাঃ প্রত্যুপকার কাতরতয়া বৈকর্ণ্যম আকর্ণয়।
হে কর্ণাটবসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে॥

হে রাজন, মূল্য দিবার আশঙ্কায় আপনি বিমুখ হবেন না। আমার অমৃতস্নিগ্ধ শ্লোকগুলি আপনি শ্রবণ করুন।

বর্ণন্তে কতিভূধরাম্বুদনদীভূগোলবৃন্দাটবী -
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রচন্দনগণাস্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

আমি ত আপনার কাছে কোন মূল্য বা পুরস্কারের প্রত্যাশা করিনি। এই যে শত শত পর্বত, নদী, মেঘ, মৃত্তিকা, অরণ্য, ঝঞ্ঝা, সমুদ্র ও চন্দ্র প্রভৃতির নানা বর্ণনা আমি করেছি, তারা আমায় কি দিয়েছে বলুন ?

রাজা কালিদাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কবি আরও একটি কবিতা শুনিয়ে জানালেন - হে রাজন, আমি জানি একজন কবির আবির্ভাব হয়েছে পদ্ম থেকে, আর একজনের পুলিন আর তৃতীয় জনের হয়েছে বল্মীক থেকে। তাঁরা ত্রিভুবনের গুরু। আমি তাঁদের দাসানুদাস কালিদাস।

রাজা এবং সভাসদবর্গ সকলেই কলহাস্যে অভিনন্দন জানালেন কালিদাসকে। অন্ধকার নেমে এল বল্লনের মুখে। উজ্জয়িনীর মহাকবি আপন খ্যাতিকে অক্ষুন্ন রেখে ফিরে এলেন উজ্জয়িনীতে।

চতুর্বেদীজী গল্পটি বলে মন্তব্য করলেন - বুঝলেন আমি ঐ বল্লনের মতই 'সুপণ্ডিত' আর কি! আবার প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। শুভ্রকেশ এই রসজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রাণখোলা হাসি আর অমায়িক ব্যবহারে মান্দালায় দিনগুলি আমার আনন্দেই কাটিছে। সঞ্জীবচন্দ্র বলে গেছেন - বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। খাঁটি কথা। তবে, মানুষ বৃদ্ধ হলেও তাকে সুন্দর দেখায়। শুভ্রকেশ বৃদ্ধের চোখে ও হাসিতে ফুটে ওঠে শিশুর সারল্য আর মনে জাগে অনাবিল রসবোধ।

আমি এখন মান্দালাতে নিজে নিজেই ঘুরে বেড়াই। শোভানন্দজী ও সূর্যনারায়ণজী যে যার জপ্-তপ্ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের আহার্য সংগ্রহের ভার প্রথম দিন থেকে সানন্দে সূর্যনারায়ণজী গ্রহণ করেছেন, এ কাজে তিনি আর কারুকে হাত লাগাতে দেবেন না। সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন দেবগাঁও গেলাম শোভানন্দজীর নির্দেশ মতন। দেবগাঁও থেকে নর্মদা দক্ষিণগামিনী। মান্দালা ছাড়িয়ে একটু এগিয়েই নর্মদার মুখ ঘুরেছে, ক্রমে নদী উত্তরমুখী হয়েছে জব্বলপুরের দিকে। মান্দালার নদীতীরে যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে নর্মদার এই অর্ধবৃত্তাকার গতি চোখে পড়ে।

একদিন সহস্রধারা ছাড়িয়ে আপনমনে হাঁটতে লাগলাম। সহস্রধারা থেকেই নর্মদা ক্রমে ক্রমে চওড়া হয়েছে। নর্মদার তীরে কোথাও কোথাও সমৃদ্ধ গ্রাম এবং উর্বর শস্যক্ষেত্র। মুণ্ডমহারণ্যের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে এসেছি, নর্মদার যে রূপ চোখে পড়ছে তা কল্যাণীরূপ। শান্তশ্রী মণ্ডিত গৌড় ও হিন্দু পল্লীতে সুখী ও স্বচ্ছল পরিবারের আভাস চোখে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর চলে এসেছি। এবার

ফিরতে হবে। মাঠে গমের ক্ষেতে কাজ করছিল একজন লোক, সহস্রধারা পৌঁছুবার কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে কোণাকুণি একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল। সেই রাস্তা দিয়ে গাছপালায় ঘেরা একটা চমৎকার স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। যেন একটা তপোবন। সহস্রধারা জলপ্রপাতের গর্জন শোনা যাচ্ছে। একটি ছোট মন্দির আর তার সংলগ্ন বড় বড় কুটীর। মন্দিরের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কানে এল - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, দরিয়াইজীকো জাদুটোনা দেখনেসে তুমহারা ক্যা ফায়দা হোগা।
আপনা সাধনমেঁ লগে রহো! নর্মদা মায়ীকা কৃপা হোনেসে তুমহারা দৃষ্টি খুল্ যায়েগা, মাতাপিতাকা রজোবীর্যসে জ্যায়সা মনুষ্য দেহ বনতী, ঐসাহি গুরুকা তেজসে ইসী দেহ কা অন্দর দিব্যদেহ বন্ জায়েগী। জাদুটোনা উহ্ অমল পদার্থ হৈ।

কথা শুনে চমকে উঠলাম। সারা নর্মদা তীর্থ জুড়ে যে মহাপুরুষ সর্বজনবন্দিত, এই প্রথম একজনের মুখে সেই দরিয়াইজীর অলৌকিক সিদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ করতে শুনলাম। আবার কানে এল - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ... স্মৃতির কণিকোঠায় যেন বিজলী খেলে গেল - এতো আমার সবচেয়ে প্রিয় সাধু জব্বলপুরের সেই সুমেরদাসজী। সামনের দিকে ঘুরে আমি আশ্রমে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখতে পেয়ে সুমেরদাসজী দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আমি প্রথম যখন তাঁর দেখা পাই, তখন বাবা-ই আমাকে নর্মদায় পাঠিয়েছিলেন, আজ আমি পিতৃহীন আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনে তিনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তাঁর স্নেহের স্পর্শে আমার চোখে বাঁধভাঙা অশ্রুর ঢল নামল।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে তাঁকে জানালাম বাবার অন্তিম আদেশ - 'শাস্ত্র মতে নর্মদা পরিক্রমা করতে হবে', তাই বেরিয়ে পড়েছি। তিনি বললেন - বহোৎ আচ্ছা। আজ আপ্ ইধরই ভোজন করেগা। আমি তাঁকে বললাম শোভানন্দজী এবং সূর্যনারায়ণজীর কথা, তাঁদের আদর যত্ন, দুর্গম মুণ্ডমহারণ্যে কিভাবে তাঁরা আমাকে সবসময় আগলে রেখেছেন সবিস্তারে বললাম। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা না খেয়ে বসে থাকবেন।

সব শুনে বললেন - তব্ আজ নেহী, শোভানন্দজী হমারা দোস্ত হ্যায়, চলিয়ে আপকা সাথমেঁ লেকর ম্যাঁয় ভী চলুঙ্গা।

এখানে তাঁর এই আশ্রমের নাম ভীষ্মাশ্রম। তাঁর গুরু ভীষ্মদাস নর্মদা মায়ীর কৃপায় খঞ্জ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হবার পর সহস্রধারা থেকে আধমাইল দূরে এই নর্মদাতটে আমৃত্যু বাস করে গেছেন। পূর্বেই বলেছি, সহস্রধারা থেকে মান্দালা তিনমাইল। মহাত্মা সুমেরদাসজীর সঙ্গে বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ আমাদের ডেরায় এসে পৌঁছে গেলাম। সুমেরদাসজীকে দেখে শোভানন্দজী আনন্দে ডগমগ। তাঁর অনুরোধে সুমেরদাসজীও আমাদের সঙ্গে ভোজন করলেন। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, সুমেরদাসজীকে দেখার পর থেকে সূর্যনারায়ণজীকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখছি। সূর্যনারায়ণজী আজ আমাকে জানালেন - মান্দালাতে প্রায় বারোদিন কেটে গেল। কবে যাত্রা শুরু করবে। সুমেরদাসজী বললেন-এত তাড়া কিসের। পরিক্রমা করতেই ত বেরিয়েছে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিক্রমা শেষ করতে হবে এমন ত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পরশু আমাদের আশ্রমে গুরুর জন্মোৎসব। আজ শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। ঐখানেই থাকবে, ঐখান থেকে আমি ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির মুখ পর্যন্ত সঙ্গে যাবো। আপলোগকা কোঈ ফিকরকা বাত নেহি।

সূর্যনারায়ণজীর মুখে থমথমে ভাব। তিনি বললেন - ইনকো হম্ লুকেশ্বর লে চলুঙ্গা।

- হাঁ হাঁ উহ্ তো বড়ি জাগ্রৎ স্থান হৈ। যানেকা বখৎ হমলোগকো ত লুকেশ্বর যানেই পড়েগা। শোচিয়ে মৎ। হম্ বাত্ দেতা হু, আপ চলা যাইয়ে, হম্ ইনকো সাথমেঁ লেকর আপকা ডেরা মেঁ জরুর পৌঁছেগা।

সুমেরদাসজী নিজেই ঝটপট আমার গাঁঠরী বেঁধে ফেললেন। শোভানন্দজীকে প্রণাম করতেই তিনি সাশ্রুনয়নে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন - শিবমস্তু! শিবমস্তু! মুণ্ডমহারণ্যের কুকুরামঠ থেকে তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। গঙ্গাবাহ ঘাটে এসে মিলেছিলেন সূর্যনারায়ণজী। তিনি কিছুতেই প্রণাম করতে দিলেন না, হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বললেন - যাইয়েগা ত জরুর ?

'জরুর; আউঙ্গা জী' এই বলে আমি সুমেরদাসজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে এলাম। ভীষ্মাশ্রমে পৌঁছে প্রায় সাতদিন থাকলাম। বড় আনন্দেই কাটল।

পাঁচই পৌষ সুমেরদাসজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে খুব ভোরে যাত্রা করলেন লুকেশ্বর অভিমুখে। তখনও নর্মদাতীর ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, টসটস করে শিশির ঝরছে। তিনি জানালেন মান্দালা থেকে জব্বলপুর উনষাট মাইল। প্রায় পনের মাইল হেঁটে গেলেই লুকেশ্বর পৌঁছনো যাবে। নর্মদা যেমন ভাবে এঁকে বেঁকে যেখানে যেমন বিন্ধ বা সাতপুরার পর্বত ভেদ করে গেছে, সেই গতিপথ লক্ষ্য করে তোমাকে নিয়ে এগিয়ে যাবো। কোন মতেই যাতে তোমার নর্মদা লঙ্ঘন না হয়, কোন ভাবেই যাতে পরিক্রমা খণ্ডিত না হয় সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে। আমি নিজে হলে বাসে চড়েই যেতাম, বাসে চড়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জব্বলপুর যাতায়াত করা যায়।

আমরা হাঁটছি। পার্বত্য পথ হলেও রাস্তা মনোরম, কোথাও গভীর শালবন - আবার কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, জনপদ, ঘাট, মন্দির এবং শস্যক্ষেত্র। দুধারেই সাতপুরার পার্বত্য অঞ্চল। সহস্রধারা ছাড়িয়ে চিরাইডোংরী, সেখান থেকে পদমীঘাটে এসে পৌঁছে শংকর-চবুতরায় ঘন্টাখানিক বিশ্রাম করলাম। এখানে আদি শংকরাচার্য কিছুকাল থেকে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যারই অনুকূল স্থান - সুন্দর পরিবেশ। কাছেই একটি সদাবর্ত আছে। পরিক্রমাবাসীদের প্রিয় স্থান। চবুতরার গায়ে বেদের চারটি মহামন্ত্র দেবনাগরী হরফে খোদাই করা ছিল, এখন অবশ্য ক্ষয়ে এসেছে। এখানে স্নানপূজা সারলাম। এখানে দেখলাম নর্মদা আবার পশ্চিমমুখী হয়েছেন। সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, নর্মদাকী গতী বড়ি বিচিত্র, হিঁয়াসে ছোলিয়াঘাট তক্ এ্যায়সাই পশ্চিমবাহিনী চলেঙ্গে, উসকা বাদ ফিন্ উত্তরবাহিনী।

নর্মদার উভয় তীরে মাঝে মাঝেই শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে। সুমেরদাসজী তাঁর আশ্রম থেকে ঝোলার মধ্যে ঘিয়ে জবজবে চাপাটি সঙ্গে এনেছিলেন, একটা মন্দিরে বসে উভয়ে তার সদব্যবহার করলাম। বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছলাম ছোলিয়াঘাটে সেখানে একটি সুন্দর শিবমন্দির আছে। কিন্তু মন্দিরের দরজা বন্ধ করে পুরোহিত চলে গেছেন। সুমেরদাসজী বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, আপকে পিতাজী বাতায়া ন, প্রণাম ভি পূজা হৈ। চলিয়ে মন্দির কা দরবাজে পর প্রনাম করকে চলা যায়েগা। শুনলাম, মন্দিরের পুরোহিতমশায়
-এর বাড়ী কাছেই। কিন্তু তাঁকে আর অসময়ে বিরক্ত করতে ইচ্ছা হ'ল না।ছোলিয়াঘাটকে খুব সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে মনে হ'ল। বহু লোকজনের বাস, কয়েকটা একতলা দোতলা পাকাবাড়ী এবং শস্যের গোলা দেখতে পেলাম। যাইহোক, সুমেরদাসজীর তাড়ায় এখানে আমার শিব দেখা হলনা। এখানে নর্মদা আবার উত্তরমুখী হয়েছেন। আবার হাঁটা শুরু করলাম। সুমেরদাসজী বললেন - পরিক্রমার নিয়ম হল নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হাঁটতে হবে, কখন কোন্ দিকে যাচ্ছি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব না পশ্চিম, তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ - নর্মদা ত বারবার একটা বিশেষ দিক ধরে যাচ্ছেন না।

ঘন্টাখানিক হাঁটার পরেই সুমেরদাসজী দূর থেকেই নর্মদা তটের অপরপারে এক বিশাল শিবমন্দির দেখালেন। বললেন - ঐ মন্দিরে নন্দিকেশ্বর শিবজী বিরাজিত। এই নন্দিকেশ্বর হতেই জব্বলপুর জেলা শুরু। বিপরীত তটে লুকেশ্বর। লুকেশ্বর ও নন্দিকেশ্বর নর্মদাতটের দুই প্রসিদ্ধ তীর্থ। আমাদের গন্তব্যস্থল লুকেশ্বর, সেখানে নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে মহাজাগ্রত মনিময় জ্যোতির্লিঙ্গ আছেন। লোচক্ষুর অগোচর। নন্দিকেশ্বর শিবও এখন তুমি দেখতে পাবে না, মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম কর। এখন গেলে নর্মদা অতিক্রম করে যেতে হবে, তাতে পরিক্রমা খণ্ডিত হবে। রেবাসংগম সে লৌটনেকা বখৎ ইনকো দর্শন করেগা। নন্দিকেশ্বর ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্মের তপস্যাস্থল। বরাহ পুরাণে আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করার মানসে যখন তপস্যায় নিমগ্ন হন, তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে।

ইনিই ধর্ম। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন - তুমি চতুষ্পদ ও বৃষবাকৃতি, তুমি বড় হয়ে প্রজাপালন কর। তখন ধর্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ হয়ে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণরূপে, ক্ষত্রিয়দের তিনভাগে, বৈশ্যদের দুইভাগে এবং শুদ্রদের একভাগ দিয়ে রক্ষা ও পালন করতে থাকেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি - এই চারটি ধর্মের পাদ। বেদে এঁর নাম তৃশৃঙ্গ। এঁর মাথা দুটি, হাত সাতটি। এই কথার তাৎপর্য কি পরে তুমি মনন করে বোঝার চেষ্টা করবে। বামন পুরাণের মতে - ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। এঁর গর্ভে চারটি পুত্র হয় - সন্যকার, সনাতন, সনক ও সনন্দ।

প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ লুকেশ্বরে পৌঁছে গেলাম। এখানের ঘাটে জনসমাগম যথেষ্ট, অনেক সাধু সন্ন্যাসী বসে জপ করছেন। সুমেরদাসজী নর্মদা মধ্যস্থ মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, আমিও প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখি সূর্যনারায়ণজী দুহাত দিয়ে দুজনকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরেছেন। তিনি আমাদের দুজনকে নর্মদাতট থেকে একমাইল দূরে একটি স্থানে নিয়ে গিয়ে তুললেন। চারদিকে বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা ফুল ফলের বাগান, সামনে একটা টিনের প্লেট শালগাছে লাগানো আছে, তাতে দেবনাগরীতে লেখা আছে- মধুবন।

তপোবনই বলা চলে, তবে যত্নের অভাবে এখন কতকটা হতশ্রী হলেও এখনও পরিবেশ সুন্দর। তপোবনের মধ্যে একটা গম্ভীর থমথমে ভাব। গাছপালা ভেদ করে একটু এগিয়ে যেতেই প্রথমে একটা পাথরের বেদী, তার পঞ্চাশ হাত দূরেই একটা বিশাল বেদী। দুটো বেদীরই কিছু কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে, লতাপাতা বেদীর গায়ে জড়িয়ে ঢেকে রেখেছে।

সূর্যনারায়ণজী বড় বেদীটি দেখিয়ে বললেন - এখানে মহর্ষি মধুমঙ্গলজী তাঁর এক হাজার আশ্রমবাসী ছাত্রকে বেদশাস্ত্রের পাঠ দিতেন। তাঁর আমলে হাজার খানেক গাভী ছিল। ঐ ছোট বেদীতে বসে আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভাবীজী স্থানীয় গরীব আদিবাসীদেরকে দুধ বিলি করতেন। তে হি নঃ দিবসাঃ গতাঃ। কপালে হাত চাপড়িয়ে বললেন -

-হায়! সে সবই নিয়তির ক্রুর খেলায় নষ্ট হয়ে গেছে।

একটুখানি সামলিয়ে নিয়ে বললেন - চলুন আপনারা আজ ক্লান্ত, সন্ধ্যাও হয়ে আসছে, এখন বিশ্রাম করুন। কাল সব দেখবেন শুনবেন। তিনি আমাদেরকে একটি একতলা পাথরের বাড়ীতে এনে তুললেন। সামনেই একটি বিশাল বৈদিক যজ্ঞকুণ্ড। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি এই যজ্ঞকুণ্ডে দেওয়া আছে, আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। পাশেই একটা দোতলা পাথরের বাড়ী।

সূর্যনারায়ণজী আমাদের বসার জন্য দুটি খাটিয়াতে বহুমূল্য পুরাণো কার্পেট পেতে রেখেছেন। তাঁর দুজন অনুচর বোধহয় শিষ্য হাত পা ধোবার জন্য গরম জল এনে দিলেন। এক লোটা চাও দিলেন। চা খাবার জন্য যে কাপ ডিস্ দিলেন, পুরানো হলেও বেশ দামী বলে মনে হল। রাত্রে আহারের ব্যবস্থাও রাজকীয় - পুরী, লাড্ডু প্রভৃতি। কিন্তু সুমেরদাসজী একাহারী, আমিও পরিক্রমার ব্রত নিয়েছি, দুবেলা আহার নিষিদ্ধ। সূর্যনারায়ণজীর অনুরোধে দুধ খেলাম। শোবার জন্য তিনি নিয়ে গেলেন দোতলা বাড়ীর নিচের তলার দুটো ঘরে। সযত্নে দুটো ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। দুই ঘরেই জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। দামী কার্পেট ও কম্বল, সবই পুরাণো, স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে, তাই পাট করে আমাদের শয্যার জন্য পাতা আছে। আমরা তারই উপর নিজেদের কম্বলাদি পেতে নিলাম। রাত্রি বেশী হয় নি। দুটি ঘরের বারান্দায় বসে সূর্যনারায়ণজী বললেন - সকালে উঠে দেখবেন, পেছনেই এক বিরাট মন্দির অর্ধভগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে, তার নাম জঙ্গম মঠ। সেখানে ধুলি ধুসরিত হয়ে পড়ে রয়েছে বৈদিক সাহিত্য এবং আমাদের বীরশৈব সম্প্রদায়ের বহু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ। অধিকাংশ পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে। মহর্ষিমধুমঙ্গলজীর আমলে বেদগানে মুখরিত থাকত এই আশ্রম। মূল যজ্ঞকুণ্ড ছাড়াও প্রায় একমাইল লম্বা এই আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে অজস্র ছোট ছোট যজ্ঞকুণ্ড এখনও লতাপাতায় ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে, মহর্ষির প্রতাপ ছিল সমগ্র নর্মদা জুড়ে। অষ্টাদশ সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শত শত সাধু সন্ন্যাসীর ভীর এখানে লেগেই থাকত। বেদগান ও যজ্ঞাগ্নি শিখায় সুরভিত থাকত মঠ।

এই পর্যন্ত বলেই সূর্যনারায়ণজী কাঁদতে লাগলেন। অনেক্ষণ পরে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন - একবার মহর্ষিজী তাঁর অভ্যাস ও নিয়মানুযায়ী ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির কোন গুহাতে তপস্যা করতে যান। কি কারণ জানিনা, ভাবীজী গৃহত্যাগ করে কোথাও চলে যান দুটি বালকপুত্রকে ফেলে রেখে। মাতৃশোকে দুটি বালকও সামান্য জ্বরে ভুগে মারা গেল। একমাস পরে যখন মহর্ষিজী ফিরে এলেন, তখন এখানে শ্মশানের দৃশ্য। সব শুনে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন, কপালে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। চেতনা হবার পরেও কপালে মুষ্ঠ্যাঘাত করতে করতে একটি মাত্র কথাই বলতেন - 'আগ্ লাগ্ গিয়া, আগ্ লাগ্ গিয়া', আর হাউ হাউ করে কাঁদতেন। শিষ্য ভক্তরা একে একে এই শ্মশানপুরী ছেড়ে চলে গেল। একদিন গভীর রাত্রে মহর্ষিজীও অন্তর্হিত হলেন, কেউ বলেন নর্মদাতে ঝাঁপ দিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, কেউ বলতে লাগলেন অন্য কথা। দুজন গুরুগত প্রাণ শিষ্য তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা একবছর পর ফিরে এসে আমাকে জানিয়েছিলেন উন্মাদের মত নানাদেশে ঘুরতে ঘুরতে দাক্ষিণাত্যের শিবাচার্য মাণিক্যবাচক যেমন নটরাজের লিঙ্গমূর্তিতে লীন হয়েছিলেন তেমনি শিবাচার্য মধুমঙ্গলজীও উজ্জয়িনীতে গিয়ে মহাকাল শিবলিঙ্গে একীভূত হন।

সূর্যনারায়ণজীর এই কথা শুনতে শুনতে স্পষ্টই আমার মনে জাগল, এটা সম্পূর্ণ সম্প্রদায়গত বিশ্বাস এবং রটনা, তবুও তিনি এমন আবেগের সঙ্গে সাশ্রুনয়নে এসব কথা বর্ণনা করছিলেন যে সেই নিঝুম রাতে নিস্তব্ধ পরিবেশে তখনকার মত তাঁর সব কথাকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল।

সূর্যনারায়ণজী তাঁর কুটীরে চলে গেলেন, আমরাও যে যার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না। ঘর গরম করার জন্য আগুনের ব্যবস্থা আছে, শীতের কোন কষ্ট অনুভব করছি না। নর্মদা পরিক্রমার কাল হতে গত কয়েক মাসে এমন আরামপ্রদ শয্যায় শোবার সুযোগ ঘটে নি। তবুও ঘুম আসছে না। মহর্ষি মধুমঙ্গলের বিয়োগান্তক জীবনকথা মনকে ভারাক্রান্ত করেছে, তন্দ্রার মধ্যে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতায় পত্নীপ্রেমিক ঋষি দুঃখশোকে জর্জরিত হয়ে নর্মদার তটে তটে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন, আমি যেন তাঁর বিলাপ ও দীর্ঘঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। উঠে বসলাম। পুরাতন জীর্ণ বাড়ীতে ইঁদুর বা অন্য কিছু ছুটে বেড়াচ্ছে।

আর কতক্ষণ এইভাবে বিছানায় বসে শুয়ে ছটফট করা যায়, আমি পা টিপে টিপে সুমেরদাসজীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি আগুনের কাছে বসে জপ্ করছেন। আমাকে ইঙ্গিতে কাছে গিয়ে বসতে বললেন। আমি তাঁকে চুপি চুপি বললাম - একজন মহর্ষির পক্ষে এভাবে শোকে কাতর হওয়া কি স্বাভাবিক বলে মনে করেন ?

- ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, বশিষ্ঠ পুত্রশোকমেঁ এ্যায়সাহি পাগল হুয়ে থে, রামচন্দ্রজীকো ভি সীতা মাইয়াকে লিয়ে এ্যায়সাই দশা হুয়া থা।

সুমেরদাসজীর উত্তর শুনে পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘুম হল না। সারারাত্রি জেগেই কাটালাম। সকালে উঠেই দুজনে সমগ্র মঠটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। যে বাড়ীটায় ছিলাম তার প্রবেশপথে দেবনাগরীতে লেখা আছে - 'জঙ্গম বাটিকা'। প্রায় একমাইল দীর্ঘ তপোবন, নানা ফল-ফুলের গাছ জলা-জঙ্গলে ভরে গেছে, সীমানা ঘেঁসে বড় বড় শালগাছ, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুর। অজস্র আমলকী। আমলকী গাছের ডাল ফলভারে নুয়ে মাটিতে লেগে গেছে। এক জায়গায় দেখলাম একটা বিশাল পাথরের বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে।

ফিরে এসে যজ্ঞকুণ্ডের সামনে যে একতলা পাথরের হলঘরটি, সেখানে ঢুকে দেখলাম উত্তরদিকের দেয়ালে একটি এবং দক্ষিণদিকের দেয়ালে আর একটি নিকেলের প্লেটে কিছু লেখা আছে। উত্তরদিকের দেয়ালে লেখা আছে একটি বেদমন্ত্র -

মম ত্বা সূর উদিতে মম মধ্যন্দিনে দিবঃ
মম প্রপিত্ব অপি শর্বরে বসবাস্তোমাসো অবৃৎসত ॥ (ঋ ৮ম। ১সূ। ২৯)

অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা প্রগাথ ঋষি বলছেন - সূর্য উদিত হলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার গূঢ়মন্ত্র আবর্তিত কর। দিবসের অবসান হলে আমার স্তোত্র আবর্তিত কর। শর্বরীকালেও আমার সিদ্ধ গুহ্যমন্ত্রকে জাগ্রত কর।

সূর্যনারায়ণজী কখন যে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখতে পাই নি। তিনি বললেন - এই বেদমন্ত্রে দিব্যদর্শনের ক্ষণের কথা বলা আছে। আজ অমাবস্যা। আজ গভীর রাত্রে মধ্যাহ্ন-ক্ষণে আমি আপনাদের দুজনকে নর্মদার ঘাটে নিয়ে যাবো। বংশপরম্পরা যে বিশিষ্ট সিদ্ধমন্ত্র আমার জানা আছে, তা জপ্ করলেই দেখতে পাবেন, লোকচক্ষুর অগোচরে নর্মদা গর্ভে যে লুকেশ্বর মহাদেব জাগ্রত আছেন সেই মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গ মন্ত্র প্রভাবে প্রকট হবেন। আমরা দুজনেই ঘাড় নেড়ে সাগ্রহে সম্মতি জানালাম; দক্ষিণ দিকের দেয়ালের লিপি আমি পড়তে পারলাম না। সূর্যনারায়ণজী বললেন - এটি ফার্সীতে লেখা, আমি পড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন। মহর্ষি মধুমঙ্গলজী তাঁর তপস্যার গুহা থেকে ফিরে এসে তাঁর সর্বনাশের কাহিনী শুনে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেই মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন -

অব্ পৈহ্‌লেহি আগাজ্ মে পামাল হুয়ে হম্।
ফরিয়াদ্ করেঁ কিসসেতি কিসমৎকে জ্বলে হম্ ॥

আমি প্রথমেই বিনষ্ট হলাম। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। কার নিকট আমার পোড়া কপালের জন্য অভিযোগ জানাবো! ভাগ্যদোষেই আজ আমি জ্বলে পুড়ে মরছি।

ফার্সী বয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে করতেই তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

বেলা নয়টা নাগাদ স্নান করতে গেলাম। স্নান করে এসে আমি আর সুমেরদাসজী দুজনে বাড়ীর দোতলায় উঠলাম ধূলি জঞ্জালে সব ভরে আছে, বহু পুঁথি থরে থরে সাজানো আছে। কিন্তু তা ধূলায় এবং পোকায় কেটে নষ্ট করেছে। দুটো বড় তৈলচিত্র টাঙ্গানো আছে দেখলাম। ধূলায় ভাল করে দেখা যায় না। একটা ন্যাকড়া দিয়ে সুমেরদাসজী মুছলেন - মহর্ষি মধুমঙ্গল ও তাঁর ধর্মপত্নীর ছবি, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

মধ্যাহ্ন আহারের পর উভয়ে খুব ঘুমালাম। সেইদিন গভীর রাত্রে পূর্বের কথামত সূর্যনারায়ণজী আমাদের দুজনকে নর্মদাঘাটে নিয়ে গেলেন। ভয়ঙ্করী অমাবস্যার রাত্রি - চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সূর্যনারায়ণজী যোগাসনে বসে জপ্ করতে লাগলেন। সুমেরদাসজী নিজেও খেলেন এক রেণু শঙ্খিয়া। আমার মুখেও দিয়ে দিলেন। সূর্যনারায়ণজী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সহসা দেখলাম - জলের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে... আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার অচৈতন্য দেহকে কখন যে দুজনে আশ্রমে বয়ে এনেছিলেন আমার জানা নেই।

পরদিন সকালে চেতনা এলে সব স্মরণে এল। আমি সাষ্টাঙ্গ হয়ে লুকেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম নিবেদন করলাম। মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে লাগলাম - প্রভু শিবসুন্দর! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, মা নর্মদে তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

শঙ্খিয়ার গুণে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হল। আজও মঠটা ঘুরে ফিরে দেখলাম। যেখানেই গিয়ে দাঁড়াই মনে হচ্ছে, গায়ে যেন কারও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি কি পাগল হয়ে যাবো! সেইদিন রাত্রিতে শুয়েও ঘুমাতে পারলাম না। চোখের পাতা বন্ধ করলেই মনে হচ্ছে - আমার নাকে বুকে কারও যেন নিঃশ্বাস পড়ছে। সুমেরদাসজীর ঘরে গিয়ে তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন- ইহ্ প্রেতপুরী হ্যায়, হমলোগ আভি ইধারসে ভাগেঙ্গে। চুপিচুপি নিজেদের গাঁঠরী বেঁধে পা টিপে টিপে মঠের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমরা পালাচ্ছি। কোনও মহর্ষির 'সাজানো বাগান' শুকিয়ে গেছে, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে পাগল হয়ে যাব। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি আর পালাচ্ছি নর্মদার তটরেখা ধরে। আমার মনে পড়ছে কবীরজীর গান -

জ্বলে আগুন বিরহন কি।
মধুকী স্বাদ পাপিয়া জানে
গান গায়ে তাপ জুড়ায়ন কি !

বিরহের আগুন জ্বলছে বুকে। পাপিয়াই জানে মধুর স্বাদ, কারণ সে একবার আস্বাদন করেছে। সেই মধুকে ছাড়া এ তাপ জুড়াবে কি !

সুমেরদাসজী এ স্থানকে প্রেতপুরী বলেছেন। আমার মনে হচ্ছে এখানে বিরহের গান স্তব্ধ হয়ে আছে সারা তপোবন জুড়ে সেই বিরহের করুণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস শুনে এলাম।

মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের অত্যাশ্চর্য জলমগ্ন পীঠস্থান লুকেশ্বর ও নন্দিকেশ্বর অতিক্রম করে সুমেরদাসজী ও আমি দ্রুত হেঁটে চলেছি নর্মদার উপলজঙ্কৃত গতিপথ অনুসরণ করে। পার্বত্য পথ হলেও, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সুন্দর বন এবং নর্মদার উভয়তটের ঘনবসতি চোখে পড়ছে। নর্মদা কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে কখনও পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে, অরণ্যের ঢালকে কোথাও বাঁদিকে কোথাও ডানদিকে রেখে আপনমনে বয়ে চলেছেন। মাঝে কোথাও চুলের কাঁটার মত রোমহর্ষক বাঁক, কোথাও ছবির মত জংলী গ্রাম, কোথাও পথের পাশে বা পথের উপর দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে ছোট্ট ঝর্ণা।

নর্মদার দুই পাড়েই প্রচুর মন্দির। আমরা নাদিয়াঘাটে এসে পৌঁছলাম। এখানে স্নানপূজা সেরে সুমেরদাসজী তাঁর ঝোলা থেকে একখণ্ড কন্দমূল বের করে নিজেও খেলেন, আমাকেও দিলেন, বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, আজ ইসি মূলসে হমলোগ বীতা দেঙ্গে। আজ যতটা পারি পথ অতিক্রম করব, আরও পনের মাইল পথ যদি হেঁটে ফেলতে পারি তাহলে রবিতির্থ ঘাটে আমার এক গুরুভাই-এর আস্তানায় পৌঁছে যাবো। রাত্রে ঐখানেই থাকব। হাঁটতে তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ? তোমার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

আমি তাঁকে আর কি বলি! এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিই যদি হাঁটতে কোন ক্লান্তিবোধ না করেন, তাহলে আমি বয়সে তরুণ হয়েও কি করে বিশ্রামের কথা মুখে বলি!

আমি বললাম - হাঁটতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, তবে লুকেশ্বরের সেই মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। পুরীতে সমুদ্রতীরে সূর্যোদয় দেখেছি, মনে হয় সহসা সূর্য যেন সমুদ্রগর্ভ থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলেন। একবার আমি গ্রামে মামাবাড়ীতে পুকুরধারে সন্ধেবেলার সময় একটা হিজল গাছের তলাতে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ পুকুরের জলের তলায় দেখতে পেলাম চাঁদের কিরণের ঢেউ খেলছে। হিজলতলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি পূর্বাকাশে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে, তারই স্নিগ্ধ আলোর প্রতিবিম্ব পড়েছে পুকুরে।

এইসব দৃশ্যের সম্ভাব্য কারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় কিন্তু ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে সূর্যনারায়ণজীর মন্ত্রপ্রভাবে নর্মদাগর্ভে যে মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের অলৌকিক প্রকাশ দেখে এলাম, তার তুলনা নেই। সূর্যনারায়ণজীর কাছে শুনে এসেছি-পৌষ মাসের পূর্ণিমায় এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় নাকি ওখানে বড় মেলা বসে। হাজার হাজার গৃহী ও সাধু দূরদূরান্ত থেকে এসে জমায়েৎ হন, লুকেশ্বরের পূজা ও জপের জন্য। পৌষ পূর্ণিমা আসতে ত আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পৌষ পূর্ণিমা পর্যন্ত থেকে এলেই পারতাম কিন্তু বিপুল মহিমমণ্ডিত একটি মঠের জীর্ণদশা দেখে এবং মহর্ষি মধুমঙ্গলজীর ঋষিজীবনের ঐরকম বিয়োগান্তক পরিণতির কথা ভেবে দিনে বা রাতে দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কেবলই মনে হচ্ছিল যেন ঐ ভাগ্যহত ঋষি এবং তাঁর দূর্ভাগিনী পত্নীর আত্মা যেন আমাকে সবসময় কিছু বলতে চাইছে, কিছুতেই আমার মনের ভয় যাচ্ছিল না। সুযোগ পেলেই ঐ মধুবনে বা নর্মদা তীরবর্তী জঙ্গমবাটিকাতে আবার আসার ইচ্ছে রইল।

সুমেরদাসজী বললেন- বেশক্ আপ্ আ সকতে হো, পহেলে তো আপকা পিতাজীকা আজ্ঞানুসার পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়ে। আপকা সাথ উস্ স্থানকা জরুর কোঈ পূরব জনমকা সম্বন্ধ থে, এ মালুম হোতা হৈ। ইয়া নর্মদামায়ীকী কৃপাসে আপকা ভাবশুদ্ধি হোনেকা কারণ আপ্ দুসরেকা দুঃখ আপনায়া! যৈসে কবীরজীনে কহা হৈ - কহে কবীরা ইহাঁ ভাববসৎ হ্যায় শুদ্ধ্ রহে হরজনকী। অর্থাৎ যাঁর হৃদয়ে ভাবশুদ্ধি ঘটেছে তিনি অপরের দুঃখ শোককে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেন।

আরে ছোঃ, ছোঃ, এক ভ্রষ্টাচারিণী কামিনীকে লিয়ে মহর্ষিকো ভি জীবন বরবাদ হো গয়া। ইহ্ কভি শুনা হৈ ?

আমি বললাম - কেন, মহর্ষি ভৃগুর মত উগ্রতেজা ঋষির পত্নীকে পুলোমা নামের রাক্ষস অপহরণ করেছিল, মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যাকেও ত ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের বেশ ধরে এসে সম্ভোগ করে গিয়েছিলেন। সে সব ক্ষেত্রে ঐসব ঋষিপত্নীই কি সর্বাংশে দোশী, তাঁদের উৎকট কাম প্রবৃত্তিকে দায়ী করে রায় দিলেই কি পুরুষদের বিবেক গ্লানিমুক্ত হল ? ঐসব ঋষিপত্নীরা যদি দিনের পর দিন উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে জৈব প্রবৃত্তির বশে কোন ক্ষণিক ভুল করে বসেন, তার কি কোন ক্ষমা নেই! তপস্বীদের তপস্যার তেজ আপন আশ্রিতা ও অনুগতা অসহায় নারীদেরকে ঐ দূরপনেয় গ্লানির কবল হতে কেন রক্ষা করতে পারল না ?

সুমেরদাসজী কোন উত্তর দিলেন না। রাত্রি নয়টা নাগাদ রবিতীর্থের ঘাটের কাছেই তাঁর গুরুভাই এর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে গেলাম। তিনি আদর্শ গৃহী। হাত-পা ধোওয়ার জন্য গরমজলসহ আমাদের দুধ ও ফল ভোজনের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও তাঁর ছেলেরা এসে হাত-পা টিপে দিলেন। আগুন জ্বেলে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করলেন। বড় আরামেই রাত কাটল। পরদিনও গৃহস্বামী কিছুতেই যেতে দিলেন না। নর্মদা এখানে আর সহস্রধারা বা লুকেশ্বর ঘাটের মতন প্রশস্তা নন। সাতপুরা পর্বতমালা ভেদ করে এখানে যেন কন্দফল-মূলাশী তপস্বীর ধ্যানে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য বোধহয় ক্ষীণকায়া হয়ে প্রবাহিতা।

ভালভাবে রোদ ওঠার পর আমরা দুজনে রবিতীর্থের ঘাটে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে ঘাটের কাছেই শিবমন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। যাঁর বাড়ীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করেছি, সুমেরদাসজীর সেই গুরুভ্রাতাই এই মন্দিরের পুরোহিত। এই অঞ্চলে রাজপুত, ব্রাক্ষণ ও গৌড়দের বসতি। কাজেই ভক্তদের বেশ ভীড় আছে মন্দিরে। পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম - এই ঘাটের নাম রবিতীর্থ হবার কারণ। তিনি বললেন - শ্রীকৃষ্ণের গুণধর পুত্র শাম্ব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দোষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে নর্মদাতটের এই ঘাটে সূর্যের উপাসনা করেছিলেন। একপায়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর শ্রীসূর্যনারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে রোগমুক্ত করেন। শাম্বই তাঁর সূর্যভক্তির স্মারকস্বরূপ এই মন্দির স্থাপন করে গেছেন। লক্ষ্য করুন এখানে কোন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নেই। এখানে যে অত্যুজ্জ্বল স্ফটিকের গোলকটিকে দেখছেন, ইনি ভগবান ভাস্করের প্রতীক।

তিনি মন্দিরের দুদিকে দুটি ছিদ্র দেখিয়ে বললেন, সূর্য পূর্বাকাশেই থাকুন আর পশ্চিমাকাশেই থাকুন, সারাদিনই সূর্যকিরণ এই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে গোলকটিকে ভাস্কর ও জ্যোতির্ময় করে তোলেন। এই বিগ্রহে শিবপূজাও করা হয়। শিব ও সূর্যনারায়ণে ত কোন ভেদ নেই। ভগবান আদিত্যনারায়ণ শাম্বকে বর দিয়েছিলেন যে তিনি নর্মদার এই উত্তরতটের মন্দিরে স্বীয় অংশে সর্বদা বিরাজ করবেন -

স্বাংশেন ভাস্করস্তত্র তিষ্ঠতে চোত্তরে তটে।
সর্বব্যাধিহরঃ পুংসাং নর্মদায়াং ব্যবস্থিতঃ ॥

এই অঞ্চলের সবাই বিশ্বাস করেন যে এখানে পূজা জপ্ করলে রোগমুক্তি ঘটে। এইজন্য নর্মদার দূর-দূর অঞ্চল থেকেও লোক আসে সর্বরোগহর এই দেবতার পূজা করতে। কোন সুদূর অতীতে এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে তার কোন সঠিক সাল তারিখ নির্ণয় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এই মন্দিরের দুদিকে দুটি ছিদ্রের এমনই নির্মাণ কৌশল যে দেখে অবাক হতে হয়।

মধ্যাহ্নভোজন করে গৃহস্বামীসহ সকলেই আমরা রোদ পোয়াচ্ছি, এমন সময় একতারা ও একটি ত্রিশূল হাতে এক সন্ন্যাসী এলেন। গৃহস্বামী জানালেন যে ঐ মহাত্মার নাম হরভজনদাস, সাতপুরা পর্বতাঞ্চলের পরগুরিয়া গ্রামে তাঁর ভজন আশ্রম। কর্ণালী, বরকাল, মালসর এবং রাণাপুর পর্যন্ত তিনি সর্বত্র গান গেয়ে বেড়ান। বেশভূষায় বাংলার বাউলদের মত, তফাৎ কেবল তিলকে। এঁরা কপালে ত্রিপুণ্ড্র আঁকেন।

সুমেরদাসজীর অনুরোধে তিনি একতারাটি হাতে নিয়ে নেচে নেচে গান গাইতে লাগলেন -

তব গুণ ক্যা জগৎগুরো জৌ পাপ করম ন নাশৈ।
সিংহ শরণ কত্ যাইয়ে জৌ জম্বুক গ্রাসৈ ॥
এক বুদবুদকে কারণ চাতক্ নিত দুঃখ পাবে।
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে কুন্ কাম ন আবে ॥
মৈঁ নহি প্রভু হৈ নহি কুছ নেহি হ্যায় মেরা।
আবসর লাজ রাখলে হরভজনদাস তেরা ॥

এখানে ভক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলছেন - যদি পাপ-কর্মের নাশই না হয়, তবে হে জগৎগুরু! তোমার মহিমা কি? যদি জম্বুকেই গ্রাস করে অর্থাৎ সিংহের ভোগ্য বস্তুকে যদি শেয়ালেই টেনে নিয়ে যায় তাহলে সিংহের শরণ নিয়ে তার প্রয়োজন কি ? একবিন্দু জলের জন্য চাতক পাখী নিরন্তর কষ্ট পায়। যদি তার প্রাণ বিয়োগ হয় আর তখন যদি সাগরও মিলে তাতো কোন কাজে আসে না। আমি কিছু নই, আমার কিছুই নেই, হে প্রভু! 'আমার' বলতে শুধু তুমিই আছ; তোমার এই হরভজনদাসের এই সঙ্কট সময়ে এই লজ্জা হতে রক্ষা কর।

গান শেষ হলে আমি সুমেরদাসজীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম - ক্যা জী, ঋষিপত্নীয়োঁকে বারে মেঁ আপ্ জো মন্তব্য কিয়ে থে, ইহ্ গানামেঁ উসকা জবাব মিলা?

নেহি জী, রাজা শ্রীবৎসকো কিসসা ইয়াদ করিয়ে। শ্রীবৎসের উপর শনি রুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু পুণ্যশ্লোক রাজাকে কিছুতেই জব্দ করতে পারছিলেন না। একদিন রাজার ভোজনকালে অসাবধানতা বশতঃ তাঁর পায়ে একটি উচ্ছিষ্ট ভাত পড়ে যায়। ভুল করে রাজা আহারান্তে পা ধোবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই ত্রুটি পেয়ে, সেই ছুতো ধরে ক্রুর শনি রাজার পুণ্যদেহে প্রবেশ করলেন। ফলে শ্রীবৎস রাজ্যভ্রষ্ট ও নিঃস্ব হলেন, এমন কি ধর্মপত্নী চিন্তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীবৎস-রাজার প্রসঙ্গ টেনে সুমেরদাসজী মন্তব্য করলেন - শৈলেন্দ্রনারায়ণজী, তুমি হয়ত ভাবছ, মহর্ষি ভৃগু, গৌতম ও মধুমঙ্গলজীর ধর্মপত্নীগণ সিংহস্বরূপ উগ্রতেজা মহর্ষিদের শরণ বা আশ্রয়ে ছিলেন, এজন্য তাঁদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা তাঁদেরই দায়িত্ব অর্থাৎ তুমি ভ্রষ্টাচারিণী ঋষিপত্নীদের দোষ লঘু করে দেখতে চাইছ। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। ঐসব কামিনীর হৃদয়ে কামভাব প্রবল ছিল। কামভাবে বিহ্বল হয়েই তারা কোন-না-কোনভাবে পরপুরুষকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলেই সিংহের আশ্রয় থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া জম্বুকদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। উচ্ছিষ্টের ছিদ্রপথে যেমন শ্রীবৎসের পুণ্যদেহে শনি প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি উৎকট কামেচ্ছার ছিদ্রপথে পাপ প্রবেশ করেছিল ঐসব কামিনীদের মনে। তারা তাতেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে বিপর্যয়ের পথে পা বাড়িয়েছিল, স্বামীদের জীবনেও ডেকে এনেছিল সর্বনাশ।

আমি সুমেরদাসজীর কথার সারমর্ম চিন্তা করতে লাগলাম। হয়ত মহাত্মার ব্যাখ্যাই ঠিক। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম - এ বিষয়ে কোন অবিচলিত সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মহাভারতে বেদব্যাস ভীষ্মের মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে যে তত্ত্ব বলে গেছেন, মনে হয় সেই মহর্ষি বাক্যকেই স্মরণে রেখে এ বিষয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে মনু রচিত ধর্মশাস্ত্র হতেএকটি শ্লোকে বলেছিলেন -

ঋষীণাংচ নদীনাংচ সাধুনাংচ মহাত্মনাম্।
প্রভবো নাধিগন্তব্য স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ॥

অর্থাৎ ঋষি, নদী, সাধু, মহাত্মা ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রের উৎপত্তির কারণ যথাযথভাবে জানা যায় না।

গানের পর হরভজনদাস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আমি রবিতীর্থের ঘাটে বেড়াতে গেলাম। নর্মদার কাকচক্ষু নির্মল জলে অত্যধিক বাতাসের ফলে ঢেউ উঠছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে, কম্বল মুড়ি দিয়েও কাঁপছি, কিন্তু নর্মদার শোভা এবং অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি নর্মদাতে পড়ে যে অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে, সেই দৃশ্য ছেড়ে অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে আসতে মন চাইছিল না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে স্নেহময় সুমেরদাসজী বন্ধু-পুত্রকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। হায়রে, দুদিন পরে কোথায় থাকবে তাঁর এই উদ্বেগ ও কাতরতা। আমি যে পরিক্রমার শপথ নিয়েছি। তাঁর কাছে থেকে যাবার তো কোন উপায় নেই আমার। সবসময় আমার চোখে চোখে থাকবেন মা নর্মদা, এগিয়ে চলবার পথ, ঝাড়ি জঙ্গল পাথর ছাড়া কারো জন্য আমার অপেক্ষার চিন্তা করাও অন্যায়।

মন্দিরের পাশ দিয়ে আসার সময় সূর্যদেবতার স্ফটিক-গোলকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে, গোলকটিকে আকাশমণ্ডলস্থ সূর্যের মত জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছে। একজন মহিলাকে দেখলাম নর্মদাতে স্নান করে এসে মন্দিরের চাতালে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে প্রণাম করতে। আমার সাথী জানালেন - এই মহিলার স্বামী ইন্দোর শহরে কাজ করতেন, ডাক্তারেরা বলেছেন, লোকটির লিভারে ক্যানসার দেখা দিয়েছে, স্বামীর আরোগ্য কামনায় উনি 'হত্যা' দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম - এর স্বামী এতে কি রোগমুক্ত হবেন ? অটুট বিশ্বাসে সাথী জবাব দিলেন - এ্যায়সা হম বহোৎ দেখা হ্যায়। জরুর উনকী আদমীকা রোগমুক্তি হোগাই হোগা।

পরদিন ভোরে উঠেই সুমেরদাসজীর সঙ্গে যাত্রা করলাম, নর্মদার উত্তরতট ধরে। মনোরম পার্বত্যপথ, মুণ্ডমহারণ্যের সেই দুর্গম বিভীষিকা আর কোথাও নেই, আমাদের বাংলার গ্রামের শোভার মত নর্মদার এই উপত্যকা অঞ্চলও নানা ফল ফুল ছোট-বড় নানারকমের গাছ ও শস্যক্ষেত্রের শোভায় অপরূপা। বাংলার গ্রামাঞ্চলে জল কাদা নালা ও পুষ্করিণী আছে, মাটি কাদার পথ, এখানে কিন্তু পরিস্কার পার্বত্য অঞ্চল, এটুকুই যা তফাৎ। মান্দালা থেকে এই পর্যন্ত দীর্ঘপথে একটি পুষ্করিণী বা ডোবা চোখে পড়ে নি। বেলা বারটা নাগাদ আমরা একস্থানে একটি শিবমন্দির দেখে স্নান সেরে নিলাম। সুমেরদাসজীর ঝোলায় কলা, পেয়ারা ও খোয়া তাঁর গুরুভাই পথে খাবার জন্য দিয়েছিলেন, আমরা তাই দিয়ে খিদে মেটালাম। মন্দিরটি নতুন তৈরী হয়েছে বলে মনে হ'ল। বলতে ভুলে গেছি, আমরা সাতপুরা পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে হেঁটে চলেছি। নর্মদা ইতিমধ্যেই সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছেন। রাত্রি নয়টা নাগাদ আমরা রবিতীর্থ থেকে সতের মাইল হেঁটে গোয়ারীঘাটে গৌরসংগম অতিক্রম করে জব্বলপুরের ভিড়াঘাটে সুমেরদাসজীর সেই 'অবধূত-আশ্রমে' পৌঁছে গেলাম।

মেহেরদাস ও অন্যান্য আশ্রমিকরা আমাদেরকে দেখে অবাক। বাবার দেহান্তের পর আমার জীবনে যে এত বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেছে তা তাঁরা জানবেন কি করে! তাছাড়া সুমেরদাসজী মেহেরদাসকে আশ্রমাধ্যক্ষ নির্বাচন করে যাবার সময় বলেছিলেন, তিনি আর ওখানে আসবেন না। মান্দালাতে তাঁর গুরুর নামাঙ্কিত 'ভীষ্মাশ্রম'-এ বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সহসা তাঁকে এভাবে উপস্থিত হতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছেন। সুমেরদাসজী কৈফিয়ৎ দিয়েছেন
- ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকা এ্যায়সা ভেষ্ দেখকর হম বহুৎ বিচলিত হো গঈ। বুড্ঢা হো গঈ, রেবা সংগম তক্ যানে নেহি সকেগা। তবভি বাঁদরাভান তক্ সাথমেঁ যাকর্ পরিক্রমাকা পথ দিখলা দুঙ্গা, উসকা বাদ ওয়াপস আকর মান্দালামেঁ ফিন্ আসন লাগায়েগা।

অবধূত আশ্রম আমার নিজের জায়গা, পুরাতন জায়গা। কাজেই খুব আনন্দে এবং আরামে থাকলাম। সকালে স্নানপুজা সেরে বিকেলের দিকে অল্পবিস্তর নর্মদাতটে হেঁটে, সন্ধ্যায় আশ্রমের ভক্ত এবং আশ্রমবাসীদের কাছে মহাভারত ও উপনিষদ্ পাঠ করে সময় কাটতে লাগল। সুমেরদাসজী আমাকে দশ বারোদিন ঐখানে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন, কিন্তু পাঁচদিনের দিন নিজেই বিকেলের দিকে কোথাও হতে এসে বললেন - ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহু, নর্মদামায়ীকী কৃপাসে এক মোকা মিল গয়া। অব বিহানমেঁ আপকো হম্ জলেরীঘাটমেঁ লে চলুঙ্গা।

তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে নর্মদাতীর্থের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কমলভারতীজী যিনি হাজার হাজার সন্ন্যাসীর জমাৎ সঙ্গে নিয়ে মার্কণ্ডেয় মুনি প্রবর্তিত নর্মদা পরিক্রমার ধারাকে নূতন করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, তাঁরই এক প্রশিষ্য শংকরভারতীজীর চারজন শিষ্য বর্তমানে গৌরসংগমে অবস্থান করছেন। বিহানমেঁ অর্থাৎ পরদিন সকালে তাঁরা ওঁকারেশ্বরের পথে যাত্রা করবেন। তাঁদের সঙ্গে গেলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব।

তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল, সেই সাধুদের সঙ্গে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব কি পারব না, সে তো ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু তিনি যে নিশ্চিন্ততা বোধ করবেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও জানালেন যে কমলভারতী ও গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীজীর মত শংকরভারতীও প্রতি বৎসর জমাৎ নিয়ে অমরকন্টক পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ওঁকারেশ্বরে যে শিলাতে বসে তপস্যা করেছিলেন সেই মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে দীর্ঘকাল কাটিয়ে কমলভারতীজী 'চব্বিশ অবতার' নামক স্থানে চলে যান। সেখান থেকে যান মর্কটি সংগমে। মর্কটি সংগমেই সেই সিদ্ধযোগী নর্মদাতে লীন হন। চব্বিশ অবতার ও মর্কটি সংগমে তাঁর দুটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের বর্তমান মোহান্ত ঐ শংকরভারতীজী।

সুমেরদাসজী আশ্রমে সবাইকে হাঁকডাক করে হৈ হৈ ফেলে দিলেন। পথে খাবার জন্য পাঁচজনের উপযোগী লিট্টি পাকাবার হুকুম দিলেন, জব্বলপুর পাঠালেন একজনকে সাবু কিসমিস আনার জন্য। মুণ্ডমহারণ্যে ঠিকরনারীরা আমার টর্চটা আত্মসাৎ করেছিলেন, একটা টর্চলাইট সহ আলাদা আরও চারটা ব্যাটারিও কিনে আনার হুকুম দিলেন। আমার কোন বাধাই তিনি মানলেন না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে বা কোন প্রবাসী পুত্র যখন চলে যায় দীর্ঘসময়ের জন্য, তখন যেমন মা বাবা সাথে তালপিটুলি থেকে

আমসত্ত্ব সব কিছুই ছেলের সঙ্গে দেন, সুমেরদাসজীও তেমনি আমার জন্য বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগী হলেন। যে সাধুটি জব্বলপুর যাচ্ছিলেন, তিনি প্রায় দু-হাজার গজ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সুমেরদাসজী হাঁক পাড়তে পাড়তে দৌড়ে গিয়ে বলে এলেন আমার জন্য কিছুটা তালমিছরীও কিনে আনতে।

রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি আমাকে নিয়ে চললেন নর্মদার ঘাটে। নর্মদার জল স্পর্শ করিয়ে আচমনাদির পর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন - জঙ্গলে খোলা জায়গায় রাত্রি কাটাতে বাধ্য হলে আমি যেন অতি অবশ্য এই মন্ত্র পড়তে পড়তে দণ্ড দিয়ে একটা গণ্ডি টেনে তার মধ্যে বাস করি, তাহলে 'শের, ভাল্লু, সাঁপ, বিচ্ছু কুছ আপকো নেহি কাটেগা। গণ্ডিকা অন্দরমেঁ উও ঘুসনে নেহি সকেগা।'

মন্ত্রটি শিখিয়ে তিনি হাতজোড় করে নর্মদার উদ্দেশ্যে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন - মায়ী! সুমেরদাস জীন্দেগী ভর আপকা পাশ কুছ নেহি মাংগা। আভি হম্ মাংগতা হু, ইস লেড়কাকো আপ্ আচ্ছিতরেসে দেখভাল করেঁ। ইহ্ হমারা বিনতি হৈ। অবিরলধারে কাঁদতে থাকলেন তিনি। নর্মদার দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে এমন কাতরভাবে নিবেদন করতে থাকলেন যে মনে হ'ল তাঁর সামনে নর্মদার জলধারা নেই, স্বয়ং মা নর্মদাই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

পরাশর ঘাটে দেখেছিলাম, নর্মদা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি শিবলিঙ্গকে আমি গৃহীর পক্ষে অমঙ্গলজনক বলায় মহাত্মা শোভানন্দজী সেই শিবলিঙ্গটিকে নর্মদার জলে ছুঁড়ে ফেলে এমনভাবে রাগি রাগি চোখ করে নর্মদার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকছিলেন যে, সেদিনও আমার মনে হয়েছিল, নর্মদা যেন ইচ্ছা করে 'দিল্লাগী' করে তাঁকে ঐ অশুভ শিবলিঙ্গটি দিয়েছিলেন এবং ধরা পড়ে গিয়ে অপরাধী মেয়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সাধুর ভর্তসনা শুনছেন।

এ রহস্য আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অনুভব করতে পারছি, এই দুই সাধুর কাছে নর্মদা যেন নিত্যপ্রকটিতা।

সুমেরদাসজী আশ্রমে ফিরে এসেও ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির নানা বিপদসঙ্কুল স্থানে কিভাবে সাবধানে থাকতে হবে, কিভাবে রেবামন্ত্র জপ করে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দিলেন। আমার জন্য তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই। সকালে উঠেই খাবারের পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে আমার সাথে শাহপুরার দিকে হাঁটতে লাগলেন। একে একে তিলওয়ারা ঘাট রাজেশ্বরী ঘাট ইত্যাদি অতিক্রম করে আমরা বেলা নয়টা নাগাদ জলেরীঘাটে এসে পৌছালাম। গোয়ারীঘাটের কাছে 'গৌর' নামে একটি ছোট্ট উপনদী পাহাড়ের উপর থেকে বয়ে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাই এই স্থানের নাম গৌরসঙ্গম।

এই জলেরীঘাটের উপরেই নর্মদার ধারে একটা টিনের আটচালা এবং পাথরের একটা ঘর আছে। সেই আটচালার মধ্যে চারজন সাধু বসে আছেন। তাঁরাই শংকরভারতীর শিষ্য। তাঁরা যাত্রা করার জন্য তৈরী হয়েই বসে আছেন। সুমেরদাসজী তাঁদের হাতে লিট্টির পুঁটুলিটি দিয়ে বললেন - ইয়ে আপকে লিয়ে পারসাদী হ্যায়। তাঁদের কাছে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়ে প্রত্যেকের হাত ধরে সাশ্রুনয়নে অনুনয় করতে লাগলেন, তাঁরা যেন দয়া করে আমার দেখভাল করেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

আমি তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলাম। পুনরায় প্রণাম করে বাবাকে স্মরণ করে সাধুদের সঙ্গে যাত্রা করলাম। পরিক্রমার ব্রত নিয়েছি - নর্মদাতীর্থের পথ আমাকে ডাকছে। বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথে আমাকে যাত্রা করতেই হবে।

এ আমি কি বললাম! বাবার আশীর্বাদে ও নর্মদামায়ীর দয়ায় অমরকণ্টক হতে যাত্রা করে মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করে এতদুর যে এলাম, পথ দুর্গম, ভয়ঙ্কর ও বন্ধুর হলেও বন্ধুবিহীন ত আমি কখনও হইনি। মহাত্মা শংকরনাথ, শোভানন্দ, সূর্যনারায়ণ সবাইতো আমার বন্ধু হয়েই এসেছেন। আর এখনও পেছন ফিরলে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, উনি! ওঁকে কেবল হিতাকাঙ্খী বন্ধু বললে ছোটই করা হবে। ওঁর উদ্বেগাকুল চিত্তের যে ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি, তার ঋণ কি কোনদিন শোধ করতে পারব! সূর্যনারায়ণজী বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে নাকি আমার পূর্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। তাঁর কাছেও আমি অনেক আপনার মানুষের মত ব্যবহার পেয়েছি, সুমেরদাসজী কখনও দাবী করেননি যে তাঁর সঙ্গে আমার কোন জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ আছে। তিনি মুখে না বললেও আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি, তিনি আমার কোন একান্ত আপনজন ছিলেন কিনা, তা দেখার জন্য ত্রিকূটীতে ধ্যান করতে হয়না।

কুকুরামঠে ঋণমুক্তেশ্বর শিব দেখে এসেছি, তাঁর কাছে দেড় কিলো অড়হর ডাল সমর্পণ করলে নাকি সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যায়। শুনেছি, ওঁকারেশ্বরেও এক ঋণমোচনেশ্বর শিব আছেন, সেখানেও নাকি দেড় কিলো অড়হর ডাল দিয়ে ঐহিক পারলৌকিক সকল প্রকার ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবার ব্যবস্থা আছে। কোন মানুষের বিবেক কি এতে সায় দিতে পারে! হোক শাস্ত্রবাক্য তবুও ঐ কথা স্বীকার করলে ভালবাসাকে অপমান করা হয়। মাতৃঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি যে কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণও অপরিশোধ্য। সমস্ত পৃথিবীর অড়হর ডালও শিবের কাছে উৎসর্গ করলে ভালবাসার ঋণ শোধ করা যায় না।

'হমলোগ শাহপুরামে পৌঁছ গয়ে' সঙ্গী সাধুদের কথায় চমকে উঠলাম। এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। এখন হুঁস এল। দেখলাম মনোরম একটি উপবনের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। কাছাকাছি লোকের বসতিও আছে।

ঔর দো ঘন্টা চলেগা তো পত্রেশ্বর তীর্থ পৌঁছ যায়েগা। উধরই হমলোগ স্নান-পান করেঙ্গে।

আমি বললাম - তথাস্তু। এখন আপনারাইতো আমার পথপ্রদর্শক। যে পথে যেমনভাবে যাবেন, আমি সেই পথেই আপনাদের অনুসরণ করব।

এই চারজন সাধুর মধ্যে একজন মৌনী, দুজন খোড়িবলি ভাষায় যেভাবে কথা বলেন তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারিনা। চতুর্থ জনের নাম চেতন ব্রহ্মচারী। আমারই মতন বয়স চব্বিশ বা পঁচিশ হবে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - ভাই, মুণ্ডমহারণ্যের মধ্যে আমি জমায়েৎ দেখে এসেছি। কোন এক কাশিকানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী সেই জমায়েৎ পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনাদের কি কোন পরিচয় আছে ?

উত্তরে ব্রহ্মচারী জানালেন যে তাঁরা গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীর দল। হোসেঙ্গাবাদের কাছে কোকসর নামক স্থানে তাঁদের মূল গদী, কোকসরেই গৌরীশংকরজীর সমাধি-মন্দির আছে। গৌরীশংকরজীর আমলে একত্রে আমাদের জমায়েৎ পরিক্রমায় যেত। কিন্তু কমলভারতীর ধারা থেকে সেই জমায়েৎ এখন পৃথক হয়ে গেছে। আমাদের গুরুমহারাজ শংকরভারতীজী পৃথকভাবে জমায়েৎ নিয়ে প্রতি বৎসরই পরিক্রমায় বের হন। তিনি এতদিনে বোধহয় পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন, সঙ্গে নিশান, তাম্বু, ছড়ি এবং ভোজ্যবস্তু বহন করার লোকজন ছাড়াও প্রায় দুই হাজার সাধু আছেন। জব্বলপুরের অনেক ধনী শেঠ আমাদের গুরু মহারাজের ভক্ত। তাঁরা যাতে এই বিরাট জনতার সেবা বা ভাণ্ডারার জন্য আগে থেকে বিধিমত ব্যবস্থা করে রাখেন, সেই কারনে আমরা জব্বলপুরে তাঁদেরকে খবর দিতে এসেছিলাম। পথে যেখানে জমায়েতের সঙ্গে দেখা হবে সেইখান থেকে আপনাকে একলা পথে যেতে হবে।

আমি বললাম - নর্মদামায়ীর যা ইচ্ছে তাই হবে।

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ আমরা পত্রেশ্বর তীর্থে পৌঁছে গেলাম। নর্মদা এখানে বেশ চওড়া। ঘাটের উপরেই একটি পাথরের শিবমন্দির। আমরা স্নান করে সকলেই মন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। একটি কালো রঙের শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের মাথায় প্রচুর ফুল এবং বেলপাতা। তার মানে কেউ এসে পূজা করে গেছেন। চেতন ব্রহ্মচারী বললেন, এতদঞ্চলে বহুলোকের বসতি। ঐ দেখুন দূরে পল্লী দেখা যাচ্ছে। গৃহীরা অনেকেই এই মন্দিরে এসে শিবপূজা করে যান। স্কন্ধপুরাণ পড়ে গুরুজী এই শিবের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, চিত্রসেন নামের এক গন্ধর্বের পুত্র ছিলেন পত্রেশ্বর। তিনি অসাধারণ রূপবান এবং বীর ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু স্বর্গে দেবগণের সভায় নৃত্যশীলা অপ্সরা মেনকাকে দেখে তিনি কামভাবে জর্জ্জরিত হয়ে মেনকার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন। তাতে দেবরাজ কুপিত হয়ে বলেন -

সত্যশৌচরতানাঞ্চ ধর্মিষ্ঠানাং জিতাত্মনাম্।
লোকোহয়ং পাপিনাং নৈব ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥

অর্থাৎ যারা সত্যনিষ্ঠ, শৌচপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মাত্মা, এই স্থান তাঁদেরই জন্য। ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপীদের স্থান স্বর্গে নেই। তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে বার বৎসরকাল ইন্দ্রিয় সংযম করে যদি রেবাতটে শান্ত শিবের উপাসনা করতে পার, তবেই পুনরায় সদ্গতি প্রাপ্ত হতে পারবে -

নর্মদাতটমাশ্রিত্য দ্বাদশাব্দং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আরাধয় শিবং শান্তং পুনঃ প্রাপ্স্যসি সদ্গতিম্ ॥

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সেই পত্রেশ্বর। তাঁর নামানুসারেই এখানে শিবের নামও পত্রেশ্বর।

পত্রেশ্বর ঘাটে সুমেরদাসজী প্রদত্ত লিট্টি খোয়া এবং ফল পাঁচজনে ভাগ করে খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। নর্মদার ধারে ধারে শালবন, সাজা, শালাই গাছ এখানে বিশেষ চোখে পড়ছে না, তবে মাঝে মাঝে সেগুন গাছ দেখতে পাচ্ছি। আমলকী এবং বহেড়ার গাছ বোধহয় সর্বত্র। পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে যেটুকু কষ্ট, তাছাড়া আর কোন কষ্ট নেই। অর্থাৎ জঙ্গলের বিভীষিকা নেই। পর্বতের উপর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ফুট উঁচুতে অরণ্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নর্মদা কৃপা করে এতদঞ্চলে উপত্যকা পথে বয়ে যাচ্ছে বলে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। তবে প্রচণ্ড শীত। শীতকালের বেলা ছোট, তাই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে গেল। মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের রাত্রে আমাকে সুমেরদাসজী এক রেণু শঙ্খিয়া দিয়েছিলেন, তার গুণেই কিনা জানিনা, পাথরের রাস্তা শিশির পড়ে ভিজে গেলেও আমি চারজন সাধুর সাথে পাল্লা দিয়ে জোর কদমে হেঁটে চলেছি। আমার সঙ্গীরা তো এরই মধ্যে একবার গাঁজা খেয়েছেন। গাঁজার গুণে তাঁদের বোধহয় শীত লাগছে না। চেতনদাস ব্রহ্মচারীকে আমাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি ঠেট্ হিন্দীতে কিছু বললেন, আমি শুধু বুঝতে পারলাম - কলহড়ি, কলহড়ি। চেতন ব্রহ্মচারী আমাকে বললেন আরও দু-তিন ঘন্টা হাঁটলে আমরা কল্হোড়ীঘাটে গিয়ে পৌছতে পারব, সেখানের মন্দির বড়, মন্দিরের মধ্যে পাঁচজনেই রাত্রে থাকতে পারব। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। শুক্লপক্ষ চলছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে, চাঁদের কিরণে নদীতীর পাহাড় সব ঝলমল করছে, নর্মদার স্বচ্ছ জলে জ্যোৎস্না পড়ে জলের ঢেউগুলো মনে হচ্ছে আলোর তরঙ্গ। অপরূপ সুন্দর এক স্বপ্নের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

রাত্রি আটটার পর আর হাঁটা গেল না। হিমের প্রচণ্ডতায় আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাই কাহিল। কিছুদূরেই চোখে পরল, তিনজন লোক হেঁটে আসছে। তাদের মুখের বিড়ির আগুন দূর থেকেই জোনাকি পোকার মত জ্বলছিল আর নিভছিল। কাছাকাছি হতেই বিড়ির উৎকট গন্ধ নাকে ভেসে এল।
'আপলোগ পরিক্রমাবাসী হ' ?

জিজ্ঞাসা করলাম - 'কল্হোরী ঘাট কেতনা দূর বা ?'

নজদিগ, নজদিগ, আপ্ লোগ আ গয়া - বলেই টর্চ টিপে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে নর্মদার ঘাটের কিনারেই একটি মন্দিরে নিয়ে উপস্থিত করল। তাদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে টাঙি। ধবধবে জ্যোৎস্নায় চারদিক দেখা গেলেও মন্দিরের গায়ে একটি অশ্বত্থ এবং কয়েকটি আমলকী গাছের জন্য আমরা মন্দিরটি দেখতে পাই নি। আমরা মন্দিরে ঢুকে যে যার গাঁঠরী থেকে কম্বলাদি বের করে বিছানা পাততে থাকলাম, একজন লোক টর্চ টিপে দাঁড়িয়ে রইল। পরিক্রমাবাসী সাধুদের জন্য এখানকার পল্লীবাসীরা প্রায় প্রতি মন্দিরের বাইরেই কিছু কাঠ জড় করে রাখে। সঙ্গের দুজন লোক সেই কাঠে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লেগে গেল। শিশির পড়ে কাঠগুলো প্রায় ভিজে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে তারা আগুন ধরিয়ে আমাদের হাত পা সেঁকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর চলে গেল। যাওয়ার আগে তাদের সভক্তি দণ্ডবৎও মনে রাখার মত। অতি সাধারণ লোক, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ভারতের মাটিতে এখনও তপস্যার প্রেরণাকে জাগ্রত রেখেছে। তাদের সঙ্গে চেতন ব্রহ্মচারীর আলাপ থেকেই জানতে পেরেছি যে, তারা এখানকারই স্থানীয় লোক। এখান থেকে বার মাইল দূরে রৈকপন গ্রামে এক বৈদ্যের কাছে গিয়েছিল 'দাবাবুটি' আনতে। ক্লান্ত শরীরে আপন মহল্লায় ফিরে এসে দেখেছে পাঁচজন পরিক্রমাবাসী রাত্রির আশ্রয় খুঁজছেন। নিজেদের ক্লান্তি উপেক্ষা করে তারা আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই ফিরে গেল তাদের ঘরে। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় এ দৃশ্য দেখা যাবে ?

এক ঘুমেই রাত্রি কাবার। ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রত্যেকের বিছানা খালি। গাঁজার গন্ধ থেকে অনুমান করলাম তাঁরা বাইরেই আছেন। মন্দিরস্থ মহাদেবকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁরা কাঠে আগুন ধরিয়ে তার ধারে বসে আছেন। তখনও চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। চেতন ব্রহ্মচারী বললেন - কুয়াশা কাটলে যাত্রা করা হবে। বেলা আটটা হবে, সেই সময় দেখলাম গত রাত্রির সেই চারজন লোক দুধ, আটা, কলা ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন আমাদের সেবার জন্য। সেবার ব্যবস্থা দেখে সাধুরা রায় দিলেন - ঠাকুরজীকে পূজা ও ভোগ নিবেদন করে রওনা হবেন। রেবাখণ্ড খুলে কল্হোরী তীর্থের বিবরণ খুঁজে বের করলাম। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন -

তত্যো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কল্হোড়ীতীর্থমুত্তমম্।
রেবায়শ্চোত্তরে কূলে সর্বপাপবিনাশনম্ ॥ (আবন্তখণ্ডে রেবাখণ্ডম্)

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অনন্তর কল্হোড়ী তীর্থে গমন করবে, এই কল্হোড়ী তীর্থ রেবার উত্তরতীরে অবস্থিত। হিতার্থং সর্বভূতানাম্ ঋষিভিঃ স্থাপিতং পুরা - পুরাকালে সর্বভূতের হিতকামনায় ঋষিগণ প্রভূত তপস্যা করে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাহ্নবী পশুরূপেন তত্র স্নানার্থম্ আগতা - জাহ্নবী (গঙ্গা) পশুরূপ ধারণ করে এই তীর্থে নর্মদা স্নান করতে এসেছিলেন।

ত্রিরাত্রং কারয়েৎ তত্র পূর্ণিমায়াং যুধিষ্ঠির
- হে যুধিষ্ঠির এই কল্হোরী তীর্থে পূর্ণিমার ত্রিরাত্র বিধানে জপ্ পূজা করলে শিবলোকে গতি হয়
- শাম্ভবং লোকমাপ্নুয়াৎ।

পুঁথিতে দেখলাম বাবা এই 'ত্রিরাত্রং' এবং 'পূর্ণিমায়াং' - এই দুটি শব্দে লালকালিতে দাগ দিয়ে রেখেছেন। উপস্থিত সাধু ও গৃহীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সেইদিনই পূর্ণিমা। আমি চেতন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে সঙ্গে আমার সংকল্প জানিয়ে দিলাম যে আমি এখানে তিনদিন বাস করবো। ব্রহ্মচারী বললেন যে তাঁদের থাকার উপায় নেই, কারণ তাঁদের গুরুমহারাজ জমায়েৎ নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। অগত্যা তাঁরা স্নান পূজা সেরে দুধ, ফল ইত্যাদি খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গৃহী ভক্তরা যে আটা নিয়ে এসেছিলেন তাদেরকে সেই আটা নিয়ে যেতে বললাম, কারণ অমি রুটি তৈরী বা কোন রকমের রান্না জানিনা। আমার সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি। এ কয়দিনে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে আমাকে আমলকী গাছের নীচে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল যে - এখানে থাকুন, আপনার কোন কষ্ট হবেনা। কিন্তু এখান থেকে বার মাইল দূরে রৈকপন মহল্লায় কিছুতেই যেন রাত্রিবাস করবেন না। কারণ ঐখানে পিশাচ থাকে। নানা বিভীষিকার ভয়ে পরিক্রমাবাসীরা সযত্নে রৈকপন মহল্লার মন্দির এড়িয়ে চলেন। বিদায় নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমি স্নান করে মন্দিরে শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে বসলাম। কমণ্ডলুর জলে ঘষে ঘষে শিবলিঙ্গটিকে ধুলাম। জলে কুলালো না, আবার নর্মদা থেকে জল এনে ঘষতে লাগলাম, পাথরের যোনিপীঠের ওপর প্রায় একফুট দীর্ঘ লিঙ্গটি ধূম্রবর্ণের। ভিতরে কোন একটি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়। ভক্তদের আনা দুধ সাধুরা সকালে খেয়ে আমার জন্য একটা বড় ভাঁড়ে রেখে গেছেন, আমি সেই দুধ এনে ঢেলে ঢেলে ঘষতে লাগলাম, তখন দেখলাম লিঙ্গের মধ্যে একটা পতাকার চিহ্ন। খাতার সঙ্গে মিলিয়ে সিদ্ধান্তে এলাম, এটি বায়ুলিঙ্গ। শিলাচক্রার্থবোধিনী থেকে বাবা খাতায় যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বায়ুলিঙ্গের এই লক্ষণ লেখা আছে -

কৃষ্ণং ধূম্রং নবারুচ্যং ধ্বজাভং ধ্বজমূষল
মস্তকে স্থাপিতং তস্য ন্যূনন্যূমিতস্ততঃ ॥

পূজা সেরে মন্দিরের পেছন দিকে পাহাড়ের উঁচু দিকটায় গিয়ে বসলাম, সেখান থেকে শালগাছ থাকে থাকে উপরে উঠে গেছে। একটু রোদ দেখে বসে রইলাম। বেলা এগারটা থেকে মন্দিরে ভক্ত সমাগম শুরু হয়ে গেল। কেউ দুধ, কেউ ফুল, ফল নিয়ে মহাদেবের মাথায় ভক্তিসহকারে নিবেদন করে গেল। বেলা একটা নাগাদ মন্দির ফাঁকা দেখে নেমে এলাম। বেলা তিনটা নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে একটা সেগুন বনে এসে বসলাম। দেখলাম ঐ বনে অনেক ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মনোহরা দৃশ্য কিছুক্ষণ বসে দেখতে দেখতে হঠাৎ অনুভব করলাম, মনটা অবসাদে, একটা অদ্ভুত বিষাদে ভরে গেছে।

এই অবসাদের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। ভাবলাম এই বিরান অরণ্যে একা আছি বলেই হয়ত মনের এই ভাবান্তর। আমি সেগুন বন থেকে মন্দিরে ফিরে এলাম। ভক্তরা পরিক্রমাবাসীর জন্য দুধ, ফল রেখে গেছে। দুধ, ফল মহাদেবকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলাম। পূর্ণিমার রাত্রি কাটল, জপ্ সেরে মধ্যরাত্রে বাইরে এসে একবার নর্মদার দিকে, একবার পাহাড়ের দিকে তাকালাম। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রিতে অমল ধবল জ্যোৎস্না বিধৌত এই কল্হোড়ী তীর্থ যেন কোন সূক্ষ্মলোকের স্তর - এ যেন আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর কোন ভূ-ভাগ নয়, একটা অপার্থিব রাজ্যে আমি পৌঁছে গেছি। চেতনা এলে দেখলাম, দুজন লোক মন্দির থেকে আমার কুশাসন এনে তাতে শুইয়ে দিয়েছে, কাঠের আগুনে আমার হাত পা সেঁকছে। সকাল হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।

- আপ্ মন্দরকা বাহারমে ক্যায়সে আ গয়া। কোঈ প্রেত বগেরা দেখা হৈ ?

- নেহি জী, শিউজীকা মন্দিরমেঁ প্রেত ক্যায়সে আয়েগা !

- আ সকতে হৈ, কেঁওকি ভূতপ্রেত তো ভূতনাথকা অগলবগলমেঁ রইবে করেগা।

আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, প্রচণ্ড শীতে অস্থির হয়ে এইখানে এসে কাঠ জ্বালাতে চেষ্টা করেছিলাম, ঠাণ্ডার চোটে হয়ত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কিছু হয় নি। তবিয়ৎ আচ্ছাই হ্যায়।

মনে পড়ল প্রেমিক সাধু সূর্যনারায়ণজীর কথা। নর্মদার সর্বত্র ঐ রকম দরদী সাথী কোথায় পাবো, যে কোথাও হতে যেকোন ভাবে হোক একটা ভাঙা কড়াই এনে মন্দিরের মধ্যেই আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছুক্ষণ পরে লোকদুটি চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাটে স্নান করে এলাম। শিবলিঙ্গে শুধু জল ঢেলে পূজা করছি, এমন সময়ে এক বুড়িমা কিছু ফুল এবং একলোটা দুধ নিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকলেন। তাঁর ভাষা কিছু বুঝতে পারলাম না, আকারে-ইঙ্গিতে তিনি ফুলগুলো শিবের মাথায় চড়াতে বলছেন। দুধের লোটা নিয়ে তিনি মন্দিরের দ্বারে বসে রইলেন। দুধের লোটা যখন শিবের কাছে রাখলেন না, তখন তা শিবের মাথায় ঢালবার জন্য চেয়ে নেবার কথা চিন্তা করাও অবান্তর। ফুল চড়িয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বুড়িমা বললেন -

পিয়ো। ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ) হুঁ।

দুধ খেতে গিয়ে দেখি গরম দুধ। সমস্ত দুধটা পান করিয়ে লোটা নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর কথা থেকে অনুমানে বুঝলাম কাছেই জঙ্গলের মধ্যে কোন পল্লীতে তিনি থাকেন। আজও বেলা দুটো নাগাদ বেরিয়ে একটা শালবনে গিয়ে বসলাম। দূরে জঙ্গলের দিকে একটা চিতল হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। শালবনে অনেক্ষণ বসে থাকার পর নিজের মনে ভাবান্তর অনুভব করলাম। একটা অদ্ভুত উদাসীনতা এসে মনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠল বৈরাগ্যের ঝঙ্কার। মনের মধ্যে করুণ সুরে কেউ বলে চলেছে - 'সমাজ সংসার সব মিছে, মিছে এ জীবনের কলরব'। প্রকৃতির রাজ্যে এ কী ভাবের খেলা! এর পরেও আমি বিভিন্নস্থানে শালবনে বৈরাগ্যের ঝঙ্কার এবং সেগুন বনে বসলে বিষাদের সুর স্পষ্টতঃ বহুবার অনুভব করেছি। বন্য-প্রকৃতিতে এই ভিন্ন প্রকার আমার বহু পরীক্ষিত সত্য। যে কেউ শুধু শাল বা শুধু সেগুন বনে গিয়ে এটি উপলব্ধি করে আসতে পারেন।

তৃতীয় দিনে অর্থাৎ কৃষ্ণ - তৃতীয়াতে পূজা করে উঠে দেখি, প্রথম দিনে যে লোকটি টর্চ টিপে আমাদেরকে মন্দিরে আসতে সাহায্য করেছিল, সে আমাকে শিবের একটি প্রসাদী ফুল দিতে অনুরোধ করল। তার ছেলেটি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, তিন-চারবার অজ্ঞানও হয়ে গেছে। বৈদ্যের 'দাবাবুটি' নিয়মিত চলছে, কিন্তু কোন উপকার হচ্ছেনা। আমি শিবের মাথা থেকে ফুল এনে তার হাতে দিলাম।

পরদিন ত্রিরাত্র - বিধানের ব্রত শেষ করে বসে আছি, দেখলাম সেই লোকটি আরও চার-পাঁচজন স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'ল। শিবের প্রসাদী ফুলে তার ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। তার সঙ্গের লোকজনও আমার কাছে নানা ব্যাধির ঔষধ চাইতে এসেছে। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, বৈদ্যের ঔষধেই কাজ হয়েছে, কাকতালীয়বৎ শিবের প্রসাদী ফুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেছ বলে ভেবোনা যে আমার হাতের কোন গুণ আছে। আমি একজন পরিব্রাজক মাত্র, আমার কোন সাধনভজনও নেই, কোন কেরামতিও নেই। যদি কিছু হয়ে থাকে তবে কল্হোড়ীনাথ মহাদেবের গুণেই হয়েছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। তাদের কাকুতি মিনতিতে বাধ্য হয়েই সকলের হাতে শিবের ফুল দিয়ে বিদায় দিলাম। তারা অনেক ফল, দুধ, খোয়া প্রভৃতি এনেছিল, সব দুধ ফল মিষ্টি শিবের মাথায় দিয়ে, তা কল্হোড়ীনাথকে উৎসর্গ করে প্রসাদ হিসেবে সকলকেই নিঃশেষে বিলিয়ে দিলাম, নিজের খাবার জন্য ফল মিষ্টি রাখতে অনেক অনুরোধ করেছিল তারা, কিন্তু আমি মনে মনে বিচার করে নিলাম, তারা রোগমুক্তি কামনায় ঐসব বস্তু এনেছে। কামনা-মাখানো বস্তু অশুদ্ধ। নিষ্কামভাবে স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নভোগেই পরিক্রমাবাসীর ব্রত হওয়া উচিত। এটাই শাস্ত্রের নিয়ম।

ঝুলি হতে সাগু বের করে কিসমিস দিয়ে ভিজিয়ে তাই খেয়ে খিদে মেটালাম। মনে মনে ভাবলাম, এইবার এখান হতে চলে যাবার সময় হয়েছে। নতুবা বিড়ম্বনা বাড়বে। পরদিন সকালেই ঝুলি-কম্বল নিয়ে রওনা হলাম নর্মদাতীরের পথ ধরে। চেতন ব্রহ্মচারীর কাছে আগেই শুনেছি এখান থেকে বার মাইল দূরে পড়বে রৈকপন মহল্লা।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি, নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে। পাহাড়ী পথে এখন হাঁটা অনেকখানি আমার রপ্ত হয়েছে, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। এই রাস্তার দুপাশেই লজ্জাবতী লতার মত একরকম ছোট ছোট লতা, কাঁটায় ভর্তি, পথকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। লোকজন যারা চলাফেরা করে তাদের পায়ের নাগরা জুতোর চাপে যেখানে যেখানে একটু পিষ্ট হয়ে গেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে সেখানে পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম, কোথাও বা হাতের লাঠি দিয়ে সাবধানে লতাগুলি সরিয়ে এগোতে লাগলাম।

মনে জাগল - এই যে এভাবে হাঁটার সুবিধার জন্য লতাগাছ নষ্ট করছি, এই বুঝি পাহাড় থেকে নেমে এসে কোন ঋষি ধমক দিয়ে বলবেন -

অন্তসংজ্ঞা ভবন্তি এতে সুখদুঃখ সমন্বিতা

- যুবক! এইভাবে লতাগুলিকে দলে পিষে ফেলোনা। এদের মধ্যেও চেতনা আছে, এদেরও মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর মত সুতীব্র সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

এইভাবে প্রায় চারঘন্টা সময় লাগল দুই মাইল রাস্তা হাঁটতে। একে হাঁটা বলে না, এর নাম লাফিয়ে লাফিয়ে খঞ্জ মানুষের মত কোনভাবে শামুকের গতিতে পথ চলা। যাইহোক, তারপরের পথ কাঁটালতা মুক্ত। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেলাম। পথের দুপাশেই নানাজাতীয় বড় বড় গাছ, অশ্বত্থ, শিরীষ, নিম, মহানিম ছাড়াও শাল ও সেগুন গাছ প্রচুর। প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পরেই আবার মানুষজনের বসতিসহ শস্যপূর্ণ উপত্যকায় পড়লাম। সূর্যের আলো দেখে অনুমান করলাম, দুপুর প্রায় পেরিয়ে গেছে। তারই মধ্যে একটা পরিস্কার ঘাট দেখে স্নান করতে নামলাম। পথে আসতে আসতে পাহাড়ের অনেক উপরে দুটি শিবমন্দির চোখে পড়েছিল, কিন্তু এই ঘাটের উপরে ত কোন শিবমন্দির নেই। আজ কি তাহলে স্নানের পর শিবপূজা ভাগ্যে ঘটল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শিব তো কেবল একটি লিঙ্গমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ নেই, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, চিত্ত এই অষ্টপ্রকৃতিই তো তাঁর অবয়ব। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত নর্মদার জলে নর্মদা ও নর্মদেশ্বরের পূজা করলাম।

বহুদূর হতে চোখে পড়ল বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী হেঁটে আসছেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম -

- রৈকপন মহল্লা আর কত দূরে?

তিনি উত্তর দিলেন - আমো গুরুস্কুঁ সাপ কামড়িছি, দেখিবাকু যিব।

সন্ন্যাসীকে 'নমো নরায়ণায়' বলে অভিবাদন ও দণ্ডবৎ জানাতে হয়, তাই তাঁকে যুক্ত করে বললাম -

- নমো নারায়ণায়!

তিনি উত্তর দিলেন -

সবু শিবঙ্ক দয়া, সে রাখি পারন্তি মারি পারন্তি।

বদ্ধকালার সাথে বাক্যালাপ বৃথা, তাঁকে অতিক্রম করে হাঁটতে লাগলাম। তাঁর ভাষা শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ওড়িশার নিবাসী ছিলেন। সুদূর ওড়িশায় জন্মগ্রহণ করলেও সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়ত গুরুর প্রভাবে মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলে নর্মদাতটে তপস্যা করতে এসেছেন।

অনেকটা পথ হাঁটবার পর ছয়জন লোককে একসঙ্গে আসতে দেখলাম। তাঁদের বেশভূষা দেখে বুঝলাম, বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁদেরকে রৈকপণ মহল্লা কতদূরে জিজ্ঞাসা করতে একজন বেশ চোস্ত হিন্দীতে জবাব দিলেন - রৈকপন মহল্লার মধ্যেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ দূরে যে শিব-মন্দির জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পারছেন, ঐটিই জানশ্রুতির মন্দির। কিন্তু ওখানে আপনি তো থাকতে পারবেন না, বেলা পাঁচটা বাজার পর কোন লোকই ঐখান দিয়ে হাঁটে না, পরিক্রমাবাসীরাও ওখানে কোনদিন রাত কাটায়নি।

- 'কেন? ওখানে কি বাঘ ভালুকের ভয়?'

- 'না, ওখানে পিশাচ আছে, ভূতের উপদ্রব খুব বেশী। পা চালিয়ে দ্রুত হেঁটে যান, মাইলখানেক দূরেই মহল্লা আছে, সেখানেই রাত্রিবাস করা ভাল'।

আমি বললাম, কাঁটালতায় পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ভূতনাথের দর্শন তো পেলাম না। অন্ততঃ ভূতকেই চোখে দেখি। আমার তপস্যার অভাবে দেবতা যদি দর্শন না দিতে চান, অপদেবতার দর্শনই বা মন্দ কি! আমি ঐ মন্দিরেই থাকব।

লোকগুলি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তাদেরকে অতিক্রম করে মন্দিরে চলে এলাম। বেলা তখন বোধহয় তিনটা হবে। মন্দিরের চত্বরে দেখলাম দুজন লোক বসে আছে। মন্দিরের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কর্পূর জ্বেলে আরতি করছেন। আরতির শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম -

- আমি পরিক্রমাবাসী, পায়ে কাঁটা ফুটে পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আমি এখানেই রাত্রে থাকতে চাই, আপনার কোন আপত্তি নেই ত ?

আমার কথা শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন। বললেন - এ কাজ আপনি কদাচ করবেন না। দেখছেন না, সন্ধ্যার আগেই আমি সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাচ্ছি। একা আসিনি, সঙ্গে আমার ছেলে এবং ভাইপো এসেছে। আমরা সাজোত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, গুজরাতের আদি বাসিন্দা। পুরুষানুক্রমে আমরা এই মন্দিরের সেবাইত। মহাভারতে আছে, জানশ্রুতি রাজা এই রৈকপন শিবের প্রতিষ্ঠাতা, শিবের বহু সম্পত্তি আছে। সকাল আটটায় পূজা করতে আসি, বেলা তিনটা নাগাদ সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাই। দুবেলাই লোক সঙ্গে নিয়ে আসি। তার চেয়ে বরং আপনি আমার বাড়িতে চলুন, সেখনেই রাত্রিবাস করবেন।

আমি বললাম - আপনি যে কথা বলছেন তা আমি রাস্তাতেই শুনে এসেছি। আজ আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমি এখানেই থাকব। কিছু চিন্তা করবেন না, সকালে এসে আমাকে জীবিতই দেখবেন।

আমার দৃঢ় সংকল্প দেখে প্রদীপে রেড়ির তেল ভর্তি করে দিলেন। তাঁর ছেলেকে বললেন, শিবের সামনে যে প্রশস্ত হোমকুণ্ড, তাতে কিছু কাঠ দিতে। খুব উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি চলে গেলেন।

নর্মদাতে হাত পা ধুয়ে এসে আমি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বিছানা পাতলাম। পৌষমাস শেষ হয়ে আসছে, হয়ত দু এক দিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। কমণ্ডলুর মধ্যে সাগুদানা ও মিছরী ভেজানো ছিল, তাই খেয়ে নর্মদা থেকে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে এলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেল। মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে হোমকুণ্ডের পাশে বসে শিবের স্তোত্র পাঠ করে বিছানায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হাতের কাছে টর্চ রাখলাম। কর্পূরের গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর এখনও সুরভিত।

মহাভারতে কোথায় রাজা জানশ্রুতির কথা আছে, তা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। মনে পর্বের পর পর্ব স্মরণ করতে লাগলাম, কিছুতেই স্মরণে এলনা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ - ঘুম ভেঙে গেল, বাইরে থেকে দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। উঠে বসলাম, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে মনে স্থির করলাম, শক্ত আবলুস কাঠের দরজা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত আমি দরজা খুলবো না। কেউ যেন দরজার বাইরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি বাবাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে থাকলাম। উপরে পাহাড়ের মধ্য থেকে একটা বিকট 'গুমগুম' শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের পাশ দিয়েই যেন একটা বড় পাথর গড়িয়ে নর্মদার জলে গিয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে, কেউ যেন নর্মদার ঘাটে স্নান করে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, মন্ত্রের ভাষা বুঝছি না, কিন্তু মন্ত্রের গুরুগম্ভীর ধ্বনি কানে যেন মৃদঙ্গের বোল তুলছে। গলা শুকিয়ে গেছে, উঠে যে জল খাবো, এতটুকু মনের শক্তিও অবশিষ্ট নেই। ভয়ে কাঁটা হয়ে পড়ে রইলাম।

কোনমতে সকাল হ'ল, দরজা খুলে ঘোর কুয়াশার মধ্যে মন্দিরের চারপাশটা একবার দেখে এলাম, পাথর গড়িয়ে পড়ার কোন দাগ কোথাও দেখতে পেলাম না। মন্দিরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে জানশ্রুতির কথা কোথায় পড়েছি ভাবতে লাগলাম। মহাভারতে নেই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, অথচ নামটা খুব চেনা ঠেকছে।

ক্রমশঃ কুয়াশা কাটতে লাগল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি, মন্দিরে চারজন লো দাঁড়িয়ে আছে, কালকের সেই পুরোহিত মহাশয় দরজা ধীরে ধীরে ঠেলে উঁকি মেরে দেখছেন, আমি ভেতরে আছি কিনা। পেছন দিক থেকে আমি সাড়া দিলাম – আভি তক্ হম্ জিন্দা হ্যায়।

চমকে উঠে পেছন দিকে তাকালেন। আমি ঘাটের দিক থেকে আসছি দেখে সে কি আনন্দ তাঁর। বললেন যে, তাঁরা এই স্থানকে বড় ভয় করেন, এর আগে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে, তাঁর বাবার আমলে তিনজন সাধু এই মন্দিরে বাস করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর পিতামহের আমলেও এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, এখানে গভীর রাতে কিছু বিভীষিকাময় কাণ্ড ঘটে, সেজন্য পরিক্রমাবাসীরাও এ মন্দির এড়িয়ে চলেন। আমি আজও এখানে থাকব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম – আমার পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি, এজন্য দু-চারদিন এখানে নিশ্চয়ই থাকব। আপনারা কিছু ভাবনা করবেন না।

তিনি বললেন - আপনি থাকতে পারলে আমাদের কিছু বলার নেই। রৈকপনেশ্বর মহাদেব আপনাকে রক্ষা করুন। আমি পূর্বেই বলেছি, এই ঠাকুরের বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, পরিক্রমাবাসীদের সেবার জন্যও আমরা জমির উপসত্ত্ব ভোগ করি, কিন্তু ভয়ে কোন পরিক্রমাকারী বা কোন জমায়েৎ এখানে রাত্রিবাস করেন না। কাজেই আমরা সেবা করার কোন সুযোগও পাইনা। আপনি আনন্দে যতদিন ইচ্ছা থাকুন, আমিই এই অঞ্চলের মুখিয়া, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আপনার সেবার উপযোগী রুটি চাপাতি, ফল, দুধ পৌঁছে দেব, ভাববেন না যে, আপনি কোন গৃহীর সেবা গ্রহণ করছেন, এই ভোগ রৈকপনেশ্বরজীর সম্পত্তি থেকেই আসবে জানবেন।

পূজা করে তিনি সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা বোধহয় একটা নাগাদ পুরোহিত মহাশয় একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আমার জন্য চাপাতি, ডাল, ফল, দুধ নিয়ে এলেন। সঙ্গের লোকটির হাতে একটি টাঙি, তাকে তিনি বললেন কাছের জঙ্গল থেকে কাঠ এনে রাতের আগুনের জন্য ব্যবস্থা রাখতে। শুধু সেইদিনই নয়, আমি যে কয়দিন ছিলাম, প্রত্যেক দিনই তিনি আমার জন্য খাবার আনতেন, গোটা রাত্রি প্রদীপ জ্বালাবার উপযোগী রেড়ির তেল এবং তুলার তৈরী সলতে এনে মন্দিরে রেখে যেতেন।

দ্বিতীয় দিন রাত্রেও পাহাড় থেকে আসা 'গুমগুম' শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দুড়্ দুড়্ দড়াম্ শব্দে একটা পাথর আগের রাত্রির মত গড়িয়ে এসে ছলাৎ করে নর্মদার জলে পড়ল, একটু পরেই আবার প্রথম রাত্রির মত দরজায় শব্দ হ'ল - ঠক্ ঠক্ ঠক্। কেউ যেন হেঁটে ঘাটের দিকে চলে গেল। 'কোন হিংস্র শ্বাপদ-বাঘ বা বুনো মহিষও তো হতে পারে'

-এই ভেবে দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম - সেই আগের মতনই গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি, যেন তালে তালে বোল উঠছে - ডমড্ ডমড্ ডমড্। সেই মন্ত্রের ব্যঞ্জনায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল আমার শিরা-ধমনীতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নতজানু হয়ে রৈকপনেশ্বরের কাছে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলাম -

জটাটবি-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে, গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্ ডমন্নিনাদ-বড্ ডর্মবয়ং, চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নমঃ শিবঃ শিবম্ ॥

(রাবণকৃত শিবতাণ্ডব)

হে প্রভু শিবসুন্দর! তোমার জটার অরণ্য হতে গঙ্গার ধারা গলগল করে বেয়ে এসে তোমার গলদেশকে প্লাবিত করেছে, সেই গলদেশ আবার সর্পমালায় বিভূষিত, তুমিই একবার ডমরু বাজিয়ে ডমড্ ডমড্ ধ্বনি তুলে তাণ্ডব-নৃত্যে ত্রিভুবনকে কম্পমান করেছিলে, তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী - বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ ধগদ্ ধগদজ্জ্বল-ললাটপট্টপাবকে কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥
(রাবণকৃত শিবতাণ্ডব)

জটারূপ কটাহ্ হতে বেগে বহমান গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গমালায় যাঁর মস্তক শোভিত এবং যাঁর ললাটে ধগদ্ ধগদ্ শব্দে অগ্নি দেদিপ্যমান, সেই তুমি কিশোর চন্দ্রশেখর! তোমার চরণকমলে আমার প্রতিক্ষণ রতি হোক।

নতজানু হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজার বাইরে লোকের কোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। বললাম - ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই দরজা খুলতে দেরী হয়ে গেল।

- কোঈ বাত নেহি। ডর নাহি লাগা ত ? আট বাজ গিয়া।

- বিলকুল নেহিজী।

বিছানা গুটিয়ে আমি স্নান করতে গেলাম। পুরোহিত মহাশয় পূজা করতে ঢুকলেন। আজ তাঁর সঙ্গে ছয়জন লোক, সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা মাতাজীও এসেছেন। তাঁরা সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন আমি অন্য গ্রহের মানুষ, পথ ভুলে তাঁদের দেশে এসে পৌঁচেছি। বাক্যালাপ করা বৃথা, তাঁদের ঠেট্ হিন্দী আমার বোধগম্য হবে না। পুরোহিত মহাশয় কিছুটা সংস্কৃত জানেন, চোস্ত হিন্দীতে কথা বলতে পারেন। তাঁরই সঙ্গে কোনমতে কথাবার্তা বলতে পারি। পূজার পর তিনি তাঁর মা-কে দেখিয়ে বললেন - মায়ের খুব ইচ্ছা আপনি যদি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। দুপুরবেলা যখন 'রোটি' দিতে আসব, তখন যদি আমার সঙ্গে যান, তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব।

আমি বললাম - আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবেনা। একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনাদের সঙ্গেই যাবো। ঐখানেই খেয়ে আসবো।

পূজাপাঠ সেরে আমি তাঁদের সঙ্গেই গেলাম। পুরোহিত মহাশয় -এর পাথরের দোতলা বাড়ী। গম, বাজরা, অড়হর, ছোলা প্রভৃতির কতকগুলি মরাই এবং বহু গরু বাছুর এবং মহিষ দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি এই পাহাড়ী অঞ্চলের এক অবস্থাপন্ন গৃহস্ত। একটি ছোট শিবমন্দিরও আছে। শিবমন্দিরেই আমাকে বসতে দিলেন। একটা আটচালাতে তাঁর গোমস্তা বসে কতকগুলো খতিয়ান ও নক্সা উল্টে পাল্টে দেখছেন।

খুব সমাদর করে তাঁরা আমাকে চাপাতি, অড়হর ডাল এবং একবাটি দুধের সর এনে দিলেন, আমি যতক্ষণ খেলাম, কাউকে সেদিকে আসতে দিলেন না। কিন্তু খাবার পরেই তাঁর মহল্লার বহুলোক এসে ভীড় করল। কথাবার্তায় বুঝলাম, তাদের মধ্যে এ কথাটা রটে গেছে যে আমি শিবমন্দিরে যখন নিরাপদে রাত কাটাতে পেরেছি, তাহলে হতে পারে আমি নিজেই পিশাচসিদ্ধ আর নয়ত আমি কোন বড় সাধক। নানারকম রোগের 'দাবাবুটি' সবাই জেনে নিতে চায়, বিশেষ করে তাদের বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে যাতে আশির্বাদ করি, সকলেই এই বায়না ধরল। আমি অনেক কষ্টে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরিত্রাণ পেলাম।

পুরোহিত মহাশয় তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে মন্দিরে এলেন, বেলা তিনটাতে সন্ধ্যারতি সেরে ফেলবার জন্য।

আজ তৃতীয় দিন। সন্ধ্যার পর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বসে আছি। প্রদীপ জ্বলছে, হোমকুণ্ডের আগুনে পর্যাপ্ত কাঠ দেয়া আছে। চুপ করে ভাবতে ভাবতে রৈক্কপন ও জানশ্রুতির রহস্য মনে পড়ল। পুরোহিত মহাশয় বলেছিলেন, মহাভারতে জানশ্রুতির কথা আছে, তাই মহাভারতের মহারণ্যে জানশ্রুতিকে খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এখন মনে পড়ল, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে জানশ্রুতি ও মহর্ষি রৈক্ক-এর কথা আছে। মহর্ষি রৈক্ক দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে তিনি একটা গরুর গাড়ীর তলায় শুয়ে থাকতেন জঙ্গলের মধ্যে। তাঁর ব্রহ্মতেজের উর্জস্বল দীপ্তির প্রভাবে বনের পাখীরা এমন কি স্বয়ং দেবতারাও পুড়ে মরবার ভয়ে তাঁকে লঙ্ঘন করতে সাহস করত না।

রাজা জানশ্রুতি তাঁর সংবাদ জানতে পেরে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার আকাঙ্খায় তাঁকে গিয়ে বলে - ঋষি! আমি আপনার জন্য ছয়শত গাভী, এই কণ্ঠহার এবং একটি অশ্বতরীবাহিত রথ এনেছি, হে ভগবন, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন তাঁর সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিন -

এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাসস্ ইতি।

আমাদের প্রাচীন ভারতের এই ধারা ছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হলে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত নিয়ে দীর্ঘকাল গুরুর সেবা বা পরিচর্যা করতে হয় নতুবা বিপুল অর্থসম্পত্তি বা গোধন দান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে হয়। সেবা দান ও দক্ষিণা দ্বারা তুষ্ট করতে পারলে তবেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চারিত করে দিতেন, আর তাতেই শিষ্যের ঘটতো মহাসচেতন সমুত্থান।

প্রৌঢ় বয়সে রাজা জানশ্রুতির পক্ষে গুরুগৃহে বাস করে গুরুর অক্লান্তভাবে সেবা পরিচর্যা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি দানের দ্বারা রৈক্ককে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহর্ষি রাজার এই দানকে যথেষ্ট বলে মনে করলেন না। তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন - হারেত্বা শূদ্র গোভিঃ সহ তব এব অস্তু ইতি। অর্থাৎ 'ওরে শূদ্র তোর এই হারের সহিত রথ-গোধন তোরই থাক্।'

সর্বস্ব দিয়েও যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাও মহাভাগ্যের কথা। রাজা জানশ্রুতি কেবল সল্প অর্থের বিনিময়ে দূর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে মহর্ষি তাঁকে 'শূদ্র' বলে ধিক্কার দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

প্রাচীন ভারতে ঋষিদের জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায়, তপঃসিদ্ধির অন্তে হয় তাঁরা আমৃত্যু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থেকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বিশ্বের মঙ্গলচিন্তা করতেন নতুবা গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করে দেশ, জাতি ও সমাজের মঙ্গলসাধনের ভার নিয়ে গৃহকেই ব্রহ্মাঙ্গনে পরিণত করার ব্রত নিতেন। রৈক্কও তপস্যা শেষে, গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করারই সংকল্প নিয়েছিলেন, কিন্তু জানশ্রুতি যে উপহার এনেছিলেন, তাতে তাঁর সারাজীবন সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকার সম্ভাবনা ছিলনা, তাই ঋষি তাঁর অপূর্ণ দান গ্রহণে আপত্তি জানিয়ে রাজাকে বিদায় দিলেন।

রাজা তখনকার মত চলে গেলেন বটে কিন্তু কিছুদিন পরে একহাজার ধেনু, বহুমূল্য সেই কণ্ঠহার, সেই অশ্বতরীবাহিত রথ এবং তাঁর প্রিয়তমা সুন্দরী কন্যাকে এনে মহর্ষির কাছে নিবেদন জানালেন - প্রভু! এই সমুদয় বস্তুসহ, এখন আপনি যে গ্রামে অধিষ্ঠিত আছেন, এই গ্রামও আপনাকে দান করলাম, আপনার নাম অনুসারেই এই গ্রামের নাম হবে রৈক্কপর্ণ। এখন আপনি দয়া করে আমায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন - মা ভগবঃ শাধীতি।

এক সুন্দরী যুবতী রাজকন্যা পিতার আত্মজ্ঞানলাভের সহায়তা করার জন্য পিতার আজ্ঞায় এক প্রৌঢ় ঋষিকে পতিরূপে বরণ করতে এসেছেন, এই দৃশ্য ঋষিকে মুগ্ধ করল। কন্যার পিতৃভক্তি এবং আত্মত্যাগ দেখে ঋষি এবারে রাজাকে আর বিমুখ করতে পারলেন না। তিনি ভেবে দেখলেন তপস্যার অন্তে তিনি গৃহী হবার ইচ্ছা করেও যথোপযুক্ত আশ্রয় ও সম্পদের অভাবে অতি কষ্টে গরুর গাড়ীর তলায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। রাজা জানশ্রুতি রৈক্কের অভাব বুঝেই ঋষিকে পত্নী দিলেন, বাসস্থান দিলেন, সুখে জীবন কাটানোর উপযোগী অর্থ-সম্পদও দিলেন। এককথায় রাজা তাঁর পার্থিব জগতের সব অভাবই দূর করলেন। জানশ্রুতির যে অন্তরের অভাব তা মেটানোর জন্য এইবার তাঁকে অপার্থিব জগতের সন্ধান দিয়ে রাজাকে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঋষি তৎপর হয়ে উঠলেন।

তিনি রাজাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন - দেখ রাজা! বায়ুর্বাব সম্বর্গো - বায়ুই সম্বর্গ। অগ্নি যখন নির্বাপিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন। সূর্য যখন অস্তগমন করেন তখন বায়ুতেই লীন হন, চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন। বায়ুই হচ্ছে মূল সঞ্চালন-শক্তি। প্রলয়কালে তেজোরূপী সূর্যাদি স্বীয় কারণবায়ুতে লীন হন, তাই বায়ুকে সম্বর্গ বলে জানবে। যখন জল বিশুদ্ধ হন, তখন বায়ুতে লীন হন, কারণ বায়ুই বাহ্য-জগতের সবকিছুকে আত্মসাৎ করেন - বায়ু হিঁ এব এত্যম্ সর্বান্ সংবৃঙক্তে।

ঋষি এইভাবে দেতাগণের মধ্যে সম্বর্গ-দর্শনের রহস্য ব্যাখ্যা করে অনন্তর শরীর মধ্যে সম্বর্গ-দর্শনের তত্ত্ব বলতে লাগলেন - দেখ রাজা! প্রাণই সম্বর্গ। জীব যখন নিদ্রা যায়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়, চক্ষু প্রাণে লীন হয়, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়, কারণ প্রাণই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করে। এই দুইটি তত্ত্বই অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রাণ - উভয়েই সম্বর্গগুণশালী -

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ চতুর্থ অধ্যায়)

রাজা জানশ্রুতি রৈক্কমুনির কাছে এই সম্বর্গবিদ্যা লাভ করে কৃতকৃত্য হলেন। তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। সম্বর্গ শব্দের অর্থ হল - সম্যক বর্গ অর্থাৎ সজাতীয় বস্তুকে সম্যকরূপে একশ্রেণীভুক্ত-করণ অর্থাৎ একীকরণ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সজাতীয় বস্তু, যেটুকু ভেদ আছে তা শুধু সজাতীয়ভেদ, একই গাছের বড়পাতা এবং ছোটপাতার মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় সজাতীয় ভেদ বলে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা - একই চিন্ময় বস্তু, পরমাত্মা সর্বব্যাপক, কিন্তু জীবভাবের আবরণ পড়ায় জীবাত্মা দেহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে। জীব ভাব খসে পড়লে আত্মা পরমাত্মার একীকরণ ঘটে।

সংস্কৃতে সমপূর্বক বৃজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করে সম্বর্গ পদ সিদ্ধ হয়। বৃজ ধাতুর অর্থ বর্জন বা ত্যাগ করা। যে অলৌকিক বিদ্যার সাহায্যে জীবাত্মা স্থূলাকাশ ত্যাগ করে সূক্ষ্মাকাশে, সূক্ষ্মাকাশ বর্জন করে কারণজগতে, ক্রমে কারণজগত ত্যাগ করে মহাকারণে লীন হয়, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সজাতীয় ভেদ রহিত পরমাত্মার সহিত একীকরণ পদ্ধতিই হল এই সম্বর্গবিদ্যা - ঔপনিষদিক যুগের ঋষিদের অতি প্রিয় গুহ্যতত্ত্ব।

জানশ্রুতি যে গ্রামে বসে রৈক্কের কাছে এই পরাবিদ্যা লাভ করেছিলেন, সেই গ্রামের নাম রৈক্কপর্ণ, চলতি ভাষার অপভ্রংশে এখন নাম হয়েছে রৈকপন।

মা নর্মদা আমাকে পথে সঙ্গীহীনভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে সম্বর্গবিদ্যার পীঠ এই রৈক্কপর্ণ তথা রৈকপন গ্রামে এনে তুলেছেন। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সকাল হয়ে গেছে, কাক কোকিলের প্রভাতী ডাক শুনতে পাচ্ছি। গোটা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে বসেই জানশ্রুতি ও রৈক্কের কথা ভাবতে ভাবতেই ভোর হয়ে গেল। রাত্রে সেই বিকট পাথর গড়িয়ে নর্মদায় পড়ার শব্দও শুনতে পাইনি। ঘুম হয়নি কিন্তু এজন্য শরীরে কোন অবসাদ নেই। মন্দিরের দরজা খুলে প্রভাত-সূর্যের উদয়রশ্মিকে প্রাণভরে প্রণাম ও অভ্যর্থনা জানালাম।

পুরোহিত এলেন পূজা করতে। আমি কিছু বলার আগে তিনি নিজেই বললেন - আজ আপনার মুখে চোখে খুব স্ফূর্তির ভাব দেখছি যে!

- তাহলে বুঝতেই পারছেন, কোন ভূত বা পিশাচ এসে আমার ঘাড় মটকিয়ে যায় নি! আপনি দয়া করে বলুন দেখি এখানে মহাবৃষদেশ নামে কোন মহল্লা আছে কি?

তিনি বললেন - মহাবৃষদেশ নামে কোন অঞ্চল নেই, তবে আমাদের এই পরগণার নাম মহাবিরিষপুর। এই রৈকপন মৌজা মহাবিরিষপুর তহশীলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমার 'কোঠিতে' নক্সা আছে, আপনাকে দেখাব।

আমি তাঁকে জানশ্রুতি ও রৈক্কমুণির বিবরণ, রৈক্কপর্ণ থেকে রৈকপন ও মহাবৃষদেশ থেকে মহাবিরিষপুর তহশীলের কিভাবে উদ্ভব হয়েছে তা সংক্ষেপে জানালাম। এখানে ভূত পিশাচ নেই, বরং সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ এই পুন্যভূমিতেই লাভ করেছিলেন মহাবৃষদেশ তথা বর্তমানের মহাবিরিষপুর তহশীলের রাজা জানশ্রুতি, রৈক্কমুনির কাছ হতে। মহর্ষি রৈক্ক এখানেই একটি গরুর গাড়ীর তলায় বাস করতেন, তাঁর নামানুসারেই রৈক্কপর্ণ হতে বর্তমানে নাম চালু হয়েছে রৈকপন। যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ সংগ্রহ করতে পারেন, আমি তবে বই খুলে সব দেখিয়ে দেব।

তিনি বললেন - এইস্থান থেকে দু-তিন মাইল দূরে একজন বড় পণ্ডিত থাকেন। তাঁর কাছে বেদ, উপনিষদ্ আছে। আপনি আরও দু-চার দিন এখানে থাকুন। আমি বইসহ পণ্ডিত এবং এখানকার লোকজনদের এখানে আনব। আপনি নিজমুখে সকলকে এই কথা বললে এই জংলী দেশের অনেক উপকার হবে। ভূতের ভয়ে বেলা তিনটের সময় সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাই। লোকও ভয়ে পূজা দিতে আসেনা। কেউ শিবের স্থানে ভেট পূজাও চড়ায় না।

আমি সানন্দে রাজী হলাম। তার পরদিনই বেলা তিনটা নাগাদ ছান্দোগ্য উপনিষদসহ সেই পণ্ডিতজী এবং আরও প্রায় শতাধিক লোককে মন্দিরে এনে হাজির করলেন পুরোহিত মহাশয়। আমি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ছান্দোগ্য উপনিষদের জানশ্রুতি ও রৈক্কমুনির উপাখ্যান ব্যাখ্যা করলাম। বললাম যে, মানুষের ভূত বিশ্বাস যত দৃঢ়, ভূতনাথের ওপর বিশ্বাস ততোটা দৃঢ় নয়। যদি কোথাও ভূত বা পিশাচ থাকে, ভূতনাথও সেখানে নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকেন। কারণ তিনি সর্বব্যাপী। ভূতনাথের ওপর ভরসা থাকলে

ভূতকে ভয় করার তো কোন হেতু নেই। আমি পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করলাম জানশ্রুতি ও রৈক্ক সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতির বিবরণ সবাইকে পড়ে শোনাতে। কিভাবে মহাবিরিষপুর ও রৈকপন মহল্লার উদ্ভব হয়েছে তাও সবাইকে জানাতে বললাম। আমি যে রাতের পর রাত নিরুপদ্রবে একাকী নির্জন মন্দিরে কাটাতে পারলাম, তাতেই প্রমানিত হয় যে রৈক্কপনেশ্বরজীর মন্দিরে পিশাচের কোন ভয় নেই। অন্ধ কুসংস্কার হতেই ভূত-প্রেতের ভয় মানুষের মনে বাসা বাঁধে। বনের ভূত এসে মানুষের ঘাড় মটকায় না, তার মনের ভূতই ঘাড় ভাঙ্গে।

সেদিন থেকেই লক্ষ্য করলাম যে ধীরে ধীরে কিছু ভক্ত রৈকপনেশ্বর মন্দিরে আসা যাওয়া করছে, শিবের কাছে ভেট-পূজাও দিচ্ছে।

সম্বর্গবিদ্যার পূণ্যপীঠে আজ সপ্তম দিন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বসে বসে ভাবছি, এখানে প্রথম দুদিন যেসব অলৌকিক কাণ্ড রাত্রে নিজের কানে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় শুনেছি, সেই দরজার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ, গুম্ গুম্ দুড়দাড় শব্দ, জলে পাথর গড়িয়ে পড়ার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, সে কি ভৌতিক ব্যাপার, সত্যিই কোন রুদ্রপিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্যের কাণ্ডকারখানা, নাকি সবটাই স্বপ্ন! স্বপ্ন কি করে হবে! আমিতো জেগেই ছিলাম। আর যদি সত্যিই সেইরকম কিছু হয়, তবে এই কয়দিন আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন ? গভীর রাত্রে নর্মদার ঘাটে যে মন্ত্রধ্বনি শুনলাম সেও কি মিথ্যা!

নিজের মনে বিচার করতে লাগলাম। আমার জীবনটা কি! জন্মেছি পল্লীগ্রামে। বাবা বলতেন, গ্রাম মাত্রেই-ভূতের রাজধানী, কারণ সেখানে জ্ঞান চর্চার অভাবের ফলে মানুষের মনে নানা কুসংস্কার বাসা বাধে।

যে কোন পল্লীগ্রামে গেলে সেখানে শ্মশান কেন্দ্রিক মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, দিদিমাদের ঝুলিতে নানা ধরণের ভূতপ্রেত, ব্রহ্মদৈত্যি আর শাঁকচুন্নিদের নানা বীভৎস লীলা খেলার বিবরণ জমা আছে। সেইসব গল্প শিশুকাল থেকেই শুনে শুনে সকলেরই মনে ভূত সম্বন্ধে ভীতি জাগা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। ভূত হয়ত নিজের চোখে কেউ দেখেননি, কিন্তু যাঁরা ভূতের গল্প বলেন, তাঁরা এমনভাবে বলেন যেন নিজের চোখে দেখেছেন। শাঁকচুন্নী এসে চক্রবর্তী বাড়ীর বামুন মার কাছে রোজই খাবার চায়, নাপিত বৌ রাত্রে দেখেছে লালপেড়ে কাপড় পড়ে কেউ যেন ছাদের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভট্টাচার্যি বাড়ীর অশ্বত্থগাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকেন, তিনি রোজ রাত্রে গাছ থেকে নেমে নদীর ঘাটে স্নান করতে যান, ঠাকুরমা নিজের কানে তার পায়ের খড়মের শব্দ শুনেছেন। দাদামশাই তামাক টানতে টানতে আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন, একদিন মামাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাজারচণ্ডী গ্রাম থেকে আসছিলেন, মামার বয়স তখন খুবই কম, সবেমাত্র তাঁর উপনয়ন হয়েছে, সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে চারিদিক ঝকমক করছে, হঠাৎ কংসাবতী নদীর বাঁধের উপর জোড়া বট গাছের তলায় কেউ বলে উঠলেন -

- ক্ষণং তিষ্ঠ, উপবীতং প্রদীয়তাম্।

দাদামশাই স্পষ্ট দেখলেন, দীর্ঘাকৃতি কোন জটাজুট মহাপুরুষ একটা পৈতা নেবার জন্য তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভয়ে পিতাপুত্র দুজনেই বাঁধের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। গ্রামের লোক তাঁদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আমাদের গ্রাম কালিয়াড়া থেকে তিনমাইল দূরে ধর্মপুর গ্রামে আমাদের ছোটমাসীর বাড়ী। এই ছোটমাসী আমাকে খুব ভালবাসতেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারত তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। ছোটবেলায় আমি প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে থাকতাম, তাঁর মুখে শুনে শুনেই রামায়ণ - মহাভারতের সমস্ত গল্প আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে শুনেছি - তাঁদের গ্রামে ভূএগ্যাদের বাড়ীর কাছে যে একটা বিরাট নিমগাছ আছে, সেই নিমগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করেন, তিনি প্রতিদিন গভীর রাত্রে নদীতে স্নান করেন। স্নান করার সময় তিনি যে মন্ত্রপাঠ করতেন, তা গ্রামের বহুলোক শুনেছেন। সেই নিমগাছ আমি দেখেছি, দিনের বেলা ঐ নিমগাছের কাছ দিয়ে যাবার সময় সবাই যুক্তকরে ঐ নিমগাছের ব্রহ্মদৈত্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেন, সন্ধ্যাবেলা ঐ রাস্তা দিয়ে জনপ্রাণীও হাঁটত না।

এইরকম পটভূমিকায় গ্রাম্য পরিবেশে আমার বাল্যকাল কেটেছে। কলেজে পড়ার সময় নৈহাটিতে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। একদিন তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যার সময় তাদের গ্রামের শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখলাম, একটা গাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরেই আঁ-আঁ-আঁ-শব্দ করতে করতে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই সে চোখ উল্টে গোঁ গোঁওও করতে লাগল। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে অনেক কষ্টে তাকে সুস্থ করা হল।
আমার চিৎকারে গ্রামের দু-চারজন লোক দৌড়ে এল, তাদের সাহায্যে তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। পরদিন সে জানালো যে তাদের গ্রামের একটি স্ত্রীলোক শ্মশানের ধারে ঐ গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুটি স্পষ্ট দেখেছিল- গাছের ডালে মেয়েটি তার গলায় দড়ি ঝুলছে, জিভ আর চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বন্ধুর মনে ভূত সংস্কার ছিল, কয়েকবছর আগে সে ঐ আত্মহত্যার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় তার সেই মনের ভূতকেই গাছের ডালে আর একবার সে প্রত্যক্ষ করেছিল।

আমার বাবা জানতেন যে গ্রামে বুড়োবুড়িদের আড্ডায় ঐসব ভূতপ্রেতের গল্প হয়। আমার ছোটমাসী বা দাদামশাই এর ব্রহ্মদৈত্য কাহিনীও তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। যেখানে যা শুনতাম, আমি নিজেই তাঁর কাছে সব বর্ণনা করতাম। পাছে ভূতের ভয় আমার মনেও দানা বাঁধে, তা দূর করার জন্য বহুবার তিনি আমাকে গভীর রাত্রে গ্রামের 'সতীকুণ্ড মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষরাত্রে ফিরে আসতেন।

তাঁর চেষ্টার ফলে আমার মনে ভূতের ভয় ছিল না। কত দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনও ভূত দেখিনি, ভূতের ভয়ও মনে কখনও দেখা দেয়নি। তবে বাল্য-কৈশোরের সেইসব স্মৃতি মনের অবচেতন স্তরে কিছু প্রভাব ফেলেনি একথা জোর করে বলা যায় না। বাবার দেহান্তের পর তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে আমি নর্মদা পরিক্রমা করতে এসেছি। কল্হোড়ীনাথের মন্দির থেকে বিদায় নেবার কালে চেতন ব্রহ্মচারী সাবধান করে গিয়েছিলেন -

- 'রৈকপন মহল্লেমেঁ রাতমেঁ মৎ ঠারো, উধর পিশাচ হ্যায়'।

রৈকপন মন্দিরে বাধ্য হয়ে যখন রাত্রি কাটাবো স্থির করেছি, তখন চারজন পথচারী আমাকে সেখানে থাকতে বারণ করলেন, মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছি পুরোহিত মানা করলেন, বললেন- পিশাচের ভয় আছে, ইতিপূর্বে এখানে থাকতে গিয়ে দুবার পাঁচজন সাধু মারা গেছেন। পরিক্রমাবাসী সাধুরা এস্থান এড়িয়ে চলেন.. ইত্যাদি।

আমি তাঁদের কোন কথাই শুনলাম না, মন্দিরেই থাকলাম বটে কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতের কোলে নির্জন নিশুতি রাতে সম্পূর্ণ একা, যখন পথশ্রমে দেহ মন ক্লান্ত, বাবার দেহান্তের পর মনের মধ্যে একটা আর্তিভাবও সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীকে বিহ্বল ও জর্জ্জরিত করে রেখেছে, ফলে অনুকূল স্থান কাল ও পরিবেশ পাওয়ায় আমার অবচেতন এবং মগ্ন চেতনার স্তরে সেইসব বাল্যকৈশোরের সুপ্ত স্মৃতি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে বিলম্ব হয়নি। আমি শুনতে পেলাম - কেউ যেন টোকা দিচ্ছে, কেউ যেন অট্টহাসি হাসছে, গুমগুম শব্দে পাথর গড়িয়ে এসে নর্মদার জলে পড়ছে, আমার ছোট মাসীর কাছে নিমগাছের ব্রহ্মদৈত্যের মন্ত্রপাঠ যেন মূর্ত হয়ে নর্মদার ঘাটের মন্ত্রপাঠ শুনতে পেলাম। মনের অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা আছে। মনঃ শক্তির দ্বারা কি সম্ভব না হয়! মন তার অঘটন ঘটিয়সী ক্ষমতার বলেই যা আছে সেটা নস্যাৎ করতে পারে, যা নেই তাকে সৃষ্টি করে চোখের সামনে নাচাতে পারে। শুক্তিতে রজতভ্রম বা রজতে শুক্তিভ্রম - এই খেলা মনের দ্বারাই সম্ভব।

অধিকাংশ সাধকের জীবনেও মন এইভাবে, ঈশ্বরকেও দেখিয়ে দেয়। যাঁরা শিব, কালি, দূর্গা, তারামা, চতুর্ভুজ নারায়ণ বা দ্বিভুজমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি নিয়ে অহরহ ধ্যান মনন বা চিন্তা করেন, বিভিন্ন শিল্পীর মনঃকল্পিত সেইসব মূর্তি সাধকের Intense thinking এবং desire এর ফলে রূপ পরিগ্রহ করে দর্শন দেয়, কথা বলে, প্রত্যাদেশ দেয়। আমি যেমন অট্টহাসি বা মন্ত্রধ্বনি শুনেছিলাম সেইরকম ভাবে দেব-দেবীর দর্শন ঘটে। ফলে তাঁরা নিজেদেরকে সিদ্ধ ভাবেন, ভক্তরাও তাঁকে অবতার বানিয়ে ছাড়েন। এই সমস্ত অলৌকিক দর্শন যে মিথ্যা দর্শন, সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত তা একটু গভীরভাবে বিচার করলেই ধরা পড়ে। যখন দেখা যায় তাঁদের এইরকমের ঈশ্বর দর্শনের পরেও তাঁরা জ্ঞান বা চৈতন্যের দিক দিয়ে পূর্বেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি রয়ে গেছেন, তখন তাদের ঐসব দর্শন, শ্রবণ বা অনুভূতির মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক বা ফাঁকি আছে তা বোঝা যায়। কারণ দিব্যানুভূতির

গোড়ার কথা এই যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার পথে সাধকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে simultaneously ওতঃপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে তার ধীশক্তি পরিণত হবে প্রজ্ঞায়, প্রজ্ঞা ঋতম্ভরায়, ঋতম্ভরা পরিণত হবে বোধি সম্বোধী বা সম্বিদশক্তিতে, সম্বিদচেতনা পরিণতি লাভ করবে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীতে। জ্যোতিষ্মতী মধুমতী প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হলেই সাধক উদ্ভাসিত চৈতন্যশিখরে আরূঢ় হবেন।

থাক্ সে প্রসঙ্গ। রৈকপনেশ্বর শিব মন্দিরের ঘটনায় ফিরে আসি। আমি পরপর দুদিন রাত্রে সেই একই ঠকঠক আওয়াজ, অট্টহাসি এবং বেদ মন্ত্রপাঠের শব্দ শুনেছিলাম, কিন্তু তৃতীয় দিন হতে সপ্তম দিন পর্যন্ত আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিনা কেন! এর কারণ বিচার করে দেখলাম, তৃতীয় দিন সকালেই আমার মনে ছান্দোগ্য উপনিষদের জানশ্রুতি ও রৈক্কমুনির কথা স্মৃতিতে ভাসল। মহাবৃষদেশের সঙ্গে মহাবিরিষপুর তহশীল, রাজা জানশ্রুতি প্রদত্ত রৈক্কপর্ণ গ্রামের সঙ্গে রৈকপন মহল্লার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে রৈক্কমুনি এখানকার জঙ্গলেরই কোন স্থানে গাড়ীর তলায় বসে রাজা জানশ্রুতিকে সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন। সম্বর্গবিদ্যা, সে যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যার মতই বেদোক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা।

বাল্য-কৈশোরে দাদামশাই ও ছোট মাসী প্রভৃতির কাছে শোনা ব্রহ্মদৈত্য রুদ্রপিশাচাদির গল্পের স্মৃতি যেমন অবচেতন বা মগ্নচেতনার গভীরে লুকিয়ে ছিল, তেমনি বাবার চরণতলে বসে যে দীর্ঘকাল বেদ উপনিষদের পাঠ নিয়েছি, সেই অনুশীলিত বিদ্যার জোরে মন ও বুদ্ধির একটা স্তর পরিমার্জিত এবং আলোক ঝলমল হয়ে আছে। বেদের উপরে অবিচলিত নিষ্ঠার ফলে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় যে, যেখানে সম্বর্গবিদ্যার মত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয় বা সেই উপদিষ্ট বিদ্যার সাধনা হয়, সেই পবিত্র স্থানে ভূত-পিশাচের আবির্ভাব ঘটবে কি করে! চৈতন্যময় বিশুদ্ধ পরিমণ্ডলে দেবতাই প্রকট হন। এই ভাবনা দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন রাত্রেই মন ভৌতিক বস্তুর ইন্দ্রজাল দেখাতে পারল না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পুরোহিত মহাশয় এসে গেছেন সন্ধ্যারতি করতে। আমি তাঁকে বললাম - এখানে কয়েকদিন থাকা হয়ে গেল। আগামীকাল সকালেই ভাবছি আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়ব। তিনি বললেন - আপনি আমাদের পিশাচভীতি ভেঙে দিয়ে রৈকপনেশ্বরের মহিমা নূতনভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, আমরা আপনাকে ভুলব না। আমরা কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে ঠিক করেছি, আপনাকে কতকটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে আসব। কাল আমার ছেলে বা ভাইপো মহাদেবের পূজা করবে, আমরা সকাল সাতটা নাগাদ মন্দিরে এসে যাবো। সন্ধ্যারতি সেরে তিনি বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে দেখি প্রায় শতাধিক লোক এসেছেন বিদায় জানাতে। পুরোহিত মহাশয় এর বৃদ্ধা মাতাজীও এসেছেন। আমি তাঁদের অতিথিপরায়ণতা এবং ধর্মপ্রাণতার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে রৈকপনেশ্বরজীকে প্রণাম করে রওনা হলাম। আমার সঙ্গে চললেন পুরোহিত মহাশয় এবং আরও পাঁচজন।

পথ কঙ্করময় তবে মানুষ চলে চলে অনেকটা মসৃণ হয়েছে। আমি খালি পায়ে হাঁটলেও বিশেষ কষ্ট হচ্ছেনা। আমার সঙ্গীদের ত কোন অসুবিধাই নেই, তাদের পায়ে নাগরা জুতো। এখানকার লোকদের ব্যবহৃত নাগরা জুতার চাপে পথে যে দাগ পড়েছে, সাবধানে দাগে দাগে পা ফেলতে পারলে পরিক্রমা -বাসীদের কোন কষ্ট হয়না। নর্মদার এই উপত্যকা অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ বলে মনে হল। পাহাড়ের উপর দিকটা বনস্পতি সমাকীর্ণ হলেও উপত্যকার সমতলভাগ গম, বাজরা, অড়হর এবং আরও নানারকম শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। রাস্তার দুপাশে শাল, সেগুন, খয়ের, আমলকী, আম ও হরিতকী গাছ। মাঝে মাঝে পল্লী গড়ে উঠেছে। পাকাবাড়ী, কুড়েঘর, পাথরের ঘর সবই আছে। গৌড়, রাজপুত, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের বসতি।

প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাবার পর পুরোহিত মহাশয় বললেন - এইখানে জব্বলপুর জেলা শেষ হ'ল। একটা পাথরের মাইলপোস্টে হিন্দীতে লেখা আছে নরসিংহপুর জেলা। নর্মদার দক্ষিণতটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন - ওপারে সিনোর নামে একটা ছোট নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে, ঐখানকার মহল্লার নামও সিনোর, ঐখান থেকে নর্মদার দক্ষিণতটে নরসিংহপুর জেলা আরম্ভ হয়েছে। জেলার প্রধান শহর নরসিংহপুর। জব্বলপুর থেকে এই শহরে যাবার কোন রাস্তা নেই। কারণ জব্বলপুর নর্মদার উত্তরতীরে, নরসিংহপুর নর্মদার দক্ষিণে। রেলপথে যাওয়াই সুবিধা। ভিটোনি আর বিক্রমপুর ষ্টেশনের মাঝখানে রেলওয়ে সেতু আছে, সেই সেতু দিয়ে নর্মদার পারাপার। নরসিংহপুরের মাইল -দশ দূরে পরবর্তী ষ্টেশনের নাম করেলি। সেখান থেকে উত্তরমুখী রাস্তায় নয়-দশ মাইল হেঁটে গেলেই নর্মদাতীরে পাবেন পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণতীর্থ, পৌষ সংক্রান্তির দিনে এখানে নদীর চড়ায় বিরাট মেলা বসে, সারা ভারতের সাধুসন্ত গৃহীরা এসে জমায়েৎ হন। ব্রহ্মাণ হ'ল ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র। আপনি অবশ্যই যাবেন ওখানে। ওখানে ব্রহ্মাণ তীর্থের সব মন্দির ত দেখবেনই, তাছাড়া বিশেষ করে দেখবেন পিষাণহারীর মন্দির। আমরা প্রতি বছরই যাই। আমরা বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি, পিষাণহারীর মন্দিরে যা মানত্ করা হয় তাই সিদ্ধ হয়।

আমি বললাম - আমি পরিক্রমার শপথ নিয়েছি, আমার ত বিশেষ কোন কামনায় মানত্ করা নিষেধ। তাছাড়া আমার রেল, লরি, বাস, গাড়ী প্রভৃতিতে চড়া চলবে না। আপনি যে পথের বর্ণনা দিলেন, তাতে করে নর্মদা লঙ্ঘন না করলে ব্রহ্মাণ বা পিষাণহারীর মন্দিরে এখান হতে যাবার কোন পথ নেই। পরিক্রমাবাসীরা কি একমাত্র রেবাসংগম ছাড়া আর কোথাও নর্মদা পারাপার করতে পারে!

- নেহি জী, বিলকুল নেহি। উহ্ মুঝে পাতা হ্যায়। তবভি লৌটনেকা বখৎ যব্ ভি আপকো মোকা মিলেগা, যাইয়েগা জরুর। উধার জানেসে আপকো পতা চলেগা - ভক্তকী মহিমা ভগবানকী মহিমাসে জ্যায়দা হৈ।

পথ চলতে চলতেই তাঁদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে একবার তাঁদেরকে ফিরে যেতে বলেছি, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় জানিয়েছেন আরও চার-পাঁচ মাইল তাঁরা আমার সঙ্গে যাবেন। কারণ চার মাইল গেলে তাঁর 'দামাদের কোঠি' পড়বে। তিনি তাঁর মেয়ে এবং নাতিদের খবর নিয়ে যাবেন। কাজেই ফিরে যাবার জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা বৃথা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- ব্রহ্মা ঐখানে নর্মদাতীরে তপস্যা করেছিলেন বলে স্থানটির নাম হয়েছে - ব্রহ্মাণ এবং নিশ্চয়ই ঐখানে আমাদের হিন্দু ভারতবর্ষের রীতি অনুযায়ী ব্রহ্মার একটি মন্দির আছে, থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু পিষাণহারী আবার কোন দেবতা ?

পুরোহিত মহাশয় জানালেন - উহ্ বহোৎ মজাদার কিসসা হ্যায়। শুননেসে আপ চমৎকৃৎ হোগা। উহ্ তো হম জরুর বাতায়েগা। পহলে আপ্ মুঝে বাতাইয়ে কৌন্ বেদ মেঁ জগৎস্রষ্ঠা ব্রহ্মাজীকা বারেমেঁ উনকা মহিমাকি ব্যাখ্যান্ হৈ।

আমি বললাম - বেদে বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্রহ্মার নাম কোথাও শোনা যাবে না। বেদে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পুরাণে ব্রহ্মার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। পরমব্রহ্মের যখন 'একোহহং বহুস্যাম' অর্থাৎ এক আছি, বহু হব - বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করব, এই ইচ্ছা জাগল তখন কারণার্নবশায়ী সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা চোখ মেলে দেখলেন চারিদিকে শুধু জল আর জল, অন্তহীন মহাসমুদ্রের মাঝখানে তিনি ভাসছেন। লক্ষ্য করতে তাঁর চোখে পড়ল তিনি একটি পদ্মের উপর বসে আছেন, সেই পদ্মের মৃণালটি একজন জ্যোতির্ময় পুরুষের নাভিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়েছে। সেই পুরুষের মুখ থেকে দৈববাণী হ'ল - তপঃ, তপঃ অর্থাৎ তপস্যা কর। অতঃপর। ব্রহ্মা তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তাঁর সেই তপস্যা থেকেই এই জগতের সৃষ্টি।

অন্য পুরাণের মতে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন পরমব্রহ্ম সেই অন্ধকার দূর করলেন এবং তাতে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করলেন। ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হ'ল। অণ্ড মধ্যে সেই বিরাটপুরুষ নিজে ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মে আকার পড়ল, নির্গুণ নিরাকার স্বরাট্ ব্রহ্ম আকারিত বা মূর্ত হতে থাকলেন। অণ্ডটি তৎক্ষণাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ আকাশে এবং অন্যভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হ'ল। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ,

ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ - এই দশজন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত সৃষ্টির ভার নিতে বলেন, কিন্তু ব্রহ্মসাধনায় বিঘ্ন হবে বলে নারদ সৃষ্টির ভার নিতে রাজি হলেন না। এইজন্য নারদকে ব্রহ্মার শাপে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী - দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন এবং রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মাথা ছিল, কিন্তু একবার শিবের প্রতি অপমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করায় ক্রুদ্ধ শিবের ললাট নেত্র হতে নির্গত অগ্নিতে তাঁর পঞ্চম মস্তক দগ্ধীভূত হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস।

এই ত আমি আপনাদেরকে ব্রহ্মার কাহিনী শোনালাম, এবার আপনি পিষাণহারীর কাহিনী বলুন।

পুরোহিত মহাশয় বলতে আরম্ভ করলেন- 'পিষাণহারী' নাম শুনে কোন দেবীর বিগ্রহ বলে মনে করবেন না, ইনি শিবই। তবে এই শিবের উৎপত্তি রহস্য বড় বিচিত্র। কলিযুগেও যে নর্মদাতটে এক অদ্ভুত দৈবলীলা প্রকট হয়েছিল, তারই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই পিষাণহারী। পিষাণহারী অতি সাধারণ একজন চাষীর বৌ। তার স্বামীর নাম ছিল রামদীন। সে অত্যন্ত অলস এবং নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক ছিল। সে 'ক্ষেতি-উতির' কাজ করত বটে কিন্তু সেদিকে তার মন ছিল না। 'ক্ষেতির' কাজ ছেড়ে দিয়ে ক্ষেতের ধারে বসেই নাম জপ করত। বাড়ীর কোন কাজ করত না। সারাদিন এমনকি রাত্রেও সে নাম-কীর্তনে মেতে থাকত। অগত্যা এই অকর্মণ্য সংসার-উদাসীন স্বামী এবং নাবালক তিনটি ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিষাণহারীর উপরই পড়েছিল। সাধ্বী পিষাণহারী প্রতিবেশীদের গম বাজরা চাকীতে পিষে দিয়ে বিনিময়ে যা পেতেন, তাই দিয়ে স্বামী ও পুত্রদের মুখে অন্ন জোগাতেন। নিজের চাকীটি মাথায় নিয়ে পিষাণহারী প্রতিবেশীদের বাড়ীতে হাজির হতেন, গম বাজরা পিষতেন আর অহরহ নর্মদামায়ী ও মহাদেবের নাম জপ করতেন। কিন্তু এইটুকু সুখও তাঁর ভাগ্যে সইল না। ভগবানও ভক্তকে পরীক্ষা করেন। হিন্দীমেঁ এক বাত হ্যায়- যব কিয়ো প্রভুকা আশ, তব হোতে সর্বনাশ।

আমি এই শুনে পুরোহিত মহাশয়কে থামিয়ে মন্তব্য করলাম - বাংলাতেও এইরকম একটা ছড়া আছে। সেখানে ভগবান বলেছেন -

যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ।
তবুও যদি না ছাড়ে পাশ, তখন হই দাসের দাস।

ভাঙা হিন্দীতে বাংলা ছড়ার অর্থ বুঝিয়ে দিতেই পুরোহিত মহাশয় সোৎসাহে বলে উঠলেন - পিষাণহারী মাতাজীকো ভি এ্যায়সা হুয়া থা। হঠাৎ একদিন ভাবাবস্থায় হাঁটিতে হাঁটিতে রামদীন পাহাড়ের একটা টিলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। বসন্তরোগ হয়ে ছেলে দুটোই অকালে প্রাণত্যাগ করল, ছোট ছেলেটিকে একরাত্রে কুটীরের দাওয়া থেকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। শোকে দুঃখে হতভাগিনী পাগলের মত হয়ে গেলেন। ঘর থেকে আর বাইরে যেতেন না। চাকীটিকে বুকে নিয়েই কখনও আদর করতেন, কখনও বা কেঁদে কেঁদে বলতেন - ভগবান! একে একে সবাইকেই ত তুলে নিয়েছ, এতকাল আমি যাদের জন্য পরিশ্রম করে এসেছি, তারা এখন আর নেই। আমি মন্ত্রতন্ত্রও জানিনা, এতকাল চাকী পিষে যাদের পূজা সেবা করতাম, তারা সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন আর কার সেবা করব! হে শিউজী, এখন তোমার আমার মাঝে এসে আর কেউ আড়াল করে দাঁড়াবে না। এই বলে চাকীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউজী, শিউজী বলে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। চাকীতিই যেন তাঁর শিউজী। এইভাবে অর্ধোন্মাদ অবস্থাতেই একদিন চাকীটিকে বুকে জড়িয়েই পিষাণহারী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রতিবেশীরা নর্মদার চড়ায় চাকীসহ পিষাণহারীকে সমাধিস্থ করে এল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেই চাকীটি একটি শিবলিঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে এবং নর্মদা পিষাণহারীর সেই সমাধিস্থল এবং শিবলিঙ্গকে মাঝখানে রেখে দুইদিকে দুইটি ধারায় বয়ে চলেছে। হতচকিত এবং বিস্মিত নর্মদার উভয়তটের অধিবাসীরা পিষাণহারীর সমাধিস্থলের সেই স্থানে ১৮৩২ সালে মহাদেবের একটি মন্দির নির্মান করে তার নাম দিয়েছে - পিষাণহারী।

প্রায় দেড়শ বছর আগে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। সেই থেকে পিষাণহারীর মন্দির তীর্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। নর্মদার প্রবল বন্যায় কতবার কতকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে কিন্তু পিষাণহারীর মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয় নি। পরিক্রমা শেষ করে যখন ফিরবেন, তখন দেখবেন সেখানে শত শত ভক্তের ভীড় লেগেই আছে। পিষাণহারীর চাকীর বিবর্তিত রূপ শিবলিঙ্গে বিরাজমান থেকে ভক্তবৎসল মহাদেব ভক্তদের অভীষ্ট পূরণ করে চলেছেন।

আমরা গল্প করতে করতে প্রায় বারো মাইল রাস্তা চলে এসেছি। এবার আমার বিদায় নেবার পালা। কারণ এখান থেকে তাঁরা উত্তরদিকে তিনমাইল দূরে তাঁর 'দামাদ'-এর (জামাতা) বাড়ীতে পৌঁছবেন। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সবাই বললেন - রৈকপনেশ্বর মহাদেব আপনার পথকে নির্বিঘ্ন করুন। পরিক্রমা শেষে যদি নর্মদাতটে আসন পাততে চান, তাহলে আমরা আমাদের গ্রামে আপনাকে আসন পাততে অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম, আপনার কোন তকলিফ্ হবে না, আপনার কথিত বৈদিক সম্বর্গবিদ্যার পীঠস্থানে রৈকপনেশ্বর মন্দিরের পাশেই আমরা আশ্রম বানিয়ে দেব।

তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। সামনে আমার অন্তঃহীন পথ, সেই রেবাসংগম আর কতদূর! আমি জানি এখনও আমি অর্ধেক পথও পরিক্রমা করতে পারিনি। বেলা প্রায় এগারটা হবে। নর্মদাকে প্রণাম করে তীর ধরে হাঁটতে লাগলাম।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। নর্মদার তীর ধরেই যাচ্ছি তবুও স্নান করতে ইচ্ছা করছে না। দূরে মানুষজন আমলকী এবং অন্য ধারে আমরুদ গাছের ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও পাহাড়ের উপর শিবমন্দির দেখতে পাচ্ছি, নর্মদার উভয়তীরে শুধু শিব আর শিব। তীর থেকে কোথাও একমাইল দূরে, কোথাও দুমাইল দূরে বসতি। কোন পথচারীকে দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে প্রায় আরও তিনঘন্টা একটানা হেঁটে একটা শালগাছের তলায় পাথরের উপর বসে পড়লাম। পাগুলো টেনে ধরেছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন, গাঁঠরীর উপর মাথা দিয়ে পাথরের উপরেই শুয়ে পড়লাম। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে, স্নানটাও এইবেলা সেরে নিতে হবে, স্নান না করলে শীত আরও বেশী করে জেঁকে ধরবে। ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাটে নামলাম। ঘাট বলতে কোন বাঁধানো ঘাট নয়, বড় বড় পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে নর্মদার জলে। সাবধানে নেমে স্নান ও তর্পণ সেরে কয়েক টুকরো মিছরী খেয়ে জল খেলাম। আবার হাঁটতে লাগলাম, একটি ছোট জঙ্গল পেরিয়ে একজন পথিককে চোখে পড়ল। সে রাস্তার বাঁকে মোড় নিতে গিয়েও আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছাকাছি কোন থাকার মত মন্দির আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলল - তিনমাইল দূরে একটা মন্দির আছে কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে মন্দিরের পথ জঙ্গলাকীর্ণ, সেখানে পৌঁছতে পারবেন না। তবে আধমাইলটাক গেলেই শাহগঞ্জে পৌঁছবেন, সেখানে খাটোলা গৌড়দের বসতি আছে। খুব বড় মহল্লা, সেখানে মন্দিরও আছে, একটি ছোট স্কুলবাড়ীও আছে, সেখানে রাত কাটানোই আপনার পক্ষে ভাল হবে। নমস্কার জানিয়ে সে চলে গেল।

শাহগঞ্জে এসে শিবমন্দির পেলাম বটে কিন্তু মন্দিরটি এত ছোট যে শিবলিঙ্গের পাশে হাত পা মেলে শোবার উপায় নেই। স্থানীয় লোকেরা আমার সমস্যা জানতে পেরে থাকার জন্য স্কুলবাড়ীর একটি কামরা খুলে দিল, পরিক্রমাবাসী জেনে শ্রদ্ধাভরে এক ঘটি দুধও এনে দিল।

দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু হাত পা কোমরের অসম্ভব যন্ত্রণায় কিছুতেই রাত্রে ঘুম এলনা। মনে হল যেন সর্বাঙ্গে জ্বর জাঁকিয়ে এসেছে। মনের মধ্যে নানা রকমের ভাবনা আসতে লাগল, বাবার আদেশ পালন করতে এসে এই বিদেশ বিভুঁইতে হয়ত বেঘোরে প্রাণটাই যাবে। নর্মদা-পরিক্রমায় এত কষ্ট জানলে হয়ত আবেগের বশে পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তাম না। বাবাকে হারিয়ে দু'বছর হল ঘর ছেড়েছি, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সবই ঘোরা হয়ে গেছে, অনেকবার পথে নিজের একাকীত্ব ও অসহায়তার কথা ভেবে চঞ্চল হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সে সব পর্যটনে পথচলার একটা স্বাধীনতা ছিল, সুযোগ পেলে এবং শরীর অসুস্থ মনে করলে ট্রেন বাস টাট্টু বা লরির মাথায় উঠে কোথাও যাতায়াত করার কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু রুদ্রকন্যা নর্মদার তটে পরিক্রমা করতে হলে খালিপায়ে যানবাহন পরিত্যাগ করে বনজঙ্গল পাথর কাঁটা যাই থাক্ তার উপর দিয়ে নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে যেতে হবে - শাস্ত্রের এইরকম রুদ্রশাসন অন্যসব পরিব্রাজনে মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। রৈকপনেশ্বরের

পুরোহিত মহাশয় ত বলেছিলেন - নর্মদা পেরিয়ে নরসিংহপুর ষ্টেশনে পৌছে রেলপথ ধরলে দশমাইল দূরের করেলি, সেখান থেকে উত্তরমুখে মাত্র দশমাইল হেঁটে গেলেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নর্মদাতীর্থ - ব্রহ্মাণে পৌছতে পারতাম কিংবা করেলি থেকে ট্রেনে ভায়া পিপারিয়া ইটারসি জংশন অতিক্রম করে হোসেঙ্গাবাদ, যার প্রাচীন নামই নর্মদাপুর, সেখানেই সরাসরি পৌছে যেতে পারতাম, কিন্তু পরিক্রমার কঠিন শপথ, উত্তরতটে চলছি যখন, তখন মরি বাঁচি উত্তরতট ধরেই যেতে হবে, কিছুতেই নর্মদা পেরিয়ে দক্ষিণতটে যাওয়া যাবেনা। এরই নাম নর্মদা মার্গের বৈদিক সাধনপথ। কি পাবো আমি এতে! আদৌ কিছু পাবো কি! শাস্ত্র বলেছেন - নর্মদা দর্শনেই সর্বপাপের বিলয়। কিন্তু কি পাপ করেছি আমি, মনে ত পড়েনা। অষ্ট বা অষ্টদশ সিদ্ধি করায়ত্ব হবে! কিন্তু তা কি আমি নর্মদামায়ের কাছে চেয়েছি! কিন্তু একটা আকাঙ্ক্ষা বা পরিকল্পনা বাবার মনে ছিল নিশ্চয়ই, হয়ত নর্মদা-পরিক্রমায় অকল্পনীয় কোন দিব্যবস্তু লাভ হয় এই প্রত্যয় তাঁর মনে ছিল বলেই অন্তিমকালে বলে গেলেন 'তুই যদি নর্মদা পরিক্রমা করতে পারিস আমি খুশী হব, শান্তি পাবো'। আমি যদি বাবার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারি বা 'দুরন্ত দৈবের বশে' পরিক্রমার অন্তেও আমার মন যদি ফাঁকা থেকে যায়, তাহলে পথের এত কষ্ট অযথা ভোগ করা হচ্ছে।

জ্বরের বিকারে এইসব আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিংবা মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম কিনা জানিনা, আমি দেখলাম বাবা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর অতি প্রিয় স্বরচিত কবিতাটি বলে চলেছেন-

এ সংসার অন্ধপুরে সর্বত্র ব্যাপিয়া,
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে;
সত্যেরে খুঁজিছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কেহ তারা শূণ্য হাতে ফিরে নাই ঘরে।

হঠাৎ কারও হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠলাম। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম একজন বৃদ্ধ সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আমার নাড়ী দেখছেন। একজন ভদ্রলোক খালিগায়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনিই আমাকে বললেন - সকালে উঠে আমি উঁকি মেরে আপনার ঘরে দেখলাম, আপনি আলু-থালু হয়ে পড়ে আছেন, মুখে গোঁ-গোঁ করছেন। সেইজন্য আমি এই বৈদ্যজীকে ডেকে এনেছি। এঁর নাম রামশংকরজী। রামশংকরজী বললেন - 'কোই ফিকর নেহি, হম্ আভি দাবা দেতা হুঁ'। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে একটি বুটি বের করে বললেন - সহদকা (মধু) সাথ পিলা দিজিয়ে, বুখার ছুট্ জায়েগা। বৈদ্যজীর কথা শুনে সেই ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে খল-নুড়ি এনে মধু দিয়ে বড়িটি মেড়ে দিলেন - হম্ ব্রাহ্মণ হুঁ। হমারা ব্রাহ্মণী আভি গরম পানি লেকর আয়েগা। নর্মদাকী পানি হৈ। উহ্ পীনেসে আপকো কৈ হরজা নেহি।

একটু পরেই গরম জল নিয়ে তাঁর ব্রাহ্মণী এলেন। একেবারে প্রশান্ত মাতৃমূর্তি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে, আমার গরম জলে মুখ ধুইয়ে, একগ্লাস গরম সাগু খাইয়ে অতি যত্নে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আমি যেন তাঁদের ছেলে। বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ছোট ছেলেকে যেমন ধমক দেয়, তেমনিভাবে আমাকে ধমকে একজন কপাল টিপতে আর একজন পা দাবাতে বসে গেলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে বলে চলেছেন - রেবা রেবা রেবা, মনে হল যেন পার্বতী-শংকর এসেছেন আর্ত, অসহায় রোগযন্ত্রনায় কাতর এই ছেলেটাকে দেখতে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম যখন ভাঙলো তখন মনে হ'ল জ্বর ছেড়ে গেছে, মাথা হালকা, শরীরে কোন যন্ত্রণা নেই। একটু পরে সেই রামশংকর বৈদ্যজী আবার আমাকে দেখতে এলেন। নাড়ী দেখে বললেন - বুখার ছুট্ গিয়া। সামকা বখৎ আউর এক বুটি আপকো লেনে হোগা। বেলা চারটা নাগাদ আমার শরীর ঝরঝরে সুস্থ লাগছিল। আমি নর্মদা দর্শন করতে চাইলাম, সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমার হাত ধরে নর্মদার তটে এনে বসিয়ে দিলেন। মানসপূজা সেরে আবার সেই স্কুল-ঘরে ফিরে এলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - এই প্রচণ্ড শীতে আপনি কিভাবে খালিগায়ে থাকতে পারছেন?

- 'হম্ ক্যা জানে। নর্মদামায়ী জানে'।

আমি মহাত্মা শোভানন্দজীর কথার প্রতিধ্বনি করে বললাম - ক্যা নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হ্যায় ?

এবারেও সংক্ষিপ্ত উত্তর 'জরুর'।

পরদিন ব্রাহ্মণ দম্পতির কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দুর্বল শরীর, ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম নর্মদামাতার কোলে কোলে।

দুধারে পর্বতমালা-বিন্ধ্য আর সাতপুরা। মধ্যে এই নর্মদা উপত্যকা। নর্মদা চলেছেন সাগর-সঙ্গমে, তার উত্তর ও দক্ষিণের পার্বত্যধারাকে বিন্ধ্য ও সাতপুরা এই দুই আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের ভৌগলিক পার্বত্য বিন্যাসে এই দুই ধারাই এক বিশাল পার্বত্যজগতের অন্তর্ভুক্ত। নাম তার বিন্ধ্যজগৎ। সে জগৎ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানে এক বিশাল ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নর্মদার এপার ওপার জুড়ে এই অবিচ্ছেদ্য পার্বত্যজগৎ পশ্চিমে আরব সাগরের কাম্বে উপসাগর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বীরভূমের পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চল এই বিন্ধ্যেরই নিশানা। কর্কটক্রান্তি বৃত্ত এই বিশাল বিন্ধ্যজগৎকে ভেদ করে গেছে। উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। বিন্ধ্যের উত্তরে উত্তরাপথ, দক্ষিণে দক্ষিণাপথ। সমগ্র বিন্ধ্যজগতের দৈর্ঘ্য সাতশ মাইল, পরিধি চল্লিশ হাজার বর্গমাইল।

এই বিন্ধ্যজগৎকে উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ করেছে পশ্চিমপ্রবাহিনী নর্মদা। উত্তরাংশের লৌকিক নাম বিন্ধ্য, দক্ষিণাংশের নাম সাতপুরা। বিহারে রাজমহল, ছোটনাগপুর ও রোটাসের পর্বতাবলী, বাঘেলখণ্ডের কৈমুর পর্বতমালা, নরসিংহপুর অঞ্চলের ভাণ্ডের পর্বতমালা এবং সেখান থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত মালবের বিন্ধ্যপর্বতমালা এই উত্তরাংশের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম সীমান্তে গীর্ণার বা রৈবতক। মেকল, মহাদেব ও সাতপুরা পর্বতমালা দক্ষিণ বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ভুক্ত। বিন্ধ্যের এই উত্তর ও দক্ষিণাংশ, নর্মদা নদীর উৎস মেকলচূড়া অমরকন্টকে যুক্ত হয়েছে।

হাঁটছি আর ভাবছি। দুধারে অরণ্য শ্যাম-গম্ভীর পর্বতমালার মাঝখানে ভারত-ভূগোলের অতি আশ্চর্য সৃষ্টি এই নর্মদা-উপত্যকা। মা নর্মদে, তুমি ঋষিদের চোখে সৃষ্টির পালয়িত্রী, সভ্যতার লালয়িত্রী হয়েও তপস্যা বিধাত্রী বরদা। বরদে একই অঙ্গে তোমার কত রূপ! মাঝে মাঝে অরণ্য সঙ্কুল, কোথাও রুক্ষ বন্ধুর - যেন রুদ্র সাজে সেজেছ। আবার তীরে তীরে তোমার কত শ্যামল বনানী, কত শষ্যক্ষেত্র, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত ঘাট, কত তীর্থমন্দির - এই সকলের মধ্যে তোমার শিবময়ী কল্যাণী রূপটি ফুটে বেরিয়েছে। শিবদুলালি! বারেকের তরে, ক্ষণিকের তরে তোমার উর্জস্বল বিভূতি অপাবৃত কর মা!

একটা হৈ হৈ শব্দ শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা বড় পাথরের চাঙড়ে হাত ঠেকাতে মুহূর্তমাত্র দেরী হলে টাল সামলাতে পারতাম না, পথের উপরেই আছড়ে পড়তাম। আমি যেখানে দাঁড়ালাম, সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেই দেখলাম একটা দাঁতালো বন্য বরাহ রাস্তার উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক বল্লম ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাকে তাড়া করে এসেছে। তারা মুখে গর্জন তুলেছে - হর হর ভারেশ্বর মহাদেও। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা বাঁক নিয়েছে, রাস্তাও বেঁকেছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট যাবার পরেই দেখি একটি ছোট নদী পাহাড়ের উপর থেকে প্রবাহিত হয়ে নর্মদায় পড়েছে। গাছের তলায় দশ বারজন লোক হাতে টাঙি আর বল্লম নিয়ে বসে আছে। এরা আবার কারা! তাদের একসঙ্গে কয়েকজন আমার দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে বলে উঠল -

- গোড় লাগি মহারাজ!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম - পুষ্কলী তীর্থ কিধার বা ?

- শাহগঞ্জকা তরফ, উহ্ তো আপ্ ছোড়কে আয়া। ইহ্ হ্যায় হিরণ নদীকা সংগম। ঘাটকা নাম ভারেশ্বর তীর্থ। ভারেশ্বরজীকা মন্দর্ দিখাই দেতা হৈ। তাদের অঙ্গুলি-সংকেত লক্ষ্য করে দেখলাম অদূরেই ধূসর রঙের বিরাট শিব মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শাল সেগুন তেঁতুল এবং শীরিষ গাছের মধ্যে ধূসর রঙ আলাদা করে সহসা চোখে পড়ে না। মন্দিরে গিয়ে দেখি, দরজা নেই, হয়ত ছিল - কতযুগের মন্দির, দরজা ভেঙে গেছে। মন্দিরের ভেতরটা একটা বড় হলের মত, প্রায় পঞ্চাশ জন শুয়ে থাকলেও জায়গার অভাব হবেনা। হলের মধ্যস্থলে প্রায় দুইফুট উঁচু উল্টানো ধামার মত দেখতে চকচকে কালো পাথরের একটি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। কাশীতে গৌরীকেদার মন্দিরে ঠিক এই রকমেরই শিবলিঙ্গ দেখেছি। তবে নর্মদাতটের এই শিবলিঙ্গটি অনেক উজ্জ্বল; মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র কেউ ঘি মাখিয়ে গেছে। হলের এক কোণে বিছানা পেতে স্নান ও তর্পণাদি সেরে এলাম। কমণ্ডলুর জলে পূজা করলাম। আঙুল দিয়ে ঘষে

দেখলাম, আঙুলে ঘি লাগে কিনা। নাহ্, ঘি নয়। এই উজ্জ্বলকান্তি শিবলিঙ্গের স্বাভাবিক দ্যুতি। ধূসর পাথর দিয়ে শিবলিঙ্গকে ঘিরে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান প্রায় চারফুট যোনিপীঠ গেঁথে তোলা হয়েছে, পাশেই একটি বিরাট ত্রিশূল পোঁতা আছে। শাহগঞ্জের ব্রাহ্মণীমা আসার সময় ঝুলিতে লিট্টি দিয়েছিলেন। তাই খেয়ে মন্দিরের চত্বরে বসে তালপাতার হস্তলিখিত পুঁথি রেবাখণ্ডম্ এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনাম পড়ে পড়ে, ভারেশ্বর তীর্থের বিবরণ খুঁজতে লাগলাম। পেলাম না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হিমেল বাতাস বইছে, দুদিন আগেই জ্বরে পড়েছিলাম। তাই আর বাইরে বসে থাকাটা উচিৎ মনে করলাম না। পুঁথিটি হাতে নিয়ে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে নিজের আসনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। বসে বসে নানা কথা ভাবতে থাকলাম। দুর্বল শরীরে প্রায় বার চৌদ্দ মাইল হেঁটে এসেছি, ঘুম পাচ্ছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রি তখন কত জানিনা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। একটা সুরেলা ধ্বনিতে গোটা মন্দির গমগম করছে, প্রচণ্ড শীতে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে কোন কিছু দেখতে ইচ্ছা হল না। ওমা! এই মিষ্টি সুরতরঙ্গ যে আমার মাথার তলদেশ অর্থাৎ মন্দিরের মেঝে থেকেই উঠছে বলে মনে হচ্ছে। আর শুয়ে থাকা যায়না, উঠে বসলাম, দেয়ালের গায়ে কান ঠেকাতেই সেই সুরেলা ধ্বনি যেন আরও স্পষ্টতর হল। মনে হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন এই ধ্বনি বা সুর তালে তালে গমকে গমকে যেন উর্ধ্বের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। আমি দাঁড়িয়ে দেয়াল ধরে ধরে হলঘরের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত দেয়ালে কান ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নিজের আসনে এসে বসলাম। যেখানেই কান পেতেছি সেখানেই একই সুরের মূর্ছনা, একই তান। ভাবলাম, জ্বরে ভুগে এবং দীর্ঘপথ অনশনে অর্ধাসনে থেকে থেকে স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, সেইজন্যই হয়ত এই সব শব্দ কানে আসছে, এই শব্দ দেওয়ালে নেই, এ আমারই দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীর ঝঙ্কার মাত্র। কিন্তু এই ধ্বনি এত সুরেলা এত মধুর কেন ? স্নায়ুদৌর্বল্য থেকে যে শব্দ কানে জাগে তাতে ত মাধুর্য থাকেনা। গুরু নানকের একটি বাণী মনে পড়ল -

হুকমৈ অন্দরি সভকো বাহর হুকুম ন কোই।
নানক হুকম্ জো বুঝৈ ইতমে কহে ন কোই॥ (জপজী দরবেশ ৬)

সর্বঘটে বিরাজিত অনাহত ধ্বনি, অগম্য তাঁহার তত্ত্ব চিরগুপ্ত খনি।
হুকুম যে বুঝে তার সরে না বচন, আমি আমি ব্যর্থ বাণী কহে না সেজন॥
জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত তার মহিমার বনে, নানক তাহার তত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥

তাহলে কি, তাহলে কি নানক কথিত সেই 'হুকম্', বা সর্বঘটে বিরাজিত সেই অনাহত নাদধ্বনির বহিরঙ্গ রূপই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ প্রতিটি পাথরের মধ্যে অধ্যারোপিত হয়ে আমার কানে এসে বাজছে! কিন্তু আমি ত কোন শব্দসাধনায় এই মুহূর্তে রত নই।

আমি এইভাবে মনে মনে বিচার করে চলেছি। সুরেলা ধ্বনির স্ফুরণ ও অবিরাম ঝঙ্কার এক মুহূর্তও থেমে নেই। ধীরে ধীরে আমি যেন এই শব্দতরঙ্গের নেশাতে মাতাল হয়ে যাচ্ছি। এ নেশা শব্দের নেশা- আমার শরীর টলছে দুলছে, আমি বিছানাতেই লুটিয়ে পড়লাম।

সকালে জেগে উঠলাম। দেখতে পেলাম, রেবাখণ্ডম্ পুঁথিটি দু'ভাগে খোলা হয়ে পড়ে আছে। এ কেমন করে সম্ভব! তালপাতার পুঁথি, দুই দিকে শক্ত কাঠের পাটা দিয়ে বাঁধা থাকে, গতকাল পুঁথিটা ত আমি যথারীতি বেঁধেই রেখেছিলাম, খুলে রাখার লোক আমি নই। যাইহোক, সেইভাবেই পুঁথি পড়ে থাকল, আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রকৃতির বেগে শৌচাদি সারতে চলে গেলাম। ফিরে এসে পুঁথির দুই ভাগ দুই হাতে ধরে বাইরে মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটা পাথরের উপর বসলাম। ভুবন-প্রকাশক উদিত হচ্ছেন বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশে; তাঁর রশ্মিচ্ছটা আলোয় আলোয় সব কিছুকেই ফুটিয়ে তুলছে, প্রকাশ করছে। পুঁথির পাতায় নজর দিতে দেখলাম শিরোনাম লেখা পুষ্কলী তীর্থ। প্রথম পংক্তিতে পুষ্কলী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে ঐ একই পরিচ্ছেদে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন - অতঃপর ক্ষমানাথ তীর্থে যাবে। সাক্ষাৎ মহেশ্বর সেখানে বাস করেন, তিনি জীব উদ্ধারের মহাভার গ্রহণ করেছেন বলে এই তীর্থের নাম ভারভূতি তীর্থ -

তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সাক্ষাৎরুদ্রো মহেশ্বরঃ।
ভারেণ মহতা জাতো ভারভূতিরিতি স্মৃতঃ॥

ওহো! এই ভারভূতিই তাহলে ভারেশ্বর হয়েছেন - 'হর হর ভারেশ্বর মহাদেও'।

আমি পুঁথির উপাখ্যান পড়তে লাগলাম। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন - এই ভারভূতি তীর্থে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন বেদবেদাঙ্গপারগ সর্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কাছে দেশ-দেশান্তর থেকে বিদ্যার্থীরা পড়তে আসতেন। এই নর্মদাতটে বিষ্ণুশর্মার একনিষ্ঠ তপস্যা ও বিদ্যাদানের ব্রত পালনে তুষ্ট হয়ে একদিন স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধরে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস করবার জন্য এলেন। বিষ্ণুশর্মা তাঁকে জানালেন - এখানে বিদ্যার্থীরা ভিক্ষা করে এনে নিজেরাই রন্ধনাদি কার্য করে এবং নানাভাবে আমার সেবা করে। তুমি যদি সেইভাবে থাকতে পার তবে তোমাকে ছাত্রশ্রেণীভুক্ত করতে আমার আপত্তি নেই। ব্রাহ্মণ-বালকবেশী মহাদেব সেই কথাতেই সম্মত হয়ে গুরুর আশ্রমে বিদ্যা গ্রহণে ব্রতী হলেন। একদিন পর্যায়ক্রমে রন্ধনের ভার ছদ্মবেশী মহাদেবের উপর পড়ল। তিনি তত্রত্য বনস্পতিগণকে দ্রুত রন্ধনকার্য গোপনে সম্পন্ন করার ভার দিয়ে পাহাড়ের ধারে যেখানে তাঁর সহপাঠীরা খেলা করছিল, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে খেলাতে যোগ দিতে চাইলেন। তাঁকে দেখেই সহপাঠীরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল - আমরা যখন রান্না করি, তখন তা শেষ করতে বেলা গড়িয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই রান্না না করেই এখানে এসেছ। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। যদি গিয়ে খেতে না পাই, তাহলে তোমার হাত পা বেঁধে নর্মদার জলে ফেলে দেব। মহাদেবও বললেন - তোমরা তাই কোর। তবে আমারও ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে রাখ, যদি তোমরা গিয়ে যথাযোগ্য ভোজন প্রস্তুত দেখ তাহলে গুরুর সামনেই তোমাদেরকেও আমি নর্মদাজলে নিক্ষেপ করব। ছাত্রেরা বিদ্যাশ্রমে ফিরে গিয়ে দেখল বিপুল ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত। গুরুকে উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞার কথা নিবেদন করে ছদ্মবেশী মহাদেব তাঁর সহপাঠীদেরকে হাত-পা বেঁধে জলে নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে গুরু হাহাকার করে বলতে লাগলেন - তুমি এ কি সর্বনাশ করলে। এই বালকদের মাতা-পিতাকে আমি কি উত্তর দেব! তার চেয়ে আমারও নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করা ভাল। এই বলে তিনি ঝাঁপ দিতে উদ্যত হতেই শাপানুগ্রহ-সমর্থ মহেশ্বর বিষ্ণুশর্মাকে নিবৃত্ত করে অবলীলাক্রমে সহপাঠীদেরকে জল থেকে তুলে আনলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মারা গিয়েছিল। গুরুর কান্নায় বিচলিত হয়ে সেই পাঁচজনের দেহ আচ্ছাদিত করে তিনি মন্ত্রপূত নর্মদার জল সেই মৃতদেহগুলির উপর ছিটিয়ে দিতেই তারা পুনর্জীবিত হয়ে উঠে বসল আর তৎক্ষণাৎ সেখানে এই ভারভূতি নামক স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রকট হল, ব্রাহ্মণবটুবেশী মহাদেব তাঁর গুরু বিষ্ণুশর্মা ও অন্যান্য অন্তেবাসীদের স্তম্ভিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় সাক্ষ্য দিচ্ছেন -

তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ভারভূতীতি বিশ্রুতম্ ॥

প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা, গাছের পাতা হতে যে শিশির পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন বরফ জল। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, আসনেই বসে আছি, পুঁথি পড়া শেষ হয়েছে এমন সময় মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে আওয়াজ ভেসে এল - হর হর ভারেশ্বর মহাদেও। স্ত্রী, পুরুষ, বালক মিলিয়ে কুড়ি বাইশজন লোক মন্দিরের চত্বরে এসে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকের হাতেই ফল ফুল পূজার অর্ঘ্য। তাঁদের মধ্যে একজনের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা। রঙীন সোয়েটারের উপর দিয়ে রুদ্রাক্ষ মালাটি গলা থেকে বুকের উপর ঝোলান আছে। কপালে ত্রিপুণ্ড্র এবং হাতে কমণ্ডলু দেখে বুঝলাম, ইনিই পুরোহিত।

আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মন্দিরে ঢুকে গেলেন সবাই। যে যার লোটায় করে জল এনে ভক্তরা আগে 'হর হর ভারেশ্বর মহাদেও' সমস্বরে উচ্চারণ করে শিবের মাথায় জল ঢাললেন। তারপর পুরোহিত মশাই বসলেন পূজায়। অনেকটা সময় ধরে তিনি পূজা করলেন, শিবমহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ করলেন, শিবের অতবড় স্তোত্র তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ আছে দেখলাম। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। তাঁর পূজার সময় কান পেতে শুনলাম, তিনি বারবার 'নর্মদে শর্মদে নমঃ' এবং
'নমো ভগবতে ভারেশ্বরায় ভূতয়ে নমঃ শিবায়' বলে ফুল চাপালেন। কর্পূর দিয়ে আরতি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মহাদেবকে।

ভক্তরা মহাদেবের প্রসাদ নিয়ে মন্দির চত্বরে বসে খেতে আরম্ভ করলেন। ভক্তদের প্রণামী ট্যাঁকে গুঁজে পুরোহিতমশাইও প্রসাদ গ্রহণ করলেন। আমি পরিক্রমাবাসী কিনা জেনে নিয়ে আমাকে বললেন-
- এই মন্দিরের নিয়ম হচ্ছে পরিক্রমাবাসী মন্দিরে উপস্থিত থাকলে তাঁর ভোগের জন্য ফলমূল আগে রেখে দিতে হবে, তারপর ভগবানের পূজা। যদি বেশী সংখ্যায় পরিক্রমাবাসী থাকেন, তাহলে প্রয়োজনে ভক্তদের আনা সব অর্ঘ্যই রেখে দিতে হবে, তখন শুধু নর্মদার জলে পূজা করলে তাতেই ভক্তবৎসল তুষ্ট হবেন। আপনার জন্য ফলমূল, খোয়া ইত্যাদি যা রেখেছি তা দয়া করে গ্রহণ করবেন। আপনি কি সকালে এখানে এসেছেন, না কাল এসেছেন ?
- গতকাল বেলা দেড়টা নাগাদ এসেছি আমি। আপনি কি কাল পূজা করতে এসেছিলেন? শিবের মাথায় কোন ফুল বেলপাতা দেখিনি।
-জরুর এসেছিলাম। এই মহল্লার নাম হিরণ্যা। অল্প লোকের বাস কিন্তু পাশের মহল্লার নাম ছিন্দোয়াড়া* ঘন বসতি। সেখানে বহু বর্ধিষ্ণু খাটোলা গৌড়, রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন। ছিন্দোয়াড়া থেকে প্রতিদিন অন্ততঃ বিশ পঁচিশজন ভক্ত এখানে পূজা দিতে আসে। পূজা করে চলে যাবার পরেই রহস্যজনকভাবে এখানে ফুল বেলপাতাও উধাও হয়ে যায়। একথা এখানকার সকলেই জানে, কিন্তু কেউ এর রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। খোলা দরজা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, আপনার নিশ্চয়ই রাত্রে খুব কষ্ট হয়েছে।
এই বলেই তিনি দুজন লোককে তাঁর বাড়ী থেকে পর্দা বা একটা বোরার 'ঠাটরা' আনতে হুকুম করলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই 'ঠাটরা' এসে গেল। মন্দিরের মধ্যে দরজার উপরে দুদিকে দুটো হুকে সেটিকে ঝুলিয়ে দিলেন। পুরোহিতসহ ভক্তবৃন্দ মহাদেবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। শব্দ রহস্যের কথা বলি বলি করেও বলা হল না।
মন্দিরে গিয়ে পুঁথিটি গুছিয়ে রাখলাম। দেখলাম, আমার আসনের কাছে পেঁপে, পেয়ারা, কলা এবং কতকটা খোয়া তাঁরা রেখে গেছেন। পূজার জন্য কিছু ফুলও আছে। স্নান করতে গেলাম, স্নান করে এসে দেখি, অতো ফুলে শিব ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন, তার একটা ফুলও নেই। কাছেই ঘাট, প্রায় বিশ মিনিট লেগেছে স্নান করে আসতে, এর মধ্যে কে এল! যে সব ফুল নিঃশেষে কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। মন্দিরে ঢুকতে যে পাথরের সিঁড়ি তা এমনই ভাঙাচোরা যে গরুর পক্ষে ওঠানামা সম্ভব হবেনা, শুধু তাই নয়, গরু এলে আমার পূজার জন্য রাখা ফুল ও ফল কি আর যথাস্থানে থাকত! রহস্য রহস্যই থেকে গেল।
যাই হোক, আমি পূজা করতে বসলাম। প্রথমেই মহাদেবের গায়ে কান ঠেকালাম। গত রাতের সেই সুরেলা শব্দ লিঙ্গের মধ্য থেকে একটানা বেজে চলেছে। একটা অশ্রুতপূর্ব রাগিনীর মধুর ঝঙ্কার, অপূর্ব তান লয়ে ঝঙ্কৃত হতে হতে সহসা মনে হল, আমার মস্তিষ্ককোষের মধ্য হতে উদ্ভূত হচ্ছে
- বমবম-ববম্-বম্।
আমি তন্ময় হয়ে গেলাম, আমার দেহকোষের প্রতিটি অনু পরমাণু যে উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে, বম্-বম্ ধ্বনির তালে তালে। অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ঢল নেমেছে আমার প্রতিটি রোমকূপে, আমার আবার নেশা হচ্ছে।
যখন ধাতস্থ হলাম, তখন সূর্য পাটে বসেছেন। শিবের মাথায় জল, ফুল দিতে গিয়ে দেখলাম হাত অবশ, শরীরও অবশ। কাঁপা কাঁপা অবশ হাত দুটোকে জোড় করতে পারলাম না, অসহ্য আনন্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম - আবেগ জড়িত কণ্ঠে আধো আধো ভাষায় বলবার চেষ্টা করলাম -

নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে ॥

(যোগতারাবলী, শংকরাচার্যকৃত)

---

* এই নর্মদা অঞ্চলেই বেতুল জেলার পাশেই ছিন্দোয়াড়া বলে আর এক স্বতন্ত্র জেলা আছে। তার প্রধান শহর ছিন্দোয়াড়া। বলা বাহুল্য এখানে উল্লেখিত ছিন্দোয়াড়া সেই ছিন্দোয়াড়া নয়। ভারেশ্বর মন্দির যে ছিন্দোয়াড়া মহল্লার পাশে অবস্থিত, সেই ছিন্দোয়াড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, নরসিংহপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত

হে নাদানুসন্ধান! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমাকে পরমতত্ত্বের সাধন বলে জানি, তোমার অনুগ্রহে প্রাণবায়ুর সঙ্গে আমার মন ব্রহ্মপদে কবে বিলীন হবে! হে দীনদয়াল, এই পিতৃহারা অনাথকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলিয়ে রহস্যের গহন অন্ধকারে নিক্ষেপ কোরনা প্রভু! দয়া কর হে আশুতোষ, ভক্তি-বিশ্বাসের অচ্যুতভূমিতে যেন আমার উত্তরণ ঘটে।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে অদ্ভুত ধরনের পূজা সাঙ্গ হল। ফলমিষ্টি মহাদেবকে নিবেদন করে বাইরে বসে খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নর্মদার ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে এসে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। মনের মধ্যে আনন্দের রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কালকের মত আজও কানে সেই সুরেলা শব্দ ভেসে আসে কিনা তা শুনবার জন্য কান খাড়া রাখলাম। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। কখন যে ঘুম দুচোখে নেমে এসেছে বোঝার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মেঘের কড়কড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, এইসময় যদি বৃষ্টি নামে তাহলে শীত আরও জাঁকিয়ে পড়বে। মনে মনে ঠিক করলাম কাল পুরোহিত মশাই যখন পূজা করতে আসবেন, তখন মন্দিরে আগুন জ্বালাবার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার মেঘ ডাকছে গুড়গুড় শব্দে। আকাশের অবস্থাটা কিরকম, এখনি বৃষ্টি নামবে কিনা তা দেখার জন্য দেওয়ালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে দরজার উপর ঝোলানো 'বোরার' পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে আকাশের দিকে তাকালাম। ওমা! মেঘ কোথায়! নির্মেঘ আকাশ ফিকে জ্যোৎস্নার আলোতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, নর্মদার জলও ঝিকমিক করছে। পর্দা ছেড়ে দিয়ে আসনের দিকে ফিরতেই আবার মেঘের গুড়গুড় শব্দ। দেয়ালে কান ঠেকালাম, দেয়াল ভেদ করেও গুড়গুড় শব্দ অবিরত হয়ে যাচ্ছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগটাই তাহলে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে মুখরিত! আসনে বসেই সেই শব্দ শুনতে থাকলাম। বাংলার ছেলে আমি, মেঘের শব্দ কত যে শুনেছি তা আর বলে দিতে হবেনা, মেঘের ডঙ্কানাদ এবং বজ্রনাদের সাথে আমার মন ও কান বিশেষ ভাবেই পরিচিত, বর্ষাকালে মেঘের সেইসব বিচিত্র শব্দ শুনে শিশুকালে ভয় পেয়েছি, কৈশোরে যৌবনেও সহসা মেঘের ডাকে চমকে গেছি, তাতে আনন্দের লহর কখনও খুঁজে পাইনি, কিন্তু এখন এই মন্দিরে বসে গতকাল এবং আজ যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা খুঁজে পাওয়া বৃথা। শুয়ে পড়লে পাছে ঘুমিয়ে পড়ে এই আনন্দের তাল কেটে যায়, এই ভয়ে শুলাম না। বহুক্ষণ পরে মেঘমন্দ্র রূপান্তরিত হল মহাউদগীথ ওঁকার নাদে। ওঁ ওঁ ওঁ - ওঁকারের ধ্বনি করতে করতে তড়িৎ-জড়িত নর্মদার ধারা আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি কোষকে প্লাবিত করে ছুটে এসে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঢেউ তুলছে, শুধুমাত্র এই অলৌকিক শব্দানুভূতি হলেও ত বোঝা যেত, এর সাথে ওতপ্রোতভাবে পাগলকরা সব আনন্দের শিহরণও যে জড়িয়ে আছে! সময় কাল ক্ষণ পরিবেশের কথা - সব ভুলে গেলাম। ডুবে গেলাম। যখন জেগে উঠলাম, বাইরে পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারলাম সকাল হয়ে গেছে। বিচার করতে বসে গেলাম মনে মনে। মহাউদগীথনাদ প্রকট হওয়া কি ছেলেখেলার ব্যাপার নাকি! আমি সাধনভজনহীন লোক, আক্ষরিক অর্থেই আমি কোনদিন ধ্যান বা যোগাভ্যাস করিনি, নর্মদেশ্বর শিব বা নর্মদামায়ের উপরও আমার ষোল আনা বিশ্বাস নেই, কেবল বাবার কথায়, মানুষ যেমন দেশভ্রমণ বা পর্যটনে যায়, তেমনিভাবে নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছি। আবেগ বা উচ্ছ্বাসের বশে এসে বরং ফাঁপরেই পড়েছি। এসবই আমার মনের বিকার। অল্প বয়স থেকে বেদ, বেদান্ত, হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতা, যোগীযাজ্ঞবল্ক্যম, শিবসংহিতা, অমনস্ক যোগ, গোরক্ষ-সংহিতা, ভর্তৃহরি প্রণীত বাক্যপদীয় এবং স্ফোটবাদ প্রভৃতি পড়ে পড়ে আমি যে 'এঁচড়ে-পক্ক' দশা প্রাপ্ত হয়েছি, তার ফলেই এই নির্জন নিশীথে শিবমন্দিরে আমার অবচেতন মনে এবং মগ্নচেতনায় অর্জিত এবং আহৃত যে সব কেতাবী বিদ্যা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল আজ। শীতকালে গর্তে যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, শীত চলে গেলেই গর্তের বাইরে বেরিয়ে ফণা তোলে, তেমনি অনুকূল কাল ও পরিবেশ পেয়ে আমার পুঁথিগত বিদ্যা তার মনোহারী বেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

তা হোক, তদবস্থায় আমি ত আনন্দেই আছি, যা কিছু ঘটেছে তার মূলে এই ভাবভূতি বা ভাবেশ্বর মহাদেবেরই মহিমা অথবা নর্মদা মাহাত্ম্য, মুণ্ডমহারণ্যের সেই মহাত্মা শোভানন্দজীর ভাষায়
- নর্মদা মেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ।

আমি নতজানু হয়ে শিবসুন্দরকে প্রণাম করতে করতে বলতে থাকলাম -

চারুস্থিতং সোমকলাবতংশং বীণাধরং ব্যক্তজটাকলাপং।
উপাসতে কেচন যোগিনস্তন্ উপাক্তনাদানুভব প্রমোদম ॥ (দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্)

যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাঁর শিরোভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করে উদগীথ মহানাদকে মাধুর্যমণ্ডিত সুরে ব্যক্ত করছেন, যাঁর জটা কলাপ বিস্তৃত, নাদানুসন্ধান যোগদ্বারা নিত্য নন্দিত, তাঁকে কোন কোন ভাগ্যবান যোগী উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু প্রভু আমি ত তোমার উপাসনা করিনি, তবুও আজ যে দুর্লভ সৌভাগ্য দান করলে, এতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আশুতোষ, তুমি বরদ। হে অহৈতুকী কৃপাসিন্ধো! তোমার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম।

- 'আট বাজ গিয়া, অভি তক আপ নেহি উঠা? তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় ত ?

চমকে পেছন ফিরে দেখি পুরোহিত মশাই 'বোরার' পর্দা গুটিয়ে উপরে তুলছেন। আজ মন্দিরে বহু ভক্তের ভীড়। ব্যতীপাত যোগ - তাই সবাই পূজা দিতে এসেছেন, সবারই হাতে পূজার ডালি। পুরোহিত মশাই আমাকে একজন বুড়ীমাই-কে দেখিয়ে বললেন - এ মায়ী ভগত্ লোগ্ আপকা লিয়ে চাপাতি বানাকর লে আয়া। আপকে ভোগকে লিয়ে চাপাতি বগেরা রাখ দেতা হুঁ।

তিনি পূজায় বসার আগেই তাঁকে এক কোণে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - ইহ্ মন্দির মেঁ আপ্ কভি আজিব শব্দ্ শুনা' ?

-'নেহি জী। মুঝে ইয়াদ আতি, কয় সালকি পহলে এক সাধু ইধর ঠাঁরতা থা। তিন রোজকা বাদ্ উহ্ পাগল হো গিয়া, মন্দর কা চারো তরফ্ উহ্ চিল্লাতে থে -

ফুট গয়া আসমান, শবদকী ধমক মেঁ।
লগী গগন মেঁ আগ, সুরতিকী চমক মেঁ ॥ (পল্টু সাহেব, সন্তবাণী সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ)

অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দের তোড়ে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আত্মজ্যোতি ঝলসে ওঠায় মনে হচ্ছে আকাশে আগুন লেগেছে।

ভারেশ্বর মন্দিরে আমার পাঁচদিন হয়ে গেল। খুব আনন্দেই কাটছে। গত দুদিন ধরে পুরোহিত মশাই আমাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন - আপ্ ইধর কোঈ আজব চীজ দেখা হ্যায় ? এহি মন্দর কা বারে মেঁ আপকা অনুভব ক্যা হৈ ?

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম - সাধারণ দৃষ্টিতে যা আজব বা অলৌকিক বলে প্রতীয়মান হয়, সেইরকম অনেক ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে। সাধারণতঃ যেসব ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় যে সব অভিজ্ঞতা সচরাচর আমরা লাভ করিনা কিংবা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যে সব ব্যাপারের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্দেশ করতে পারি না, তাকেই আমরা আজব বা অলৌকিক বলে মনে হয়, আসলে তা তাদের দুর্বল বা অজ্ঞান মস্তিষ্কের পরাকর্ষ প্রতিকৃয়ার ফলে ঘটে থাকে। আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি লৌকিক-অলৌকিক বিষয়ে আর কিছু বলতে পারব না।

পুরোহিত মশাই বললেন - নারাজ মৎ হোও জী। ঔর আপকো তন্ নেহি করেগা। ভারেশ্বর মন্দর্ কা বারে মে বহুৎ কিসসা চালু হ্যায়।

আমি চুপ করে গেলাম। তিনিও সন্ধ্যারতি সেরে চলে গেলেন।

ভারেশ্বর মন্দিরে আজ সপ্তম দিন। বেলা আটটা নাগাদ পুরোহিত মশাই পূজা করতে এসেছেন, সঙ্গে যথারীতি চব্বিশ পঁচিশজন স্ত্রী-পুরুষ, তাঁরাও এসেছেন পূজা দিতে। হঠাৎ তুবড়ী বাজাতে বাজাতে এক দীর্ঘকায় গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সাধু, এক গেরুয়া ধারিণীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। স্ত্রীলোকটির মাথায় জটা। পুরুষটির মাথাতেও জটা তবে তা কুণ্ডলী করে মাথায় চুড়ার আকারে বাঁধা। উভয়েরই গলায় রুদ্রাক্ষ এবং কপালে ত্রিপুণ্ড্র। পুরুষটির ডান হাতে একটি বড় কালো খরিস্ সাপ জড়ানো আছে সাপটি ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। পূজার্থীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। পুরোহিত মশাই তাঁকে দণ্ডবৎ জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে দূর থেকে। পুরোহিত মশাই আমাকে জানালেন - ইস্ মহাত্মাকা নাম জটিয়াবাবা। এহি দো মূর্তি দশ পনের সাল হোসেঙ্গাবাদ সে নরসিংহপুর তক্ সব জাগাহ্ মেঁ বিচরণ করতা হৈ। হম্ ইনকো কয় দফে দর্শন কিয়া। সাঁপকে লিয়ে কোঈ ডর নেহি।

উনি ত বলছেন কোন ভয় নেই, কিন্তু ভরসাও ত কিছু দেখছিনে। বিষধর সাপ, যার এক দংশনেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাকে নিয়ে এক ঘরের মধ্যে রাত্রি কাটাতে হবে, এই দুশ্চিন্তা আমাকে সাময়িকভাবে চঞ্চল করে তুলল। এই ভেবে মনকে দৃঢ় করলাম যে, এতকাল শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যে যে অদৃশ্য শক্তি পদে পদে আমাকে রক্ষা করে চলেছেন, তিনিই রক্ষা করবেন, আমি আর ভেবে কি করব!

পুরোহিত মশাই পূজা সমাপ্ত করে তিনজনের উপযোগী ফলমূলাদি রেখে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। জটিয়াজী এবং তাঁর সঙ্গিনী গাঁজা টানতে বসলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, উভয়েই কানে ফুট্ বা ছিদ্র আছে, তাতে পেতলের কুণ্ডল। গলায় ঔর্ণ বা রেশম সুতোর ডুরি ঝুলছে। আমি এর আগে গোরক্ষপুর গিয়েছি, সেখানে এবং অন্যত্র গোরক্ষপন্থী কানফাট্টা যোগী বহু দেখেছি। তাঁদের গলাতেও ঐরকম ঔর্ণ সুতোর ডুরি ঝোলানো থাকে, তার সাম্প্রদায়িক নাম - সেলি। তাতে দু-তিন অঙ্গুলি পরিমিত কাঠের বাঁশীর মত একটি যন্ত্রও বাঁধা থাকে, তার নাম - নাদ। বিশুদ্ধ গোরক্ষপন্থী বা কানফাট্টারা বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ করে মনকে অন্তর্মুখ করতে পারলে হৃদয়ে অনবরত যে একতান প্রণবনাদ বা অনাহতনাদ ঝঙ্কৃত হচ্ছে তা শুনতে পাওয়া যায়। ভিতরের সেই নাদে মনকে সমাকৃষ্ট করার জন্য হৃদয়যন্ত্রের উপর অর্থাৎ বক্ষোদেশে নাদটি ঝুলিয়ে রাখার বিধান। জটিয়াজীর বা তাঁর ভৈরবীর গলায় 'সেলি' দেখতে পেলাম, কিন্তু নাদ দেখতে পেলাম না। আর একটি তফাৎ চোখে পড়ল - কানফাট্টা বা গোরক্ষপন্থীদের কানের ছিদ্র অনেক বড় থাকে, তাতে পেতল, রূপা বা দস্তার কুণ্ডল থাকে না, তাঁদের কুণ্ডল সাধারনতঃ সাদা পাথর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরী হয়। তার নাম 'মুদ্রা' বা 'দর্শন'। এইজন্য কানফাট্টাদের অপর নাম দর্শনযোগী। দীক্ষার সময় গুরু এই মুদ্রা, নাদ বা সেলি শিষ্যকে দিয়ে থাকেন। গোরক্ষপন্থী এবং কানফাট্টারা নিজের গুরু বা যে কোন দেবতা বিশেষতঃ শিবকে প্রণাম করার সময় নাদে ফুঁ দিয়ে প্রণবধ্বনি করেন এবং বলতে থাকেন - 'আদেশ, আদেশ'। এই সাধু এবং তাঁর ভৈরবী যখন ভারেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলেন, তখন দেখলাম তাঁরা নেচে নেচে তুবড়ী বাজিয়ে নতশিরে সাপটি শিবলিঙ্গে ছোঁয়ালেন মাত্র, 'আদেশ' উচ্চারণ করলেন না।

ভৈরবী মা তাঁদের উভয়ের ঝোলাঝুলি কম্বলাদি মন্দিরে রেখে এসেই জটিয়াজীকে বললেন - অক্রন্দ কেলা যাস্তি হ্যায় লেকিন্ চাপাতি পাঁচগো। ইসমে হম্ লোগকা ক্যা হোগা? রোটি পাকাউঁ ? জটিয়াজি সম্মতি দিতেই তিনি নিজের ঝোলা থেকে জোয়ার বাজরার আটা বের করে কাঠ জ্বেলে ভোজন বানাতে বসে গেলেন। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম - আপলোগ কানফাট্টা হো ?

- 'নেহি জী। হমলোগ্ কানিপা যোগী হুঁ। শিউজী ঔর গোরক্ষনাথজীকো হমলোগ বহোৎ মানতা হুঁ, হমলোগ গোরক্ষপুর গদী মে যাকর দীক্ষা লেতা হুঁ, লেকিন 'নাদ' নেহি লেতা। শিউজীকা সবসে বড়া চিহ্ন সর্পরাজকো হমলোগ হরবখৎ অঙ্গমেঁ ধারণ করতা হুঁ। কানফাট্টা বগেরা সর্পরাজ দেখনেসে বেঁহোস হো যাবেগা। উনলোগকা এতনা হিম্মৎ নেহি হৈ।

হিম্মৎই বটে। এইসব সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী নিয়ে হিম্মৎওয়ালার সঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস হোলনা। আমি স্নান করতে গেলাম।

স্নান করে এসে পূজায় বসলাম। পূজা করে এসে দেখি তাঁদের 'রোটি পাকানো' হয়ে গেছে। ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। পুরোহিত মশাই-এর রেখে যাওয়া ফলমূল চাপাতি ইত্যাদি এনে ভৈরবী মা আমাদের দুজনকে খেতে দিলেন, নিজেও বসলেন। আমাকে পেটভরে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মায়ের জাত, সর্বাবস্থাতে মা-ই থাকেন। তিনি বৈরাগিনী সন্ন্যাসিনী ভৈরবী যে বেশই ধারণ করুন না কেন, খেতে দেবার সময় মাতৃহৃদয়ের লক্ষণ তাঁদের মধ্যে ধরা পড়ে যায়। তাঁর আদর যত্ন দেখে অনুভব করলাম - স্ত্রী জাতির বাহ্যিক বেশ যাই হোক, অন্তরে তাঁরা অনাদিকাল থেকে মা।

খাবার পর, বেলা তখন দুটো আড়াইটা হবে, মন্দিরের চত্বরে যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে তিনজনই বসে আছি, ভৈরবী মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - 'কলকাত্তা ক্যাতনা বড়া শহর, জব্বলপুর কা তরহ্, ইয়া হোসঙ্গবাদ কা তরহ্? আর জটিয়াজী মৌজ করে গাঁজা টানছেন, আমি কৌতূহলবশে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেললাম - আচ্ছা, আপনি যে সাপটাকে হাতে জড়িয়ে রাখেন, তার কি বিষের থলি নষ্ট করে আগেই বিষ দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে ?

প্রশ্ন করা মাত্রই তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন - ক্যা আপ মুঝে মদাড়ীবালে (সাঁপুড়ে) সমঝাতে হো ? এই বলে দৌড়ে মন্দির থেকে ঝাঁপি নিয়ে এসে সাপটাকে বের করে আমি কিছু বোঝবার আগেই - 'লেও সোহাগিন্ মেরে পেয়ার' - এই বলে ভৈরবীমার বাঁ হাতটা টেনে সাপটাকে খোঁচা মারলেন, চোখের নিমেষে কালসর্প তার লকলকে ফণা তুলে ছোবল দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

দু মিনিটের মধ্যেই ভৈরবী মা থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আমি তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলাম। বিষের জ্বালায় তিনি ছটফট করতে করতে ক্রমে স্থির হয়ে গেলেন। শরীর ক্রমশঃ নীল হয়ে আসছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হল। 'তুম্ খুনী হ্যায়, বদমাস হ্যায়, তুমকো পুলিশকো হাবালা মেঁ দেনা ঠিক হ্যায়' ইত্যাদি যা আমার মনে এলো তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলাম। জটিয়াজী সাপটাকে ঝাঁপিতে ভরে হাসতে হাসতে গিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন, তারপর সাশ্রুনয়নে মন্ত্র পড়তে পড়তে বেরিয়ে এসে একটা ছোট্ট কালো পাথর দষ্টস্থানে জেঁকে বসিয়ে দিয়েই বলতে লাগলেন - নমস্তে নর্মদে ত্বভ্যং ত্রাহি ত্রাহি মাতঃ বিষসর্পতঃ। গুরু গোরখ্ গুরু গোরখ্। ওঁ রুদ্র হসন্তি, বিষ্ণু জপন্তি, রেবা রুখন্তি, মূলে রেবা মধ্যে রেবা, ওঁ হর হর ভারেশ্বর মহাদেও।

প্রায় পনের মিনিট ধরে মন্ত্র পড়ার পর ভৈরবীমার চোখমুখ স্বাভাবিক হয়ে আসল, জটিয়াজী একটা কৌটা হতে এক চিমটি চূর্ণ নিয়ে তাঁর মুখের ভিতর আমাকে ঢেলে দিতে বললেন। দুঘন্টার মধ্যে তাঁকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখলাম। তিনি নিজেই হেঁটে গিয়ে মন্দিরে শুয়ে পড়লেন। জটিয়াজী আমাকে বললেন - ক্যা মন্ত্রকী প্রভাও দেখা? মন্ত্রকী প্রভাও সে হমলোগ্ সর্পরাজকো আপনা বশমেঁ দাবা দেতা হুঁ, গুরু গোরক্ষনাথজীকা দয়া।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমিও নিজের আসনে গিয়ে বসলাম। পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজকের এই ঘটনা মনকে ভীষন বিচলিত করেছে। কিছুতেই ঘুম এলনা, বিশেষতঃ জটিয়াজী ও ভৈরবীমায়ের নাসিকা গর্জনে কেউ তাঁদেরকে এক ঘরে নিয়ে ঘুমোতে পারে সাধ্য কি! মনে মনে স্থির করলাম, রাত্রি প্রভাত হলেই এস্থান ত্যাগ করে আবার পথে বেরিয়ে পড়ব।

সকালে উঠেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই স্নান করে পূজায় বসে গেলাম, পুরোহিত মশাই এলেই যাতে বিদায় নিতে পারি। সারাদিন আবার অনির্দিষ্ট অজানা পথে পাড়ি দিতে হবে। কানিপা যোগী-যোগিনী তখনও ঘুমাচ্ছেন। গাঁঠরী কম্বল বেঁধে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। যথারীতি সকাল আটটায় পুরোহিত মশাই এলেন, একে একে পূজার্থীরাও আসছেন, জটিয়াজী আর ভৈরবীমা ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে বসলেন। আমি প্রাণভরে ভারেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে সকলকে দণ্ডবৎ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

পুরোহিত মশাই বললেন - 'হিঁয়াসে সিরিফ তিন মিল চলনেসে আপ্ নরসিংহপুর জেলা অতিক্রম করকে হোসঙ্গাবাদ জেলামেঁ ঘুসেঙ্গে'।

নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে চললাম উত্তরতট ধরে। বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল নেমে এসেছে নর্মদার তীর পর্যন্ত। তার ফলে কোথাও কোথাও রাস্তা সংকীর্ণ এবং খারাপ হলেও মোটামুটি উপত্যকা অঞ্চলের রাস্তা ভালো। আধঘন্টার মধ্যেই আমি নরসিংহপুর জেলা অতিক্রম করে হোসেঙ্গাবাদ জেলায় প্রবেশ করলাম। মধ্যাহ্নে একটি শিবমন্দিরে পৌঁছলাম। উঁকি মেরে দেখলাম মন্দিরের মধ্যে জল, নর্মদা এখানে বেশ চওড়া, নর্মদার ঢেউ-এর জলই হয়ত মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। যাই হোক কিছু মিছরী নর্মদাকে নিবেদন করে তাই প্রসাদ পেলাম। ভাবলাম নর্মদাতীরের মন্দিরে শিবহীন শিবমন্দির থাকতেই পারেনা, হয়ত কোন কুণ্ড আছে তার মধ্যেই শিব আছেন। ভারতের বহুস্থানেই এইরকম দেখেছি, যেমন মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের মহামায়ার মন্দিরে সিদ্ধিনাথ, দীঘার নিকট চন্দনেশ্বর এবং পুরীর জগন্নাথ

মন্দিরের পশ্চিমে লোকনাথ শিব, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা মহকুমা শহরে হট্টনাগর শিব। তাঁদের লিঙ্গরূপ চোখে দেখা যায় না, জলে ঢাকা আছে। ভাবলাম, চোখে না দেখা গেলেই বা ক্ষতি কি! অষ্ট প্রকৃতিই যাঁর অবয়ব, সর্বব্যাপ্ত সেই নিরঞ্জন পুরুষ এখানেও বিরাজিত। প্রণাম করেই হাঁটিতে লাগলাম, ধারে কাছে কোন লোকের দেখা নেই, ফলে সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারলাম না।

একটু পরেই নর্মদার এপারে ওপারে বহু শিবমন্দির চোখে পড়ল। দূরে দূরে বহু বসতি গড়ে উঠেছে, তাদের কাঁচাপাকা বাড়ী, মরাই, গোয়াল সবই দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে দলে দলে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। তাদের 'দেখভাল' করার জন্য আছে লাঠি হাতে রাখাল ছেলের দল আর বড় বড় কুকুর। মাঠে ফসল কাটা হচ্ছে। দু'চার জন লোককেও পথে দেখলাম। তাদের কাছে জানলাম এই পরিক্রমার রাস্তা থেকে অর্থাৎ নর্মদার তট হতে আধমাইলটাক দূরেই সরকারী বাঁধ আছে, দু'মাইল দূরে বাস চলাচলের পাকা রাস্তাও আছে। সেই রাস্তাতেই যানবাহন মানুষজন চলাচল করে। স্থানে স্থানে ফেরিঘাট আছে। সাধারণ লোক ফেরিঘাটে নৌকায় নর্মদা পেরিয়ে এপার-ওপার যাতায়াত করে।

দ্রুততালে হাঁটার ফলে পা গরম হয়ে উঠেছে। বেলা তিনটা নাগাদ নর্মদার দক্ষিণতটের সাতপুরা পর্বতমালার শীর্ষদেশে চোখ পড়তে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম - আটপৌরে চলতি ভাষায় যাকে বলে 'থ' হয়ে গেলাম। একবার ডানদিকে নীল আকাশের গায়ে বিন্ধ্যপর্বতমালার বাদামী - ধূসর আলপনা আর একবার বামদিকে সাতপুরা পর্বতমালার রূপালী আলপনা, সূর্যরশ্মি পড়ে ঝলমল করছে। কি মূর্খ আমি! এই দৃশ্য এতক্ষণ চোখ মেলে দেখিনি! এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে যদি দু'মিনিট সময় ব্যয় না করি, তবে বিধাতা প্রদত্ত এই চোখ দুটোর সার্থকতা কি!

বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, কেননা প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল, এখনও সূর্য সম্পূর্ণতঃ অস্ত যায়নি। এখনও পথঘাট, পাহাড়, পাহাড়ের গাছপালা সব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে গুলজা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ছোট ছোট ছেলেরা একটা খেলার মাঠে খেলা করছিল ছোট্ট একটা বল দিয়ে।

একজন লোক তাদেরকে খেলা ছেড়ে ঘরে ফিরতে তাড়া দিচ্ছে -

'অব বস্ করো জী। খেল্ ছোড়কে ঘর মে চলো'।

খেলা ছেড়ে ঘরে ফেরাই ত আসল কথা, লাখ কথার এক কথা। একবার একটি ধোপা মেয়ে তার বাবাকে বলেছিল- 'বেলা গেল, বাসনায় আগুন দাও' - সেই কথা শুনেই লালাবাবুর মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অগাধ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে ভজনে ডুবে গেলেন। আমি ত আর লালাবাবু নই, কাজেই ছেলেদের প্রতি লোকটির উক্তি যতই গভীর অর্থবহ হোক না কেন, আমার মনে ভাবান্তর ঘটল না। আমার এখন রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রয়োজন, বিশ্রাম প্রয়োজন, লোকটির কাছে তারই সন্ধান চাইলাম। তিনি বললেন- আধা ঘন্টা চলনেসে আপ্ গোদারিয়া সংগম গুলজারীঘাটমেঁ পঁহুছ যায়েগা। উধর মন্দির ভি হ্যায়, পরিক্রমাবাসীয়োঁ কে লিয়ে আচ্ছা ইন্তেজাম্ ভি হ্যায়।

- ইধর কোঈ মন্দির নেহি হ্যায় ? হম্ বহোৎ থক্ গিয়া।

- হমারা ছোটিসি মহল্লামেঁ মন্দির নেহি হ্যায়, কেঁওকি গুলজারীঘাট বহোৎ নজদিগ্ হ্যায়, উধর শিউজীকা আচ্ছা মন্দির হ্যায়, হমলোগ উধরই পূজা করতা হুঁ। তব্ চলিয়ে ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কা পাশ, উনকা কোঠিমেঁ জাগাহ্ মিলেগা। মিনিট তিনেক হেঁটে নর্মদার ধারে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কুটীরে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম - একটি আমলকী গাছের কাছে এক ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট ছোট চারাগাছকে গরু ছাগলের গ্রাস হতে রক্ষা করার জন্য কাঠ বা বাঁশের যেমন কুণ্ডল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, সেইরকম এক কাঠের কুণ্ডলের মাঝখানে ঠারেশ্বরী মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। খালি গা, কোমরে জড়ানো আছে একটুকরো গৈরিক বস্ত্র। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নর্মদার দিকে।

মৃদু কণ্ঠে জপ করে চলেছেন সেই একই মহানাম -

- রেবা, রেবা, রেবা।

আমলকী গাছের ডালে আকাশ প্রদীপের মত আট দশটা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ঝুলছে। সেই আলোতে দেখলাম - পাশাপাশি দুটো কুটীর আছে।

আমার সঙ্গী লোকটি 'গোড় লাগি মহারাজ' বলে সশব্দে যুক্তকরে প্রণাম করতেই সেই শব্দ শুনে কুটীর থেকে একজন গেরুয়াধারী বেরিয়ে এলেন। তিনি লোকটির কাছে আমি আশ্রয়প্রার্থী জেনে আমাকে দ্বিতীয় কুটীরটিতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কথায় কথায় জেনে নিলাম এই সাধুর নাম বিন্ধ্যেশ্বরী, তিনি ঠাড়েশ্বরী মহারাজের শিষ্য এবং সেবক। ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে কেউ কেউ খাড়েশ্বরী মহারাজ বলেও সম্বোধন করে থাকেন। এই গুলজ্বা গ্রামে নর্মদাতীরে তিনি এইরকম দাঁড়ানো অবস্থাতেই কুড়ি বছর ধরে তপস্যা করছেন, কেউ কখনও তাঁকে এই রকম দণ্ডায়মান অবস্থা ছাড়া বসা বা শোয়া অবস্থায় দেখে নি, দিবারাত্র সঙ্গে থেকে বিন্ধ্যেশ্বরীজীও দেখেন নি। ঐ রকম অবস্থাতেই তিনি শৌচাদী এবং ভোজনকর্মাদি সেবকের সাহায্যে করে থাকেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজীর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনে দু-একটা কথা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতে তিনি এভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে নিরন্তর রেবা মন্ত্র জপ্ করে চলেছেন।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে সাগ্রহে আমাকে জানালেন

- মেরে গুরুজীকে পাশ সবকুছ ঋদ্ধি-সিদ্ধি হ্যায়। দেহাত সে বহোৎ আদমী ইধর আতা হৈ, মাথা টেকতা হৈ ঔর চলা যাতা হৈ। ব্যাস্, ইসীসে উনলোগোঁকা দিল্ কা বাসনাকি পূর্তি হো জাতা হৈ। আপ্ ইধর আজ আয়েঙ্গে, ইয়ে বাত পহলেসে উনোনে বাতা দিয়া হৈ। ইসি ওয়াস্তে এ কামরা ভি আপকে লিয়ে খালি করকে রাখ্ দিয়া হুঁ।

এই কথা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম। বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে জিজ্ঞাসা করে আরও জেনে নিলাম যে এই দুটি কুটীর গুণমুগ্ধ গ্রামবাসীরাই তৈরী করে দিয়েছেন। একটিতে বিন্ধ্যেশ্বরীজী নিজে থাকেন, কুটীরের বারান্দাতে রান্নার কাজ হয়, অপর কুটীরটিতে কচিৎ দু'চারজন আগন্তুক অতিথি এলে তাঁরা থাকেন। পরিক্রমাবাসী সাধুরা সাধারণতঃ আধমাইল দূরের গোদারিয়া নদীর সংগম গুলজারী ঘাটে গিয়ে থাকতে ভালবাসেন। কারণ সেখানে মন্দির সদাবর্ত সবই আছে।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী এক হাঁড়ী গরমজল দিলেন। ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধার পেট চুঁই চুঁই করছে, ক্ষুধার চোটে বিছানায় উঠে বসলাম, পেট ভরে জল খেয়ে আবার শুলাম। সারাদিন পথ চলার পরিশ্রমে ঘুম আসতে এবার দেরী হোলনা। কিন্তু শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। কুটিরের দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে আমলকীতলায় গিয়ে ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কি করছেন, তা দেখার আগ্রহ বা দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় এল। গিয়ে দেখি তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, গাছের ডালে প্রদীপগুলো নিভে গেছে। কম্বল মুড়ি দিয়েও কনকনে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি, আর মহাত্মা খালিগায়েই তাঁর তপস্যা করে চলেছেন। একেই বলে উগ্র তপস্যা। নর্মদামাতার কৃপা এঁরা ছাড়া আর কে পাবেন! চিন্তা করতে করতে কুটীরে এসে আবার শুয়ে পড়লাম, শুয়ে পড়ার সাথে সাথে যেন ঘুম দুচোখে জড়িয়ে এল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। দেখলাম, ঠাড়েশ্বরী মহারাজ সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে। বিন্ধ্যেশ্বরীজীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আজ ২রা ফাল্গুন অর্থাৎ গতকাল ১লা ফাল্গুন হোসেঙ্গাবাদ জেলায় এসে পৌঁচেছি। পরিক্রমা শুরু করা থেকে চারমাস কেটে গেছে। শৌচাদি সেরে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে আসার সময় দেখি প্রায় দশজন ভক্ত ভেট নিয়ে ঠারেশ্বরীজীকে প্রণাম করে আপন আপন সমস্যার কথা নিবেদন করছেন। মহাত্মা কোন উত্তর দিচ্ছেন না, নির্নিমেষনেত্রে নর্মদার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু নিজেদের কথা নিবেদন করেই ভক্তদেরকে সন্তুষ্ট দেখছি, দরবারে যখন পেশ করা হয়েছে তখন তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধি হবেই এই অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী ভক্তদের আনা ফলমূল, বাজরা, জোয়ার, দুধ ইত্যাদি তিনজনে উপযোগী রেখে দিয়ে বাকী সব প্রসাদ হিসাবে বিলিয়ে দিলেন। নর্মদাশ্রয়ী সাধুর কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখতে নেই। সেই বিধি মেনে চলা হচ্ছে কঠোরভাবেই। আমি গোদারিয়া নদীর সংগম গুলজারীঘাট দেখতে যাবো, বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমার সঙ্গে যেতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন – দুপহরমেঁ ভোজন কে বাদ আপকা সাথ চলুঙ্গা।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই ভোগ প্রস্তুত হয়ে গেল। বিন্ধ্যেশ্বরীজী অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁর গুরুদেবকে রুটি, ফল দুধ একটু একটু করে মুখে তুলে দিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তা ভোজন করলেন, কুটিরের দ্বারে বসেই আমি সব লক্ষ্য করলাম। ভোজন পর্বের সময়েও দেখলাম, দৃষ্টি তাঁর নর্মদার দিকেই ন্যস্ত। এইভাবে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকলে যে কোন লোকেরই দু'পা অসাড় হয়ে ফুলে যাবার কথা, কিন্তু সত্তর বছর বয়স্ক ঠাড়েশ্বরী মহারাজের শরীর বয়সের তুলনায় অনেক সতেজ, অনেক সুস্থ এবং বলিষ্ঠ বলে মনে হ'ল।

খাওয়াদাওয়ার পর দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম গুলজারীঘাটের উদ্দেশ্যে। নর্মদার এ অঞ্চলে বিরাট প্রসার। প্রায় বার চৌদ্দ মিনিট হেঁটে গোদারিয়া নদীর সংগমে এসে পৌঁছলাম। বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশ থেকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে একটি ছোট নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে। সংগমস্থলেই একটি শিবমন্দির। সেখানে এক মহাত্মা বসে জপ্ করছেন। মন্দিরে কোন দরজা নেই। শিব এবং সাধুকে প্রণাম করে আমরা গুলজারী ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। এখানেও একটি শিবমন্দির। এই মন্দিরটি বিশাল, তার সুউচ্চ শীর্ষদেশে একটি বড় পেতলের কলস সোনার মত ঝকঝক করছে, কলস ভেদ করে পেতলেরই এক ধ্বজাও শোভা পাচ্ছে। এখানে কিছু সাধু সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ বা মন্দিরে জপ করছেন। একটু দূরেই দেখা যায় পরিক্রমাবাসীদের জন্য সদাবর্ত। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মন্দিরের চত্বরেই বসলাম।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী বলতে লাগলেন - এই গুলজারীঘাট বা আমাদের গুলজা গ্রাম হোসেঙ্গাবাদ ও শিহোর এই দুই জেলার সীমান্তে অবস্থিত। হোসেঙ্গাবাদ জেলার সীমা শেষ হয়ে শিহোর জেলা শুরু হচ্ছে - এইরকম সীমান্ত স্থান এটি। নর্মদার বিচিত্র গতিপথের জন্যই এইরকম হয়েছে। নর্মদার ওপারে দক্ষিণতটের দিকে তাকিয়ে দেখুন ঐ যে সুন্দর বাঁধানো ঝকঝকে ঘাট দেখতে পাচ্ছেন, ঐ ঘাটের নাম - শেঠানীঘাট। জানকী-বাঈ শেঠানী নামে ধনাঢ্য মহিলা নর্মদামাতার কৃপা লাভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ বিশাল ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। হোসেঙ্গাবাদ শহরের সবচেয়ে সুন্দর ঘাট ঐটি। ঐখানে পাশাপাশি যে অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছেন তার একটি নর্মদা মন্দির, একটি শিব মন্দির, একটি বিষ্ণু মন্দির ও একটি হনুমান মন্দির। এখান থেকে ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা, ঐ মন্দিরগুলোর আড়ালে আরও দু-তিনটে মন্দির আছে। ঘাটের পেছনেই মূল শহর। নর্মদা মন্দিরে নর্মদামায়ীর পূর্ণাবয়ব শ্বেতপাথরের সুন্দর মূর্তি আছে। হোসেঙ্গাবাদে স্কুল, দোকান, বাজার, তিন-চারটা ধর্মশালা এবং দুটো বড় সদাবর্ত আছে, সেইজন্য দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করার সময় দলে দলে পরিক্রমাবাসী হোসেঙ্গাবাদে আশ্রয় নেন, জপতপ করেন। হোসেঙ্গাবাদ শহর থেকেই বারমাইল দূরে কোকসর গ্রামে নর্মদাবাসী প্রসিদ্ধ মহাত্মা গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীজীর সমাধি মন্দির আছে। কমলভারতীজীর পর তিনিই হাজার হাজার সাধুর জমায়েৎ নিয়ে 'নর্মদা' পরিক্রমারূপ তপস্যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। হোসেঙ্গাবাদের পশ্চিমদিকে কোকসর আর পূর্বদিকে আট-দশ মাইল গেলেই পাবেন বাঁদরাভান। সেখানে বৈদিক দেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নির তপস্যাক্ষেত্র আছে। বৈশ্বানর নামে এক রাজাও সেখানে তপস্যা করেছিলেন। বাঁদরাভান প্রসিদ্ধ নর্মদা তীর্থ। আপনি উত্তরতট দিয়ে পরিক্রমা করছেন, কাজেই এখন ত আপনার নর্মদা লঙ্ঘন করে ঐসব স্থানে যাবার উপায় নেই। রেবাসংগমে পৌঁছে যখন দক্ষিণতট দিয়ে ফিরবেন, তখন অতি অবশ্যই হোসেঙ্গাবাদের ঐসব স্থান ঘুরে দেখবেন। আগে থেকে আপনাকে অনুরোধ করে রাখলাম। আপনাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছি এই জন্য যে ঐস্থান এমন একজন নর্মদামায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মার চরণস্পর্শে ধন্য যে, প্রায় তিনশ বছর আগে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর তপস্যার তেজে এখনও ঐখানকার পরিমণ্ডল তপস্বীদের আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, একথা আমার পূজনীয় গুরুদেব ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে শুনেছি, অন্যান্য পরিক্রমাবাসীরা আরও বেশী করে ঐখানে নিজেদের গরজেই গিয়ে থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম - কে সেই মহাত্মা, যিনি তিনশ বৎসর আগে আবির্ভূত হয়েও এতকাল ধরে পরিক্রমাবাসী সাধুদেরকে প্রভাবিত করতে পারছেন ? তাঁর নাম কি ?

বিন্ধ্যেশ্বরীজী বললেন - তাঁর নাম ছিল রামজী। হোসেঙ্গাবাদ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ঘানাবড় গ্রামে এক চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিলনা। পূর্বজন্মের সংস্কার ও সুকৃতিবশে

তিনি শিশুকাল হতেই ভগবানের নাম ভজন করতে ভালবাসেন। সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেও তাঁর ভাললাগত না। খেলতে গেলেই দেখা যেত, যখন অন্য ছেলেরা খেলার আনন্দে মেতে আছে, এক ফাঁকে রামজী একধারে সরে গিয়ে একখণ্ড পাথর বা নুড়িকেই ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে, পুজো করছে। হোসেঙ্গাবাদে এখনও যেমন, সেযুগেও তেমনি সাধু-মহাত্মাদের ভীড় লেগেই থাকত। তখন অবশ্য হোসেঙ্গাবাদ নাম ছিল না, নাম ছিল নর্মদাপুর। সাধু মহাত্মা দেখলেই রামজী লুকিয়ে তাঁদের কাছে চলে যেত। পরিক্রমাকারী সাধুরা প্রায় প্রত্যেকেই রেবা রেবা জপ্ করে থাকেন। তাই দেখে বালক রামজীও রেবা রেবা জপ্ করতেন। একবার রামজীর বয়স যখন দশ বা এগার, তখন কতগুলি বোরার উপর গম ও বাজরা রোদে মেলে দিয়ে, যাতে পাখী বা গরু বাছুর এসে তা খেয়ে না যায়, তাই পাহারা দেবার জন্য তাঁর বাবা সেখানে রামজীকে বসে থাকতে বলেন। বাড়ীর সমর্থ স্ত্রী, পুরুষ সকলেই নিজের কাজে চলে যান। দুপুর বেলা তাঁরা ফিরে এসে দেখেন একপাল পাখী মনের সুখে গম বাজরা খাচ্ছে, একটা বাছুরও গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে। রামজী হাসতে হাসতে ছড়া কাটছেন -

রেবাকি চিড়িয়া রেবাকি গেহুঁ,
রেবাকি চীজ্ রেবাকো দেহুঁ।

রামজীর বাবা রাগে দৌড়ে এসে রামজীর গালে এক থাপ্পর মারলে রামজী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ কিছুতেই হয়না। প্রায় সন্ধ্যাকালে জঙ্গল থেকে এক সাধু এসে তাঁর কানে রেবামন্ত্র শোনালেন। রামজীর জ্ঞান ফিরে এলো। সাধুটি রামজীর বাবাকে বলে গেলেন, এই ছেলেকে দিয়ে তোমার সংসারের কোন কাজ হবেনা। একটি আলাদা কুটির করে দিয়ে একে ভজনেই মেতে থাকতে দাও। কিন্তু সংসারী লোক প্রাণে ধরে কি ছেলেকে বিষয়ে নির্লিপ্ত থেকে ভগবানকে ডাকার উপদেশ মেনে নিতে পারে! বিশেষ করে পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ শতগুণ। দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলে কে তাঁর এই পাগল ছেলেটাকে দেখবে! তাই তিনি রামজীকে কিছু ক্ষেতি কাজ শিখাবার জন্য অনেক আদর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক দিন মাঠে লাঙ্গল করাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু একপাক লাঙ্গল ঘুরিয়ে যেই দেখলেন লাঙ্গলের ফালে রক্তের দাগ, সঙ্গে সঙ্গে রামজী লাঙ্গল ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড়োতে লাগলেন। অনেক খুঁজে পেতে তাঁর বাবা মা তাঁকে পেলেন নর্মদার ধারে। উভয়ে কাঁদাকাটা করে তাঁকে কোনমতে ফিরিয়ে আনলেন ঘরে। এরপর অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে তাঁর বাবা তাঁকে একটি পৃথক কুটীর করে দিয়ে একটি তামাকের দোকান করে দিলেন। কুটীরের দাওয়ায় তামাকের দোকান করে দিলেন। কুটীরের দাওয়ায় তামাক পাতার বাণ্ডিল আর একটি দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা পড়ে থাকত। তামাক পাতা বিক্রয়ের দিকে রামজীর মন ছিলনা, তিনি কুটীরের মধ্যে বসে ভজনেই মেতে থাকতেন। পাশাপাশি মহল্লার লোকেরা তামাক পাতা কিনতে এসে নিজেরাই ওজন করে যে যার প্রয়োজন মত তামাক নিয়ে দাম সেখানেই রেখে যেত। এই ভজনানন্দী মানুষটাকে কেউ ঠকানোর কথা চিন্তাও করত না। একবার এক খরিদ্দার দুষ্টবুদ্ধিবশে এক সের তামাক নিয়ে আধ সের তামাকের দাম রেখে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখল তামাক পাতা অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে। সে ছুটে এসে রামজী বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সেই থেকে মহল্লাবাসীরা ধীরে ধীরে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হতে লাগল। একবার নর্মদায় প্রচণ্ড বন্যা হ'ল। সেই বন্যায় সবকিছু ভেসে গেল। বানের প্রচণ্ড তোড়ে ঘানাবড় গ্রাম এবং অনেক মহল্লাই জলে ডুবে গেল। গরু মহিষ যে কত ভেসে গেল তার ইয়ত্তা নেই। মহল্লার লোকজন বাড়ীঘর ফেলে পাহাড়ে উঠে কোনমতে আত্মরক্ষা করল। বানের জল সরে যেতে চারদিক থেকে ভক্তরা রামজীর খোঁজ নিতে এলেন। তাঁরা দেখে অবাক হলেন, চারিদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল, মাঝখানে রামজীর কুটীরটি শুধু জেগে আছে। তাঁর সেই ভজন কুটীরের চেয়ে আরও উঁচু স্থানের বাড়ি ঘর জলে ডুবে গেছে কিন্তু প্রলয়ঙ্করী বন্যার জল কুটীরের দাওয়া পর্যন্ত এসেছে। আত্মভোলা রামজী দাওয়ায় বসে নর্মদামায়ীর ভজন গেয়ে চলেছেন।

এই ঘটনার পর নর্মদামায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মা হিসেবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পরল। হাজার হাজার ভক্তের ভীরে এবং ভজনগানে তাঁর আশ্রম সর্বদা মুখর থাকত। তিনি কাউকে দীক্ষা দিতেন না, বলতেন - আকুল হয়ে ভগবানের শরণ নিলেই ভগবান ভক্তকে দেখা দেন, রক্ষা করেন। রেবাতীরে 'রেবা' নামই মহাসিদ্ধ মন্ত্র। শিব প্রদত্ত মন্ত্র।

তাঁর দেহরক্ষার ঘটনাও অলৌকিক। আগে থেকেই তিনি মৃত্যুর দিনক্ষণ ঘোষণা করে একটি সমাধি-কুটীর তৈরী করান। নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত হাজার হাজার ভক্তকে আশীর্বাদ করে কুটীরের মধ্যে বসে যান যোগাসনে। ভক্তরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সাশ্রুনেত্রে প্রতীক্ষা করতে থাকেন সেই মহাক্ষণটির। যথাক্ষণে তাঁর শরীর ঘিরে দাউ দাউ করে স্বতঃই আগুন জ্বলে ওঠে। হাজার হাজার ভক্তের চোখের সামনে তাঁর দেহ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ঘানাবড়ে সেই সমাধি-মন্দির এখনও আছে। প্রতিদিন শত শত গৃহীভক্ত এবং পরিক্রমাবাসীরা রামজী বাবার আশীর্বাদ নিতে যান। এছাড়াও ঘানাবড় হতে কয়েক মাইল দূরে খাপড়খেদা গ্রামে এবং হোসেঙ্গাবাদ ষ্টেশনের কাছে আরও দুটি রামজী বাবার স্মারক-মন্দির আছে।

আমি বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে বললাম-আপনি রামজী বাবার দেহান্তের যে বিবরণ শোনালেন, এতো আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার কথা। দক্ষ প্রজাপতি যখন শিবহীন যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন তখন তাঁর কন্যা সতী অনাহুত হয়েও পিতৃগৃহে গিয়েছিলেন। দক্ষ তাঁর সামনে শিবনিন্দা করতে থাকলে, সতী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন - আপনি আমার স্বামী এবং ইষ্ট মহাদেবের নিন্দা করায় আমি নিজেকে অশুচি ভাবছি। সুতরাং আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহ আমি মৃতদেহের ন্যায় এখনই ত্যাগ করব। এই বলে সতীদেবী উত্তরাস্যা হয়ে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন এবং আচমনপূর্বক পীতবসনে দেহ ঢেকে যোগস্থ হলেন। সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁর দেহ সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার দ্বারা যাঁরা যোগীশ্বর একমাত্র তাঁরাই এইভাবে দেহকে প্রজ্জ্বলিত করে ফেলতে পারে। রামজীবাবা যোগীশ্বর ছিলেন সন্দেহ নেই।

বিন্ধেশ্বরীজী বললেন-এইজন্যই ত বলছি, ফেরার পথে দক্ষিণতট দিয়ে যখন আসবেন তখন অবশ্যই হোসেঙ্গাবাদ পৌঁছে ঘানাবড়ে রামজী বাবার সমাধি-মন্দির দেখবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। হোসেঙ্গাবাদ নর্মদার দক্ষিণতটে একটি বড় নর্মদাতীর্থ।

- দেখার জন্য ফেরার পথে নিশ্চয়ই যাবো। তবে কোন অভীষ্ট সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। আসার সময় আমাকে রৈকপনেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতও দক্ষিণতটের ব্রহ্মাণতীর্থ দেখিয়ে বলেছিলেন, সেখানে যে পিষাণহারীর মন্দির আছে, তা অবশ্যই দেখা উচিৎ, কারণ পিষাণহারীর মন্দিরে প্রার্থনা করলে নাকি সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমাকে একাধিক মহাত্মা বলেছেন, নর্মদাতীরে কেবল রেবানাম জপ্ করলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, মার্কণ্ডেয় মুনির মতে ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং রেবাসংগমে গেলেও সর্বাভিষ্ট সিদ্ধ হয়। আমার অভীষ্টের পরিমাণ বা সংখ্যা কত, যে তা পূরণ করার জন্য এতগুলি দৈবশক্তির সাহায্য নিতে হবে! আমার বাবা কিন্তু আমাকে শিখিয়েছেন - এক সাধে ত সব সাধে, সব সাধে সব যায়।

আমার কথা শুনে বিন্ধ্যেশ্বরীজী থতমত খেয়ে গেলেন। এক মিনিট চুপ থেকে বললেন - অব চলেঙ্গে। গুরুজীকো ছোড়কে জ্যাদা সময় বাহর মেঁ রহনা ঠিক নেহি। গলজ্বারীঘাটের শিবমন্দিরের দরজা খুলেছে। প্রণাম করে গুলজা গ্রামে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের আশ্রমে ফিরে এলাম।

তখনও অনেক বেলা আছে। এসে দেখলাম ঠাড়েশ্বরীজী সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী তাঁর গুরুদেবকে প্রণাম করে কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন, আমি নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভীড় করে এল। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদেরকে ইষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক রকম শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে দেখেছি। প্রয়াগে কুম্ভমেলায়, কল্পবাস ব্রত পালনের সময় মাঘমেলায় ঊর্ধবাহু, আকাশমুখী, পঞ্চধূনী, জলশয্যী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সাধু দেখেছি। গুদরী সম্প্রদায়ের সাধু সবসময় চলতে থাকেন, হয় পথে নতুবা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পদচালনা করতে করতে তাঁদের দুটো পা ফুলে গেছে তবুও হাঁটার ছন্দে তাঁদের পদচালনার বিরাম নেই। কেউ কেউ এক বা উভয় বাহুকে সতত ঊর্ধেই তুলে রাখেন। কেউ বা উপরের দিকে কোন গাছের ডালে পা দুটো বেঁধে রেখে অধোমস্তকে ঝুলতে থাকেন এবং মাথার নিচে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করেন। এঁদের নাম ঊর্ধমুখ তপস্বী। মেদিনীপুর জেলার ধলহারা গ্রামে 'পাগলী মা' বা 'গৌরীমা' নামে একজন মহাসাধিকা ছিলেন। আমার জীবনে তিনিই প্রথম সাধু। তখন আমার বয়স মাত্র বার বৎসর। আমাদের গ্রামবাসী পুঁটিরাম পাত্র নামে পাগলীমায়ের এক শিষ্যের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করার জন্য বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেছিলাম, বৈশাখ মাসের খররৌদ্রে পাঁচ দিকে পাঁচটা

অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেই যোগেশ্বরী মা পঞ্চতপা করছিলেন। তাঁর গুরু ভূষনানন্দজী ছিলেন ত্রাটকসিদ্ধ মহাযোগী। তিনি প্রতিদিনই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। কুম্ভমেলাতে কাউকে দেখেছি কাঁটার উপর শুয়ে আছেন, কেউ বা প্রচণ্ড শীতে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে সাধনা করে চলেছেন। এঁদের নাম জলশয্যী। অযোধ্যার সরযুতীরে এক মহাত্মার জল-তপস্যা দেখেছিলাম, একটি মাচার নিচে একটি খাদ, খাদটি জলপূর্ণ, তার মধ্যে তিনি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছেন, মাচার উপর একটি ছিদ্রযুক্ত কলস, দুজন সেবক অহরহ সেই কলসে জল ঢালছেন, জল সেই সাধুর মাথার উপর গিয়ে পড়ছে। তিনি তন্ময় হয়ে ইষ্টনাম জপ্ করে চলেছেন। পঞ্চধূনী বা পঞ্চতপার চেয়েও এই জল-তপস্যাকে কঠিনতর বলে মনে হয়েছিল। এখানে এই গুলজা গ্রামের ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে দেখছি দিনরাত দাড়ানো অবস্থাতে নিজের সাধনায় মগ্ন আছেন।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনে ধিক্কার জন্মাল। আমার পক্ষে ত কোন উগ্র তপস্যাই সম্ভব নয়। তাহলে আমার কি হবে! নর্মদেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে বললাম- প্রভু! তোমার কৃপালাভ করতে হলে এত যদি উৎকট উগ্র তপস্যার প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার নাম আশুতোষ কেন !

সূর্যাস্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্ধকারের ঢল নামছে বিন্ধ্যপর্বতের সর্বত্র। আশ্রমে ফিরে এলাম, পাঁচ-ছয় জন মহিলা এসে আমলকীর ডালে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী ধূপ দীপ এবং কর্পূর জ্বালিয়ে তাঁর গুরু ঠাড়েশ্বরী মহারাজের আরতি করতে করতে বলছেন -

অনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥

ঠাড়েশ্বরীজীর দেহে মনে কোন চাঞ্চল্য নেই, বিকার নেই, কোন দিকে দৃকপাত করছেন না, তাঁর অপলক দৃষ্টি একইভাবে নর্মদার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে।

আরতি শেষ হতেই মায়েরা চলে গেলেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী ঠাড়েশ্বরীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আমিও প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি আহ্বানের ভঙ্গীতে নড়ে উঠল, দৃষ্টি সেই একইভাবে নর্মদার দিকে, আমি তাঁর তর্জনীর ইঙ্গিত বুঝতে পারিনি, বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমার গায়ে টোকা দিয়ে মহাত্মার কাছে এগিয়ে যেতে সংকেত করলেন। আমি তাঁর কুণ্ডলের কাছে এগিয়ে গেলে তিনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন - য়হ্ খালা কা ঘর নাঁহি।

এই খণ্ডিত বাক্যাংশের মর্ম কিছু বুঝলাম না। বক্তার দৃষ্টিতে যদি কোন Expression না থাকে তাহলে এমনিতেই বক্তব্য বিষয়ের রস বা ভাব উপলব্ধি করা যে কোন শ্রোতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ এখানে তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলি আংশিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে, যার আক্ষরিক শব্দার্থ হ'ল - এটা মাসীর বাড়ী নয়! হঠাৎ কোন কথা নেই বার্তা নেই, বিনা প্রসঙ্গে আচমকা তিনি এমন কথা কেন বললেন বুঝতে পারলাম না, আমি নীরবে দাঁড়িয়েই রইলাম। এক মিনিট পরেই তিনি আবার মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন-

কবীর য়হ্ ঘর প্রেম কা, খালা কা ঘর নাঁহি।
সীস উতারেঁ হাথি করি, সে পৈসে ঘর মাহি ॥
কবীর নিজ ঘর প্রেম কা মারগ অগম অগাধ।
সীস উতারি পগ তলি ধরৈ তব নিকটি প্রেম কা স্বাদ ॥

অর্থাৎ নিজের হাতে মাথা কেটে হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে হবে প্রভুর প্রেম-মন্দিরে। দুর্গম সেই পথ, অসীম তার বিস্তার। এ মাসীর বাড়ী নয় যে আবদার করলে আর চোখের জল ফেললেই যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যাবে!

মহাত্মা আর কিছু বললেন না - আগের মতই নীরব নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা কুটীরে ফিরে এলাম। বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কারণ, তাঁর গুরুদেব ক্বচিৎ কদাচিৎ কারও কারও সঙ্গে দু-একটি কথা বলেন বটে কিন্তু গত বিশ বছরের মধ্যে আমাকে নিয়ে মোট তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে তিনি দেখলেন। কাজেই আমার মহা সৌভাগ্য।

বিছানায় বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। বিকেলে নর্মদার ঘাটে বসে পঞ্চতপা, জলতপা প্রভৃতি তপস্যাকে আমি উৎকট এবং উগ্র ভেবে মনে মনে ভগবানের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিলাম, এত কঠোর তপস্যা ছাড়া তোমাকে পাওয়া যাবেনা, এই যদি তোমার বিধান হয় তাহলে তোমার আশুতোষ নাম কি মিথ্যা! বুঝতে পারলাম - ঠাড়েশ্বরী মহারাজ আজ সন্ধ্যায় তারই জবাব দিয়েছেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমাকে আগেই কথায় কথায় জানিয়েছেন যে আমি যেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌছলাম সেদিনই মধ্যাহ্নে নাকি তাঁর গুরুদেব আমার আসার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। মহাত্মা কি তাহলে সত্যই অন্তর্যামী এবং ভবিষ্যতদ্রষ্টা!

তিনি যাই হোন, তবুও তাঁর ঐরকম তপস্যার উগ্রতাকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার মনে হল, আপাতঃ দৃষ্টিতে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের ঐরকম বিচিত্র তপশ্চরণকে যতই কঠোর মনে হোক, এর মূলেও আছে ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম। প্রীতম্ প্রিয়তমের প্রতি আকুল করা সব ভুলানো প্রেমভাব না জন্মালে কি কোন মানুষের পক্ষে নরদেহ ধারণ করে এত কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হয়!

ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে আমার শুকনো যোগীমাত্র বলে মনে হচ্ছে না, তিনিও প্রেমিক, আর প্রমিক বলেই তাঁর শোয়া বসা নেই। অপলক দৃষ্টিতে অহোরাত্র তাঁর প্রমাস্পদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম ভোর হয়ে আসছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফাল্গুন মাস পড়ে গেলেও তখনও খুব শীত। কুয়াশার অন্ধকারে সব ঢেকে আছে। কৌতুহল বশে পা টিপে টিপে মহাত্মা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে এলাম। তাঁর জটা এবং পরিধেয় গৈরিক বস্ত্রখণ্ড শিশির পড়ে ভিজে গেছে। তাঁর ডান দিকের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান। সহসা তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী কিঞ্চিৎ নড়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলার মত এটাকে তর্জনী সংকেত মনে করে সাহসে ভর করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় দু-মিনিট পরে পূর্বের মতই মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন -

প্রীতম্ হসনাঁ দূরি করি, করি রোবন সৌ চিত্ত।
বিন্ রোয়াঁ বস্তু পাই এ প্রেম পিয়ারা মিত্ত॥
হঁসি হঁসি কান্ত ন পাইএ, জিন্ পায়া তিন্ রোই।
জো হাঁসে হী হরিমিলৈ তব্ নহী দুহাগিন্ কোঈ॥

অর্থাৎ প্রিয়তম এমনিতর দুঃখের পথ দিয়েই আসেন। হাসতে হাসতে তাঁকে পাওয়া যায়না। যে তাঁকে পেয়েছে কাঁদতে কাঁদতেই পেয়েছে; দিনরাত তাঁর চোখে জল ঝরেছে, তবে প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটেছে। হাসতে হাসতে যে হরিকে পেল তার মত দূর্ভাগা আর কেউ নেই।

আবার সব চুপচাপ। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছ হতে সরে এলাম।

গুলজা গ্রামে চারদিন কেটে গেল। আনন্দেই কাটল। প্রতিদিনই বিকেলে গুলজারী ঘাটে বসেছি। এইবার আবার পথে বেরিয়ে পড়তে চাই। পঞ্চম দিনে বিন্ধ্যেশ্বরীজীর সন্ধ্যারতি শেষ হলে মহাত্মার কাছে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলাম- আগামীকাল সকালেই আমি যাত্রা করব, আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। কি সৌভাগ্য আমার, আজও তিনি কথা বললেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন - এতদিন ত ঘুরলে! নর্মদা পরিক্রমা করতে এসে কি অনুভব করলে? অনেক ভেবে উত্তর দিলাম - অমরকণ্টকে পরিক্রমা আরম্ভ করার সময় আমাকে একজন মহাত্মা শুনিয়েছিলেন -
পরিক্রমার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম হল, নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে চলতে হবে। পরিক্রমাকালে সেইভাবেই আমি হেঁটেছি। অনুভব করেছি, পরিক্রমাকালে পরিক্রমাবাসী নর্মদাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারুন বা না পারুন, নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে সবসময় চোখে চোখে রাখেন, এক মিনিটও চোখের আড়াল করেন না।

মনে হল যেন এক লহমার জন্য তাঁর পলকহীন চোখে হাসির লহর ফুটে উঠল।

ষষ্ঠদিন ভোরে উঠেই বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করে ঠাড়েশ্বরীজীকে প্রণাম করলাম। বাবা এবং নর্মদামায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম গুলজারী ঘাটের দিকে। গুলজা গ্রামে যে অভিজ্ঞতা হল তা কোনদিনই ভুলতে পারব না। বাবার আশীর্বাদে অনেক সাধু-মহাত্মা দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষণ অন্তর্লক্ষ্য, বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন ঠাড়েশ্বরী মহারাজের মত শাম্ভবী মুদ্রায় নিত্যস্থিত এইরকম উচ্চকোটির যোগী আমি খুবই কম দেখেছি।

গুলজারীঘাট অতিক্রম করে বুধনীঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন বড়জোর বেলা দশটা হবে। বুধনীঘাটে বহুলোকের সমাগম দেখলাম। স্ত্রী-পুরুষ-বালক নির্বিশেষে সকলে স্নান করছে, ঘাটের উপরেই শিবমন্দির। ঘাট থেকে মাইলখানিক দূরেই বুধম্ বলে এক মহল্লা আছে। শুনলাম, খুব সম্পন্ন গ্রাম, লোকজনের বসতি যথেষ্ট। এত শীঘ্র স্নান করতে ইচ্ছা হলনা। মন্দিরের শিবকে প্রণাম করে এগিয়ে চললাম। কতকটা যাবার পরেই গরম বোধ করলাম। কম্বলটা কাঁধে ছিল, সেটাকে গাঁঠরীর মধ্যে বেঁধে হাঁটতে লাগলাম উত্তরতট ধরে। আকাশ পরিষ্কার, পথও মোটামুটি ভাল। পথিমধ্যে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম - পথে আর কোথাও ভাল ঘাট বা মন্দির পাবো? তিনি বললেন - করীব দশ মিল যানেসে আপকো হোলিপুরা মিলেগা, উধর্ পরিক্রমাবাসী ঠারতা হৈ। তিনি প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আমি কোনমতে তাকে নিরস্ত করে হাঁটতে লাগলাম। বেলা আড়াইটা বেজে গেল, তবুও হোলিপুরার দেখা পেলাম না। পথে অল্পস্বল্প লোক চলাচল আছে, যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে - নজদিগ হ্যায়। তিনটা বাজলো তবুও 'নজদিগের' নাগাল পেলাম না। আমার মনে পড়ল, একবার কটকে নেমে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমৎ ভাগীরথী পরমহংসের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি তখন ব্রাহ্মণী নদীর তীরে মধ্যশ্মশান নামক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে যখনই কোন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি মধ্যশ্মশান আর কত দূর, তাদের প্রত্যেকের মুখে একই কথা শুনেছি - বাট দিসুছে, অর্থাৎ ঐতো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই 'দিসুছে' পথ হাঁটতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। এখানেও বোধ হয় 'নজদিগের' নাগাল পেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে তাই ঘটল, বেলা চারটা নাগাদ আমি হোলিপুরাতে এসে পৌঁছলাম। মাঝখানে বেলা সাড়ে বারটা বা একটা নাগাদ ঘাটে নেমে স্নান তর্পণ করতে আধঘন্টা হয়ত সময় লেগেছে। সেই আধঘন্টা বাদ দিলে দশমাইল রাস্তা হাঁটতে কখনই পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগতে পারে না। বিশেষ করে এতো আর মুণ্ডমহারণ্যের পথ নয়, এতো এবড়ো খেবড়ো উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ হলেও উপত্যকা অঞ্চল দিয়েই হেঁটে এসেছি। হোলিপুরা মন্দিরে দেখলাম একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং একজন বৃদ্ধামায়ী বসেছিলেন। আমি মন্দিরে পৌঁছতেই সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলে উঠলেন -

লেও মায়ী, আপকা ভাগ পুরা হো গিয়া। আমার দিকে তাকিয়ে যা বললেন তার সারমর্ম এই যে - ওই বুড়ীমার ব্রত - তিনি সন্ধ্যার আগে তিনজন সাধুকে ভোজন করিয়ে তবে অন্নজল গ্রহণ করেন। যদি কোনদিন তা সম্ভব না হয়, তাহলে নির্জলা কাটিয়ে দেন। ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছাড়া আর একজন সাধুকে তিনি খাইয়েছেন, আমিই তৃতীয়জন। মন্দিরের বারান্দায় গাঁঠরী ফেলে নর্মদা থেকে কমণ্ডলু ভরে জল এনে শিবের মাথায় ঢাললাম, প্রণামাদি সেরে খেতে বসলাম। চাপাটি, কিছু শাক-সব্জীর তরকারী এবং দুধ তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম, এই ভারতের মাটিতে পূণ্যলোভাতুরা ব্রতচারিণী হিন্দুরমণীর উচ্চাদর্শ এবং পবিত্র ধর্মসংস্কারের কথা। চকিতে একবার মনে হল, ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে যে বলে এসেছি, নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে চোখে চোখে রাখেন, একথা ধ্রুব সত্য। খাঁটি কথা, প্রাণের কথাই বলে এসেছি।

আমাকে খাইয়ে বুড়িমা চলে গেলেন। একটু পরেই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে দুজনে মন্দিরে ঢুকলাম। আমি সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম - এহি মহাদেবকা ক্যা নাম হ্যায়?

- নর্মদেশ্বর হ্যায়, ঔর ক্যা। শিউজীকা নাম শিউজী হ্যায়।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক! ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধকরা যুগ যুগ ধরে গুরুপরম্পরাগত বহুবিধ সিদ্ধ পথের মধ্যে যে কোন একটা পথ ধরে দুশ্চর তপস্যা করে থাকেন। যোগের পথ না ভক্তির পথ - কোন পথের পথিক আপনি ?

তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন- হম্ দিওয়ানা হ্যায়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে নাম লেখাইনি আমি। প্রভুর নাম করতে ভালবাসি, নর্মদাতটে ঘুরে ঘুরে সাধ্যমত আমি তাঁর নামগান করি। ভগবৎ-প্রেমের কোন বাঁধাধরা পথ আছে বলে আমি মনে করিনা। যে কোন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলে, চলতে চলতে পায়, পেতে পেতে চলে।

অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পারছিনা। যে যার শয্যায় বসে আছি। সাধুজী বলে চলেছেন- ভগবানের যিনি যথার্থ প্রেমিক, ভগবান ছাড়া তাঁর আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। প্রেমের পথে ভক্ত তাঁর প্রিয়তমকে ক্ষণে পায় ক্ষণে হারায়। যখন পায় তখন আনন্দে আত্মহারা হয়, আর যখন হারায় তখন যাতনায় ছটফট করে। প্রেমিকা প্রিয়তমকে পেয়েও পায়না, বুঝেও বোঝেনা তাঁর রহস্য। কিন্তু একবার যদি রহস্য বোঝে তাহলে প্রিয়ের সন্ধানে আর এখানে সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়না। তখন আপন অন্তরের মধ্যেই তাঁকে দেখতে পায়, দেখতে পায় তার প্রিয়তম প্রভু হৃদয় আলো করে রয়েছেন।

এই বলে তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একটি ভজন শুরু করলেন -

চলি মৈঁ খোজমেঁ পিয়কী। মিটি নহি সোচ ইহ্ জিয়কী॥
রহে নিত পাশ হি মেরে। ন পাউ ইহারকো হেরে॥
বিকল চহুঁ ওরকো ধাউঁ। তবহুঁ নহিঁ কান্তকো পাউঁ॥
ধীরজ্ধ ধরুঁ ক্যায়সে ধীরা। গয়ি গির হাথসে হীরা॥
কটি জব্ নৈনকী ঝাঁঈ। লখ্যা তব্ হৃদয়মেঁ সাঁঈ॥

গানের সরলার্থ হল - আমি প্রিয়ের খোঁজে চলেছি। তাঁকে কি করে পাব, অন্তরের এই ভাবনা কিছুতেই ঘুচছে না। বন্ধু আমার নিয়তই পাশে রয়েছেন তবু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। আকুল হয়ে ছুটে বেড়াই তবুও প্রাণকান্তকে পাচ্ছিনা। কি করে আমি ধৈর্য ধরব বল, আমার হাত থেকে যে হীরা পড়ে গেছে। যখন আমার চোখের পর্দা সরে গেল তখন তাকিয়ে দেখি প্রভু আমার হৃদয়েই রয়েছেন।

সাধু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অত্যন্ত দরদ দিয়ে প্রত্যেকটি চরণ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলেন। কোন বাদ্যযন্ত্র নেই, খালি গলায় তাঁর সুরের লহর আমার শুষ্ক প্রাণকেও সরস করে তুলল। মন্দিরের ভেতরে সেই সুরের যাদু যেন একটা সুরভিত মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকারেই অনুভব করলাম সাধু শুয়ে পড়েছেন। এই নর্মদাতটেই কয়দিন ধরে দেখে এলাম ঠাড়েশ্বরী মহারাজের উৎকট তপস্যা। শুনে এলাম তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি - য়হ্ খালা কা ঘর নাঁহি, অর্থাৎ এ মাসীর বাড়ী নয় যে আবদার করলে আর চোখের জল ফেললেই তাঁকে পাওয়া যাবে। এখন এই নর্মদাতটেই শুনছি, প্রেমিক সাধুর আর্তি। তাঁর প্রাণের প্রত্যয়, প্রিয়তমের কাছে আবদার করলে আর যে কোন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেই চলতে চলতে সে পায়, আর পেতে পেতে চলে।

হোলিপুরার মন্দিরে এক রাত্রি কাটল। সকালে ঘুম ভাঙল 'দিওয়ানা' বৃদ্ধ সাধুর গানে। তিনি গুনগুন স্বরে আপন মনে গেয়ে চলেছেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরের মধুর গানের ভাষা বুঝবার জন্য কান পাতলাম। তিনি গেয়ে চলেছেন -

সকল শিরোমণি নাম হৈ, সব ধরমকে মাহিঁ
অনন্য ভক্ত উহ্ জানিয়ে, সুমিরণ ভুলৈ নাহিঁ॥
মনহি মনমেঁ জপ করুঁ, দরপণ উজ্জ্বল হোয়॥
দরশন হো বৈ রামকা, তিমির যায় সব খোয়॥

অর্থাৎ সকল ধর্মের সারকথা এই যে ভগবানের নামই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। তাঁকেই অনন্য ভক্ত বলে জানবে, যিনি মুহূর্তের জন্য নামের স্মরণ বা জপ ভোলেন না। মনে মনে অহরহ প্রভুর নাম জপ করবে, তাতে আমার চিত্তরূপ দর্পণ পরিমার্জিত হবে, চিত্তের অন্ধকার দূরীভূত হলেই প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন মিলবে।

তিনি গান করতে থাকলেন, আমি প্রাতঃকৃত্য সারতে বাইরে গেলাম। এসে দেখি, তিনি তাঁর একমাত্র সম্বল একটি ছোট সতরঞ্চি এবং কম্বলটি গুটিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। আমাকে বললেন দড়ি কম্বল বাঁধ লিয়া, অব চলিয়ে আপকে সাথ বৈষ্ণবতীর্থ তক্ চলুঙ্গা। আমিও সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নর্মদার তীর ধরে হাঁটতে লাগলাম। একই পথ। অনেকক্ষণ নীরবে হেঁটে যাবার পর নিছক কথা বলার জন্যই তাঁকে বললাম, মুখ বুজে একা একা হাঁটলে পথের শ্রম বড় বেশী বলে মনে হয়। আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে নর্মদামাতা সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাতে শোনাতে চলুন, গল্প করতে করতে দুজনে পথ চললে পথের শ্রম অনেক লাঘব হবে। আপনার মত লোককে সঙ্গী পেয়েছি, এ আমার ভাগ্য। ব্যাস, আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি গান আরম্ভ করে দিলেন -

না মৈঁ ধর্মী নাহি অধর্মী না মৈঁ যতি না কামী হো।
না মৈঁ কহ্তা না মৈঁ শুনতা না মৈঁ স্বামী-সেবক হো।
না মৈঁ বন্ধা না মৈঁ মুক্তা না মৈ বিরত ন রংগী হো।
না কাঁহুসে ন্যারা হুয়া না কাহুকে সংগী হো॥

অর্থাৎ আমি ধার্মিক নই, অধার্মিকও নই। আমি নির্বানপ্রার্থী যতি নই, কামনাপরায়ণ কামুকও নই। আমি সেবকও নই, স্বামীও নই। আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই। বিরক্তও নই, অনুরক্তও নই। কারুর থেকে আলাদা নই, কারুর সঙ্গীও নই।

গান গাইতে গাইতে তিনি ঢলে পড়লেন। আমি না ধরে ফেললে কঙ্করময় পথে পড়ে গিয়ে তাঁর আঘাত লাগত সন্দেহ নেই। আমি ধীরে ধীরে তাঁকে রাস্তার উপরে শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে কমণ্ডলুর জলের ঝাপটা দিলাম। ভাবতে লাগলাম, এঁকে নিয়ে পথ চলতে ত বেশ বিপত্তি দেখছি। দিওয়ানা সাধু এইভাবে যদি কথায় কথায় গান ধরেন এবং ভাবের ঘোরে পথের মধ্যেই নাচতে থাকেন, তবে পথে এগিয়ে যাওয়া তো বিষম দায় হবে। 'হর নর্মদে হর', 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে তাঁর গায়ে নাড়া দিতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন। বেলা দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম সাততুমড়ী মহল্লায়। সাততুমড়ী অতিক্রম করে বেলা বারটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম একটা আমলকীর জঙ্গলে। প্রায় সিকি মাইল রাস্তা জুড়ে শুধু আমলকী গাছের বাগান - দিওয়ানা সাধু একটি ঘাট ও শিবমন্দির দেখিয়ে বললেন এহি আমলকীঘাট হৈ। ইধরই হমলোগ আস্নান ও পূজা করেঙ্গে। তিনি আমার আগেই স্নান করে মন্দিরে ঢুকলেন। স্নান তর্পণাদি সেরে আমি মন্দিরে ঢুকে দেখি, তিনি শিবলিঙ্গকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে গান জুড়েছেন। দুচোখ দিয়ে অবিরলধারে জল গড়িয়ে পড়ছে, তিনি গাইছেন -

সব দুনিয়া সেয়ানা মৈঁ হুঁ দিওয়ানা। হম্ বিগড়ে ঔর না বিগড়ে কোঈ জনা।
মৈঁ নহি বৌরা রাম কিয়ো বৌরা। সতগুরু দয়াসে গয়ে ভ্রম মেরা।
বিদ্যা ন পঢ়ুঁ বাদ নহি জানুঁ। হরিগুণ কথত-শুনত মৈঁ হুঁ দিওয়ানা।
গানা গাবত গাবত পূজা রাম তুমকো গানা হৈ মেরে আরাধনা॥

সাধু গানের মাধ্যমে বলছেন - প্রভু সমস্ত দুনিয়া সেয়ানা, আমি কেবল পাগল। আমি বিগড়েছি কিন্তু আর যেন কেউ না বিগড়ায়। আমি ত পাগল ছিলাম না, রামই আমাকে পাগল করে দিয়েছেন। সদগুরুর দয়ায় আমার ভ্রম কেটে গেছে। লেখাপড়া শিখিনি, বিচার বিতর্কও জানিনা। হরিগুণ কীর্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্তন শুনে শুনে আমি পাগল হয়েছি। গান গেয়ে গেয়ে প্রভু আমি তোমার পূজা করব, তোমার গানই আমার পূজা।

স্নান করে এসে জলভরা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাঁর কান্না কিছুতেই থামছে না, শিবলিঙ্গ হতে তাঁর হাতও উঠছে না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম, সদ্য স্নান করে এসে তখন শীতে কাঁপছি, অগত্যা শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে শুরু করলাম। ভক্ত আর ভগবানের একসঙ্গেই পূজা হোক। তাঁর হাতে ঠাণ্ডা জল পড়তে, তবে তাঁর চমক ভাঙল। শিবলিঙ্গকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন। ঝোলা থেকে মিছরী ও কিসমিস দিয়ে শিবের ভোগ দিলাম। উভয়ে সেই প্রসাদ ভাগ করে খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। নর্মদার তীর থেকে বিন্ধ্যপর্বতের ধার পর্যন্ত এ দিকটা শ্যামল উপত্যকা। রাস্তার ধারে বুনো নিম, তুলো এবং শালগাছ বেশী। মাঠে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়েছে। দিওয়ানা সাধু বললেন আমাদের ডানদিকে দিওয়াস জেলা। আমরা শিহোর জেলা পেরিয়ে দিওয়াস জেলার সীমান্ত দিয়ে হাঁটছি। বেলা দুটো-আড়াইটা নাগাদ আমরা মর্দানাঘাটে পৌঁছে গেলাম। 'ব্যস করোজী হমলোগ্ আজ ইধরই ঠারেঙ্গে' - এই বলে সেখানকার শিবমন্দিরের দাওয়াতে দিওয়ানা সাধু বসে পড়লেন। তখনও অনেক বেলা আছে, কাজেই আমার আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সাধু কিছুতেই নড়তে চাইলেন না। তিনি বসে পড়েই গুণগুণ করে গান ভাঁজতে লাগলেন। সারাদিন হেঁটে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কি করে যে মনে গান জাগে তা আমার মাথায় আসেনা। মনে মনে আমি বেজায় বিরক্ত হলাম। সাধু ভাব-ঢুলুঢুলু নয়নে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে গাইতে লাগলেন -

রাম নাম গাওরে মনুয়া রাম নাম গাও ....
সরগবাসু ন বাঞ্ছিয়ে, ডরো মৎ নরক নিবাসু।
হোনাঁ হৈ সো হবেগা মনমেঁ ন কীজে আসু ॥
ক্যা জপ্ ক্যা তপ্ সংযমো ক্যা বরত্ ক্যা অসনাঁন।
জব লগি জুগতি ন জানিয়ে ভাউ ভগতি ভগবাঁন ॥
সম্পৎ দেখি ন হরখিয়ে বিপৎ দেখি ন রোই।
জো সম্পৎ সো বিপৎ হৈ করতা করৈ সো হোই।
রাম নাম গাওরে মনুয়া রাম নাম গাও ....

ওরে মন, রাম নাম গাও। স্বর্গবাসের বাঞ্ছা কোরনা, কোরনা নরকবাসের ভয়। যা হবার তাই হবে। মনে কোন আশা রেখ না। যতক্ষণ যুক্তি দিয়ে ভাবভক্তি দিয়ে ভগবানকে না জানছ ততক্ষণ জপতপ সংযম পালন ব্রত বা স্নান এসব দিয়ে কি হবে! সম্পত্তি পেয়ে উল্লাস কোরনা, বিপদ দেখে কেঁদে ভাসাবে না, যা সম্পত্তি তাই বিপত্তি।

সাধুর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে আমিও সাময়িকভাবে খিদে তৃষ্ণা ভুলে চোখ মুদে তন্ময় হয়ে তাঁর গান শুনছিলাম। গান থামতে চোখ খুলে দেখি আট-দশজন লোক ক্ষেতির কাজ ছেড়ে মাঠ থেকে এসে গান শুনছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, কাছেরই গ্রাম মর্দানপুরের বাসিন্দা তারা। একজন লোক দৌড়ে চলে গেল তার মহল্লায়। প্রায় আধঘন্টা বাদে একটা বড় লোটায় দুধ এবং কিছুটা খোয়া এনে দিওয়ানা সাধুর কাছে রেখে তা গ্রহণ করতে মিনতি জানাল। সাধু আমাকে তা শিবকে নিবেদন করতে বললেন। ভোগ নিবেদন হলে তিনি প্রত্যেকের হাতে একটু করে খোয়া-প্রসাদ দিলেন। বাকী খোয়া এবং দুধ আমরা দুজনে প্রসাদ পেলাম।

একজন মহাত্মাকে বলল - গানামেঁ আপনে কহা - মনমেঁ ন কীজে আসু। আমরা ত আশা নিয়েই বেঁচে আছি। সংসারী লোক আমরা, কামনা-বাসনা কি ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব! আমরা যখন সুখে থাকি তখন ভগবানকে ভুলে যাই। যখন দুঃখে পড়ি তখন তাঁর পায়েই কেঁদে পড়ি, মনের কামনা পূরণের জন্য তাঁর কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইব ?

সাধু তাকে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উত্তর দিলেন - ভগবান গীতাতে বলেছেন - যারা আর্ত ও অর্থার্থী হয়ে ভগবানকে ডাকে তারাও ভক্ত বটে, তবে তারা প্রেমিক নয়। ভগবানকে যে যথার্থ ভালবাসে সে তাঁর কাছে কোন দাবী পেশ করে না। ভালবাসার জন্য যে ভালবাসা, সেই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বলেছিলেন - তোমার যা ইচ্ছা তুমি বর চাও।

তার উত্তরে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ উত্তর দিয়েছিলেন - আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রভু তোমার দর্শন পাওয়াই তো আমার সব পাওয়া। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই তোমার কাছে চাইনা। যারা কিছু পাবার আশায় তোমাকে ডাকে, তারা বেনিয়াবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তোমার ভক্ত নয় - ন স ভক্তঃ স বৈ বণিক্। যাঁরা যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিক তাঁরা সম্পদ বিপদকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁদের মনে কোন চাওয়া-পাওয়ার হিল্লোল ওঠেনা, তাঁরা প্রভুর সেবা করে, নাম কির্ত্তন করে, তাঁকে ডেকেই সুখ পায়।

মহাত্মার কথা শুনে তারা ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে অত্যন্ত তৃপ্ত মনে ফিরে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা মন্দিরে ঢুকে যে যার বিছানা পাতলাম। ফাল্গুন মাসের বারদিন হয়ে গেল। শীতের প্রকোপ কমলেও রাত্রিতে কম্বলমুড়ি দিতে হয়। আমি সাধুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকার পর কৌতুহল বশে তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য টর্চ জ্বাললাম। দেখলাম, তিনি বিছানার উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর ভাবাবেগ কাটলে তিনি কোন কথা বলেন কিনা এই আশায় বসে থেকে থেকে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভোরে দিওয়ানাজীর গানের সুরে। তিনি বিভোর হয়ে গাইছেন -

নৈনোঁকী করি কঠরী পুতরী পলংগ বিছায়।
পলকোঁ কী চিক ডারিকৈ পিয়াকো লিয়া রিঝায়।
প্রীতমকো পাতিয়া লিখুঁ, যো রহেঁ বিদেশ।
তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ তাকৌ কহা সন্দেস॥

দরবিগলিত ধারায় কাঁদতে কাঁদতে মহাত্মা বলছেন - চোখকে করলাম ঘর, তাতে পাতলাম আঁখি তারার পালং। তারপর ফেলে দিলাম চোখের পলকের চিক। তাতে প্রসন্ন হলেন আমার আদরের প্রেমাস্পদ। প্রিয়তম বিদেশে থাকলে তাঁকে চিঠি লিখতাম, কিন্তু তিনি যে শরীরে মনে নয়নে সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন, আমাকে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে আর কোথায় খবর পাঠাব!

দিওয়ানাজী দিওয়ানাই বটেন। ভগবানের নামে পাগল। অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, তাঁদের দরাজ গলার মুন্সীয়ানা দেখে অনেক সময় চমকে গেছি। অনেক 'কিন্নর-কণ্ঠী', কোকিল কণ্ঠী খ্যাতনামা গায়ক গায়িকাদের গান শোনারও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের সুরের মাধুরী মনকে দোলা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বৃদ্ধ সাধুর বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং আর্তি জড়িয়ে আছে যে মনে হচ্ছে এ যেন তাঁর প্রাণের স্পন্দন। মর্মদেশের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে তাঁর প্রাণের কান্না অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে তাঁর প্রীতম প্রিয়তমের চরণতলে। গান শুনে আমারই প্রাণে কান্না উজিয়ে আসছে। আনন্দ বেদনার একসঙ্গে অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম। 'প্রীতমকো পাতিয়া লিখুঁ' এই শব্দ কয়টি, মহাত্মার উচ্চারণ করার ভঙ্গীতে, তাঁর সুর সৃষ্টির উদ্বেল মূর্চ্ছনায় আমার মনকে উথাল পাথাল করে তুলেছে।

মহাত্মা নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি প্রাতঃকৃত্য করার জন্য বাইরে গেলাম। ঘন্টাখানেক দেরী হয়েছে। নর্মদার ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখি মন্দিরের মধ্যে যেন সোরগোল পড়েছে। মন্দিরের পুরোহিত এবং আরও পাঁচ-ছয়জন ভক্ত এসেছেন মন্দিরে পূজা দিতে। আমাকে দেখেই পুরোহিতমশায় বললেন - দিওয়ানা মহারাজকো সমাধি লাগ গিয়া।

আমি বললাম- তব্ আপলোগ ভজন করিয়ে, কীর্তন করিয়ে। ভগবানকী নামকা প্রতাপসে সমাধিসে উনকা ব্যুত্থান ঘটেগা।

কথাটা আমি হালকা ভাবেই বলেছিলাম। কারণ আজকাল গান করতে করতে বা গান শুনতে শুনতে অনেক সাধুবেশী ধূর্তকে হাত পা খিঁচে বা অভয় বাণী দেবার ভঙ্গীতে, ওপর দিকে হাত তুলে সমাধির ঢং করতে দেখা যায় আর এইরকম তথাকথিত 'দশাপ্রাপ্ত' সাধুর ভক্তরা তাঁকে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অবতার বানিয়ে প্রচারের ডঙ্কা বাজাতে শুরু করে দেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে সবীজ, নির্বীজ, সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, সবিকল্প, নির্বিকল্প প্রভৃতি সমাধির সংজ্ঞা, লক্ষণ এবং কোন্ সমাধিতে কি রকম অনুভূতি হয় তার বিশদ আলোচনা আছে। পাতঞ্জল যোগদর্শন ছাড়া নাথপন্থী যোগী এবং মরমী সাধকদের মধ্যে সহজ সমাধি, আনন্দ সমাধি, চৈতন্য সমাধি প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকারের সমাধির কথা আছে। হঠযোগীরা খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে সমাধির অবস্থা লাভ করেন, তার নাম জড়সমাধি।

ভক্তিপন্থের পথিকদের মধ্যে ভাবসমাধি কথাটা বহুল প্রচলিত। বলাবাহুল্য পাতঞ্জলোক্ত যে কোনও সমাধির চেয়ে জড়সমাধি বা ভাবসমাধি অনেক নিম্নস্তরের সমাধি। সমাধি শব্দটির সহজ অর্থ 'সমভাবে অধিষ্ঠান'। স্বরূপস্থিতি হলে কিংবা চৈতন্য জাগরণ ঘটলে সাধক স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং তুরীয় ভূমিতে একই অবস্থায় থাকেন, তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে যাবতীয় তত্ত্বের সমাধান হয়। তখন ধ্যেয় ধ্যাতা ধ্যান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন - এই ত্রিপুটের লয় হয়। আত্মসাক্ষাতকার ঘটে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিওয়ানাজীকে দেখতে লাগলাম। তাঁর দেহে কোন স্পন্দন নেই, নাসাভ্যন্তরচারিণো বায়ু, নাসিকার বাইরে শ্বাস প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়া নেই, হৃদপিণ্ডও স্তব্ধ, উর্ধ্বদৃষ্টি, দেহটি নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির। তাঁর চোখে মুখে নাকে কপালে হাসির ভাব, আনন্দ ও জ্যোতি যেন উছলে পড়ছে! ভক্তদেরকে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন থামিয়ে তাঁর আসন থেকে দূরে বসে কেবল 'রেবা রেবা' জপ্ করতে বললাম। প্রায় বেলা বারটা নাগাদ ধীরে ধীরে তাঁর দেহে স্পন্দন দেখা দিল, শ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি আর পুরোহিতমশায় দুজনে তাঁকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। চোখেমুখে নর্মদার জল ছিটিয়ে দিলাম। পূজা করে যাবার সময় পুরোহিতমশায়কে সম্ভব হলে মহাত্মার জন্যে কিছুটা গরম দুধ সংগ্রহ করে আনার অনুরোধ করলাম। ঘন্টাখানিকের মধ্যে তিনি দুধ নিয়ে এবং আমার জন্য রুটি ও ফল নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুধ খেয়ে দিওয়ানাজী শুয়েই থাকলেন।

ভেবেছিলাম আজ সারাদিনে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ মাইল রাস্তা হেঁটে ফেলব। তা আর হলনা। তা না হোক, একজন সমাধিবান যোগী তথা ভক্তের দুর্লভ সমাধি দর্শন করলাম, এও কি কম সৌভাগ্যের কথা! বেলা চারটার সময় তিনি উঠে বসলেন। দেওয়াল ধরে ধরে তিনি চলবার উপক্রম করতেই আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে ধরে ধরে নর্মদার ঘাট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। স্নান করে স্বাভাবিক মানুষের মত হেঁটে মন্দিরে এলেন। পুরোহিতমশায় এসেছেন সাধুর অবস্থা দেখতে। রাত্রে মন্দিরে প্রদীপ জ্বালার ব্যাবস্থা করে গেলেন। যে যার শয্যায় বসে আছি। অন্ধকার অনেক আগেই হয়ে গেছে। আমি তাঁকে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম - কাল রাত্রে আপনার কি ধরণের অতীন্দ্রিয় দর্শন ঘটেছিল? আপনার দিব্য অবস্থা দেখে আমি আপনাকে কিছুটা চিনবার সুযোগ পেয়েছি। এই কথা বলা মাত্রই তিনি কচি শিশুর মত আধো আধো বুলিতে স্খলিতকণ্ঠে বলে উঠলেন - তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ...। আমি তাঁকে আর কোন কথা বলতে দিলাম না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাঁর মনকে নামিয়ে আনার জন্য আবহাওয়ার কথা, বৈষ্ণব-তীর্থ আর কতদূর, কাল সেখানে আমরা পৌঁছতে পারব কিনা, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এনে ফেললাম। বলতে লাগলাম, রেবাখণ্ডম পুঁথি ঘেঁটে আমি বৈষ্ণবতীর্থের কথা পেয়েছি, কিন্তু ঐ পুঁথিতে কোন স্থানের নাম নেই। 'অনন্তর এই তীর্থে যাইবে, অনন্তর ঐ তীর্থে যাইবে', উত্তর তটের তীর্থ এবং দক্ষিণতটের তীর্থ সব এলোমেলো ভাবে লেখা, ক্রমানুসারে তীর্থগুলির বর্ণনা সাজানো নেই, কোন তীর্থেরই সামগ্রিক স্থানীয় নামের উল্লেখ নেই। পড়ে মনে হয় পুঁথির রচয়িতা নিজেই হয়ত কোন দিন নর্মদা পরিক্রমাতে যাননি। কারও কাছে নর্মদাতটের বর্ণনা শুনে লিখে গেছেন।

সব শুনে দিওয়ানাজী বললেন - এ্যায়সা মৎ বলিয়ে। মার্কণ্ডেয় মহারাজ স্কন্দ্ যুধিষ্ঠিরজীকো তীর্থয়োঁ কে বারে মে নির্দেশ দিয়া থা। মার্কণ্ডেয় মুনিসে জ্যায়দা কৌন নর্মদা বারেমে জানতা হৈ! উনকা বখৎ মে নর্মদাকী অঞ্চল ঔর মহল্লা বগেরা থোরিই এ্যায়সা থা! ক্যাতনা পরিবর্তন হো চুকা হৈ। ক্রমানুসারে বর্ণনা নেই - উসকা মতলব এহি হ্যায়, যো পরিক্রমা করেঙ্গে, উহ্ স্কুদ্ ঢুঁড়েঙ্গে তালাস্ করেঙ্গে। উহ্ উনকা নর্মদা-তপস্যা কী অঙ্গ হৈ।

যাক আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমি বললাম-মহারাজ আমার ঘুম পেয়েছে, কাল সকালে কথা হবে। এই বলে আমি শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে দেখি তিনি যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। তাঁর স্নান পর্বও শেষ। আমাকে বললেন - আপ্ ভি নাহা লিজিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি গাঁঠরী বেঁধে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে এলাম। মন্দিরের শিব এবং নর্মদাকে প্রণাম করে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

দিওয়ানাজীকে আজ বেশ দ্রুত হাঁটিতে দেখছি। পথ এখানে লাল ধুলায় ভর্তি, পথের দুপাশেও লাল কাঁকর। কিছু কিছু শাল, ঘোড়া নিম, আমলকী এবং তেঁতুলগাছের জটলা চোখে পড়ছে। নীরবেই দুজনে হাঁটছি। পথঘাট সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। বেলা দশটা নাগাদ পৌছলাম বাবরীঘাটে। দিওয়ানাজী বললেন - ইহ্ বাবরীঘাট কা মন্দর কোই পুরানা মন্দর নেহি হ্যায়। মহল্লাবাসীয়োঁ নে নয়া বনায়া। ইসকাবাদ সীলকণ্ঠ। নর্মদার উপত্যকা অঞ্চলে হাঁটিতে বিশেষ কষ্ট হয়না। বেলা বারটা নাগাদ সীলকণ্ঠ মহল্লায় পৌছে গেলাম। এখানে একটা গাছের নীচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তিনি গুণগুণ করে কিছু গাইতে লাগলেন। গান ছাড়া ইনি থাকতে পারবেন না। গানেই এঁর বিশ্রাম, গানেই এঁর পূজা। ভজন গানই এঁর সাধনা। গান করতে করতে পাছে আবার ভাব রসে মত্ত হয়ে পড়েন, এই ভয়ে উঠে পড়বার জন্য তাড়া দিলাম। হাসতে হাসতে তিনি উঠে পড়লেন। হাঁটিতে হাঁটিতে বলতে লাগলেন - রাত্রি নয়টা পর্যন্ত হাঁটলে আজই আমরা ককেড়া সংগম এবং গৌনীসংগমের মধ্যস্থলে এই উত্তরতটে বৈষ্ণবতীর্থে পৌছে যেতে পারব, কিন্তু আর দেড়ঘন্টা দুঘন্টা হাঁটলেই আমরা পৌছব নীলকণ্ঠ ঘাটে। সেখানে আমার বন্ধু যোগনাথজীর আশ্রম। তিনি নাথপন্থী মহান্ যোগী। নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরের গায়ে তিনি আশ্রম বানিয়ে বাস করছেন। তিনি আজ আমাদেরকে কিছুতেই ছাড়বেন না। নিলকণ্ঠঘাটে সেই স্থানে তোমার একরাত্রি বাস করাও ভাল।

তথাস্তু। এদিকটায় দেখছি ক্রমেই ছোটি ছোটি জঙ্গলের আধিক্য বেশী। বেলা দেড়টা নাগাদ অদূরেই একটি শিবমন্দিরের চূড়া দেখিয়ে বললেন - ঐ নীলকণ্ঠ। মহাত্মা যোগনাথজী ঐখানেই বাস করেন। চল, নর্মদার ঘাটে আমরা আর একবার স্নান করেনি। হাঁটু পর্যন্ত দুজনেরই লাল ধুলায় ভর্তি।

নর্মদাতে নেমেই সাধু ভজন আরম্ভ করলেন -

বহুৎ দিননকী জোবতী বাট তুমহারী রাম।
জীব তরসৈ তুঝ মিলন কুঁ মনি নাহী বিসরাম॥
বিরহিনী উঠে ভী পড়ে দরসন কারনি রাম।
মৌত্ কা পিছে দেহগে সো দরসন কে হি কাম॥
মৌত্ পিছে জিনি মিলৈ কহে কবীরা রাম।
পাথর-ঘাটা-লোহে সব পারস কৌণৈ কাম॥
বাসরি সুখ না রৈণি সুখ না সুখ সুপিনৈ মাহি।
কবীর বিছুট্যা রাম সূঁ নাঁ সুখ ধূপ ন ছাঁহি॥

হে রাম! বহুকাল ধরে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রাণ ছটফট করছে, মনে এতটুকুও শান্তি নেই। হে রাম, তোমার দর্শনের জন্য বিরহিনী উঠে দাঁড়াচ্ছে আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে। মরবার পর তুমি যে দর্শন দেবে, তা কোন্ কাজে আসবে। কবীর বলছেন - রামকে ছেড়ে দিলে সুখ নেই, সুখ নেই রাতে, স্বপ্নে সুখ নেই, রোদে সুখ নেই, ছায়াতেও সুখ নেই।

দিওয়ানা সাধু গান গাইলেই আমার ভাবনা হয়, এই বুঝি ভাবাবেশে ঢলে পড়েন। যাক্, সেরকম কিছু ঘটল না। আমরা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্নান করছিলাম, পেছনদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি একজন সৌম্যকান্তি সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলায় সেলি ও নাদ ঝুলছে, উভয় কর্ণের দুটি বড় ছিদ্রের মধ্যে গণ্ডারের সিং দিয়ে তৈরী সাদা দুটি কুণ্ডল, যার পারিভাষিক নাম- মুদ্রা। দিওয়ানাজী মুখ ফেরাতেই ঐ সাধু হাতজোড় করে তাঁকে স্বাগত জানালেন - স্বাগতম্, সুস্বাগতম্। উভয়ে কোলাকুলি করলেন। দিওয়ানাজী তাঁর পরিচয় দিলেন - ইনিই মহান্ যোগী যোগনাথজী। আমাদের দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে যোগনাথজী আশ্রমে নিয়ে এলেন। আশ্রমটি পাথরের তৈরী একতলা বাড়ী, সারি সারি পাঁচখানা ঘর আছে। নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরের সংলগ্ন আশ্রম। আমি যোগনাথজীর অনুমতি নিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম নীলকণ্ঠ মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করতে। প্রায় দুই ফুট লম্বা সাদা শিবলিঙ্গ। যোনিপীঠও সাদা পাথর দিয়ে তৈরী। সাদা হলেও ইনি স্ফটিক লিঙ্গ নন। শিবলিঙ্গের মধ্যস্থলে উজ্জল কালো রঙ-এর বিন্দু ফোঁটার মত জ্বলজ্বল করছে। হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে নীলকণ্ঠ শিবের লক্ষন দেওয়া আছে -

দীর্ঘকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥

লম্বা আকৃতির শ্বেত বর্ণের এবং তাতে কৃষ্ণ বিন্দু থাকবে এমন শিবলিঙ্গকে নীলকণ্ঠ লিঙ্গ বলে।

দেবতা এবং অসুরের পূজনীয় নীলকণ্ঠ মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। শিবের পেছনেই তিনটি তৈলচিত্র, প্রত্যেকটির নীচে পরিচয় লেখা আছে - মহাসিদ্ধ গোরক্ষনাথজী, মহাযোগী গম্ভীরনাথজী এবং সদগুরু নিবৃত্তিনাথজী। মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর তৈলচিত্রের নিচে একটি শ্লোক লেখা আছে -

সুকেশং সুবেশং সুনেত্রং সুবক্তুম্
সুনাশং সুহাসং সুপানিং সুপাদম্।
সুকর্ণং সুবর্ণং সুবাচং সুশীলম্
প্রপন্নোহস্মি নাথং মনোহারিরূপম্॥

আমি ডায়েরীতে শ্লোকটি লিখে নিচ্ছি, এমন সময় চমকে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বরে - ভুখ্ লাগাজী। আভি আইয়ে। যোগনাথজীও এসেছেন। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁদের সঙ্গে আশ্রমে এসে খেতে বসলাম। যোগনাথজীর দুজন আশ্রম সেবক পরিবেশন করলেন চাপাটি, অড়হরের ডাল, কড়াই প্রসাদ ইত্যাদি। পরিতৃপ্তিসহ ভোজন পর্ব সমাধা হল।

যোগনাথজীর ঘরের দুপাশের দুটি ঘর আমাদের দুজনের থাকার জন্য বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। আশ্রমের প্রতিটি ঘরেই রেড়ির তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার পর আশ্রমের প্রশস্ত বারান্দায় বসে তিনজনে গল্প করতে লাগলাম। দিওয়ানাজী আমার পরিচয় দিতে গিয়ে কিভাবে আমি বাবার আদেশে তাঁর দেহান্তের পর নর্মদা পরিক্রমা করতে এসেছি, মহাত্মা শংকরনাথজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে কিভাবে নর্মদামাতার ইচ্ছায় পথ ভুলে কপিলধারা আশ্রমে আমার মাতৃপিতৃবীজ লাভ হয়েছে, আমার শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুরই আনুপূর্বিক ইতিহাস গড়গড় করে বলে গেলেন। বিস্ময়ে আমার বাকরোধ হবার জোগাড়। এতকথা ইনি কি করে জানলেন! মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার হোলিপুরার শিবমন্দিরে দেখা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত বিবরণ কিছুই তাঁকে জানাইনি। জানানোর কোন প্রসঙ্গই ওঠেনি, তিনিও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি। অথচ দেখছি, তিনি আমার সম্বন্ধে সবই জানেন। বুঝলাম সাধু চেনা বড়ই কঠিন, উচ্চকোটির মহাপুরুষদের চেনা অসম্ভব বললেও চলে।

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য আমি যোগনাথজীকে তাঁর গুরুর কথা বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি জানালেন - তাঁর গুরু মহাত্মা নিবৃত্তিনাথজী ছিলেন মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর শিষ্য। গোরক্ষপুরের মোহান্ত সদগুরু গোপালনাথজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনার দ্বারা গম্ভীরনাথজী মহাযোগেশ্বর পদে উন্নীত হন। অষ্টাদশ সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল। উনোনে মুর্দাকো জিন্দা করনে বালা মহাত্মা থে। উনকা নাম আপ্ নাহি শুনা ?

আমি উত্তর দিলাম - হ্যাঁ, তাঁর নাম আমি শুনেছি। বাঙালী মাত্রেই বোধহয় তাঁর নাম জানেন। কারণ, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাত্মা গম্ভীরনাথজীকে খুবই মান্য করতেন, তিনি তাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা বাঙালীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়াও প্রসিদ্ধ সেবা প্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীও যে গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে মূলতঃ তারই অনুপ্রেরণায় ভারত-সেবাশ্রম সংঘ স্থাপন করে দুঃস্থ ও আর্তদের সেবা, তীর্থ-পাণ্ডাদের অনাচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা-যজ্ঞে আত্মনিয়োগরূপ মহাব্রতের প্রবর্তন করে গেছেন, এসব কথা আমি জানি। আমি গোরক্ষপুরে আপনাদের মূল গদী দেখে এসেছি। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের গায়ে কপিলধারা আশ্রমে গম্ভীরনাথজীর প্রতিষ্ঠিত যোগমঠ বা অভিনব সাধনগুহাও দেখে এসেছি। গোরক্ষপুর এবং গয়া উভয়স্থানেই তাঁর অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনীও শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

- কিন্তু তুমি বোধহয় একথা শোননি যে মহাযোগী গম্ভীরনাথজী প্রায় চার বৎসরকাল ধরে নর্মদার তটে পরিক্রমা করেছিলেন! শুধু তাই নয়, তিনি গোরক্ষপুরের গদীতে মোহান্তরূপে অভিষিক্ত হবার পর তাঁর প্রধান দুই শিষ্য শান্তিনাথজী এবং নিবৃত্তিনাথজীকে নর্মদা পরিক্রমা করতে পাঠিয়েছিলেন, তাই আমার গুরুদেব নিবৃত্তিনাথজী এখানে তাঁর গুরুদেবের স্মারকচিহ্ন হিসেবে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যান। তুমি যাঁর সঙ্গে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলে, অমরকন্টকবাসী সেই মহাত্মা শংকরনাথজী আমারই জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার পারংগম ব্যক্তি তিনি।

আমি বললাম - মহাযোগী গম্ভীরনাথজীও যে নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন, একথা আমার জানা ছিলনা। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী যে নর্মদা-পরিক্রমা করেছিলেন সেই কথা আমি শুনেছি।

- তুমি যখন পরিক্রমা করছ তখন মহাযোগী গম্ভীরনাথজী এবং আমার গুরুদেব নিবৃত্তিনাথজী কিভাবে পরিক্রমা করতেন, সেকথা তোমার শুনে রাখা ভাল। পরিক্রমা করার সময় তাঁরা যে কেবল পথে চলতেই থাকতেন তা নয়। সাধনার উপযোগী যেসব স্থানে তাঁরা পৌঁছতেন, সেইসব স্থানে কোথাও একমাস, কোথাও তার বেশি এমনকি ছয়মাস পর্যন্ত অবস্থান করে সাধনায় ডুবে যেতেন, আবার চলতে আরম্ভ করতেন নর্মদার তট ধরে। অনবরত চলতে থাকা তাঁদের স্বভাব ছিলনা। তাঁরা জানতেন যে কেবলমাত্র পদব্রজে নদীটির দুই পাড় ঘুরে আসাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য নয়; তাতে তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব হয়না। যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তার পবিত্র প্রভাবে সাধনার দ্বারা বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখীন করাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য। চঞ্চল চিত্তে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ক'রে যারা তীর্থ ভ্রমণের কর্তব্যটি 'যেন-তেন-প্রকারেণ' শেষ করেন, তাদের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণের মাহাত্ম উপলব্ধি করা কোনমতেই সম্ভব হয়না। ক্যা দিওয়ানাজী হমারা বাত মেঁ কোঈ গলতি হৈ ?

- নেহি জী। আপকা বাত্ বিলকুল ঠিক। এই কথা বলে দিওয়ানাজী আমার দিকে তাকিয়ে খোড়িবলী হিন্দীতে যা বলতে লাগলেন তার সারমর্ম এই - পরিক্রমার উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি কেবল নূতন নূতন স্থান দেখে বেড়ানো নয়। শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই, নর্মদামাতাও এমন কোন সময়সীমা বেঁধে দেননি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ি কি মরি করে অমরকন্টক থেকে রেবা সংগম পর্যন্ত ঘোরা শেষ করতে পারলেই পরিক্রমা কর্ম শেষ। মূল কথা, বৈদিক যুগের বহু ঋষি হতে আরম্ভ করে এ যুগের সাধু মুনিরা যে যে স্থানে বা ঘাটে বসে তপস্যা করেছিলেন, সেই সব স্থানে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ধ্যান ধারণা করলে সেইসব স্থানের চৈতন্য প্রবাহ সাধকের তপস্যার পথ খুলে দিতে সাহায্য করে।

তুমি সৌভাগ্যবান যে তোমার পিতাজী এই যুবা বয়সেই তোমাকে পরিক্রমা করার প্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন। যুবা বয়সে শরীর মন যখন সতেজ এবং বলিষ্ঠ থাকে, সেই সময় পরিক্রমায় বেরিয়ে বিভিন্ন তপস্থলীতে সমাধিযোগ অভ্যাস করলে সাধনার পথ সুগম হয়। একাকী নিরাশ্রয়ভাবে বিপৎসঙ্কুল পথে চলতে চলতে মন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গুরু বা ভগবানকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে অভ্যস্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় নিতান্ত অপরিচিত স্থানেও যখন ভিক্ষা জুটে যায়, তখন সহজেই উপলব্ধি হয় যে ভগবানই যোগক্ষেম বহন করে চলেছেন। পরিক্রমাকালে নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধু ও মহাত্মার সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। ফলে নানাবিধ সাধনার বহু গুহ্য-পদ্ধতি ও কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাত্মাদের তীব্র বৈরাগ্য, সাধন নিষ্ঠা এবং অলৌকিক উচ্চাবস্থা দেখে নিজেরও মুমুক্ষুতা এবং সাধনার ঐকান্তিকতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেছে। আসর ভাঙল। আমরা যে যার ঘরে শোবার জন্য চলে এলাম। কি জানি কেন, আজ রাত্রে বাবার পুণ্যজীবনের নানা স্মৃতিকথা আমার মনকে উদ্বেল করে তুলল।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, তবুও বেশ ঠাণ্ডা। কম্বলমুড়ি দিয়ে শৌচে গেলাম। শৌচাদি সেরে মন্দিরের পাশ দিয়ে আসার সময় অতি মধুর বাঁশীর তান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল মন্দিরের মধ্য থেকেই ঐ শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের পশ্চিমদিকের জানলাটি খোলা ছিল, কৌতুহল বশে উঁকি দিয়েই ভয়ে বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমার মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল।

দেখলাম - যোগনাথজী যোগাসনে সমকায় শিরোগ্রীব হয়ে বসে আছেন, তাঁর নাসিকা হতে এক অদ্ভুত সুরেলা আওয়াজের একটানা ঝঙ্কার উঠছে। একটা সোনালী রঙ এর বিরাট বিষধর সাপ নীলকণ্ঠ শিবকে জড়িয়ে ধরে ফনাবিস্তার করে তালে তালে দুলছে। সেই দৃশ্য দেখে আমি একটু একটু করে পিছিয়ে দৌড়ে আশ্রমে এসে দিওয়ানাজীর ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। কোন সাড়া পেলাম না। তখন ব্রহ্মচারীদেরকে কথাটা জানালাম। তাঁরা জানালেন - কোঈ ফিকরকা বাত নেহি। হমারা গুরু মহারাজ জব প্রাণায়াম করতা হৈ, তব্ যো মিঠিমিঠি সুর নিকলতা হৈ, ওহি সুর মে মোহিত হোকর সর্পরাজ উনকা পাশ হররোজ আতা হৈ। উহ্ কাটেগা নেহি।

মনের উদ্বেগ গেলনা, নিজের ঘরে বসে শিবমন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে কমণ্ডলু হাতে যোগনাথজী আশ্রম-বাড়ীতে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ আগেই সূর্য উঠেছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পর্বত ও নর্মদা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। দিওয়ানাজীর ঘর তখনও বন্ধ। বেলা দশটা নাগাদ আমি স্নান করতে গেলাম। মন্দিরে ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম পূজা করতে। ভাল করে চারপাশটা লক্ষ্য করে দেখলাম, মন্দিরে কোন সাপও নেই, সাপের গর্তও নেই। নীলকণ্ঠের পূজা যোগনাথজী আগেই করে গেছেন, পুষ্পপাত্রে প্রচুর বেলপাতা এবং বনফুল রাখা আছে। পূজা শেষ করে ঋষি কুৎস দৃষ্ট বেদমন্ত্র পাঠ করছি, দুই ব্রহ্মচারী ভোগের থালা রেখে আমাকেই নিবেদন করতে বলে গেলেন।

পূজা শেষে আশ্রমে ফিরে এলাম। সূর্য মধ্যগগনে। তখনও দিওয়ানাজীর ঘর বন্ধ। যোগনাথজী আমাকে বললেন - দিওয়ানাজী নিশ্চয়ই সমাধিস্থ। সমাধি অবস্থায় তাঁর এইরকম একদিন দুদিন কেটে যায়। তুমি চঞ্চল হয়োনা। আমরা ওঁকে ভালভাবেই জানি। এস আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি।

খাবার পর আমি ঘরে বসে ডায়েরী লিখতে বসলাম। কিছু দেহাতি ভক্ত এসেছেন যোগনাথজীর কাছে। তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। আমার মন কিন্তু পড়ে আছে দিওয়ানাজীর ঘরের দিকে। কোনো সারাশব্দ নেই, ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ, ঘরের একটি মাত্র জানালা, সেটাও বন্ধ। ঘরের মধ্যে তিনি কি অবস্থায় পড়ে আছেন, তা উঁকি দিয়ে দেখবারও উপায় নেই। বেলা তিনটা নাগাদ, বারান্দায় যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে যোগনাথজী বসলেন, আমাকেও ডাকলেন। আমি সকালে তাঁর সেই নাসিকা হতে উদ্ভূত মন-মাতাল করা ধ্বনি এবং তালে তালে সোনালী সাপের ফনার দোল্-এর কথা ভুলিনি। তার রহস্য জানবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সরাসরি সেই সাধন-রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, এই আশঙ্কায় সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, গোরক্ষনাথজীর সম্প্রদায়ে কি হঠযোগই মুখ্য সাধন, নাকি অন্য কোন নিগূঢ় সাধন-পদ্ধতি আছে ?

তিনি বললেন - গুরু গোরক্ষনাথজী শ্রেষ্ঠ যোগী গুরু ছিলেন, নাথপন্থে হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতির সাধনা আছে সন্দেহ নেই, তবে সাধারণতঃ গৃহী শিষ্যকে প্রথমে গুরু গোরক্ষ, শিব গোরক্ষ, প্রভৃতির যে কোন একটি সিদ্ধমন্ত্র গুরু দান করেন। মন্ত্রযোগে উন্নতি করতে পারলে অনাহত নাদের সাধন শব্দযোগও দেওয়া হয়ে থাকে। তবে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে পন্থের অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাঁদেরকে গুরু আধার ও অধিকার বিচার করে কিছু অন্তরঙ্গ সাধনার পদ্ধতি শেখান। তার সঙ্গে থাকে কিছু সাম্প্রদায়িক আচার। গুরু স্বহস্তে কাঁচি দিয়ে শিষ্যের শিখা বা একগোছা চুল কেটে দেন, এর নাম 'ঝুঁটিকাটা' বা 'চুটিকাটা'। এই চুটিকাটা মুণ্ডনের অনুকল্প। এর তাৎপর্য এই যে, গুরু-শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন করে তার পূর্বজীবনের অবসান ও নবজীবনের সূচনা করে দিলেন। তখন সাধকের পুনর্জন্ম। তখন তাকে পূর্বাশ্রমের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে গুরুদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করতে হয়। ঝুঁটি-কাটার সঙ্গে নাদ ও সেলি ধারণ করতে হয়।

নাথযোগীদের দ্বিতীয় স্তরের দীক্ষায় গুরু-শিষ্যের দুই কানে দুটি বড় ছিদ্র করে তাতে গণ্ডারের শিং-এর কুণ্ডল পরিয়ে দেন। এর নাম যথাক্রমে শিবকুণ্ডল, মুদ্রা বা দর্শন। যোগে সিদ্ধিলাভ করার জন্য এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। যোগীসমাজে অনধিকারী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য এই কষ্টকর কর্ণচ্ছেদনের ব্যবস্থা নাথগুরুগণ প্রবর্তন করেছিলেন।

চুটিকাটা এবং কানফাটা ছাড়া উপদেশী দীক্ষা নামে তৃতীয় প্রকারের দীক্ষাবিধি আছে। উপদেশী দীক্ষাকালে মন্ত্রপূত জ্যোৎ-জাগান, হরপার্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ ও গোরক্ষনাথের পূজা, ভাঙ, মদ্য, মাংস প্রভৃতির দ্বারা আকাশ-ভৈরবের পূজা করা হয়। কেবল উপদেশীরাই ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে, অন্যের পক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এ ছাড়া চতুর্থ প্রকারের এক দীক্ষা পদ্ধতি আছে। এর নাম অজপা গায়ত্রী দীক্ষা বা হংস-মন্ত্রের সাধনা।

গুরু গোরক্ষনাথ এই গুহ্যসাধন পদ্ধতির সংকেত বলতে গিয়ে বলেছেন -

'হং' কারেণ বহির্যাতি 'স' কারেণ বিশেৎ পুনঃ
হংস-হংসেতি অমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥
ষটশতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতিঃ।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে 'হং' শব্দের সঙ্গে বায়ু বাইরে আসে এবং 'স' শব্দের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করে। জীব স্বভাবতঃ সর্বদাই হংস মন্ত্র জপ্ করছে। দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার প্রত্যেকেই এই মন্ত্র জপ্ করে (প্রতি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, এই হিসেবে ২৪ x ৬০ x 15 = ২১৬০০ বার)। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই যে হংস জপ্ চলছে, তা যদি মনোযোগের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করে অনুভব করতে অভ্যাস করা যায়, তবে অজপা নামক গায়ত্রীর সাধন হয়। ঠোঁট, জিহ্বা বা মনের সাহায্যে বিশেষ কোন বীজমন্ত্রকে বারবার উচ্চারণ করে এই জপ্ করা হচ্ছেনা, তাই এর নাম অজপা।

অজপা গায়ত্রী যোগীগণের মোক্ষদায়িনী। হংস মন্ত্রের তাৎপর্য 'অহংসঃ' - সোহহং অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। শ্বাস-প্রশ্বাস অহরহ আমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যবর্তী ক্ষণে স্বভাবতঃ আমরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই। বুদ্ধিপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ করে সেই ভাবটি স্মরণ করতে করতেস্থায়ী করবার চেষ্টাই এই সাধনার উদ্দেশ্য। অন্তর্দর্শী গুরুর নিকট বসে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যবর্তী ক্ষণটি ধরার কৌশল জেনে নিতে হয়। অজপা গায়ত্রী সিদ্ধ মহাপুরুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে এই কৌশল ধরবার এবং সেই পথে চালনা করবার ক্ষমতা নেই।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। যোগনাথজী মন্দিরে গেলেন তাঁর আপন কাজে। আমি দিওয়ানাজীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন শব্দ পেলাম না। নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম সন্ধ্যা করতে।

পরদিন সকালে উঠে যথারীতি কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্য মন্দিরের জানালার কাছে দাঁড়ালাম, উঁকি দিয়ে দেখলাম যোগনাথজী আগের দিনের মতই ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন, তাঁর নাসিকার অভ্যন্তর থেকে আগের মতই শ্রুতিমধুর বংশীধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু সেই সোনালী সাপটিকে আজ দেখছিনা। আজও বেলা দশটা নাগাদ স্নান সেরে নীলকণ্ঠের পূজা করলাম। আজ নর্মদার জলে ভাল করে মার্জনা করতে করতে বুঝতে পারলাম, লিঙ্গের মধ্যবর্তী উজ্জল ফোঁটাটি কৃষ্ণবর্ণের নয়, গাঢ় নীল। পূজা করে এসে আশ্রমে বসে যোগনাথজীর সঙ্গে বসে গল্প করছি, ব্রহ্মচারী দুজন ভোগ তৈরীর কাজে ব্যস্ত, এমন সময় দিওয়ানাজীর ঘর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। শশব্যস্তে আমরা দুইজনে তাঁর ঘরের দরজার কাছে এসে কান পাতলাম, দিওয়ানাজী মৃদুকণ্ঠে গান গাইছেন -

সাধো, সো সতগুরু মৌহি ভাবে।
সৎপ্রেমকা ভর ভর পেয়ালা,
আপ্ পিবৈ মৌহি পিয়াবে ॥

অর্থাৎ সাধু, সেই সদগুরুকে আমার ভাল লাগে যিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে নিজে খান আর আমাকেও খাওয়ান।

আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, তিনি এই তিনলাইন ভজনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন। দরজা বন্ধই আছে, দরজা খোলার কোন লক্ষণ দেখলাম না। যোগনাথজী তাঁর একজন সেবককে বললেন -
দিওয়ানাজী সমাধিসে জাগ গিয়া। একঠো বিল্বপত্র ঔর দো'চাম্মচ ঘিউ গরম করকে রাখনা। আমাকে বললেন, মন্দিরে ভোগ নিবেদন করে আসতে। আমি ভোগ নিবেদন করে ফিরে এলাম, তখনও দিওয়ানাজীর ঘর বন্ধ। যোগনাথজী দরজার কাছে দাঁড়িয়েই আছেন। মিনিট দশেক পরে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এখনও গলার স্বর স্বাভাবিক নয়। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে গাইছেন -

আরে, লালী মেরে লালকী জিত দেখোঁ তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ গঈ মৈঁ ভী হো গঈ লাল।

তিনি গানের মাধ্যমে বলছেন - আরে আমার প্রীতম প্রিয়তমের লালিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যেদিকেই তাকাই সেদিকেই সেই লাল। সেই লালিমা দেখার জন্য আমি গেলাম। গিয়ে আমিও লাল হয়ে গেলাম।

আরও পনের মিনিট পরে তাঁর দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। দিওয়ানাজী ঘর থেকে টলতে টলতে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর সারা শরীরের লালিমা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যোগনাথজী তাঁকে দুহাতে ধরে বারান্দায় কম্বলের উপর বসিয়ে দিলেন। যোগনাথজী তাঁকে বেলপাতা থেঁতো করে দু'চামচ ঈষদুষ্ণ গরম ঘি এর সঙ্গে একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে দিওয়ানাজী বললেন বিহানমেঁ সুবাহ্ বৈঙ্গো তীর্থ জানেকা বাত হৈ ন? যোগনাথজী তাঁকে হাসতে হাসতে বললেন - দো রোজ আপ, কাল ঔর সময়কে উধার থে! অভি উহ্ বাত্ ছোড় দিজিয়ে। আপ যো বিহানকা বাত বোল রহা হৈ, উহ্ দো রোজ পহেলেই বীত গয়া। ঔর দো রোজ বাদ হম্ ছুট্টিয়া যায়েঙ্গে। হম্ লোগ্ এক সাথমেঁ চলেঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরেই যোগনাথজী দিওয়ানাজীর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে নর্মদাতে স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁরা যখন নর্মদার ঘাটে গিয়েছিলেন তখন একজন ব্রহ্মচারী বললেন - আমরা গুরুজীর (যোগনাথজী) কাছে শুনেছি, দিওয়ানাজী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করার সামর্থ্য রাখেন। পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়। নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। ওঁর ঐরকম সমাধি আরও দু'একবার আমরা দেখেছি। উনি দিওয়ানা মানে পাগল সেজে থাকেন।

একজন প্রকৃত সমাধিবান যোগী এবং প্রেমিক সাধুর দর্শন পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। নর্মদা-পরিক্রমা করতে না এলে এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার জীবনে হয়ত ঘটত না। বাবা কেন যে আমাকে তাঁর অন্তিমকালেও নর্মদা-পরিক্রমা করার কথা বারবার করে বলে গিয়েছিলেন, তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

যাইহোক যোগনাথজী এবং দিওয়ানাজী স্নান করে আসার পরেই আমরা খেতে বসলাম। খাওয়ার পর বারান্দাতে আমরা সবাই বসে গল্প করতে থাকলাম। একথা-সেকথা বলতে বলতে আমি যোগনাথজীকে প্রশ্ন করে বসলাম - কোন কোন যোগীকে দেখেছি, প্রাণায়াম করতে করতে তাঁদের নাক থেকে এক অদ্ভুত সুরেলা বাঁশীর তান নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভেসে আসতে থাকে। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে যোগীর কাছে সাপ এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু দংশন করেনা। উত্তরকাশীতে এক মহাত্মাকে এক ধরণের প্রাণায়াম করতে দেখেছিলাম, প্রণায়ামের পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। সে সময় তাঁর গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে বসত। দুঘন্টা তিনঘন্টার পর যখন তাঁর প্রাণায়াম ও ধ্যানাবস্থার অবসান ঘটত, তখন মৌমাছিগুলো আপনা থেকেই উড়ে যেত, তাঁর গায়ে দংশনের কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। কেন এরকম হয় এবং কিভাবে হয়? যোগের পথে উন্নতি করতে হলে কি প্রাণায়াম অভ্যাস খুবই জরুরী?

প্রায় একই সঙ্গে দুই মহাত্মা দুরকম উত্তর দিলেন।

যোগনাথজী বললেন - 'জরুর' আর দিওয়ানাজী বলে উঠলেন - প্রাণায়াম জরুরী নেহি হ্যায়, প্রেম জরুরী। প্রীতম কো পিয়ার করো। বিন্ প্রেম সে না মিলে নন্দলালা।

দু'মিনিট চুপ করে থেকে যোগনাথজী বলতে থাকলেন - রেচক পূরক ও কুম্ভকের সাহায্যে নাড়ী শোধন হয়। নৌলী, ধৌতি, কপালভাতি ইত্যাদি ষটকর্মের দ্বারা শরীর রোগশূন্য হয়। হঠযোগপ্রদীপিকা এবং গোরক্ষসংহিতাতে ষটকর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শরীরস্থ বায়ুকে ত্যাগ করার নাম রেচক, বায়ুকে শরীর মধ্যে পূর্ণ করার নাম পূরক আর শরীর মধ্যে বায়ুস্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধকে কুম্ভক বলা হয়। কুম্ভক নানা প্রকার, যে কুম্ভকের দ্বারা বিজৃম্ভন এবং মুখ ও নাসিকার শীৎকার হয় তার নাম- শীৎকার-কুম্ভক। যে কুম্ভক দ্বারা বায়ু পূরণকালে ভৃঙ্গনাদ এবং রেচককালে ভৃঙ্গীনাদ হয় তার নাম - ভ্রামরী-কুম্ভক। ভ্রামরী কুম্ভকে সিদ্ধিলাভ করলে যোগীর সাধনকালে বাঁশীর তান এবং সেই মধুর তানে আকৃষ্ট হয়ে সর্পরাজ বা মৌমাছির আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়। যোগে এইরকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটে থাকে, উত্তরকাশীর যোগী যোগাসনে থাকাকালে এইজন্যই তাঁর শরীরে মৌমাছির ঝাঁক এসে বসত।

যোগনাথজীর কাছে প্রাণায়ামে থাকার সময়ে যে সোনালী রং এর বিষাক্ত সাপকে ফনাবিস্তার করে বসে থাকতে দেখেছি তার প্রকৃত রহস্য জানা গেল। আমি আরও কিছু জানার জন্য আবার জিজ্ঞাসার ছলে

বললাম - প্রাণায়াম ত প্রাণের অয়মন বা বিস্তার। সেজন্য কি বায়ুত্যাগ, বায়ুপূরণ এবং বায়ুরোধ কি খুবই জরুরী ? আমি ত শুনেছি, রেচক পূরক কুম্ভক প্রাণায়াম এর ক্রিয়ামাত্র, ঐগুলির দ্বারা প্রাণশক্তির বিস্তার ঘটেনা, কাজেই তা প্রকৃত প্রাণায়াম নয়। যার দ্বারা প্রাণারামের সঙ্গে জীবসত্তার মিলন ঘটে তারই পারিভাষিক নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম কোন মতেই বাহ্যিক ক্রিয়া বিশেষ নয়। কবীর বলেছেন - মানুষের হৃদপিণ্ড কি কামারশালের ভস্ত্রা যে তার সাহায্যে বাতাস নিতে হবে আর ছাড়তে হবে!

দিওয়ানাজী হঠাৎ বলে উঠলেন - প্রাণায়াম, প্রাণারাম - বহুত আচ্ছা বাত আপনে বাতায়া।

আমার কথায় যোগনাথজী যথেষ্ট তেতে উঠেছেন দেখলাম। অত্যন্ত ঝাঁঝের সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম, যার অনিবার্য উপযোগিতার কথা হঠযোগপ্রদীপিকা, গোরক্ষসংহিতা এবং দত্তাত্রেয় সংহিতাতে আছে, তা তুমি মানতে পারছনা, এতো বড় আশ্চর্যের কথা।

আমি বললাম - উপযোগিতা হয়ত নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যোগিসমাজে প্রাণায়াম বলতে রেচক পূরক ও কুম্ভকের যে খেলা দেখি, সেইসব পদ্ধতি মহর্ষি পতঞ্জল কথিত বৈদিক প্রাণায়ামের সঙ্গে মেলেনা।

- পাতঞ্জল যোগদর্শনে কি রকম বৈদিক প্রাণায়ামের কথা আছে ?

আমি বললাম - আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন -

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য (পা, সমাধিপাদ, সূত্র ৩৪)।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, অত্যন্ত বেগের সঙ্গে বমন হলে যেমন অন্নজল বের হয়ে যায়, সেইরকম বলপূর্বক প্রাণকে বাইরে নিক্ষেপ করে যথাশক্তি বাইরেই নিরুদ্ধ করতে হয়। ঐসময় মূল ইন্দ্রিয়কে ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে রাখতে হয়। যখন অস্থিরতা আসবে, তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতরে এনে পুণরায় সামর্থ্যানুসারে বাইরে যতক্ষণ পারা যায় নিরুদ্ধ করে রাখতে হবে এবং মনে মনে ওঁকার জপ করতে হবে। তাতে মন পবিত্র হয়ে ধীরে ধীরে স্থির হবে। পাতঞ্জলোক্ত প্রাণায়ামের চারটি ভাগ -

(১) বাহ্যবিষয়ক, (২) আভ্যন্তর বিষয়ক, (৩) স্তম্ভবৃত্তি, (৪) বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী।

'বাহ্যবিষয়ক' অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাইরেই নিরোধ করা। 'আভ্যন্তর বিষয়ক' অর্থাৎ প্রাণকে যতক্ষণ ভেতরে রোধ করা যায় ততক্ষণ রোধ করা। 'স্তম্ভবৃত্তি' অর্থাৎ এক সঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেইস্থানেই যথাশক্তি নিরুদ্ধ রাখা। 'বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী' অর্থাৎ যখন প্রাণ ভেতর হতে বাইরে আসতে থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে তাকে বের হতে না দিয়ে, বাইরের দিক হতে ভিতরে আনতে হবে, আর যখন প্রাণ বাহির হতে ভিতরে আসতে আরম্ভ করবে তখন তাকে ভিতর হতে বাইরের দিকে ধাক্কা দিয়ে রোধ করতে হবে। এইভাবে একের বিরুদ্ধে অন্যর ক্রিয়া করলে, উভয়ের গতিরুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদি নিজের অধীন হবে।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপসংহারে বলেছেন যে - পাতঞ্জলোক্ত ঐ প্রাণায়ামের যথাযথ অনুষ্ঠান করলে শরীরে বীর্যবৃদ্ধির ফলে স্থৈর্য বল পরাক্রম জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্পায়াসে অল্পসময়ের মধ্যে সকল শাস্ত্র বুঝবার সামর্থ জন্মে।

- আপ ইহ্ প্রাণায়াম বিধি জানতা হৈ ?

আমি বললাম - বাবার কাছে আমি শিখেছি।

- মুঝে শিখলাইয়ে ত। চলিয়ে আপকা কামরা মেঁ।

যোগনাথজী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে রক্ষা করলেন দিওয়ানাজী। তিনি বলে উঠলেন- নেহি, নেহি। ইহ্ লেড়কা পরিক্রমাবাসী, নর্মদামেঁ আতা হৈ শিখনেকে লিয়ে, শিখানেকে লিয়ে নেহি।

দিওয়ানাজীর কথায় যোগনাথজী গম্ভীর মুখে বসে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

যে যার ঘরে ঢুকে গেলাম। আজ আবার নূতন করে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

নীলকণ্ঠ ঘাটে পাঁচদিন থাকা হয়ে গেল। ষষ্ঠদিন সকালে স্নান পূজা সেরে দিওয়ানাজী এবং যোগনাথজী যাত্রার পূর্বে তাঁর দুজন ব্রহ্মচারী সেবককে নীলকণ্ঠের পূজা, কোনো অতিথি এলে তাঁর পরিচর্যা এবং আশ্রমের গরুগুলির 'দেখভাল' করার উপদেশ দিতে ভুললেন না।

নর্মদা ক্রমেই যেন চওড়া হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। উপত্যকা অঞ্চল দিয়ে কাঁকুরে পথে হাঁটছি বটে কিন্তু ক্রমে যেন অরণ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গত পনেরদিন যেমন নর্মদার এই উত্তরতটে মাঝে মাঝেই ঘন বসতি পেয়েছি, এখন লোকের বসতি যেন ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। রাস্তাও ক্রমে খারাপ হচ্ছে। দূরে দূরে দু'একটা পল্লী চোখে পড়ছে। প্রায় প্রতি মাইল অন্তরই ছোট ছোট জঙ্গল পড়ছে। জঙ্গলের পাশেই চাষযোগ্য জমি, মাঠে ফসল কাটা হচ্ছে, কোথাও ভুট্টা, বাজরা মহিষের গাড়ীতে করে চাষীরা তাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। যে ছোট বনগুলি অতিক্রম করছি, সেইসব বনে শাল, তেঁতুল, শীরিষ ও বেলগাছের প্রাধান্যই বেশী। প্রায় চারঘন্টা হেঁটে আমরা ছাপানের ঘাট নামক একটি মহল্লায় পৌঁছলাম। একটি পকেট ঘড়ি বের করে যোগনাথজী বললেন - এখন বেলা একটা বেজে কুড়ি মিনিট। নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রসাদ সঙ্গেই আছে। এখানে বসেই আমরা প্রসাদ গ্রহণ করব। আহার ও বিশ্রাম দুই-ই হবে। বেলা দুটো নাগাদ এখান থেকে আবার হাঁটা শুরু করলে সন্ধ্যার আগেই আমরা ককেড়া সংগমে পৌঁছে যাবো। তাঁর প্রস্তাবমত নর্মদার ঘাটে মুখ ধুয়ে এসে আহার ও বিশ্রাম পর্ব শেষ করে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এ অঞ্চলে দেখছি দিওয়ানাজীকে সবাই জানে এবং শ্রদ্ধা করে। পথের মধ্যে যে লোকই আসা যাওয়া করছে, এমন কি মাঠ থেকে উঠে এসেও লোকে কাঁকর ও ধূলিময় পথের উপরেই তাঁকে প্রায় সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। দিওয়ানাজী তাদের পরিবারের লোকজনের প্রায় প্রত্যেকেরই নাম ধরে ধরে কুশল বার্তা নিচ্ছেন। পথের মধ্যে আর একটা বন পেলাম। বেশ ঘন বন। ঝোপ ঝাড় কোথাও নেই। খুব উঁচু উঁচু শালগাছ, আমলকী, পেয়ারা এবং খদির গাছ পরিক্রমাবাসীর পথের দুধারেই ঘন সন্নিবিষ্ট। সেই জঙ্গলের ধার দিয়েই স্বচ্ছসলিলা নর্মদা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। পথে বড় বড় কাঁকর। আমার সঙ্গী মহাত্মা দুজন ত আর পরিক্রমা করছেন না। তাঁদের পায়ে জুতা আছে। কিন্তু আমি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিক্রমাবাসী, পায়ে জুতা নেই, আমারই চলতে কষ্ট হচ্ছে। প্রায় মাইলখানেক সেই বনপথে হাঁটার পরেই হঠাৎ যোগনাথজী চীৎকার করে উঠলেন - ডাঙ্গো, ডাঙ্গো হ্যায় হুঁশিয়ার! ডাঙ্গো অর্থাৎ হায়না। একটা নয় দুটো। আমরা দেখতে পাইনি, কতদূর থেকে যে তারা আমাদের অনুসরণ করে আসছে জানতেও পারিনি। যোগনাথজীর যখন নজরে পড়ল, তখন তারা প্রায় সামনে, বড় জোর বিশ হাত দূরে। একটা বড় পাথরের চাঙড়ের দুদিকে দাঁড়িয়ে। তাদের লোলুপ হিংস্র দৃষ্টি, লকলকে জিহ্বা, চোখগুলো যেন জ্বলছে। যোগনাথজী ছিলেন সামনে, দিওয়ানাজী পেছনে, আমি ছিলাম মাঝে। যোগনাথজী চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে দিওয়ানাজী তড়িৎগতিতে আমাদের দুজনকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কপালে ঠেকালেন। মিনিটখানেক ঐভাবে থেকে তিনি সহসা উচ্চৈঃস্বরে আক্রমনোদ্যত সেই হায়না দুটোর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন - সাধুলোগোঁকা উপর হামলা করনেবালা হে ডাঙ্গো মহারাজ, আপ দোনো বুড়বক হ্যায়। আপ্ জানতা নেহি রেবাতটমেঁ -

> ভূতানি রেবা ভুবনানি রেবা
> স্ত্রিয়ঃ পশবঃ নরাশ্চাপি রেবা।
> যৎ যৎ দৃশ্যতে খলু সৈব রেবা
> রেবাস্বরূপাদ্ অপরং ন কিঞ্চিৎ ॥

মন্ত্রটি বলে তিনি পুনরায় হায়না দুটোর উদ্দেশ্যে প্রণাম করা মাত্রই হায়না দুটো দৌড়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। যোগনাথজী দরদর করে ঘামছিলেন, তাঁকে থরথর করে কাঁপতে দেখে আমি ধরে রাস্তার উপরেই বসিয়ে দিলাম। দিওয়ানাজী তাঁকে হাত ধরে পুনরায় দাঁড় করিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - দেখা যোগনাথজীকা যোগবল? যোগীলোগ্ যোগকা প্রতাপসে হাজারোঁ শেরকো ভি হঠা দে সকতা হৈ। ম্যায় ত কাঙাল দিওয়ানা হুঁ। সিরিফ্ প্রণাম শিখা হ্যায়, ডাঙ্গোয়োঁ কো প্রণাম কিয়া।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। কমণ্ডলুর জল খেয়ে যোগনাথজী পুনরায় নীরবে আমাদের দুজনের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। আরও আধঘন্টা হাঁটার পর জঙ্গলটি পেরিয়ে সমতল অঞ্চলে পৌঁছলাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ককেড়া সংগমে। ককেড়া নামের একটি পাহাড়ী নদী এখানে নর্মদাতে এসে মিলিত হয়েছে। সঙ্গমেই একটি পাথরের শিবমন্দির আছে। যোগনাথজীর ইচ্ছা সেই মন্দিরেই আজ রাত্রিবাস করবেন। কিন্তু দিওয়ানাজী বললেন -

নেহি জী ঔর দো ঘন্টা চলনেসে হমলোগ বৈষ্ণোতীর্থ কা চক্রেশ্বর মন্দিরমেঁ পৌঁছ যাবেগা। আজ পৌর্ণমাসী হ্যায়, চলনেসে কোঈ দিক্যৎ নেহি হোগা। ফিন্ আগে বাঢ়ো।

আমরা হাঁটিতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। দূরের মহল্লা থেকে কোথাও খোল করতাল, কোথাও ঢোলকের শব্দ ভেসে আসছে। রামা হো রামা হো চীৎকারের সঙ্গে কানহাইয়া বাঁশুরিয়া হো, হর নর্মদে হর ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠছে। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আবিরের খেলা চলছে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চক্রেশ্বর শিবমন্দিরে পৌঁছলাম। বিরাট শিবমন্দির। মন্দিরে যে ফাগের তাণ্ডব কিছুক্ষণ আগেই হয়ে গেছে তা বোঝা গেল, যত্রতত্র লাল আবীরের ছড়াছড়ি দেখে। নাটমন্দিরে নিজেদের গাঁঠরী ফেলে রেখে প্রথমেই নর্মদার ঘাটে গেলাম হাত মুখ ধুতে। নর্মদার বুকে জ্যোৎস্নার ঢেউ জেগেছে। বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পূর্ণচন্দ্রের কিরণে চতুর্দিকে স্নিগ্ধ জ্যোতির প্লাবন। অপরূপ দৃশ্য। নর্মদাকে প্রণাম করে আসার পর আমরা মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরের মধ্যে ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। প্রকাণ্ড প্রদীপ, প্রায় একসের ঘি লাগে ভর্তি করতে। পুরোহিতমশায় বোধহয় কর্পূর দিয়ে আরতি করে চলে গেছেন। নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের পাশেই রূপার সিংহাসনে একটি বড় শালগ্রাম শিলা। ইনিই চক্রেশ্বর না শিবলিঙ্গটি চক্রেশ্বর? দিওয়ানাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন - দোনো একই হ্যায়। শিব ঔর নারায়ণ মেঁ কোঈ ভেদ নেহি হ্যায়।

ওঁ নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ॥

মূল মন্দিরের সংলগ্ন আরও তিনটি পাথরের ঘর দেখালেন দিওয়ানাজী। দুটি পরিক্রমাবাসী সাধুদের রাত্রিবাসের জন্য, তৃতীয়টি ভোগঘর। তিনি জানালেন, যখন পরিক্রমাবাসীদের জমায়েৎ এখানে আসে তখন মন্দিরের নাটমন্দিরসহ বিশাল প্রাঙ্গণ সব ভরে যায়। দিওয়ানাজী পুনরায় আমার হাত ধরে অমল ধবল জ্যোৎস্নার আলোতে উদ্ভাসিত নর্মদার ঘাটে নিয়ে গেলেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন - হিঁয়াসে দো মিল পশ্চিতরফমেঁ ককেড়া কী তরহ ঔর এক ছোটিসা নদী গৌণী, নর্মদামেঁ আকর সংগত হুয়া। উহ্ স্থানকা নাম গৌণী-সংগম হ্যায়। ককেড়া সংগম ঔর গৌণী সংগমকা বিচমে ইহ্ হ্যায় বৈষ্ণোতীর্থ। পুরান-প্রসিদ্ধ তীর্থ হৈ। রেবাখণ্ডমে ইসকা বারে মেঁ বহুৎ কুছ্ লিখ্যা হ্যায়।

ঘাট থেকে ফিরে এসে অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটিতে তাঁরা দু'জন শয্যা পাতলেন, আমি ছোট ঘরটিতে ঢুকলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম - দিওয়ানাজী আজ একটি চমৎকার মন্ত্র শোনালেন - শিবের হৃদয় বিষ্ণু, বিষ্ণুর হৃদয় শিব। একজনেরই দুইরূপ বা দুয়ে মিলে একরূপ। দুই-ই এক। এই সমন্বয় দৃষ্টি বা অভেদ দর্শনই হিন্দু দর্শনের সারকথা। আজই বিকেলে নরখাদক হয়নার রক্তলোলুপ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েই মহাত্মা শোনালেন এক অভিনব তত্ত্ব। সমগ্র প্রাণীজগৎ রেবারই রূপ, চতুর্দশ ভুবন জুড়ে রেবার বিভূতি, নরনারী, পশুপক্ষী সকলের মধ্যে ব্যাপ্তি চৈতন্যরূপে রেবা প্রকটিত আছেন, যৎ যৎ বস্তু চোখে পড়ছে তৎ তৎ বস্তু রেবারই প্রকাশ বিকাশ। অর্থাৎ তাঁর ঐ কথায় বোঝা যাচ্ছে যে রেবা এবং ব্রহ্ম সমার্থক শব্দ। সেই ব্রহ্মস্বরূপা বা ব্রহ্মময়ী রেবার নদীরূপ পরিক্রমা করতে এসেছি। ঠাকুর আমাকে দয়া কর, আমি যেন বাবার আদেশ পালন করতে পারি। আমি নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম নর্মদার উদ্দেশ্যে, কিছুক্ষণ রেবা মন্ত্র জপও করলাম।

ঘুম কিছুতেই আসছে না, দিওয়ানাজী কর্তৃক হায়না বিতাড়নের অভিনব পদ্ধতির কথা বারবার মনে তোলপাড় করছে। মনে পড়ছে, বাংলাদেশের ব্যায়ামাচার্য শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরবর্তীকালে সোহহং স্বামী রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে অমিত বিক্রমে নরখাদক বাঘের সঙ্গে খালি হাতে যুদ্ধ করতেন। কুচবিহারের মহারাজা একবার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, শ্যামাকান্তই সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। দুই হাতে বাঘের চোয়াল টেনে ধরে মুষ্ঠ্যাঘাতের পর মুষ্ঠ্যাঘাতে তিনি বাঘকে ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য করেছিলেন। স্বামী রামতীর্থের কথাও মনে পড়ছে। অসাধারণ অঙ্কবিদ্ রূপে যখন তিনি গৌরবের সঙ্গে পাঞ্জাবের লায়লাপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন, সেইসময় এক আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে তিনি সন্ন্যাস নেন এবং পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার বলে শীঘ্রই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে জগৎ প্রসিদ্ধ হন। শেষ বয়সে আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে একটি পাহাড়ে বাস করতেন।

সেইখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর অলৌকিক যোগবল এবং বেদান্ত ব্যাখ্যায় গুণমুগ্ধ আমেরিকাবাসী সেই পাহাড়টির নাম দেন Ram Tirtha Hill, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করার পর যখন প্রয়াগে বাস করতেন সেই সময় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, গরু, মহিষ, কুকুর, শেয়াল, সাপ যাকেই দেখতে পেতেন তাকেই 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে বুকে নিতেন। তাই দেখে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর তাঁকে বিলাতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেখানে দুষ্ট বুদ্ধিবশতঃ সাধু সত্য সত্যই সর্বত্র আত্মদর্শন ক'রে 'আ মেরি আত্মা হ্যায়' বলে, নাকি সেটা তাঁর বুজরুকি তা পরীক্ষা করার জন্য লণ্ডনের পশুশালায় আফ্রিকা হতে সদ্য ধৃত ভয়ঙ্কর এক বিরাট বাঘের খাঁচায় তাঁকে ঢুকিয়ে দেন। শত শত গণ্যমান্য ব্রিটিশ লর্ড ও লেডিরা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য উপভোগ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন হিংস্র বাঘ শীঘ্রই সাধুর দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। কিন্তু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁরা হতবাক হয়ে যান, যখন দেখলেন, রক্তলোলুপ বাঘটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রামতীর্থ বাঘকে জড়িয়ে ধরে 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়, আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে আদর করছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বাঘটা পোষা বেড়ালের মত মহাপুরুষের পদতলে শান্ত হয়ে বসে আছে।

আমি শুয়ে শুয়ে বিচার করছি, শ্যামাকান্ত বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে কাবু করেছিলেন অসাধারণ সাহস ও প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিবলে, স্বামী রামতীর্থ আত্মজ্ঞানের তেজে বাঘকে বশীভূত করেছিলেন; সর্বত্র সমদর্শী ব্রহ্মাজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী রামতীর্থের পরাবর দৃষ্টিতে বাঘ ছিলনা, বাঘের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ব্রহ্মের স্বরূপ। আর গতকাল অপরাহ্ণে দিওয়ানাজীকে দেখলাম প্রেমদৃষ্টিতে তিনি হায়নাকে তাঁর প্রীতম্ প্রিয়তমেরই চিদবিলাসরূপে বুঝে প্রণাম করলেন। হায়নাও তার হিংসা ভুলে গেল।

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের সাধনপাদের একটি সূত্রের কথা মনে পড়ে গেল। সূত্রটি হচ্ছে - অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধ্যৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ২।৩৫ ॥ অর্থাৎ ঋষি বলেছেন মনে প্রাণে যদি কেউ অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তার সান্নিধ্যে এলে বা সমীপস্থ হলে হিংস্র প্রাণীও তার হিংসা ভুলে যায়, চরম শত্রুও তার বৈরিতা ত্যাগ করে। আত্মারাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নেই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলে অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মদর্শী হলে সিদ্ধযোগীর ইষ্টানিষ্ঠ বোধ থাকেনা , রাগদ্বেষও থাকতে পারেনা। যাঁর অন্তঃপ্রকৃতি হতে হিংসা দ্বেষ বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে, সেই সর্বভূতান্তদর্শী মহাত্মার সান্নিধ্যে এলে হিংস্র ও ক্রূর প্রাণীর মধ্যে তাঁর জ্ঞানদৃষ্টি বা প্রেমদৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে, তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে সেই হিংস্র ও ক্রূর প্রাণীর মন থেকে হিংসা ও ক্রূরতা দূর হয়ে যায়।

মেসমেরিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা করে যাঁরা ইচ্ছাশক্তির কিছুটা উৎকর্ষসাধন করতে পারেন তাঁরা তাঁদের স্থির দৃষ্টিবলে যে কোন প্রাণীকে সাময়িকভাবে সম্মোহিত করে বশীভূত করতে পারেন কিন্তু তাতে উভয়ে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু লণ্ডনে নরখাদক বাঘের খাঁচায় মহাত্মা রামতীর্থজীকে যখন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁর পক্ষে বাঘের দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি স্থাপন করে বাঘটিকে সম্মোহিত করার সুযোগ বা সময় কোনটাই ছিলনা। তিনি আক্রমনোদ্যত ভয়ঙ্কর বাঘটিকে দেখামাত্র 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আর গতকাল জঙ্গলের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, সেখানে ত দিওয়ানাজী হায়না দুটোকে দেখা মাত্রই চোখ মুদে নতমস্তকে প্রণাম করতে লেগে গিয়েছিলেন।

কাজেই মহর্ষি পতঞ্জলির অহিংসা-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সূত্রটি যে কেবল তত্ত্বকথা বা বাণীমাত্র নয়, এ যে প্রত্যক্ষ সত্য তা নর্মদাতটে না এলে নিজের চোখে দেখার সুযোগ ঘটত না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই। মন্দিরের জাগরণী ঘন্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। পুরোহিতমশায় এসে গেছেন মন্দিরে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বড় ঘরটাতে উঁকি দিলাম, দিওয়ানাজী বা যোগনাথজীর কাউকে দেখতে পেলামনা। শৌচাদি ও স্নানপর্ব সেরে এসে রেবাখণ্ডম্ পুঁথিটি খুলে বৈষ্ণব তীর্থের বিবরণ পড়তে লাগলাম।

মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন -

রেবায়া উত্তরে কুলে বৈষ্ণবং তীর্থমুত্তমম্ ।
জলশায়ীতি বৈ নাম বিখ্যাতং বসুধাতলে ॥
দানবানাং বধং কৃত্বা সুপ্তস্তত্র জনার্দনঃ ।
চক্রং প্রক্ষালিতং তত্র দেবদেবেন চক্রিণা ।
সুদর্শনং চ নিষ্পাপং রেবাজল সমাশ্রয়াৎ ॥

রেবার উত্তরকূলে অনুত্তম বৈষ্ণবতীর্থ বিদ্যমান । এই তীর্থ পৃথিবীতে জলশায়ী নামে বিখ্যাত । চক্রধর জনার্দন দানবদেরকে বধ করে এই জলশায়ী তীর্থে শয়ন এবং জলশায়ীর জলে সুদর্শন চক্র ধৌত করেছিলেন । হে রাজন্! এই স্থানের রেবাজল সংস্পর্শে চক্রধারীর সুদর্শন চক্র নিষ্পাপ হয়েছিল । পুরাকালে তালমেঘ নামে এক দৈত্য ছিল । সে হিমালয়ে বাস করত । তার লক্ষ লক্ষ দুর্ধর্ষ দৈত্যসেনা ছিল । সে সেই সেনাদের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে স্বর্গ জয় করে । ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয় । পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত দেবতাগণ ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন । ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন -

ত্বমেব জহি ত্বং দুষ্টং মৃত্যুং যাস্যতি নান্যথা ।

হে জনার্দন! পাপমতি তালমেঘ আপনি ছাড়া আর কারও বধ্য নয় । আপনি সেই দুষ্ট দানবকে বধ করুন, অন্যথা তার মৃত্যু হবেনা ।

দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণুর দয়া হয় । তিনি গরুড় বাহনে হিমালয়ে গিয়ে তালমেঘকে আক্রমণ করেন । বহুদিন যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ করে অবশেষে সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তিনি তালমেঘকে বধ করেন । তালমেঘকে বধ করে স্থানে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সুদর্শন চক্রটিকে এইখানে রেবা জলে ধৌত করেছিলেন । সেই থেকে এই চক্রতীর্থ একটি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়ে বিখ্যাত হয় ।

পুঁথি পড়া শেষ হয়েছে, এমন সময় মন্দিরের পুরোহিতমশাই পনের কুড়িজন লোক সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলেন । আমি তাঁকে জানালাম যে আমি পরিক্রমাবাসী, নীলকণ্ঠ ঘাট হতে মহাত্মা দিওয়ানাজী এবং যোগনাথজীর সঙ্গে গত রাত্রিতে এখানে উপস্থিত হয়েছি । দিওয়ানাজীর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল । বুঝলাম, দিওয়ানাজী এখানে সর্বজনমান্য মহাত্মা । পুরোহিতমশায় বললেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারেন, পরিক্রমাবাসীদের সেবা করার এখানে ব্যবস্থা আছে । দিওয়ানাজী নিজেকে পাগল বলে পরিচয় দেন, উনি কিন্তু সত্য সত্যই পাগল নন । অতি উচ্চতমকোটির মহাত্মা । অহর্নিশ ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন । বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি এইখান হতে হোলিপুরা পর্যন্ত যাতায়াত করেন, যেখানে যেমন ইচ্ছা যতদিন ইচ্ছা বাস করেন, মন্দির বা গাছের তলা যেখনেই থাকেন, আনন্দে থাকেন, ভজন গানে ডুবে থাকেন । আপনি ভাগ্যবান যে এইরকম একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছেন । মহাত্মা যোগনাথজীকেও আমি চিনি । এখানে পাশাপাশি কয়েকটি মহল্লায় অনেক নাথপন্থী গৃহীভক্ত বাস করেন । তাঁরা মহাত্মা নিবৃত্তিনাথের ভক্ত । চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন তাঁর ভাণ্ডারা । সেই ভাণ্ডারা উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসরই এই সময় যোগনাথজী এখানে এসে থাকেন, তিনি ঐ একই উদ্দেশ্যে হণ্ডিয়াতেও যান ।

পুরোহিতমশায়ের কথা শেষ হতে না হতেই দিওয়ানাজী এবং যোগনাথজী উভয়ে এসে উপস্থিত হলেন । দিওয়ানাজীকে দেখে সকলের মধ্যে প্রণামের ধূম পড়ে গেল । তিনি বললেন - সবেরে পূজা করকে সিধা চলা যায়েগা । মুঝে তন্ মৎ করনা, তন্ করনেসে হম্ ফিন্ ভাগেঙ্গে । সকলেই সানন্দে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন ।

- চলিয়ে, আপকা পাশ যো কিতাব হ্যায়, উহ্ লেকর চলিয়ে । নারায়ণজীকা ক্যায়সা চক্র ইধর বিরাজমান হ্যায়, পহচানিয়ে ত ।

- দিওয়ানাজীর নির্দেশ মত 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক পুস্তকটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করতে গেলাম । যোগনাথজী নাট মন্দিরে বসে গোরক্ষপন্থী দুজন ভক্তের সঙ্গে বার্তালাপে ব্যস্ত । মন্দিরে ঢুকেই

দিওয়ানাজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নারায়ণ শিলা ও নর্মদেশ্বর শিবের দিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর শরীরে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চ পুলক ও শিহরণ দেখা দিতে লাগল। আমি প্রণাম করে শালগ্রাম শিলাটি হাতে নিয়ে চন্দনাদি মুছে উলটে পালটে চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। মন্দিরের মধ্যে যদিও ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে, তবুও সেই আলো পর্যাপ্ত নয় বলে আমি গরুড়াসন হতে শিলাটি উঠিয়ে মন্দিরের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দক্ষিণমুখী মন্দির, সামনেই নর্মদা। সূর্যের আলোতে দেখলাম, শিলাটি একটি আপেলের মত বড়। শিলাটির মাথায় শ্বেতাভ একটি ছাতার মত আভাস ফুটে রয়েছে তাতে একটি গহ্বর বা মুখ। সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেখলাম, মুখের ভিতর বাঁদিকে দুটি এবং ডানদিকে দুটি মোট চারটি চক্র রয়েছে। মুখের বাইরে দুদিকে দুটি রক্তিম চিহ্ন। শঙ্খ, মুষল, ধ্বজা, ধনুর্বান এবং গদারও স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম। ইতিমধ্যে দিওয়ানাজীও মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিহ্নগুলি দেখালাম। মন্দিরের ভিতরে শিলাটিকে নিয়ে গিয়ে তাম্রকুণ্ডে স্থাপন করে নর্মদার জলে স্নান করিয়ে চন্দন মাখিয়ে পুনরায় গরুড়াসনে স্থাপন করলাম। বই ঘেঁটে শিলাস্থিত চিহ্নগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দিওয়ানাজীকে বললাম, লক্ষণ অনুযায়ী এই শিলার নাম - অচ্যুত। বই থেকে পড়ে শোনালাম -

চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈস্তু বামে দক্ষিণপার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলদ্বয় শোভিতঃ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবাণকৌমুদকীধরঃ।
যো মুশলধ্বজশ্বেতচ্ছত্ররক্তাংশুকৈর্যুতঃ।
সোঽচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্লভস্তু সদা নৃণাম্ ॥

শ্লোক-বর্ণিত সমস্ত চিহ্নই এই শিলার মধ্যে বর্তমান। বই অনুযায়ী এই শালগ্রাম শিলার নাম অচ্যুত হওয়া উচিত এবং তদনুযায়ী এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ না হয়ে অচ্যুত-তীর্থ হলে আরও যুক্তিযুক্ত হ'ত।

দিওয়ানাজী বললেন - উসমে ক্যা ফারাক হ্যায়। অচ্যুত ভি নারায়ণ, চক্রেশ্বর ভি নারায়ণ। ইস্ স্থানকো বৈষ্ণবতীর্থ কহা যাতা হ্যায়, এহি ঠিক হ্যায়। এ্যায়সা শিলা ঔর কহি দেখা ?

আমি বললাম - সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছি, হাজার হাজার মন্দির দেখেছি, চিত্রকূট, বদ্রীনারায়ণ, অযোধ্যার হনুমানগড় যেখানে হাজার হাজার শালগ্রাম শিলা আছে, তাও দেখেছি কিন্তু এইরকম শালগ্রাম আমি কোথাও দেখিনি। নর্মদাতীর্থের কথা ছেড়েই দিলাম, এই মন্দির ছাড়া অমরকন্টক থেকে এই পর্যন্ত কোন মন্দিরে শালগ্রাম শিলাই দেখতে পাইনি। নর্মদাতে শুধু শিবেরই রাজত্ব।

আমার কথা শুনে দিওয়ানাজী হাসতে লাগলেন। এমন সময় যোগনাথজী এসে জানালেন যে পুরোহিতজী আমাদের ভোজনের জন্য ভোগ এনেছেন। চাপাটি ও মালাই। ভোগের থালা রেখে পুরোহিতজী দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে চলে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর নাটমন্দিরে দিওয়ানাজী কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি এবং যোগনাথজী গল্প করতে লাগলাম।

যোগনাথজী আমাকে বললেন - তুমি গোরক্ষপুরে গিয়েছিলে, ওখানে এখন মোহান্ত দিগ্বিজয়নাথজী গদ্দীনসীন মহাত্মা। তাঁর কাছে তোমার দীক্ষা নেয়া উচিৎ ছিল। নাথপন্থে না এলে তুমি সাধনরাজ্যের কোন সন্ধান পাবেনা। কলিযুগে স্বয়ং শিবই গোরক্ষনাথজী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গোরক্ষনাথজী নেপালের জাতীয় দেবতা। তাঁর নামানুসারেই নেপালের অধিবাসীদের গোর্খা নাম হয়েছে। নেপালের বর্তমান মহারাজা ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহের প্রপিতামহ গোরক্ষনাথজীর আশীর্বাদেই নেপালে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আশীর্বাদ আছে, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ নেপালে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। চিতোরের রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর হাম্বীরকে গোরক্ষনাথজীই এক দিব্য খড়্গ দান করেন, সেই দিব্য বলে বলীয়ান হয়েই তিনি সমগ্র মেবার জয় করতে পেরেছিলেন। জ্বালামুখী তীর্থ গোরক্ষনাথজীরই তপস্যাস্থল, কলিকাতার কালিঘাটের কালীমূর্তি এবং নকুলেশ্বর ভৈরবের প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছিলেন। ঐ কালী এবং শিবের নিত্যপূজার ভার দিয়েছিলেন চৌরঙ্গীনাথকে। আগে কলিকাতা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে চৌরঙ্গীনাথজী বসতেন, সেই স্থানের নাম হয়েছে চৌরঙ্গী। আমি কলিকাতায় একবার গিয়েছিলাম।

গোরক্ষনাথজী কে জান ?

সিদ্ধানাঞ্চ মহাসিদ্ধঃ ঋষিনাঞ্চ ঋষীশ্বরঃ।
যোগীনাম্ চৈব যোগীন্দ্র শ্রীগোরক্ষ নমোঽস্তুতে ॥
শ্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দে সানন্দ বিগ্রহম্।
যস্য সান্নিধ্য মাত্রেন চিদানন্দায়তে তনুম্ ॥

গোরক্ষনাথজী নিজেও শৈবদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সাধনায় প্রবেশ করলে, তাঁর স্পর্শ পেলে যে কোন সাধকের দেহ চিন্ময় হয়ে যায়।

যোগনাথজীর উচ্ছ্বাস কমলে, আমি তাঁকে বললাম - আমার বাবাই আমার ইষ্ট এবং উপাস্য। তাঁর কাছেই আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। স্বয়ং শিব আমার কাছে প্রকট হয়ে দীক্ষা নিতে বললেও আমি তাঁর সেই অযাচিত দিব্য দানকেও প্রত্যাখান করবো। তবে আমি বাবার কাছে শুনেছি যে গোরক্ষনাথজী মহাযোগেশ্বর ছিলেন, তিনি শৈবাবধূত ছিলেন।

- শৈবাবধূত কিসকো বলতে হ্যায় ?

বললাম - যিনি বর্ণাশ্রমের উর্ধ্বে চলে গেছেন এবং আত্মাতেই স্থিতচিত্ত সেই অতি বর্ণাশ্রমী যোগীকে বলা হয় অবধূত। মহামনীষী বাচস্পতি প্রণীত অভিধানে অবধূতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা আছে -

যো বিলঙ্ঘ্য আশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতি বর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।

অবধূতের আবার শ্রণীবিভাগ আছে - গৃহাবধূত আর কুলাবধূত। গৃহাবধূত গৃহী আর কুলাবধূত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। তাছাড়াও শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত এবং ভক্তাবধূত নামে আরও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। আর যিনি অপূর্ণ ভক্তাবধূত, তাঁকে বলা হয় পরিব্রাজক।

- এ বাত বিলকুল ঝুট হ্যায়। গোরক্ষনাথজী শৈবাবধূত নেহি থে, উনোনে স্বয়ং শিব থে।

যোগনাথজীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে ছেড়া ধনুকের মত দিওয়ানাজী বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বলতে লাগলেন - লেড়কা কা বাত সহি হ্যায়। আপলোগ কট্টর সাম্প্রদায়িক হ্যায়। আরে, তুমলোগ ক্যা সমঝোগা। কবীরজী ভি গোরক্ষনাথজীকে বারে মেঁ কহা হ্যায় -

অবধূ যোগী জগসে নেহারা।
মুদ্রা নিরতি সুরতি করি সীংগী নাদখণ্ডে ধারা।
বসে গগনমেঁ দুনী ন দেখৈ চেতনী চৌকি বৈঠা।
চঢ়ি আকাশ আসন নহিঁ ছোড়ে পীবে অমীরস মীঠা।

এই যোগী (গোরক্ষনাথজী) অবধূত। ইনি জগৎ থেকে আলাদা। ইনি যোগীর চিহ্ন সুরতি নিরতি আর শিঙা ধারণ করেন, নাদের দ্বারা পন্থের ধারাকে খণ্ডন করেন না। গগনমণ্ডলে এঁর নিয়ত বাস, দুনিয়ার দিকে ইনি তাকান না। চৈতন্যের চৌকির উপর ইনি বসে আছেন। আকাশে ছাড়েন না, সর্বদাই পান করেন মধুমহারস অমৃত।

পরগট কন্থা মাঁহি, যোগী দিলমেঁ দরপন জোবৈ।
সহঁস ঐকীশ ছ সৈ তাগা নিচল নাকৈ পোবৈ।
ব্রহ্ম অগনি মেঁ কায়া জারৈ, ত্রিকুটী সংগম জাগৈ।
কহে কবীর সোঈ যোগেশ্বর, সহজ সুনি ল্যৌ লাগৈ ॥

কবীর গোরক্ষনাথজীকে দেখিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন - যদিও ইনি প্রকটরূপে কাঁথা জড়িয়ে থাকেন তবু নিজের হৃদয় দর্পণে সব কিছু দেখতে পান। নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছয়শত তাগাতে গিঁট দেন। ইনি ব্রহ্মাগ্নিতে সহজ ও পুণ্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

- কহিয়ে যোগনাথজী ইসসে বড়া মহিমা কৌন বর্ণন কর সকতে হৈ ? শৈবাবধূতকা গতি এ্যায়সাই হোতে হৈ। ইন্ লেড়কাকী পিতাজীনে গোরক্ষনাথজীকো শৈবাবধূত বাতাকর আচ্ছাই কিয়া।

আগুনে যেন জল পড়ল। দিওয়ানাজীর কথা শুনে যোগনাথজী চুপসে গেলেন।

বৈষ্ণবতীর্থে আজ তৃতীয় দিন। সন্ধ্যাবেলা যোগনাথজী বললেন যে গুরুদেবের ভাণ্ডারার দিন এগিয়ে আসছে। এখানে তাঁর কাজ সাঙ্গ হয়েছে। তাঁর পক্ষে আর দেরী করা সম্ভব নয়। তিনি বিহানমেঁ (আগামীকাল ভোরেই) এখান থেকে যাত্রা করবেন। আমি এখানে থাকব, নাকি তার সঙ্গে যাত্রা করব জানতে চাইলেন। দিওয়ানাজী তাঁকে জানালেন ইনোনে ভি আপকা সাথ যাত্রা করেঙ্গে, আপ্ জানতে হো, হম্ বৈষ্ণো তীর্থসে হোলিপুরা তক্ সফর করতা হুঁ। হম্ ইধারই জ্যায়দা নিবাস করতা হুঁ, ইধারই ঠারেঙ্গে।

আমি তাঁর অনুমতি পেয়ে গেলাম। তিনি যোগনাথজীকে আমার কামরায় এবং আমাকে তাঁর কামরায় শোবার ব্যবস্থা করলেন। আমি তাঁর আসন হতে দূরে নিজের আসন পাতলাম। দিওয়ানাজী আসনে বসে আমাকে বললেন - যে যার ইষ্ট মন্ত্র সর্বদা জপের বস্তু হলেও নর্মদাতটে রেবা মন্ত্রও প্রতিদিন অন্ততঃ এক হাজার আটবার জপ করবে। এ বিষয়ে কোন অন্যায় জিদ করবে না। হণ্ডিয়া থেকে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি আরম্ভ হয়েছে, একথাই সাধারণতঃ সবাই বলে কিন্তু এই পথে জামানের সংগম অতিক্রম করার পরেই ঝাড়ি পথ শুরু হয়ে যাবে। মুণ্ডমহারণ্য যেমন এক ভয়ঙ্কর স্থান, তেমনি ভয়ঙ্কর স্থান বলে জানবে এই ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িকে। হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ এই জঙ্গলকে নর্মদা-তপস্যার অন্যতম মহাপরীক্ষার স্থল বলে জানবে। মনের মধ্যে কোন কামনা বাসনা না থাকলে নর্মদামাতা নিজে তোমাকে রক্ষা করবেন। তাঁর অভয় নাম স্মরণ করে হেলায় সব দুর্বিপাক হতে পার পেয়ে যাবে তুমি।

যো মাঁগে সো কছু ন পাবৈ, বিন্ মাঁগে রেবা দেতা।
কহে দিওয়ানা নিহকাম ভজে যে, তে আপন করি লেতা ॥

সাংসারিক কামনা বাসনা ত দূরের কথা, ঋদ্ধি সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সে কিছু পাবেনা, কিন্তু নিষ্কামভাবে নর্মদা পরিক্রমা করতে পারলে মাতা রেবা তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানকে সব কিছুই দিয়ে থাকেন। দিওয়ানা বলছেন যে, নিষ্কাম ভক্তকে মা নর্মদা নিজ জন হিসাবে আত্মসাৎ করেন। রেবা, রেবা, রেবা - এই বলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমাকে শুতে বলে নিজেও শুয়ে পড়লেন।

শীত অনেক কমে গেছে। তখনও ঘুম ধরেনি। বাবার আশীর্বাদে মহাঘোর মুণ্ডমহারণ্য যাইহোক করে অতিক্রম করে এসেছি, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে কি ঘটবে জানিনা। এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করলাম, দিওয়ানাজী উঠে বসেছেন। তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তাঁর উপবিষ্ট ভঙ্গিমার আকৃতিটি জ্যোতির রেখায় ফুটে উঠেছে। স্তম্ভিত হয়ে আমি উঠে বসলাম। যেন কোন অদৃশ্য শিল্পীর নিপুন অঙ্গুলি স্পর্শে অন্ধকারের পটভূমিতে জ্যোতির্ময় পেনসিল্ দিয়ে টুকটুক করে আঁকা হয়ে গেল। দিওয়ানাজীর চোখমুখ ভুরু নাক কান চিবুক দাড়ি চুল জটা সবই দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখের পাতা সেই দিব্যমূর্তি দেখতে দেখতে ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলাম। এবারে তাকিয়ে দেখি দিওয়ানাজী পদ্মাসনে উপবিষ্ট আর একটি সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ থেকে বেরিয়ে এমনভাবে সংস্থাপিত হল যে, মূল দেহের ভ্রূদ্বয়ের উপরেই সূক্ষ্মদেহের হাঁটু দুটো পদ্মাসনের আকারে ভাঁজ করা আছে; সূক্ষ্মদেহের চক্ষু নিমীলিত; শুভ্র জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত।

আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ বন্ধ হয়ে আসল আপনা থেকেই, চোখ বন্ধ হতেই মনে হল পেছন দিকে মাথা বাঁকালে ঘাড়ের কাছে যেখানে ভাঁজ খায়; সেখানে ভিতর দিকে একটা চুলের চেয়েও সূক্ষ্মতর এক জ্যোতির্ময়ী রেখা শিরশির করে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে উঠে যাচ্ছে, প্রতি রোমকূপে আনন্দের ঢল নেমেছে, সেই আনন্দের স্রোত ক্রমে একটি নদীর আকার নিল, আমি চিনতে পারলাম এই নদী নর্মদা। যে ঘরের মধ্যে বসে আছি, সেই ঘরের কোন ছাদ দেওয়াল কিছুই নেই। পরম বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম এই পরমাশ্চর্য নদীর জল জ্যোতি হয়ে বয়ে যাচ্ছে; সহসা সমস্ত জ্যোতির্জল এক পলকের মধ্যে জমাট হয়ে এক অপূর্ব মাতৃ মূর্তি গ্রহণ করল, তাঁর পদতলে যুক্তকরে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে বসে হাজার হাজার ঋষি তপস্যায় মগ্ন। দিওয়ানাজী আছেন, এমনকি আমার বাবাও সেখানে আছেন। কোন সুদূর পরম ব্যোমমণ্ডল থেকে ভেসে আসছে ওঁ ওঁ ওঁ বম্-বম্-ববম্ নাদ।

জেগে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বরে। ভাবাবেগে তিনি গেয়ে চলেছেন -

নৈনা অন্তরি আও তুঁ জ্যু হৌ নৈন ঝাঁপেউঁ
না হোঁ দেখৌ ঔরকু না তুঝ দেখন দেউঁ ॥
কবীর রেখ সিন্দুরকী কাজল দিয়া না জাই।
নৈনূঁ রমইয়া রবি রহ্যা দূজা কহাঁ সমাই ॥

তুমি এস আমার চোখের মধ্যে, তাহলে আমি চোখ বুজে ফেলব। আমি আর কাউকে দেখবনা। আর কাউকে তোমাকে দেখতে দেবনা। কবীর বলেছেন যেখানে সিঁদুরের রেখা দিতে হয়, সেখানে কাজল দেয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ করছেন সেখানে অন্যের স্থান হবে কোথায়।

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমি বসেই আছি। তবে কি রাত্রে আমি শুইনি! বসে বসেই রাত কাটিয়েছি। তাই বা কেমন করে হবে! তাহলে ত শরীরে ক্লান্তি থাকত, অবসাদ থাকত। পরিবর্তে, শরীর অনেক হালকা মনে হচ্ছে। রাত্রে ভাল ঘুম হলে শরীরে যে ঝরঝরে তৃপ্তিবোধ হয়, সেইরকম বা তারও বেশী গভীর সুষুপ্তির আনন্দে আমার সকল স্নায়ুতন্ত্রীকে স্নিগ্ধ এবং সতেজ দেখছি।

দরজার বাইরে যোগনাথজীর গলা শোনা যাচ্ছে। সাত বাজ গিয়া, আভি যাত্রা করেঙ্গে, হম তৈয়ার হো গয়া। দিওয়ানাজী উত্তরে বললেন - ইনকা তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়। বড়ি খুশীসে আপ যা সকতে হো। হম্ ইনকা সাথ নেমাবর তক্ খুদ জায়েঙ্গে। দরজা খুললেন না। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে গিয়ে দরজা খুলতে। কিন্তু এক অনাস্বাদিত পূর্ব তৃপ্তির আবেশে আমার অস্থি সন্ধি সিথিল হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াতে পারলাম না।

দিওয়ানাজী যোগনাথজীকে যেন শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে আমাকে বলতে লাগলেন - মাকড়সা যেমন ধীরে ধীরে তার লালা দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুর জাল বোনে, তেমনি সাধুর মধ্যে যদি লালসা বা প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি থাকে তাহলে জনসেবা, দুঃস্থ আর্তদেরকে সাহায্য দান, গুরুর জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি, স্কুল কলেজ বা স্মৃতিসৌধ স্থাপন কিংবা সাড়ম্বরে কোন দেবদেবীর পূজা মহোৎসবের অনুষ্ঠানের অজুহাতে ধীরে ধীরে মায়ার ফাঁদে ফেঁসে যায়, সে শিষ্য ও ভক্তদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহে মেতে ওঠে। এইসব কাজকে সে গালভরা নাম - জীবসেবা, লোককল্যাণ প্রভৃতি আখ্যা দেয়। এইভাবে সে আস্তে আস্তে ইষ্টসাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

এই যোগনাথজীর কথাই ধর। ইনি যোগের পথে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমানে ধীরে ধীরে ইনি অর্থসংগ্রহের বিড়ম্বনায় ফেঁসে গিয়ে সাধন-পথ হতে অনেক দূরে সরে গেছেন। বৈষ্ণব তীর্থে এসে এই তিনদিনের একবারও তাঁকে ঠাকুর ঘরে বসে ধ্যান বা উপাসনা করতে দেখা যায়নি। কেবলই মহল্লার পর মহল্লা চষে বেড়িয়েছেন ভাণ্ডারার জন্য অর্থ-ভিক্ষার কাজে। অথচ মহাযোগেশ্বর গোরক্ষনাথজীর একটি প্রধান শিক্ষাই হল -

দৃষ্টি অগ্রে দৃষ্টি লুকাইবা সুরতি লুকাইবা কানং।
নাসিকা অগ্রে পবন লুকাইবা তব্ রহিগয়া পদ নিরবানং ॥

অর্থাৎ গোরক্ষনাথজী তাঁর উপলব্ধ সত্য পরমপদ, নির্বাণ বা কৈবল্য লাভ কিভাবে হবে তা বলতে গিয়ে বলেছেন, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বিষয় প্রপঞ্চ হতে প্রত্যাবৃত্ত করে অন্তর্মুখ করতে হবে। যেমন চোখের অভ্যাস এই প্রপঞ্চ জগতের ভৌতিক রূপ রসে আসক্ত থাকা, তার স্বভাবই হচ্ছে বাহ্যরূপ দর্শন। যোগীর কর্তব্য এই দৃষ্টিকে বহির্জগৎ হতে প্রত্যাহার করে, অন্তর্জগতের দিব্যরূপ দর্শনে রত রাখা। কানের কাজ
বাহ্যিক বার্তালাপ বা ব্যর্থ প্রলাপে মেতে থাকা এবং বাহ্যশব্দ শ্রবণ। যে যথার্থ যোগী হবে সে কানের এই বৃত্তিকে উলটিয়ে অন্তঃকর্ণে অনাহত নাদ শ্রবণে মেতে থাকবে। নাসিকা পথে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের যাতায়াত চলছে, সেই গতিকে উলটে শ্বাস-বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারিণো করে আরোহের পথে প্রাণ-চৈতন্যের কূলে পৌঁছতে হবে। এইভাবে নিরন্তর লেগে থাকলে তবেই অলখ্ নিরঞ্জনকে প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ হয়।

দরজা খুলে আমরা দুজনে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন মনে হ'ল আটটা বেজে গেছে। যোগনাথজীকে কোথাও দেখতে পেলামনা, তিনি চলে গেছেন। চক্রেশ্বর বা অচ্যুতনারায়ণের মন্দিরে পূজা চলছে। বহু ভক্তের ভীর। আমরা নর্মদাতে স্নান-তর্পণাদি সেরে যখন ফিরলাম তখন পূজা হয়ে গেছে। মন্দিরে কেউ নেই। মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। সারাদিন একা দিওয়ানাজীর সাথে থাকতে পেরে তাঁর কাছে অনেক গুহ্য তত্ত্ব শুনতে এবং শিখতে পারলাম।

পরদিন ভোরে উঠে দুজনে যাত্রা করলাম নর্মদার তট ধরে। গৌণী সংগম পেরিয়ে বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছলাম জামানের সংগমে। গৌণী সংগম হতেই পাহাড়ী পথ উপত্যকা অঞ্চলের সমতল পথ শেষ হয়েছে, কোথাও কৃষিক্ষেত্র চোখে পড়ছেনা, জঙ্গল ক্রমেই বাড়ছে, উঁচু নিচু রুক্ষ কঠিন পাহাড়ি পথে হাঁটছি। জামানের সঙ্গমে একটি শিবমন্দিরেই রাত্রিবাসের সংকল্প করলেন দিওয়ানাজী। নর্মদাতে স্নান করে আমার ঝোলাতে জব্বলপুরের ভিড়াঘাটে মহাত্মা সুমেরদাসজীর দেওয়া যে মিছরী এবং কিসমিস ছিল তাই নর্মদার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আমরা প্রসাদ পেলাম। দিওয়ানাজী বললেন - কভি মালাই, কভি চানা, কভি কড়াই, মিছরী দানা, এই ত সাধুর জীবন। তোমার ঝোলার সঞ্চয় শেষ হল, এইবার আকাশবৃত্তি, নিঃশ্ব ও নিষ্কাম হয়ে রেবাতটে পরিক্রমা কর, দেখ রেবা মাতা কিভাবে তাঁর অগাধ ও অফুরন্ত মাতৃস্নেহে তোমাকে প্রতিপালন করেন।

মন্দিরে ঢুকে দেখলাম এক বিরাট শিবলিঙ্গ, লিঙ্গের গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র, কোনদিন পূজা হয় বলে মনে হলনা। দিওয়ানাজী ভৈরব, ভৈরব, ভৈরবায় নমঃ' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রণাম করে উঠে আমাকে বললেন- ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথে রাস্তার নমুনা দেখেছ ত ? এইবার যত এগোবে, ততই এই মহাবনের ভীষণতা অনুভব করবে। যে পথে এসেছ, এই পথই যথার্থ পরিক্রমার পথ। পরিক্রমাবাসীরা যতদূর সম্ভব এই পথকে এড়িয়ে চলবার জন্য হয় রেবা সঙ্গম থেকে দক্ষিণতট ধরে, নতুবা হণ্ডিয়া থেকে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা সুরু করেন। তাতে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথ যে বাদ দেওয়া যায় তা নয়, তবে চুয়াল্লিশ মাইল ব্যাপী এই কঠিনতম কষ্টকর পথের বিকল্প অপেক্ষাকৃত সহজতর পথে হেঁটে পরিক্রমা করা সম্ভব হয়। যাঁরা পরিক্রমা করেনা অথচ ওঁকারেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে ইচ্ছুক সেইসব সখের অভিযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের জন্য হোসেঙ্গাবাদ হতে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত একশ পঁচিশ মাইল পথ রেলপথে আসার ব্যবস্থা আছে। হোসেঙ্গাবাদ হতে ভায়া ইটারসি হরদা হরসুদ হয়ে খাণ্ডোয়া জংশনে পৌঁছানো যায়। খাণ্ডোয়া থেকে সনাবদ হয়ে মোরটক্কাতে নেমে সাতমাইল রাস্তা রুক্ষ কাঁকরময় পথে অল্পসল্প জঙ্গল পথে হাঁটলে কিংবা হোসেঙ্গাবাদ হতে মোটরে চেপে এসে মোরটক্কাতে নেমেও ওঁকারেশ্বর মহাতীর্থে পৌঁছানো যায়। কিন্তু নর্মদা-তপস্যার পথ সেটা নয়। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করে নগ্নপদে পরিক্রমা করতে পারলে তবেই তাকে তপস্যা বলা যাবে। তোমার বাবার কাছে ত শুনেইছ - তপস্যা মানে তাপ সহা! এই বলে হাসতে লাগলেন।

বাবা কবে বাংলাদেশের এক গ্রামে বসে তপস্যা অর্থে তাপ-সহা এই ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই মহাপুরুষ দেখছি, তাও জানেন। আমার জীবনের কোন ঘটনাই দেখছি এঁর অবিদিত নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হঠাৎ আমাকে বললেন - এসো মন্দিরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করি। মহাত্মা সুমেরদাসজী ত তোমাকে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে মন্ত্রে গণ্ডী দিতে শিখিয়েছিলেন, এসো সেই মন্ত্রেই মন্দিরের চারপাশে গণ্ডী কাটি; বলেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। বললেন, ওঁকারের ঝাড়ির উপান্তভাগ সুরু হয়েছে, কাজেই এদিকেও জঙ্গল থেকে শের, ডাঙ্গো, সাপ, হুড়াল বা গণ্ডারাদি ছিটকে চলে আসতে পারে; তাই গণ্ডী কাটলাম। আমি জন্তু জানোয়ারকে ডরাইনা। কিন্তু আমি নিজে এটি আচরণ করে তোমাকে জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছি, ওঁকারের ঝারিতে মন্দির বা গাছতলা যেখানেই রাত্রিবাস করবে, একাই থাক আর জমাতের সঙ্গেই থাক, অতি অবশ্যই এই মন্ত্রে গণ্ডী কেটে বাস করবে, আমাকে কথা দাও। এই বলে চিবুকে হাত দিলেন। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বললাম - আপনার হুকুম আমি অবশ্যই পালন করব।

মন্দিরে ঢুকে আমরা আসন পাতলাম। মন্দিরের দরজা নেই। তবে ফাল্গুন মাসের আজ শেষ দিন, শীত খুব সামান্যই আছে। তিনি একদম মৌন হয়ে গেলেন। শুয়ে পড়লেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম সুমেরদাসজী আমাকে গণ্ডী কাটার যে মন্ত্র শিখিয়েছিলেন তাও এঁর অজানা নেই। ভাগ্যবশে যখন এইরকম একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছি, তখন এঁর সঙ্গে থেকে গেলেই বা মন্দ কি! কিন্তু না, বাবার হুকুম নর্মদা পরিক্রমা করতে হবে। জীবন থাকতে বাবার অন্তিম আদেশ অমান্য করতে পারবনা। বাবার কথা চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েই পড়লাম।

ভোরেই ঘুম ভেঙেছে। দিওয়ানাজী বললেন - চল নর্মদাতে স্নান সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পরি। স্নান সেরে এসে উভয়ে ভৈরবের মাথায় জল ঢাললাম। প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ বলতে বালি আর কাঁকর, লাল আর কালো পাথরের ঢিবির পর ঢিবি। ঢিবির গায়ে গায়ে ফণিমনসা আর কাঁটা বাবলা। মাঝে মাঝেই সেগুন গাছের জটলা। কোথাও বা পথের দুধারে সারিবদ্ধভাবে সেগুন, বুনো নিম এবং শিরীষ গাছ। নর্মদা যেন ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে কতকটা পথ ঢুকে গিয়ে আবার বক্রগতিতে আপন পথে বয়ে চলেছে। দিওয়ানাজী বললেন - এসো গল্প করতে করতে যাই, তাতে হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে। তুমি যথেষ্ট সাবধান আছ, তবুও তোমাকে বলছি পরিক্রমার পথে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে পাবে যাদের বেশভুষা, পোষাক পরিচ্ছদ, মালা-তিলকের ঘটা কিংবা বচন-পারিপাট্য দেখে মনে হবে যেন কত বড় সিদ্ধযোগী, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারবে, তাদের অধিকাংশই বৈরাগ্যহীন বৈরাগী, কপট এবং ক্রুর প্রকৃতির মানুষ। সাধু সেজে থাকে, যোগী সেজে থাকে। সাধন ভজন না করে কেবল ছত্রে বা সদাবর্তে অন্ন ধ্বংস করাই তাদের কাজ। বৃথা বাগবিতণ্ডায় তারা সময় কাটায়। ভারতের বিভিন্ন মঠে এবং সম্প্রদায়ে এ ধরনের লোক এখন ভীড় করে আছে। নর্মদা পরিক্রমা করতে করতেও অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাবে। এদের সঙ্গে কোন মতেই বিবাদ বা সংঘাত সৃষ্টি করবেনা। এড়িয়ে চলবে, প্রয়োজন বোধে মৌনব্রত অবলম্বন করবে। সাম্প্রদায়িক সাধুরা ভীষণ গোঁড়া হয়। শাস্ত্রীয় সত্য প্রকাশের অনুরোধে কারও আচার বিচারকে ভুল বলে মনে হলেও চুপ করে থাকবে। সাধুসমাজে এইরকম ভণ্ডের ভীড় পূর্ব যুগেও ছিল নতুবা যোগীগুরু দত্তাত্রেয় একথা বলতেন না যে -

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতৎ তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ ॥
অন্নপানবিহীনাস্ত্র বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
উচ্চাবচৈ বিপ্রলম্ভে যথস্তে অশনালবঃ ॥

হে সাঙ্কৃতে! ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, এই কথাকে সত্য বলে জানবে। শিশ্নোদর তৃপ্তির মানসে যারা যোগীর বেশ ধারণ করে, তাদের সিদ্ধি কেমন করে সম্ভব? তারা অন্নপানাসক্ত উদরসর্বস্ব হয়েও লোকের কাছে পান ভোজন ত্যাগের অভিনয় করে এবং লম্বা চওড়া কপট বাক্য উচ্চারণ করে লোকসমাজকে প্রবঞ্চিত করে থাকে।

দিওয়ানাজী কথা বলতে বলতে বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, বড় একটা কাঁকরে হোঁচট খেলেন। আমি ধরে ফেললাম। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিয়ে দেখি, সামান্য একটু ছড়ে গেছে। আমি জল ঢেলে তাঁর পা ধুইয়ে দিলাম। নর্মদাতে গেলাম কমণ্ডলু ভরে নিতে। ফিরে আসতেই বললেন - মহাত্মা সুমেরদাসজী তোমাকে গণ্ডী কাটার যে রেবামন্ত্র শিখিয়েছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আমি গতকাল জামানের সঙ্গমের ভৈরব মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলাম, সেই মন্ত্র দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা গণ্ডী কাট। দূরে একটা হিংস্র গোঁওড়া আসছে দেখতে পাচ্ছি। মন্ত্রটি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পার কিনা, আমি সেটা নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই। তুমিও রেবামন্ত্রের মাহাত্ম্য পরীক্ষা করে মন্ত্রের কার্যকারিতায় ধ্রুব বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

তাঁর কথা শুনে আমি পথের দিকে এবং পথের দুপাশের জঙ্গল এবং পাহাড়ের দিকে ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম, বনের পাখী এবং দূরের গাছের ডালে দু'চারটা ময়ূর ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলামনা। পুনরায় তিনি তাড়া দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দুজনের দাঁড়ানোর মত স্থানকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে গণ্ডী টানলাম। গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় দশ মিনিট পরেই দেখি জঙ্গল ভেদ করে গাছপালা

আলোড়িত করে একটা বিরাট গণ্ডার ক্রুদ্ধভাবে গর্জ্জন করতে করতে গণ্ডী থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতার পশুশালায় গণ্ডার দেখেছিলাম, কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গলের পটভূমিতে তেজে বীর্যে টগবগ করছে এই রকম একটি বিকট জীব, দুটো বড় ধারালো দাঁত নিয়ে যখন সামনে এসে হাজির হল, বুঝলাম এর সঙ্গে পশুশালার গণ্ডারের কোন তুলনাই হয়না। আমি চাপা কণ্ঠে মহাত্মাকে বললাম, আপনি নর্মদার দিকে ঘুরে দাঁড়ান, আপনি চেয়ে থাকলে বা চোখ বুজে থাকলে আমার মনে হবে, সেদিনকার সেই হায়না তাড়ানোর মত আপনি কিছু করলেন। আমি মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করতে চাই। মৃদু হেসে দিওয়ানাজী নর্মদার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

গণ্ডার কিন্তু আর এগিয়ে এলনা। যে রকম তেড়ে ফুড়ে সে এগিয়ে এসেছিল, তার সেই উদ্দাম গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মিনিট খানেক থমকে দাঁড়িয়ে থেকে গণ্ডারটা ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল।

দিওয়ানাজী বললেন - রেবামায়ীকি মন্ত্রকী প্রভাও দেখা ? ভুলো মৎ। জঙ্গলমেঁ জাঁহা রাত বীতায়েগা এহি মন্ত্রসে গণ্ডী জরুর দেনা। এখন গণ্ডীর রেখাটা মুছে ফেল। এটা থাকলে কোন পশুরই ক্ষমতা নেই যে এই গণ্ডী অতিক্রম করে। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সন্তানদের যাত্রাপথ অবাধ এবং অবারিত থাকাই শ্রেয়।

গণ্ডী মুছে আবার হাঁটিতে লাগলাম। সারাদিন হেঁটে বেলা প্রায় চারটার সময় নেমাবরে এসে পৌঁছলাম। দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়া মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম। বড় বড় সেগুন গাছের জটলার জন্য সম্পূর্ণ মন্দিরটা চোখে পড়ছিলনা। জঙ্গল পেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলাম বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধনাথ বিরাজিত। কিছুদূরে আরও দু'চারটা পাথরের পুরোনো বাড়ী দেখতে পেলাম। দিওয়ানাজী বললেন - এই নেমাবর হচ্ছে নর্মদামাতার নাভিস্থল। পরিক্রমাবাসীর হাঁটা পথে অমরকন্টক হতে চারশ ছাব্বিশ মাইল পথ তুমি হেঁটে এসেছ। এখনও প্রায় আর্দ্ধেক পথ বাকী, তবেই রেবাসঙ্গমে পৌঁছতে পারবে। এই স্থান প্রাচীনকাল হতেই তপস্যার অনুকূল। এখানকার বাতাবরণ বড়ই পবিত্র। সদাবর্ত আছে। চল যাই সর্বাগ্রে সিদ্ধনাথকে দর্শন করে প্রণাম করে আসি।

মন্দিরে গিয়ে দেখলাম বহু ভক্তের ভীড়। গৃহী সন্ন্যাসী দুই-ই আছে। এই মন্দিরের পুরোহিত একজন সন্ন্যাসী, তাঁর একটি চোখ নষ্ট, জটাধারী। দেখলাম তিনি দিওয়ানাজীকে চেনেন, তিনি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে বললেন - বৈষ্ণোতীর্থ ছোড়কে আপ ইধর পধারেঙ্গে ইয়ে ত বড়ি তাজ্জব বাত। আপকা সাথমেঁ কয় মূর্তি হ্যায় ? দিওয়ানাজী আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

- 'তব ত হম্ নেহি ছড়ুঙ্গা। হমারা আশ্রমমেঁ ঠারনেই পড়েগা। আজ চৈত্র মাসকি পহেলা হ্যায়। ইহ্ পুণীত দিবসমেঁ আপকা দর্শন মিলা, ইহ্ হমারা ভাগ্ হ্যায়'।

তাঁর কথায় বুঝলাম আজ ছয় মাস ধরে আমি পরিক্রমা করছি। সন্ধ্যা হয়নি। আরতির দেরী আছে। আমরা সিদ্ধনাথকে প্রণাম করে নর্মদার ঘাটে এসে স্নান করলাম। স্নান সেরে উঠতেই দিওয়ানাজী নর্মদার দক্ষিণ তটের একটি সুউচ্চ মন্দির দেখিয়ে বললেন - 'উহ্ হ্যায় হণ্ডিয়াকী ঋদ্ধনাথজীকা মন্দর'। মন্দিরের চূড়ায় দ্বাদশ কলস, বোধহয় পেতলের, ঝকঝক করছে।

দিওয়ানাজী বললেন - নর্মদার এপারে এই উত্তরতটে নেমাবর এবং ওপারে ঐ দক্ষিণতটে হণ্ডিয়া, দুই স্থানকে নর্মদার নাভিস্থল এইজন্য বলা হয় যে এই দুই স্থানই অমরকন্টক হতে রেবাসংগম পর্যন্ত দূরত্বের মাঝামাঝি স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঋদ্ধনাথ ও সিদ্ধনাথ এই দুই স্থানই কুবেরের শিবতপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র। মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমার দূরত্বকে আটশ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন বটে কিন্তু পরিক্রমাকারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে বোঝা যায় মুণ্ডমহারণ্য, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি এবং শূলপাণির ঝাড়ি এই তিনটি ঘোর জঙ্গল সহ পাহাড়ী উপত্যকা অঞ্চলকে ধরলে সমগ্র পথ সাড়ে আটশ মাইলের কম হবেনা। যে যুগে মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন সেই সময় হয়ত পথের দূরত্ব আটশ মাইলই ছিল, কিন্তু কালক্রমে নর্মদার গতিপথের সামান্য অদলবদল হওয়ায় এখন দূরত্ব কিঞ্চিৎ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেড়ে গেছে। কুবেরজী সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে বল শুনি।

বললাম - পুরাণে এবং রামায়নে যা আছে তাতে জানা যায় যে, কুবের যক্ষদের রাজা, তিনি ধনাধিপতি। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবামুনি তাঁর পিতা। কুবেরের মায়ের নাম দেববর্ণিনী। বিশ্রবার পুত্র বলে এঁর আর এক নাম বৈশ্রবণ। উগ্র তপস্যা করে কুবের ব্রহ্মার বরে অমরত্ব, উত্তর দিগন্তের দিকপালত্ব এবং ধনাধ্যক্ষতা

লাভ করেন। ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক রথ দান করেছিলেন। এই দিব্য রথের বৈশিষ্ট্য এই যে, স্মরণ মাত্রই এই রথ তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ত এবং যথাস্থানে পৌঁছে দিত। বিশ্রবামুনি তাঁর এই পুত্রের জন্য লঙ্কাপুরী বাসস্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু বিশ্রবার অপর পুত্র কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের কাছ হতে স্বর্ণলঙ্কা এবং পুষ্পক রথ অধিকার করে নেন। তখন বিশ্রবামুনি অলকাপুরীকে কুবেরের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। মহাকবি কালিদাসের অমর গীতিকাব্য 'মেঘদূতম্'-এ বর্ণিত এই অলকাপুরী লোকমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কুবের হিমালয়ে একবার দেবী রুদ্রানীকে দৈবাৎ দেখতে পান, ফলে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং বাম চক্ষু বিগলিত হয়ে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। কুবেরের তিনটি পা এবং আটটি দাঁত ছিল। এঁর দেহের গঠন এইরকম কুৎসিৎ বলেই নাম হয় কুবের। কুবেরের দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে নল-কুবের ও মনিগ্রীব, কন্যার নাম মীনাক্ষী। এই পৌরাণিক কাহিনী বাদ দিলে বৈদিক মতে কুবের শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। কুবি আচ্ছাদনে 'এর' ধাতু হতে কুবের শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যঃ সর্বং কুবতি স্বব্যাপ্তাচ্ছদয়তি স কুবের জগদীশ্বরঃ। যিনি স্বীয় ব্যাপ্তির দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম কুবের।

সব শুনে দিওয়ানাজী বললেন, তা ঠিক; তবে তুমি এইমাত্র বললে যে কুবের উগ্র তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সেই উগ্র তপস্যা স্থান এই নেমাবর এবং হণ্ডিয়া। রাবণ কুবেরের কাছ থেকে স্বর্ণলঙ্কা এবং পুষ্পক রথ কেড়ে নিলে মনের দুঃখে কুবের নর্মদায় উত্তরতটস্থ এই নেমাবরে সিদ্ধনাথের স্থানে এসে ষড়ক্ষরী শিববীজ জপ্ করতে থাকেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে কুবেরকে 'নবনিধি' অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, মহাপদ্ম, মকর কচ্ছপ, নীল কুন্দ, মুকুন্দ, খর্ব প্রভৃতি মহামূল্য মণিমাণিক্যের সঙ্গে পুষ্পক রথ এবং অলকাপুরী দান করেন। রাবণ পুনরায় সব কেড়ে নিলে মহাদেবের প্রত্যাদেশে কুবের নর্মদার দক্ষিণতটে ঐপারে হণ্ডিয়াতে ঋদ্ধনাথের স্থানে বসে তপস্যা করেন এবং পুনরায় সেই নবনিধি এবং অলকাপুরী ফিরে পান।

মন্দিরে আরতির বাজনা বাজছে। আমরা সিদ্ধনাথের মন্দিরে এসে আরতি দেখতে লাগলাম। দিওয়ানাজী আরতি দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পরলেন। ভক্তদের ভীড় ঠেলে আমি তাঁকে বসিয়ে দিলাম। আরতি শেষ হবার পর একজটা বাবা জোর করে ভক্তদেরকে মন্দির ছেড়ে যেতে বাধ্য করলেন। তিনি দিওয়ানাজীর এই দুর্লভ অবস্থার সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচিত। দিওয়ানাজীর শরীরে কোন স্পন্দন নেই, নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিঃশ্বাস পরছেনা। শরীর ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে। মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে ঘি-এর প্রদীপ, দরজার দুই কোণে জ্বলছিল দুটি মোমবাতি। ক্রমে দুটি মোমবাতিও নিভে গেল। মন্দিরের দাওয়াতে পূর্বদিকে আমি আসন পেতেছি। একজটা বাবাও অন্যদিকে একটি কম্বল এনে তাঁর শয্যা পাতলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় নর্মদার জল পাহাড় ও বনস্থলী অপূর্ব স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সমাধিস্থ দিওয়ানাজীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর মুখমণ্ডল ঘিরে এক জ্যোতির বলয় সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর দাড়ির চুলগুলোও চিকচিক করছে। একজটা বাবা স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জপ্ করে চলেছেন। হঠাৎ সারা মন্দির কস্তুরীর সুন্দর গন্ধে ভরে গেল।

শেষ রাত্রে দিওয়ানাজীর শরীরে কম্পন দেখা দিল। কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠে তিনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন 'হরি হরয়ে নমঃ, হর নর্মদে হর'। একজটা বাবার ইঙ্গিতে রেবামন্ত্র উচ্চারণ করে কমণ্ডলু হতে কয়েক বিন্দু নর্মদার জল তাঁর শরীরে ছিটিয়ে দিলাম। একজটা বাবা দ্রুত তাঁর আশ্রমে গিয়ে একটা খাটিয়া নিয়ে এলেন। দুজন শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে তাঁকে খাটিয়ায় শুইয়ে আশ্রমে বয়ে আনলাম। দিওয়ানাজী তদবস্থায় শুয়ে রইলেন, আমি তাঁর কাছেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। ভোর হয়ে আসছে। বেলা নটার সময় আমি যখন জেগে উঠলাম তখন দিওয়ানাজী বসে বসে গুণগুণ করে গান গাইছেন। আমাকে বললেন - নর্মদাতে গিয়ে স্নান করে বাবা সিদ্ধনাথের পূজা করে এস। কাল থেকে তুমি অভুক্ত। একজটাজী ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন। ভক্তদের 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি ভেসে আসছে। স্নান করে মন্দিরে পৌঁছতেই একজটাজী পূজার সুযোগ করে দিলেন। মন্দিরের প্রাত্যাহিক নিত্যপূজা শেষ হয়ে গেছে। ভীড় আর নেই বললেও চলে।

পূজা করতে বসে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি বেদমন্ত্রে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে ভাল করে মার্জনা করতে করতেই শিবলিঙ্গের স্বাভাবিক রূপ দেখতে পেলাম। দেখলাম প্রায় দুই ফুট উচ্চ শিবলিঙ্গের সামনের দিকটা কালো এবং যোনিপীঠের দিকটা সাদা। জ্যামিতিক মাপে সাদা ও কালো অংশ প্রায় সমান। শিবলিঙ্গের যোনিপীঠ যেইদিকে, সেইদিকে গিয়ে খুব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে শিবলিঙ্গের গাত্রে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চিহ্ন,

দক্ষিণাবর্ত গতিতে পরিস্ফুট চক্র চিহ্ন এবং কৌমুদকী অর্থাৎ গদার চিহ্ন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সামনে ঘুরে এসে ঘন কৃষ্ণ অংশ একটুকরো রেশমী বস্ত্রে (মন্দিরেরই) ভাল করে ঘষতে ঘষতে যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা অস্পষ্ট চিহ্নকে বোঝবার চেষ্টা করছি, তখন পেছন থেকে একজটা বাবা বলে উঠলেন - আরে ভেইয়া, শিউজিকো এতনা রগড়াতে হো কেঁও ? ম্যায়নে দেখা, উহ্ পদ্মচিহ্ন হ্যায়। মহাদেওকি বিভূতি এক দো নেহি, উনকা অনন্ত বিভূতিয়াঁ হৈ। আমি তাঁকে বললাম, আপনার আশ্রমে যাচ্ছি একটা বই আনতে। তাতে সব চিহ্নের পরিচয় আছে। এসে পূজা করব।

- য্যায়সা আপকী মৌজ।

আশ্রমের দিকে যাচ্ছি, দেখলাম দুজন বৃদ্ধ দণ্ডী সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হাতে মন্দিরে যাচ্ছেন সিদ্ধনাথের পূজা করতে। আশ্রমে এসে দেখি দিওয়ানাজী ঘুমিয়ে আছেন। ঝোলা হতে 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বইটি বের করে আবার মন্দিরে ফিরে এলাম। সেই দণ্ডী সন্ন্যাসীদ্বয় তাঁদের দণ্ড স্পর্শ করে শিবস্তোত্র পাঠ করছেন। স্তোত্র পাঠ হতেই তাঁরা চলে গেলেন। অমরকন্টক হতে এ পর্যন্ত আমি এর আগে কোন দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখিনি, একজটা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে স্বামী ভাবানন্দ আশ্রম নামে এক মহাত্মা আজ তিন চার বৎসর হল নেমাবরে এসে আশ্রম করে রয়েছেন। এই দুজন মহাত্মা তাঁরই শিষ্য। স্বামী ভাবানন্দ শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, তিনি অনর্গল সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন না। তাঁর গুরুপীঠ হল কাশীস্থিত মছলি-বন্দর মঠ। আমাদের ডেরা থেকে একটু দূরেই তিনি সম্প্রতি তাঁর আশ্রমেই অবস্থান করছেন। এখন তুমি পূজা সেরে চল, কোনো এক সময় তাঁর কাছে নিয়ে যাবো। তবে সংস্কৃতে কথা বলতে হবে। সংস্কৃতে কথা বলার ভয়ে ঐ সন্ন্যাসীর কাছে কেউ যেতে চাননা।

যাইহোক আমি 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বইটি ঘেঁটে পূর্বদৃষ্ট লক্ষণ মিলিয়ে সিদ্ধনাথের পরিচয় পেলাম যে, ইনি বৈষ্ণবলিঙ্গ, কারণ বৈষ্ণবলিঙ্গের পরিচয় হচ্ছে -

বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্কগদাজাদিবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসকৌস্তুভাঙ্কঞ্চ সর্বসিংহাসনাঙ্কিতম্॥
বৈনতেয়সমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্।
বৈষ্ণবং নাম তৎপ্রোক্তং সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদম্॥

সিদ্ধনাথের লিঙ্গে শ্রীবৎস, কৌস্তভ, গরুড় ও বিষ্ণু পদচিহ্ন না থাকলেও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি বিষ্ণু চিহ্ন থাকায় ইনি যে বৈষ্ণবলিঙ্গ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। এই লিঙ্গ অর্চনায় সর্বৈশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। তাই রাজ্যভ্রষ্ট হৃতসর্বস্ব কুবের এর তপস্যা এবং অর্চনা করে পুনরায় অলকাপুরী লাভ করতে এবং ধনাধিপতি হতে পেরেছিলেন।

শিবের মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে প্রণাম করে মন আনন্দে ভরে গেল। মন্দির থেকে বেরিয়েই আমি একজটা বাবাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে নামলাম। ইতিমধ্যেই আমার মনে জেগেছে যে, হরকুমার ঠাকুর এই দুর্লভ বই 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' সংকলন করেছিলেন এবং মহারাজা যতিন্দ্রমোহন ঠাকুর যেটি প্রকাশ করে সমগ্র হিন্দু জনতার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন, যে বইটির সাহায্যে শিবভূমি নর্মদাতে এসে আমি শিবলিঙ্গের পরিচয় জানতে পারছি, আমার সর্বাগ্রেই উচিৎ ছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে নর্মদার পবিত্র জলে অর্ঘ্য দান করা। আমি নর্মদার জলে তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে এসে একজটা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ডেরায় ফিরলাম।

আশ্রমে ঢুকে দেখি দিওয়ানাজী দুটি বড় ভাঁড়ে মাঠা ঢেকে রেখে বসে আছেন। একজটা বাবার দুজন সেবক তাঁকে মাঠা দিয়েছিলেন, আমাকে নিয়ে একসঙ্গে তা পান করবেন বলে বসে আছেন। মাঠা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন - ক্যা সিদ্ধনাথজীকা পরিচয় উদঘাটন কিয়া ? আমি তাঁকে সব তথ্য জানালাম। বেলা প্রায় একটার সময় ভোজনপর্ব সমাধা করে একজটা বাবাকে অনুরোধ করলাম দণ্ডী সন্ন্যাসী ভাবানন্দজীর আশ্রমটা দেখিয়ে দিতে। দিওয়ানাজী মন্তব্য করলেন - বেকার বার্তালাপ সে ক্যা ফায়দা ?

বিশ্রাম করো, সিদ্ধনাথজীকো স্মরণ মনন করো। আমি তাঁকে কোনমতে বুঝিয়ে আশ্রমের সেবককে সঙ্গে নিয়ে ভাবানন্দজীর আশ্রমে এলাম। বনের মধ্যে নর্মদার তটেই তিনটি কুটীর, একটিতে তিনি স্বয়ং থাকেন, অন্য দুটিতে আর চারজন সন্ন্যাসী থাকেন। আমি আশ্রমে ঢুকতেই ভাবানন্দজীর গর্জন শুনতে পেলাম।

- কুতো আগতবান ভবান্ ? গৌড়দেশাৎ ?

- বাঢ়ম্ (হ্যাঁ)।

- অহমেব তত্রদেশাৎ অগতোহস্মি যত্র দেশাৎ ভগবৎ পূজ্যপাদ শংকরাচার্য আবির্ভুবয়ন্ বৌদ্ধধর্মাদিন অপধর্মাননিগড়ীকৃত্য সনাতন ধর্মতত্ত্বম্ সমুজ্জ্বল কৃতবান্।

- যো ধর্মতত্ত্বাৎ ভগবৎপাদ বুদ্ধঃ মহাবীরশ্চ অহিংসা মৈত্রী করুণা মুদিতাদিন প্রচার্য্য সর্বেষাম্ শং মঙ্গলম্ করোৎ তান ধর্মান্ অপধর্মান্ উচ্চার্য ত্বমহপি অপভাষিতবান্। ইদং গর্হিতম্, ইদং গর্হিতম্।

সংস্কৃত ভাষার এই কথোপকথন বাংলাতে দাড়ায় যে, তিনি এমন মহান দেশ থেকে এসেছেন যে দেশে ভগবান শংকরাচার্য আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতি অপধর্মকে নিগড়বদ্ধ এবং স্তব্ধীভূত করে সনাতন হিন্দুধর্মকে সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

তার উত্তরে আমি জানালাম যে - ভগবান বুদ্ধদেব ও মহাবীর অহিংসা সত্য মৈত্রী মুদিতা ও করুণার বাণী প্রচার করে সমগ্র জীবজগতের কল্যণ সাধন করেছিলেন, তাঁদের সেই মহান্ কল্যান ধর্মকে অপধর্ম বলে আপনি গর্হিত কাজ করেছেন।

আমার কথায় সাধু ক্ষেপে উঠলেন যেন। তিনি সংস্কৃতে বলতে লাগলেন - গৌড়দেশ বেদবর্জিত। বেদ বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব গৌড়ীয়দের মাথায় ঢুকবেনা, তায় তোমার বয়সও অল্প।

আমি সংস্কৃতেই জবাব দিলাম - যে দেশ মহর্ষি কপিলের তপস্যাভূমি, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সন্ন্যাসীকুলের পূজনীয়, ভারতের দ্বিতীয় শংকরাচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' লিখে শংকরাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের কঠিন্ ইক্ষুদণ্ড হতে সুমিষ্ট নির্যাস নিষ্কাসন করে আপনাদের মত পণ্ডিতম্মন্যদের বোধগম্য করে তুলেছেন, কিংবা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেখানে আবির্ভূত হয়ে ভক্তিপ্রেমের মন্দাকিনীর রুদ্ধ স্রোতকে উৎসারিত করে দিয়েছেন, সেই দেশকে বেদবর্জিত বলতে আপনার মত প্রবীণ সন্ন্যাসীর জিহ্বা কম্পিত হলনা দেখে আশ্চর্য বোধ করছি।

ভাবানন্দ - অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণেতা মুধুসূদন সরস্বতীর গুরুস্থানীয় আচার্য শংকরের জন্মভূমি এবং চৈতন্যদেবের গুরুস্থানীয় পূর্বাচার্য রামানুজ বা মধ্বাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদের উৎপত্তিস্থল হিসাবে কেরল তথা মদ্রদেশের গুরুত্ব যে গৌড়দেশের চেয়ে বেশী একথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারনা। মহা মহা মনীষী বেদজ্ঞ এবং বৈদান্তিক জন্মেছেন দাক্ষিণাত্যে।

আমি বললাম- বড়ই আশ্চর্য হলাম যে, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেও ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ সংস্কার হতে এখনও মুক্ত হতে পারেন নি। কেরল, মাদ্রাজ বা বাংলাদেশ এইসবই ঋষিসেবিত ভারতবর্ষেরই এক একটি অঙ্গদেশ মাত্র। ভারতের যে অংশে যে মনীষী বা তত্ত্ববিদ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাই দিয়ে কোন রাজ্য ছোট বা বড় তার বিচার করা একান্ত হীনবুদ্ধির পরিচয় বলেই মনে করি। তপোভূমি নর্মদার তটে কোন সন্ন্যাসীর কাছে এই রকম কথা শুনতে পাব আশা করিনি। আপনি দণ্ড গ্রহণ করেছেন যেখান থেকে, আপনার গুরুস্থান অর্থাৎ কাশীর মছলি বন্দর মঠও আর্যাবর্তেরই একটি ক্ষুদ্র স্থান। কোন তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা মনীষার দিব্যপ্রকাশ ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়; যেখানেই, যার মধ্যেই জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞার উদয় ঘটুক না কেন; তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই উপকৃত করে। দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে তা সর্বকালের সর্বজাতির মানুষরই গর্ব ও গৌরবের বস্তু হয়। গৌড় তথা বঙ্গদেশের উপর আপনার বিরাগ এবং উন্নাসিক মনোবৃত্তি দেখে আপনাকে গৌড়ীয় মহামনীষী অতীশ দীপঙ্করের পুণ্যনাম সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শুধু কেরল বা মদ্রদেশে কেন সারা পৃথিবীর কোণে কোণে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আপনি তাঁর সমকক্ষ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী আর একজন তত্ত্বাচার্যের নাম করতে পারবেন না।

দেখলাম, ভাবানন্দজীর মুখ ক্রোধে রক্তিম আকার ধারণ করেছে; কপাল ও গলার শিরাগুলোও ফুলে উঠেছে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সংস্কৃতে বলে উঠলেন - 'তুমি বালক, তোমার প্রগলভতা আমি ক্ষমা করলাম। বলত বাচাল ছেলে, শংকরাচার্যের মত মাত্র আট বৎসর বয়সে আর কে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হতে পেরেছেন ?

'শংকরো শংকরঃ সাক্ষাৎ স দেব ন তু মানুষঃ। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়েছিল। পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে আর কোন ধর্মাচার্যের কথা কি তুমি পড়েছ যিনি এত অল্প বয়সে সারাভারতের তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদেরকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে বেদ-বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের বিজয়-কেতন উড্ডীন করতে পেরেছেন ? কী অমানুষিক সংগঠনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি! একবার ভেবে দেখ, পদব্রজে পরিক্রমান্তে ভারতের চার প্রান্তে চারটি প্রধান মঠ, যথা দ্বারকায় সারদামঠ, মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীতে গোবর্ধনমঠ এবং বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ স্থাপন করে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের একটি সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন। দৈবী প্রতিভা ছাড়া কি আর কারও দ্বারা এই রকম বিরাট কাজ করা সম্ভব ?

বললাম - আপনি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আচার্য শংকরকে আমি যুগন্ধর পুরুষ বলে স্বীকার করি ও শ্রদ্ধা করি। আমি কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করব। আচার্য শংকর বারটি প্রধান উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন একথা আমরা সবাই জানি এবং মানি। তাঁর প্রতিটি ভাষ্য রচনার প্রতি পংক্তিতেই মনীষার স্বাক্ষর রয়েছে, একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কিন্তু স্তবকমালার শতশত স্তোত্রও কি তিনি রচনা করেছিলেন ?

ভাবানন্দ - নিশ্চয়ই করেছিলেন। দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর প্রতিটি স্তোত্রের নীচে লেখাই ত আছে - ইতি শ্রীমৎ - পরমহংস - পরিব্রাজকাচার্য - শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য - বিরচিতং শিবাপরাধক্ষমাপণ - স্তোত্রং অথবা শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্রং-সমাপ্তম্ ইত্যাদি। কাজেই এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ থাকলে তা অমূলক।

আমি বললাম - ভগবন! আপনার মত এইরকম বিদ্বান স্বামীজীর দর্শন লাভ আর কোনদিন জীবনে ঘটবে কিনা জানিনা, আপনার কাছে আর একটি শঙ্কার সমাধান করেনি। আপনি কোন অপরাধ নেবেন না।

স্তব স্তুতিতে দেবতা সন্তুষ্ট হন, স্বামীজী ত মনুষ্য দেহধারী! তিনি আমার বিনম্র বচনে অর্থাৎ তোষামুদিতে তুষ্ট হয়ে হাসতে হাসতে বললেন - ব্রুহি ব্রুহি কিম্ শঙ্কামিতি, অর্থাৎ বল বল তোমার শঙ্কাটি কি ?

বললাম- শংকরাচার্য বিরচিত স্তবস্তোত্র প্রসঙ্গে আপনার শ্রীমুখ হতে যখন দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবাপরাধক্ষমাপণ এবং শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রের নাম উচ্চারিত হল, তখন ঐ দুটি স্তোত্র সম্বন্ধেই আমার কিঞ্চিৎ আশঙ্কার কথা নিবেদন করছি। শিবাপরাধক্ষমাপণ নামক দীর্ঘ স্তোত্রে শিবের কাছে কাতর প্রার্থনা করা হচ্ছে - হে মহাদেব! পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম-বিপাকে আমি যখন ভ্রূণাবস্থায় মাতৃগর্ভের মধ্যে বিষ্ঠা-মূত্রের সঙ্গে লিপ্ত ছিলাম, তখন তোমাকে স্মরণ করিনি, শৈশবে স্তন্যপানে সদাই আসক্ত থাকায় রোগে তাপে জর্জরিত হয়ে তোমাকে ডাকার কথা ভুলে গেছি। যৌবনকালে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় কামভোগে মত্ত থেকেছি। স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-লালসা, মানগর্ব এইসব নিয়ে ভোগের মোহে ডুবেছিলাম। তোমাকে যথোচিতভাবে স্মরণ মনন করিনি। এখন বার্ধক্যে ইন্দ্রিয় জীর্ণ এবং বিকল হয়ে গেছে। রোগ শোক তাপে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি বলে তোমার ধ্যান করতে পারছিনা। হে প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর -

ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।

এই স্তোত্র যদি শংকরাচার্য প্রণীত হয়, তাহলে তাঁর বার্ধক্য অবস্থার কথা আসে কি করে? আপনি ত বলেইছেন, তাছাড়া তাবৎ হিন্দুজনতা এবং শংকরপন্থী সন্ন্যাসী মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়েছিল, বত্রিশ বৎসর বয়সকে ত যৌবনকালই বলা যায়। এর একটা মাত্র জবাব এই হতে পারে যে, তিনি এই স্তোত্রে 'মম' 'মে' প্রভৃতি প্রথম পুরুষের শব্দ ব্যবহার করলেও সর্বসাধারণের শৈশব-বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্ধক্য অবস্থার কথা বিবেচনা করে সর্বসাধারণের পক্ষে মহাদেবের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদনের জন্য এই স্তোত্র রচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রের এমন একটা শ্লোক আছে যার দ্বারা প্রমানিত হয় যে আচার্য শংকর পঁচাশী বৎসর বয়স এমন কি তদধিক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তদযথা -

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
অপীদানীং মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণং॥

এই স্তোত্রে দেখা যাচ্ছে, শিবস্তোত্রের ঢং-এ শংকরাচার্য বলছেন- জগৎজননী মাগো, আমি যন্ত্র-মন্ত্র জানি না। কিভাবে স্তুতি বা কিভাবে কাতরতা প্রকাশ করতে হয়, তাও আমার জানা নেই; নির্ধনতা ও আলস্য নিবন্ধন শাস্ত্রানুসারে যে সকল কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয় তাও আমি শিখিনি। আচার-বিচারের

আড়ম্বর ও নিয়ম-নিষ্ঠার বেড়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে যথোচিত ভক্তি সহকারে কোন দেবতার সেবা পূজাও করিনি। ইদানীং পঁচাশী বৎসরের অধিককাল আমার বয়স হয়ে গেছে, এখন শেষ আশ্রয় তুমি। অয়ি লোম্বোদর-জননি, অবলম্বনহীন নিরাশ্রয় সন্তানকে এখন তুমি যদি কৃপা না কর, তাহলে আমি কার শরণ নেব ? 'পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে ত্বু বয়সি' অর্থাৎ পঁচাশী বৎসরেরও অধিককাল বয়স - এইরকম একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, হয় এইসকল স্তব স্তুতি শংকরাচার্য রচনা করেন নি, নতুবা তিনি বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থেকে নানা অসাধ্য সাধন করেছিলেন, এই গল্প মিথ্যা। এখন মহারাজের যা অভিরুচি।

ভাবানন্দ কোন উত্তর দিলেন না। থমথমে মুখ নিয়ে বসে থাকলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বলতে লাগলাম- আরও একটি ক্ষুদ্র শঙ্কা মনে জাগছে। আমি দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় মাধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য এবং তৎপুত্র পণ্ডিত নারায়ণাচার্য প্রণীত 'মণিমঞ্জরী' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়েছিলাম। পুস্তকটির প্রণয়নকাল অজ্ঞাত। ১৮৩৪ সালে মাদ্রাজের মাধ্ববিলাস বুক ডিপো হতে বইখানি প্রকাশিত। ঐ পুস্তকে আচার্য শংকরকে 'জারজ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শংকরের বর্ণসঙ্করত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই হয়তো উক্ত গ্রন্থের সর্বত্র 'শংকর' শব্দের বর্ণবিন্যাস করা হয়েছে- 'সংকর'। শংকরাচার্য যখন মণ্ডনমিশ্রকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করেন তাতে মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডন পত্নী সরস্বতী দেবী। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'মণিমঞ্জরী' প্রণেতারা যা লিখেছেন তার কয়েকটি শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। আপনার অবগতির জন্য এবং সেই বই পড়ার পর থেকে যে চিত্ত-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি, তা অপনোদন করে নেবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি শ্লোক বর্ণনা করছি, আপনি দয়া করে শুনুন,

ততঃ স মণ্ডনমিশ্রস্য গৃহং ব্রবাজ সংকরঃ।
কিমপ্যবোধ্যতাপাঙ্গবীক্ষয়া তৎপ্রিয়ামুনা॥
নিলীনোহধ্বায়ত্তিস্ফূর্নিশীথে প্রঙ্গনাদ্বহিঃ।
তয়া কিঞ্চৎ পরিগতে, নিদ্রয়া নিঝর্ভর্ত্তরি॥
... ...
ইত্যুক্তা তেন সোহজল্পৎ সা পতিম্ জিতমব্রবীৎ।
ততঃ পর্যব্রজদ্বিপ্রস্তয়া রেমে স সংকরঃ॥

আচার্য সংকরের মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ বিচার প্রসঙ্গে ত্রিবিক্রমাচার্য যা লিখেছেন; শ্লীলতা রক্ষার জন্য তার সারসংক্ষেপ ও তাৎপর্যানুবাদ করলে এই দাঁড়ায় - 'সংকর মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বিচারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বদিন মণ্ডন মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে অপাঙ্গবীক্ষণ দ্বারা তাঁর পত্নীর চিত্তহরণ করেন এবং রাত্রে সংকেত ধ্বনির দ্বারা পণ্ডিতের পত্নীকে গৃহের বাইরে এনে তাঁকে রমন করে বশীভূত করেন। পরদিন মণ্ডনমিশ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পত্নীকে মধ্যস্থ রেখে শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হন। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী পূর্ব হতেই সংকরের বশীভূতা ছিলেন বলে তিনি সংকরের জয় এবং মণ্ডনের পরাজয় ঘোষণা করেন। বিচারের পূর্বে প্রতিশ্রুতি অনুসারে মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন শংকর কিছুদিন মণ্ডন পত্নীর সঙ্গে বাস করে তাঁর রতিবাসনা পূর্ণ করেন...।

এইসব কথা বলে আমি মন্তব্য করলাম - মহারাজ, শিবকল্প মহাযোগী শংকরাচার্যের দেবচরিত্রের এই কদর্য অপবাদের এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনা। আপনার দৃষ্টিতে যাঁরা বেদবর্জিত, সেইরকম কোন গৌড়দেশীয় পণ্ডিতের কলম থেকে এইরকম কোন কদর্য কথা প্রকাশিত হয়নি। এই জঘন্য অপবাদ প্রচার করেছেন আপনারই স্বদেশবাসী তথাকথিত 'বেদজ্ঞ মদ্রদেশীয় পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য এবং তাঁর গুণধর পুত্র পণ্ডিত নারায়ণাচার্য।

ভাবানন্দ ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন - দূরমপসর! দূরমপসর! অর্থাৎ তুই দূর হয়ে যা!

নমো নারায়ণায় বলে অভিবাদন করে যখন আমি একজটা বাবার আশ্রমে দ্রুতপদে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

আমাকে দেখেই দিওয়ানাজী বললেন - ঝুটমুট বিতণ্ডাসে ক্যা ফায়দা হোতা হৈ? যো আদমি ঘেমণ্ডী হোতা হৈ, সাল ভর সমঝানেসে ভি উনকা ঘেমণ্ড বিমারী হঠেগা নেই। আভি চলিয়ে সিদ্ধনাথজীকি আরত্ দর্শন করুঁ।

দুজনে সিদ্ধনাথজীর আরতি দর্শন করতে মন্দিরে গেলাম ।

আগামীকাল সকালেই যাতে ওঙ্কার-মান্ধাতার দিকে যাত্রা করতে পারি, দিওয়ানাজী ও একজটা বাবার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে রাখলাম।

দিওয়ানাজী বললেন - সতত রেবা মন্ত্র জপ করতে করতে ঝাড়ি পথে হাঁটবে। ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি প্রায় ৮০ মাইল লম্বা এবং ১০ মাইল চওড়া। ঘনঘোর জঙ্গল, তবে মুণ্ডমহারণ্যে যত ঘন ততটা ঘন এ জঙ্গল নয়। সেগুন গাছের এতবড় জঙ্গল সারা ভারতের আর কোথাও নেই। তাছাড়া বুনো নিম্, সাজা, বিল্ব, কোথাও বট অশ্বত্থেরও ক্বচিৎ দর্শন মিলবে। মুণ্ডমহারণ্যের চেয়ে এ জঙ্গলে গেণ্ডা (গণ্ডার), বাঘ, ডাঙ্গো (হায়না), হুড়াল (নেকড়ে) এবং সাপের উপদ্রব বেশী। শীত শেষ হয়ে গেছে বলে ভয়ঙ্কর বিষধর সাপেরা এবার গর্ত থেকে বেরোবে। মা নর্মদা তোমাকে রক্ষা করুন।

এই বলে তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন - বেটা, রেবা নাম হরবখৎ জপতে রহো তব রেবা মাতাজীকা কৃপা মালুম হোগা।

আমি তাঁকে বললাম - আচ্ছা আপনি ছাড়াও এই রেবাতটে যত মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, সবাই এক বাক্যে বলেছেন রেবা নাম জপ কর। এর কারণ কি ? প্রত্যেকের গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র আছে। সেই জপ করলে কেন তা ফলদায়ী হবে না ? রেবাতট যদি তপোভূমি হয়, তাহলে যে যার ইষ্টমন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে জপ করলে এবং যথোচিত নিয়মে ইষ্টদেবতার স্মরণ-মনন করলে সেই মন্ত্রই ত জাগ্রত ও চিন্ময় হয়ে ওঠার কথা। আর তবেই ত নর্মদাতটকে তপোভূমি এবং নর্মদামায়ীকে সিদ্ধিপ্রদায়িনী মহাকন্যকা শক্তি বলা সার্থক হয়! আমার পিতৃদত্ত মহাবীজ ত্যাগ করে শ্বাসে শ্বাসে রেবা নাম জপ করলে তাতে কি অনবস্থা দোষ জন্মাবেনা ?

- য্যায়সা তুমহারা ইচ্ছা। ক্যা কহুঁ, নর্মদামায়ী তুমহারা আচ্ছাই করেগা। এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমিও শুলাম। দিওয়ানাজীর হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম প্রায় সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু না, তিনি নিজেই বললেন - আভিতক্ সুবা নাহি হুয়া। দো আড়াই ঘণ্টে আভিতক্ বাকী হ্যায়।

- তবে ডাকলেন কেন!

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন - শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্ আমার মুখস্ত আছে কিনা ?

- না আমার মুখস্ত নেই, তবে বহুবার আমি পাঠ করেছি।

- নর্মদা পরিক্রমা করতে পাঠিয়েছেন তোমার বাবা, অথচ তোমাকে তিনি শিবমহিম্নস্তোত্রম্ মুখস্ত করাননি, ইয়ে বড়ি তাজ্জব বাৎ।

তাঁর কথা শুনে মনে উষ্মা দেখা দিয়েছে। বাবার বিষয়ে কেউ এই ধরণের কথা বললে; তিনি যত বড়ই তপস্বী, এমনকি স্বয়ং শিবই হোন না কেন, আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি বললাম - কেন শিবমহিম্ন স্তোত্র মুখস্ত না থাকলে কি এমন ক্ষতি হয়। পুষ্পদন্ত নামক কোন গন্ধর্ব প্রণীত স্তোত্রের চেয়ে আরও অনেক বড় মহিমা-মণ্ডিত মহাসিদ্ধ শিবস্তোত্র বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন। ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রে একাদশ রুদ্রের স্তব আছে, আরও অনেক শিবমন্ত্র বেদে আছে। বাবার দয়াতে সেসব আমি জানি, বেদমন্ত্রের চেয়ে আর কোন স্তব বড় হতে পারেনা।

- দেখ বাবা, ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত বিগ্রহ অনাদিকারণ-তত্ত্ব শিবসুন্দরের পীঠিকা হল এই পৃথ্বী, আকাশ তাঁর শীর্ষ। সহস্রার মণ্ডল রূপ হিমালয়ে তাঁর দিব্যপ্রকাশ, তুষার-ধবল তাঁর অঙ্গজ্যোতিঃ, নগ্ন নিঃসঙ্গ শ্মশানচারী মহাভৈরব তিনি। উত্তরা সুষুম্নার পথ বেয়ে দিব্য নর্মদার ধারা ব্রহ্মনাড়ী পথে বয়ে চলেছেন। চক্রে চক্রে ঘাটে ঘাটে তাঁর দিব্য অবতরন এবং আরোহ পথে সমুদ্রসংগমে অর্থাৎ শিবাত্মায় লীন হয়ে - এই মহাযজ্ঞ এবং তপস্যার ধারাকে বাহ্যতঃ সূচিত করে এই নর্মদা পরিক্রমার পথ। নর্মদা তপস্যায় মুণ্ডমহারণ্য আছে, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি আছে, আছে মহাভয়প্রদ শূলপাণির ঝারি। অন্তর্জগতে এসবই আছে। সপ্তাক্ষর অঘোর মন্ত্রের সাধনায় এই তত্ত্ব দ্রুত উপলব্ধিতে ফুটে ওঠে।

পুষ্পদন্ত বলেছেন - মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ শিবের চেয়েও শ্রেষ্ঠ দেবতা মহিম্নঃ হতে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোর মন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নেই।

- মহিম্নঃ স্তোত্রের ঐ সাঁইত্রিশ নম্বর শ্লোকটি আমার জানা। শিব এবং শিবস্বরূপ গুরু সম্বন্ধে ঐ শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তা আমি নতমস্তকে মানি। তবে অঘোর মন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নেই, একথা আমি স্বীকার করিনা। কেননা পূর্বাপর সকল ঋষিই স্বীকার করে গেছেন যে গায়ত্রীই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। গায়ত্রীকে বলা হয় মন্ত্ররাজ, আর সামান্য গন্ধর্বকৃত স্তোত্রকে আমি যে শ্রেষ্ঠ বলে মানিনা, তাতো আপনাকে একটু আগে বলেইছি। নিজে স্তোত্র রচনা করে পুষ্পদন্ত নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়েছেন - মহিম্নো ন পরা স্তুতিঃ।

আমার কথা শুনে দিওয়ানাজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ভোর হয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্য থেকে বন্যমোরগ ডেকে উঠল।

আমি তাঁকে বললাম - এই অঘোর মন্ত্র কি অঘোরী কাপালিকদের যে কথা শুনি, তাদের মন্ত্র? তারা ত ঘোর তান্ত্রিক, কোন আচার বিচার নেই, নরমাংস ভক্ষণ করে; শবদেহের উপর বসে শ্মশানে সাধনা করে। দাহ্যমান শবের মাথার খুলি ফেটে গেলে তার ঘিলু নর-কপালে ধরে ভক্ষণ করে আর সর্বদাই সুরাপানে মত্ত থাকে।

দিওয়ানাজী হাসতে হাসতে বললেন - না, না, সেইসব অনাচারী বীভৎস প্রকৃতির সাম্প্রদায়িক সাধনার মন্ত্র এটি নয়। পঞ্চাননের পাঁচটি রূপ - ঈশান, সদ্যোজাত, তৎপুরুষ, বামদেব এবং অঘোর। অঘোর শিবেরই নাম। তাঁরই সর্বসিদ্ধি মন্ত্র এই অঘোর বীজ। যোনিপীঠ মুদ্রায় বসে কোন সংযমী সাধক যদি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সপ্তাক্ষর মহাবীজ জপ করেন তবে এগার দিনের মধ্যে তাঁর দেবদুর্লভ নির্বিকল্প সমাধি ঘটবে। এই মন্ত্রের যিনি সিদ্ধসাধক, যিনি যোনিপীঠ মুদ্রা নামে বিশেষ প্রক্রিয়াটি জানেন তাঁর কাছেই এই মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। তাতেই সিদ্ধি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে কিংবা কোন অনাচারী বা ব্যভিচারী যদি বই পড়ে এই মন্ত্র শিখে নিয়ে সাধনা করতে বসে যায় তাহলে তিনদিনের মধ্যে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। আমি সারাজীবন ধরে এই মন্ত্রের সাধনা করে আসছি। আমাকে যে এতদিন ধরে দেখছ, আমাকে কি অনাচারী বা উন্মাদ বলে মনে কর!

আমি পরিহাস করে বললাম - অনাচারী নন, সমস্ত আচারের ঊর্ধ্বে আপনিও ত একধরণের উন্মাদ - ঊর্ধ্বের বস্তু নিয়ে মেতে আছেন, অঘোরমন্ত্র আপনাকে দিওয়ানা করে ছেড়েছে।

- তা তুমি যাই বল, এই অঘোর মন্ত্রের সাধনায় কি হয়, তা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে হলে শংকরাচার্যের শতশ্লোকীয়র একটি শ্লোক তোমাকে শোনাতে হয়। শতশ্লোকীয়তে আছে -

নো দেহ নেন্দ্রিয়ানি ক্ষরমতি চপলং নে মনো নৈব বুদ্ধিঃ।
প্রাণো নৈবাহংঅস্মীতি অখিল জড়মিদং বস্তুজাতং কথং স্যাম্।
নাহঙ্কারো ন দ্বারা স্বজন গৃহসুত ক্ষেত্র বিত্তাদি দূরং
সাক্ষী চিৎ প্রত্যগাত্মা নিখিল জগদধিষ্ঠান ভুক্তঃ শিবোহহং॥

অর্থাৎ অঘোর মন্ত্রের সাধনায় অচিরাৎ এই বোধ জন্মে যে, আমি দেহ বা ইন্দ্রিয় নই। বিনশ্বর ও অতি চঞ্চল মন বা বুদ্ধিও আমি নই, এমনকি প্রাণও নই; সুতরাং এই অখিল জড়বস্তুর সমষ্টিই বা কেমন করে হব! আমি অহংকার নই, স্ত্রী পুত্র বন্ধু ক্ষেত্র ধন প্রভৃতি আমার থেকে অনেক দূরে। আমি কর্তাও নই, ভোক্তাও নই, প্রপঞ্চের দর্শক-সাক্ষী মাত্র আমি; চৈতন্য আমার স্বরূপ, জীবের অন্তর্যামী আত্মাই আমি, সমস্ত বিশ্বের আধার আমার এই জ্ঞান, আমার সত্তা শিবস্বরূপ। জীবাত্মা আমি নই, আমি শিবাত্মা, শিবাত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। অঘোর মন্ত্রের সাধনা করলে এই প্রকৃত স্বরূপ হতে আগন্তুক যত উপাধি, যত আবরণ, যত বন্ধন, সেইসমস্ত দ্রুত সরে যায়, খসে পড়ে ছিন্ন হয়। যোনিপীঠের ওপর যেমন শিব থাকেন তেমনি যোনিপীঠ মুদ্রা (বলতে বলতেই তিনি যোনিপীঠ মুদ্রার অঙ্গ-ভঙ্গিমা বা আসন দেখিয়ে দিলেন)। এই মুদ্রায় বসে সপ্তাক্ষর অঘোরমন্ত্র - হৌং অঘোরায় নমঃ - নিবিষ্ট চিত্তে জপ করতে থাকলে জীবচেতনা শিবচেতনায় রূপান্তরিত হয়। এই মন্ত্রের সাধনা করেছিলেন অগস্ত্য, করেছিলেন দুর্বাসা এবং দত্তাত্রেয়। শিবের প্রধান অনুচর পুরাণ প্রসিদ্ধ ভৈরব নন্দী মহারাজও এ মন্ত্র জপ করেছিলেন ...

- থামুন, থামুন; আপনার কাছে কোন মন্ত্র সাধনা শেখার প্রয়োজন আমার নেই, চিৎকার করে উঠলাম আমি। আমার গুরু পিতাঠাকুরের কাছে যে মন্ত্র পেয়েছি, সেই আমার পরম সম্বল। এই বলে আমি কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে সিদ্ধনাথজীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে এসে দেখি, দিওয়ানাজী পরিপাটি করে আমার গাঁঠরী এবং কম্বল বেঁধে রেখেছেন। একজটা বাবা বললেন - সারাদিন জঙ্গল পথে হাঁটতে হবে, এই পথে সহসা কোন লোকালয় পাবেন না, সারাদিন কিছু জুটবে কিনা ঠিক নেই। ব্রহ্মচারী আশ্রমের গাভীটিকে দুয়ে এই দুধ আপনার জন্য দিয়েছে। খেয়ে নিন। তাঁর হাতে থেকে দুধের ভাঁড় নিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলাম। একজটা বাবাকে প্রণাম করে দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে হাতজোর করে বললাম -

আপনি বৈষ্ণবতীর্থ হতে হোলিপুরা পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেন। এর বাইরে কোথাও যাতায়াত করেন না, একথা আমি শুনে এসেছি, সেই আপনিই আপনি যে স্নেহবশে এতদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছেন - আপনার এই স্নেহ এবং করুণার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি আপনার মন্ত্রদান কালে যে উত্তেজনা দেখিয়েছি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন। দিওয়ানাজী আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমি বললাম - ছিঃ। অঘোর মন্ত্রের সাধককে কাঁদতে নেই। আপনিই তো একটু আগে বলেছেন, যিনি অঘোর মন্ত্রের সিদ্ধসাধক তাঁর চোখে এ জগৎ প্রপঞ্চ মাত্র, তাঁর স্নেহ মমতা থাকতে নেই, তিনি ত সাক্ষাৎ চৈতন্য!

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বড় বিসদৃশ এবং কটু শোনালো। নিজের মনে ধিক্কার জন্মাল, এতবড় সিদ্ধ মহাত্মাকে একথা না বললেই হত। কিন্তু আমার স্বভাব যা তাইতো করব। আমি পুনরায় প্রণাম করে জঙ্গল পথে নর্মদার তীর ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। সূর্যোদয় হচ্ছে, বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার শীর্ষদেশ উদীয়মান সূর্যের লাল আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে। হন্ হন্ করে হাঁটছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বর শুনে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে আসছেন -

তেরা হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।
কোঈ ঢুড়ে পূরব কোঈ ঢুড়ে পছিম কোঈ ঢুড়ে পানি পত্থল মেঁ।
দিওয়ানা যো হীরাকো পরখেঁ বাঁধ লিয়া জীয়ারাকে আঁচলমেঁ॥

অর্থাৎ কাদায় হারিয়ে গেছে তোর হীরা। কেউ খুঁজছে পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ জলে কেউ পাথরের মধ্যে খুঁজছে। দিওয়ানা এই হীরা পরীক্ষা করে হৃদয়ের আঁচলে বেঁধে নিয়েছে।

আমি কোন ভ্রূক্ষেপ করলাম না, তাঁর রসমধুর গানের মাধুরী আজ আমাকে আকর্ষণ করতে পারছেনা, সামনে আমার দীর্ঘপথ, ভয়ঙ্কর ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ির পথে আমি, পথ কঙ্করময়। একটু অসাবধান হলে হোঁচট খেতে হবে। সেগুনের বিরাট অরণ্য সারা আকাশটা যেন ঢেকে রেখেছে। মনে নানা কথার উদয় হচ্ছে। এতদিনের যাত্রাপথে কত বন্ধু, কত সাথী পেয়েছিলাম। মুণ্ডমহারণ্যে হাঁটার পথে সাথী পেয়েছিলাম দুজন দরদী সাধুকে - শোভানন্দজী ও সূর্যনারায়ণজী, তাঁরা মুণ্ডমহারণ্যের অরণ্য যাত্রাকে আমার পক্ষে আরামপ্রদ করে তুলেছিলেন। কি খাবো, কোথায় থাকব, কোন তীর্থঘাটের পরে কোন তীর্থঘাট, কোথায় কি নামের কি কি শিবমন্দির বিরাজিত, সে বিষয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয়নি। খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যপ্রস্তুত, কনকনে শীত থেকে বাঁচার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা, এসবই তাঁরা করেছিলেন। তারপরে যখন মান্দালায় এসে আমার আপনজন সুমেরদাসজীর সাক্ষাৎ পেলাম, কখনও মনে কষ্ট হয়নি, দুঃখ পাইনি মুহূর্তের জন্যও। কিন্তু আজ! আজ আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সাথীহীন, নির্বান্ধব অবস্থায় চলেছি। দূর থেকে সামনের দিকে তাকালে ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলের বড় বড় পাতাওয়ালা লম্বা লম্বা সেগুন গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন আমারই দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ দূরাগত এক কণ্ঠধ্বনি ভেসে এল। সামনের দিকে তাকিয়ে কোথাও কাউকে দেখতে পেলামনা। কান পেতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেই কানে ভেসে এল -

তেরা হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।

এতো দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বর। তাঁর গানের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের কোণে কোণে। পাশের জঙ্গলে দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা। ঘন সেগুন গাছের তলায় তলায় ছোটি ছোটি নানা গাছের ঝোপে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। আবার গানের একটি লাইন কানে এসে বাজল। গাঁঠরী ফেলে রেখে সামনের একটা বড় পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালাম। পেছন দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম কেউ যেন আমারই মত একটা বড় পাথরের উপর উঠে বসে আছেন। একি! সুমেরদাসজী! কিন্তু তিনি এখানে কিভাবে আসবেন! এ নিশ্চয় আমার দৃষ্টি বিভ্রম। একটু আগেই সুমেরদাসজীর কথা ভাবছিলাম, আমার সেই মনের ভাবনা গাছ ও পাথরের উপর পতিত সূর্যরশ্মির তির্যক কোণের সৃষ্টি করায় তারই পরাকর্ষ প্রতিক্রিয়ায় (refracted reaction) সুমেরদাসজীর মূর্তি গড়ে আমাকে প্রতারিত করছে। আমি চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিলাম। এবার যখন সেইদিকে তাকালাম, তখন আমার চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না, দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। এ যে আমার প্রতিক্ষণের ধ্যেয় মূর্তি, আমার জাগ্রত চেতনায় এই দিব্যমূর্তি এতই জীবন্ত যে মনের সাধ্য নেই যে এই রূপদর্শনে কোন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে আমি চোখ বড় বড় করে সেই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করতে লাগলাম। আমি যখন গ্রামের বাড়ী হতে কলকাতা যেতাম, তখন তিনি কিছুটা পথ সঙ্গে এসে মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমি কালিয়াড়া গ্রামের মাঠ পেরিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডে না ওঠা পর্যন্ত ঘন ঘন পেছন ফিরে তাকাতাম, দেখতাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। যতক্ষণ না আমি দৃষ্টির আড়াল হচ্ছি, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই স্নেহ-বিহ্বল করুণাময় একই সজীব মূর্তি! নর্মদাতটে এই ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, আমি পড়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়েই দৌড়তে লাগলাম। গাঁঠরী কমণ্ডলু সেখানেই পড়ে থাকল। প্রায় ছশ গজ দৌড়ে এসে দেখি, চোখ বন্ধ করে দিওয়ানাজী গেয়ে চলেছেন -

দিওয়ানা জো হীরাকো পরখেঁ বাঁধ লিয়া জীয়ারাকে আঁচলমেঁ।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম - আপকা বিভূতিকা বিড়ম্বনা বন্ধ করো জী। আমি হাঁপাচ্ছি। যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে মৃদু হেসে আমাকে বললেন - আমি তোমাকে দুটো কথা বলতে ভুলে গেছি, এইখান থেকে আর মাইল তিনেক গেলেই বাগদী সংগমে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে আর দশ মাইল দূরে তীথি ঘাট। সেখানে রাত্রির আশ্রয় জুটবে, সাথীও পাবে।

- আপনার অপার করুণা। কোন সাথীর আশা করে নর্মদা পরিক্রমা করতে আসিনি, অথচ বাবার দয়ায় যখনই প্রয়োজন হয়েছে সাথী জুটে গেছে। আপনারা বলবেন নর্মদেশ্বর মহাদেবের দয়া কিংবা মাতা নর্মদার দয়া। আপনাকে মোটামুটি চিনতে পেরেছি, তাই বলছি - সারাজীবন আপনার কাছে থাকতে পারলে আমার আধ্যাত্মিক মঙ্গল হত সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য সর্বাগ্রে নর্মদা পরিক্রমা শেষ করাই আমার প্রধান কর্তব্য। আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমার ব্রত সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারি। তিনি জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় চুমু খেলেন। প্রণাম করে আমি এগিয়ে চললাম। আর পেছনের দিকে তাকালাম না।

যেখানে গাঁঠরী ফেলে গিয়েছিলাম সেখানে এসে গাঁঠরী আবার কাঁধে তুলে নিলাম, কমণ্ডলুতে জল ভরবার জন্য নর্মদার ঘাটে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে কমণ্ডলু ভরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম একটা নীলগাই-এর পেছনে একপাল নেকড়ে দৌড়ে চলে গেল। আমার গায়ের গন্ধ কি ওরা পায়নি! শুনেছি মানুষের গায়ের গন্ধ অনেক দূর থেকেই ওদের নাকে পৌঁছয়। আমার গায়ের গন্ধ পেলে কিংবা আমাকে দেখতে পেলে আমি যদি সারাদিন এবং সারারাত নর্মদার জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তাহলে ওরা তীরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করত, কিছুতেই ছেড়ে যেতনা। যাইহোক আমি তটে উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। বেলা বোধহয় দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম বাগদী সংগমে। পাহাড়ের উপর থেকে সেগুন বনের মধ্য দিয়ে একটা ছোটি নদী বয়ে আসছে। বুঝলাম এটাই বাগদী সংগম। কোন মন্দিরও চোখে পড়ল না। এতদূর এলাম কোন মানুষজনও দেখলাম না। জঙ্গল ক্রমেই আরো ঘন হচ্ছে, মনে আতঙ্ক জাগানো সেগুন বনের সেগুন বনের বীভৎসতার মধ্যে সজ্ঞানে প্রবেশ করছি। এ এমন এক জঙ্গল যার কোন ছিড়ি-ছাঁদ নেই। হঠাৎ মড় মড় মড়াৎ শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু দূরেই সেগুন বনের ছোটি ছোটি গাছ নড়ে দুলে উঠছে। বাঘ না কি ? মনে

হওয়া মাত্রই সুমেরদাসজীর শেখানো মন্ত্রে গণ্ডী টেনে দাঁড়াবো কিনা ভাবছি, এমন সময় একটা বুনো হাতির বাচ্চা হেলে দুলে ছোট সেগুনের গাছ চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে এল। কালো মেঘের মত গায়ের রং, যেন একখণ্ড জমাট মেঘ সেগুন বনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমি কয়েকটা বড় সেগুন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম। হাতীটা চলে যেতেই আবার হাঁটতে থাকলাম। চৈত্রমাস সূর্যের তেজ বেশ বেড়ে গেছে, গায়ের ঘামে আলখাল্লাটা ভিজে জবজব করছে। শুকনো সেগুন পাতার ওপর পা পড়লেই পায়ে ফুটছে, গাছের পাতা যে পায়ে ফোটে তা এই প্রথম অনুভব করলাম। সামনে দেখি একটা বেলগাছের তলায় বড় বড় বেল পড়ে আছে। পাকা দেখে একটা বেল কুড়িয়ে ঝোলায় পুরলাম। ছায়া পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে এসে পড়লাম এমন একটা স্থানে, যেখানে গাছের জটলা অপেক্ষাকৃত কম। আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যকে মাথার উপর দেখে বুঝলাম বেলা বারটা বেজে গেছে। আর একবার স্নান করার জন্য ঘাটের দিকে নেমে গেলাম। ঘাটের গায়ে একটা বড় পাথরের চাঙড়ের উপর গাঁঠরীটা সবেমাত্র রেখেছি হঠাৎ সেই পাথরের তলা থেকে ফণা তুলে বেরিয়ে এল বিরাট লম্বা একটা সাপ। পিঙ্গল বর্ণের এইরকম সাপ জীবনে কখনও দেখিনি। আমি দ্রুত সুমেরদাসজীর শেখানো মন্ত্রে গণ্ডী টেনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপের ক্রুদ্ধ ফোসফোসানি ও লকলকে জিহ্বা বের করতে দেখে ভয়ের পরিবর্তে আমাদের কুলগুরু ঈশ্বর মহেশ গোস্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। মায়ের মুখে গল্প শুনেছি, এই গৃহীযোগীর সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ গৌরকান্তি দেহ এবং তিলক লাঞ্ছিত প্রশস্ত ললাট দেখে যে কেউ বুঝত যে ইনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি অসাধারণ হয়েও সাধারণের সাথে মিশতে পারতেন। সাধারণ চাষীভুষি ভক্তদের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে যেতেন। একবার তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে এসে দাবা খেলায় তন্ময় ছিলেন, এমন সময় গ্রামের এক গরীব ভক্ত এসে কেঁদে পড়ল। সেই ব্যক্তির বৌকে সাপে কামড়েছে। দংশানোর সাথে সাথে অজ্ঞান। এখন ওঝা এবং একজন ডাক্তার এসে বলছে বৌটা মরেই গেছে। লোকটি যতই ডুকরে ডুকরে কাঁদে ততই গুরুদেব তাঁর সঙ্গী খেলোয়াড়কে বলেন - এই তোমার ঘোড়াকে খেলাম। এই নৌকার কিস্তি দিলাম। তাঁর এইরকম উদাসীন্ এবং নিষ্করুণ ভাব দেখে আমার বাবা অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন - গুরুদেব! দয়া করে গরীবটার দিকে দৃষ্টি দিন। শুনেই তিনি তাঁর নৌকা রাজা আর বোড়ের দিকে লক্ষ রেখেই বলতে থাকেন - কি বললে সাপ ? সে থাকে কোথায়? তার জাত কি ? গোত্র কি? নাম কি? যা যা বিরক্ত করিস্ না, দেখবি যা রোগী উঠে বসেছে, তাকে টক পান্তা খেতে দিবি।

পরে দেখা গেল সত্য সত্যই সেই সাপেকাটা রোগিনী সেরে উঠেছিল। আমি কুলগুরুর সেই ঘটনা স্মরণ করে সর্পরাজের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলাম - 'ওহে, তোমার নাম কি? গোত্র কি? কি জাত তোমার? সাপটা সহসা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আমি নিজেই নিজের আচরনে আশ্চর্য হলাম। সেই কুলগুরুর পুণ্যনাম ও গোত্র উল্লেখ করে নর্মদার জলে তর্পণ করতে ইচ্ছা হোল। স্নান তর্পণ সেরে বেলটা পাথরে ঠুকে ভেঙে নর্মদামাতাকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলাম।

ইষ্ট স্মরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম। পরিক্রমাবাসীদের পথ এটা। সামান্য চলার দাগ মাত্র, দুদিকেই পাথর আর কাঁকর, পথের উপরেও ছোট বড় পাথর, তাও আবার ঝোপ গুল্মে ঢাকা। খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও উপায় নেই, লাফিয়ে ডিঙিয়ে হাতের লাঠি দিয়ে লতাপাতা সরিয়ে সরিয়ে চলতে লাগলাম। এইভাবে প্রায় আধমাইল হাঁটার পর এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে প্রায় দেড়ফুট চওড়া পরিস্কার পথের দাগ। চারিদিকে সেগুন, শিমূল, বেল, জামীর, কাঁঠাল, চম্পক এবং অগস্তি গাছের ছায়াতে চলার পথটা অনুকূল হওয়ায় চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। নর্মদা তাঁর আপন বেগে বয়ে চলেছেন। নর্মদা এতদূর যেভাবে এঁকে বেঁকে আসছিলেন; এখানে দেখছি, তাঁর জলরাশি যেন ক্রমেই উঁচু হতে নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ জলের তলায় পাহাড়ের অংশটা ক্রমে ঢালুর দিকে বাঁক নিয়েছে। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল হাঁটার পর এমন ঘোরতর সেগুন বনে ঢুকে গেলাম, যেখানে সবই ছায়াছায়া অন্ধকারে ঢাকা। বেলা অনুমান করলাম বড়জোর দুটো হবে। বনের প্রকৃতিটাই যেন বদলে গেল। দুনিয়ার তাবৎ কবিকুলের উপরেই আমার রাগ জন্মাল। যাঁরা রাজধানীর সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে কিংবা সখের ভ্রমণে বেরিয়ে বাংলো বা হোটেলের জানালা দিয়ে পাহাড় দেখে সবুজ বনানীর লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, আমার ইচ্ছা হল তাঁদেরকে ধরে এনে এখানে বসিয়ে তাঁদের বল্গাহীন কল্পনার দৌড়টা

একবার দেখি। বড় অদ্ভুত এই বন। প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক গাছের ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে - সে শেওলা কোথাও কোথাও এমন লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে, বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, কোথাও সূর্যের রশ্মি এসে পড়তে পারছেনা, সবসময়েই যেন গোধূলি। চারদিক ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরণের নিস্তব্ধতা - বাতাস বইছে, তারও কোনও শব্দ নেই, ময়ূরের কেকাধ্বনি বা অন্য কোন পাখীর ডাকও শুনতে পাচ্ছিনা; বনের কোন জানোয়ারেরও কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা। যেন কোন অন্ধকার প্রেতরাজ্যে এসে পড়েছি।

আমার ত আর থমকে দাঁড়ালে চলবেনা। আমি সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে চমকে উঠে তাকাতেই দেখতে পেলাম পাঁচ-ছটা বুনো বেড়াল দৌড়ে আসছে, তাদের হলুদবর্ণের ঘোলাটে চোখ আর হিংস্র দৃষ্টি দেখে প্রথমে মনে করলাম এগুলো বাঘের বাচ্চা, কিন্তু তাদের পেছনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে কয়েকটা বুনো কুকুর দৌড়ে আসতেই দেখলাম তারা প্রাণপণে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। বাঘের বাচ্চা হলে অত সহজে পালাত না। আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পথ পরিস্কার দেখে আবার হাঁটতে লাগলাম। মাইল খানেক অরণ্য গোধূলির অন্ধকারে ঢাকা, সেই এলাকা পাড় করে পরিস্কার বনভূমিতে পৌঁছলাম। চারিদিক রৌদ্রকরোজ্জ্বল। নর্মদা ও পাহাড়ের সব গাছপালা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। পথ একই, সেই সেগুন বেল অগস্তি গাছের জঙ্গল, তবে সবকিছু চোখে দেখতে পাওয়ায় মনে স্বস্তি পাচ্ছি। নর্মদার জলের ধারা যেখানে, সেখান থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচুতে পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি। পথের দাগকে কিছুতেই চোখের আড়ালে যেতে দিইনি। পথের সেই দাগই যেন আমাকে আরও উঁচুতে এনে ফেলল চড়াই-এর পথে। এইভাবে প্রায় আরও তিন মাইল হাঁটলাম। একবার নিচে নর্মদার দিকে তাকাতে দেখলাম একপাল বন্য শূকর চরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই আমকে কোন নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছতে হবে। থাকে থাকে পাহাড় ও জঙ্গল উঠে গেছে, আমি বোধহয় হাজার ফুট উঁচু দিয়ে হাঁটছি, নিচে নর্মদার জল চিকচিক করছে। এইভাবে আরও মাইল তিনেক হাঁটলাম। সামনে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। মুখে সূর্য কিরণ এসে পড়ায় গাছের ছায়া দেখে দেখে দ্রুত হাঁটছি। হঠাৎ বহুদূর হতে বাঘের প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ভেসে এল। এ ডাক আমি চিনি। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনুমান করার চেষ্টা করলাম, ব্যঘ্রমহারাজ কতটা দূরে আছেন। কতকগুলো নীলগাই হুড়মুড় করে দৌড়ে গেল আমার কাছ হতে অন্ততঃ চারশ ফুট নিচ দিয়ে, তাদের পেছনেই একপাল বন্য শূকর। ক্রমে নীচের দিকে নামতে থাকলাম। নর্মদার স্রোতও নিম্নাভিমুখী হচ্ছে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর নর্মদার কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। একই পরিচিত পথের চিহ্ন আমাকে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে চড়াই উৎরাই করিয়ে ছাড়ল। বড় ক্লান্ত লাগছে, ঘামে ভিজে গেছি। নর্মদার জলে মুখ হাত ধুয়ে পেট ভরে জল খেলাম। কানে ভেসে আসছে শিঙা ও ভেরীর আওয়াজ। মন আনন্দে দুলে উঠল। কিছুদূরে নিশ্চয়ই পরিক্রমাবাসীদের জমায়েৎ ছাউনি ফেলেছে। তাদের কাছে পৌঁছতে পারলেই রাত্রির আশ্রয় পেয়ে যাবো। ভেরীর আওয়াজ লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধমাইল হাঁটার পর তিনজন লোককে দেখতে পেলাম, তাদের দুজন কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটছে। আর একজনের হাতে তিনটে কুড়ুল, কুড়ুলগুলো দেখতে টাঙ্গির মতন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম -

তীথিঘাট কিধার বা? উহ্ ভেরীকা আওয়াজ কাঁহাসে শুনাই দেতা হৈ?

তারা উত্তর দিল - তীথিঘাটমেঁ আপ আগেয়া। এক জমায়েৎ সে উহ্ আওয়াজ আতী হৈ। উহ্ লোগনে পরিক্রমা করকে লোটতা হৈ। আভি গরমী কালমেঁ উনকা পরিক্রমা বন্ধ রহেগা।

- এখানে কোন মন্দির কি আছে, যেখানে রাত্রে থাকতে পারব ?

- আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা একটা শিবমন্দিরেই আছি। আমাদের গুরুদেবও সঙ্গে আছেন। আপনার থাকতে কোন অসুবিধা হবেনা। আমরা ওঁকারমান্ধাতার দিকেই যাচ্ছি, সেখানে গুরুদেব কিছু লোককে দীক্ষা দেবেন। আমরা শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ের লোক।

শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ের নাম কখনও শুনিনি। লোকগুলোর বেশভূষাও সাধারণ লোকের মত। তিলক ত্রিপুণ্ড্রাদি মালা ঝোলা কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন তাদের অঙ্গে দেখতে পাচ্ছিনা। জমায়েতে শত শত লোকের সঙ্গে থাকার চেয়ে এই চারজন লোকের সঙ্গে থাকাই সুবিধাজনক হবে, এই ভেবে তাদের সঙ্গেই হাঁটতে লাগলাম। পথ চলতে চলতে তাদের মধ্যেই একজন বললেন যে এই তীথিঘাট স্থানটি ফতেগড় স্টেটের অন্তর্গত। তাঁদের সন্তগুরু স্বয়ং অলখ-নিরঞ্জনের অংশ। তাঁর নাম পাতিরাম।

তারা বললেন - আমরা একেশ্বরবাদী, একমাত্র নিরাকার নির্বিকার নির্গুণ পরমেশ্বরের সৎনাম নিরঞ্জন কর্তাপুরুষেরই আমরা উপাসনা করে থাকি। আমরা জাতপাত মানিনা, আমাদের সম্প্রদায়ই একমাত্র সংস্কারমুক্ত সম্প্রদায়। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোককেই নির্বিচারে আমরা গোষ্ঠীভুক্ত করে থাকি। মূর্তিপূজা আমরা মানিনা। শিব, দুর্গা, কালী, নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি দেবতাকেও মানিনা। তীর্থভ্রমণে আমাদের আস্থা নেই, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপও করিনা। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে।

বললাম - এককথায় বলুন না, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় পূজনীয় বস্তু বা আচার বিচার আছে আপনারা তার ঘোরতর বিরোধী। আপনাদের এই অভিনব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে? কতদিন আগে ভারতবর্ষে এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে?

- উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলায় চন্দোয়ার গ্রামে শিবনারায়ণ নামে এক ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অলখ্ নিরঞ্জন কর্তাপুরুষের এক দিব্যরশ্মি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তিনিই সন্তধর্ম প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারে এই সন্তমতের লোকেরা বর্তমানে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই মধ্যপ্রদেশে গাজীপুর এবং আগ্রা অঞ্চলে আমাদের সম্প্রদায়ের বহু লোক বাস করেন। বর্তমানে আগ্রা প্রভৃতি স্থানে সন্তমত নামে যে এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের কর্তাগুরু শিবনারায়ণজীর ভাবধারায় প্রভাবিত। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে কর্তাগুরুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; ১৭৯১ সংবতে তাঁর রচিত সন্তবিলাস, সন্তসুন্দর, সন্ত-আখেরি, সন্ত-উপদেশ শব্দাবলী এবং সন্ত-মহিমা প্রকাশিত হয়। আপনাদের কলিকাতাতেও আমাদের সম্প্রদায়ের বহুলোক বাস করেন। সন্ত বলদিরামের শিষ্য তাঁরা, সেই বলদিরামের শিষ্য সন্ত পাতিরামকে এখনই মন্দিরে গিয়ে দর্শন করবেন।

কথা বলতে বলতেই মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের গোপুরমে দেখলাম একজন নধরকান্তি পুরুষ বসে আছেন। বয়স বড়জোর পঞ্চাশ হবে, দেখতে সুপুরুষই বটে। গলায় একটা সরু সোনার চেন। কাঠের বোঝা ফেলে দিয়েই তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন - বন্দেগী কর্তাগুরু আপনো অলখ পুরুষ। সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। যে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলাম, তিনি গুরুদেবকে আমার পরিচয় দিলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে 'আও মেরে রাম' বলে সাদরে আবাহন করলেন। আমি এড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি গাঁঠরী ফেলে দিয়ে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। পর্বতের আড়ালে সূর্য পড়ে গেলেও তখনও চারিদিকে আলো আছে, তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। আমি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে দেখি শিবলিঙ্গের উপর গুরু মহারাজের কোর্তা ও মের্জাই রাখা আছে। গুরু মহারাজের ইঙ্গিতে তাঁর একজন অনুচর সেই দুখানা সরিয়ে রাখলেন, আমি শিবের মাথায় জল ঢাললাম। জল ঢালতে ঢালতেই শুনতে পেলাম; গুরু মহারাজ দোঁহা আওড়াচ্ছেন -

ইনসান হোকে না পূজো দেও পত্থর।
ইহলোক দুঃখ পাবে পড়ে নরক ঘোর॥

অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে যে লোক দেবতা ভেবে পাথর পূজা করে তারা ইহলোকে দুঃখভোগ করে, অন্তে নরকভোগ করে।

জেঁও নেহি সতী দুজা পতি ভাবে।
ত্যায়সে সন্তজন পরদেব না সেবে॥

এর মানে হল - সতী নারী যেমন পরপুরুষের সেবা করেনা, তেমনি সন্তজন নিজ্ গুরু ছাড়া অন্য দেবতার পূজা করেনা।

শিবকে প্রণাম করে উঠে ভাবতে লাগলাম, দিওয়ানাজীর কথামত তীর্থঘাটে ভাল সাথীই পেলাম বটে। এঁদের সঙ্গে ওঁকারমান্ধাতা পর্যন্ত যাওয়া খুব সুখকর হবে বলে মনে হয়না। মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম, তখনও দিনের আলো আছে। সন্তমহারাজ সাদরে ডেকে আমাকে পাশে বসালেন এবং একজন লোককে বললেন- ডাণ্ডারা লেআও। লোকটি দ্রুত মন্দিরে ঢুকে একথালা লাড্ডু আমাকে এনে দিলেন। বুঝলাম এরা মিষ্টান্নকে ডাণ্ডারা বলেন, যাক্ বাঁচা গেল ডাণ্ডারা তাহলে ডাণ্ডা প্রহার নয়। সন্তমহারাজ অত্যন্ত মিষ্টভাষী, আমাকে আদর করে বললেন - মেরে রাম, খানা সুরু করিয়ে, আভি তক সাম নেহি হুয়া। হমকো পতা হ্যায়,

পরিক্রমাবাসী সাঁঝ হো জানেসে কুছ্ নাহি লেতে হৈ।

একটা বেল ছাড়া সারাদিন কিছুই পেটে পড়েনি। ক্ষুধার চোটে সেই একথালা লাড্ডু সবই খেয়ে ফেললাম। খেয়ে থালা ধুতে যাবো, তিনি হাঁক পাড়লেন 'শোভারাম' সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে আমার হাত হতে থালাটা নিয়ে নর্মদাতে ধুতে চলে গেলেন, আমাকে কিছুতেই ধুতে দিলেন না। অন্ধকার হয়ে আসতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। তাঁর অনুচরেরা ইতিমধ্যেই মন্দিরের মধ্যে তিনটে পেতলের প্রদীপ জ্বেলে ধূপ জ্বালিয়েছেন, একটা প্রদীপ ভোগের ঘরে জ্বলছে, সন্তপুরুষের সান্ধ্যভোগ প্রস্তুত হচ্ছে। এইসব প্রদীপ মন্দিরের নয়, তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। পুরু কার্পেটের উপর পরিচ্ছন্ন রঙীন বিছানার চাদর পেতে সন্তমহারাজের পরিপাটি শয্যা পাতা হয়েছে। মন্দিরের এক কোণায় আমার আসন পাতলাম। তারা চারজন গুরুমহারাজকে ঘিরে উপাসনায় বসলেন। শোভারামজী ভজন আরম্ভ করলেন -

> ওহি দেশ বসন্ত গাইয়ে যাঁহা রহিমি দিবস ন হোই।
> যাঁহা ধরিতি আকাশ না পাতালা যাঁহা চাঁদ সূরয না তারা
> বিনা দীপক উজিয়ারা হো, উজিয়ারা হো।
> যাঁহা বনুদক কমল ফুলানা, মধুবন পিয়া মরু কানা,
> তাঁহা শিবনারায়ণ মন মনা, তাঁহা সন্তন কিয়া পিয়ানা॥

অর্থাৎ সেই দেশে নিত্য বসন্ত বিরাজিত, যেখানে দিন নেই, রাত্রি নেই, ধরিত্রী, আকাশ, পাতালও নেই, চাঁদ সূর্য তারাও নেই। প্রদীপ ছাড়াই যে দেশ আলোয় আলো হয়ে আছে, বিনা জল বা সরোবর ছাড়াই যেখানে অজস্র পদ্ম ও নানাবিধ ফুল ফুটে রয়েছে, যেখানের মধুবনে মধু নিয়ত ঝরছে, শিবনারায়ণ তা পান করছেন, সন্তরা বা সন্তমতিয়ারাই কেবল তা পান করতে পারে।

বন্দনাগান শেষ হতেই সকলে এক একটা পাতলা কাপড়ে মুখ ঢেকে দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বসে রইলেন। বুঝলাম, শব্দ-সাধনা হচ্ছে। এক ঘন্টার মধ্যেই উপাসনাপর্ব শেষ হল, সন্তমহারাজ শোভারামকে বললেন - মেরে লিয়ে দুদুররাম লে আও। আমাকে বললেন - আমরা সত্য পথের পথিক। মন যা চায় তাই করি, ক্ষমা সত্য এবং মিতাচার এই তিন ধর্মকে আমরা প্রধান বলে মানি। মূর্তিপূজা, দেবদেবীর পূজা ভেষ এবং ভেক ধারণাকে আমরা ঘৃণা করি। অলখপুরুষ পরমেশ্বরের কোন গুণবাচক নাম জপে কোন ফল হয় বলে আমরা মনে করিনা। কর্তাপুরুষ অলখ্ নিরঞ্জন সকল জীবের মধ্যে শব্দস্বরূপে বিরাজমান। সেই পথেই আমরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করি। তুমি যদি দীক্ষা পাও তখন আমাদের গুহ্য সাধনার সঙ্কেত জানতে পারবে।

এই সময় শোভারাম একটা রূপার গ্লাসে কিছুটা পরিমান তরল পদার্থ এনে দিলেন। বুঝলাম, এটাই সন্তমহারাজের দুদুররাম অর্থাৎ মদ। তিনি চুমুক দিতে লাগলেন। আমি নিজের মনে ভাবতে লাগলাম - সন্তবাবাজী, ছোট জিনিষকে আটপৌরে ভাষায় 'পাতি' বলা হয়, তুমি ত পাতিলেবু, পাতিহাঁস বা পাতিকাকের মতই একটা পাতিরাম মাত্র। তোমার গুরু বড়রাম এলেও আমাকে তাঁর সম্পত্তি করতে পারবেনা। শালুক চিনেছ গোপাল ঠাকুর।

আমি শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম। আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে; পথের ক্লান্তি ছাড়াও যে সব আতঙ্কজনক জিনিষ চোখে পড়েছে, তাতে মনের উপরেও খুব চাপ গিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সহসা সচেতন হয়ে জানিয়ে দিল যে, সাবধান! সাক্ষাৎ মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম ভাঙতেই ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। ঘরের মধ্যে মেঝেতে ঘসটে ঘসটে একটা বড় গোখরো এগিয়ে যাচ্ছে সন্তমহারাজের দিকে। 'দুদুররামের' নেশায় তিনি ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

মন্দিরের দরজার চৌকাঠ ঘেঁসে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু,, পাকা তেঁতুলে মত রং। পাহাড়ী গোখরো। 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করে উঠতেই সেই মৃত্যুদূত ঝটাৎসে আমার দিকে ঘুরে ফোঁস করে বিরাট ফণা

তুললো। সাপটা মেঝে থেকে প্রায় দুই ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো জ্বলছে যেন দুটো হীরে। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যতে। আমার মনে হল এর হাত থেকে বাঁচা মানে আমাদের সকলেরই পুনর্জন্ম। সন্তমহারাজের কোন অনুচরও জেগে উঠে সবাইকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়েছে, জেগে উঠেই তারা হুড়মুড় করে পাশের ভোগের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কপাট লাগানোর শব্দ কানে শুনতে পেলাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখার কোন উপায় নেই। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম সেই ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার আয়ু নির্ভর করছে দৃঢ় ও অকম্পিত ভাবে সাপটির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ওপর। যতক্ষণ এইভাবে ত্রাটক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারব, ততক্ষণই আমি নিরাপদ। কিন্তু যদি দৃষ্টি কেঁপে ওঠে! আমার দেহ মনের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে তাকিয়ে রইলাম তার চোখের দিকে। ক্রমে দেওয়াল, মেঝে, সাপের দেহ সবই আমার চোখ ও মন থেকে উবে গেল। আমি দেখছি দুটো জ্বলন্ত হীরের টুকরো। চারিদিকে অন্ধকার এবং একটা ভয়াবহ শুন্যতা নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে ঐ দুটো আলোর দানা হয়ত সাপের চোখ নয় - জোনাকি পোকা, কিংবা নক্ষত্র, কিংবা .....

এখন রাত না দিন! ভোর না সন্ধ্যা! চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম বেদমন্ত্র -

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমম্ বাজেষু হবনশ্রুতম্।
বৃষন্তমস্য হূমহে ঊতিং সহস্রসাতমাম্॥ (ঋগ্বেদ ১/১০/১০)

জানি তোমায় জানি ইন্দ্র অমোঘ তুমি দাতা
বিপদকালে রণস্থলে তুমিই মোদের ত্রাতা।
বৃষ্টিধারার মত তোমার পড়ছে ঝরে স্নেহ,
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, রক্ষ মোদের দেহ॥

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধি সহস্রসামৃষিং॥ (ঋগ্বেদ ১/১০/১১)

হে কৌশিক শতক্রতু! ক্ষিপ্র তুমি হেথায় আসি
অভিযুত সোমধারায় পান কর হে হাসি হাসি।
বৃদ্ধি কর পরমায়ু কর্মে কর বরণীয়
ত্যাগ-তপস্যায় হই যেন গো অমর ঋষি স্মরণীয়॥

মন্ত্র পাঠ করেই অভ্যাস মতো হাত জোড় করার চেষ্টা করতেই দৃষ্টি চঞ্চল হল। চোখ গেল কেঁপে। আবার দৃষ্টি দিতে গিয়েই দেখি - সামনের আলোর দানা দুটো নেই। সাপ কোথায় ? তাড়া করে আসছেনা কেন? পেছন থেকে সন্ত শিরোমণি কর্তাপুরুষ বলে উঠলেন - শালে সাপ ভাগ গিয়া। থপ্ থপ্ করে এসে আমার হাত দুটো ধরে বলতে লাগলেন - আপনে বহুৎ আচ্ছা কিয়া। ইহ্ সাপ ভাগানেওয়ালা মন্ত্র আপসে শিখ্ লেঙ্গে। লেকিন ইন্দ্রকা নাম হম্ নেহি লেঙ্গে। আমি বললাম - এ সাপ তাড়ানোর মন্ত্র নয়, বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষি মধুছন্দা দৃষ্ট বেদমন্ত্র। ইন্দ্র বলতে এখানে স্বর্গের রাজা শচীপতি ইন্দ্রকে বোঝানো হচ্ছেনা, বেদে পরমেশ্বরকেই ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দ্রের অর্থ পরমাত্মা। ইতিমধ্যে প্রদীপগুলো জ্বালানো হয়েছে। শোভারাম একটা বড় টর্চ হাতে নিয়ে মন্দিরের চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখছে। সন্তমহারাজ একজনকে বললেন, আমার হাতটা ভাল করে দলাই মলাই করতে। ভোর হয়ে গেছে। একজন প্রস্রাব করতে যাবে বলে উসখুস করছিল, তাকে সন্তমহারাজ দাবড়ানি দিলেন। বললেন - দরজার সামনে নিশ্চয়ই ওৎ পেতে আছে, দরজা খুললেই ছোবল মারবে। আমাকে বললেন - আপ পহেলে যাইয়ে। কেওকি আপ্ মন্ত্র জানতে হৈ। অগত্যা আমিই দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। শৌচাদি সেরে এসে দেখি তাঁরা তাঁদের বিছানাপত্র বাঁধছেন। সন্তমহারাজ বললেন - এ স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিৎ। সাপ পুনরায় ফিরে আসতে পারে। আমি স্নানটা সেরে ফেলতে চাইলাম, তিনি বললেন - মাইল দশেক গেলেই ধর্মপুরী পৌঁছে যাব, সেখানেই আমরা স্নান করব।

অগত্যা গাঁঠরী বেঁধে মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। সেই একই পার্বত্য পথ। দামী জুতো পায়ে দিয়েও সন্তমহারাজ একটুকুতেই আহ্‌ উহ্‌ করে উঠছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই চার শিষ্য এসে তাঁর পায়ে হাত বুলোচ্ছে। ভাবলাম, এভাবে যদি হাঁটা যায় তাহলে ধর্মপুরী পৌঁছতেই রাত হয়ে যাবে। আমি বললাম, আপনি আমার সঙ্গে হাঁটুন, কোথাও হোঁচট খেলে আমি ধরে ফেলব, পথের মধ্যে পাথর-কাঁকর থাকলেও তা সাবধানে সরিয়ে ফেলব। গত রাত্রির ঘটনার পর থেকে তাঁর কাছে আমার আদর বেড়ে গেছে। আমার কথায় রাজী হয়ে হাঁটতে লাগলেন। শোভারামকে বললেন - তোমরা সবাই শুনে রাখ, এ যদি আমার কাছে দীক্ষা নেয়, তাহলে একেই আমি মোহন্ত বানাব। তোমাদের কোন আপত্তি আছে ?

- নেহী জী। বহুৎ আচ্ছাই হোগা।

আমি দীক্ষা নিতে রাজী আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাদের দীক্ষার পদ্ধতি কি?

- পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম আছে বলে আমরা স্বীকার করিনা। তাঁর গুণানুসারে সত্য, নাথ, নিরঞ্জন, অলখপুরুষ বলে নির্দেশ করি মাত্র। দীক্ষাকালে থালার উপর ধুনুচি রেখে তাতে ধূপধূনা লোবান জটামাংসী কর্পূর জ্বালাতে হয়। শিবনারায়ণজী রচিত যে কোন একখানা বই-এর উপর সেই থালা রেখে তাতে কয়েকজন শিবনারায়ণী পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দীক্ষার্থীর কপালে ঠেকিয়ে চারটি শপথবাক্য পাঠ করায়। সেই শপথবাক্য হ'ল - (১) সত্যপথে থাকব, পরস্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি দেবনা (২) মূর্তিপূজা বা হিন্দু-মুসলমানদের কোন আচার অনুষ্ঠান করবনা। কোন দেবদেবীকে মানব না। (৩) দেখি দেখি ঘর যাও, অর্থাৎ বিচার করে চলব এবং যো মন চাহে সো খাও - যা খেতে রুচি হবে তাই খাবে। (৪) অলখপুরুষের অবতার কর্তাগুরুর নামই জপ্ করব। - এই শপথবাক্য পাঠের পরেই শব্দ সাধনার সঙ্কেত জানানো হয়। পিতৃদত্ত নামের সঙ্গে 'রাম' শব্দ যুক্ত করে নূতন নামকরণও করা হয়। যেমন ধর শিবনারায়ণজীর চার শিষ্য ছিলেন, তাঁদের নাম - রামনাথরাম, যুবরাজরাম, রঘুনন্দনরাম এবং লক্ষ্মণরাম। লক্ষ্মণরামের শিষ্য ছিলেন সদাশিবরাম আর সদাশিবরামের শিষ্য ছিলেন বলদিরাম, তিনিই আমার গুরু। আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি সাঙ্কেতিক নাম আছে, যেমন -

ভাত - ফুলরাম,	লবণ - রামরস,	মুরগী - হুঁকা
ডাল - রুক্মিণী,	হাঁস মাংস - বটের,	শূকর মাংস - চন্দনখোরি
রুটি - মুদ্রা,	মাছ - জলাষেম,	গাঁজা - আনন্দরাম
ছাগ মাংস - কাঁঠাল,	তরকারী - সুধি,	আফিং - ভোলারাম
মদ - দুদুররাম	লাড্ডু - ডাণ্ডারা।	

- ক্যা শোভারাম, ইনকো ত এক কিসিমকা দীকছা হো চুকা। ওঁকারমান্ধাতামেঁ পৌঁছকর যব্ দুসরা আদমীওকো শিবনারায়ণী বানায়েগা উস্ বখৎ ইনকো শব্দসাধন শিখলা দেঙ্গা।

শোভারামের সংক্ষিপ্ত জবাব - জী হাঁ।

আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন - এখন তুমি কিসের সাধনা কর ?

- আমি কোন অলখপুরুষ বা অদৃশ্য দেবতার উপাসনা করিনা। কোন অদৃশ্য বা অদৃষ্টপূর্ব দেবতাকে ধ্যেয়ে বেড়ানো আমার স্বভাব নয়। আমার যিনি ইষ্টদেবতা, সেই জন্মদাতা জ্ঞানদাতা বাবারই উপাসনা করি। বাবা নর্মদা পরিক্রমা করতে বলেছিলেন, তাই পরিক্রমাতে এসেছি।

- এখন করছ কর, উসসে কোই হরজা নেহি। তবে আমি দীক্ষা দেওয়ার পর তোমাকে আর পরিক্রমা করতে দেবনা, হয় আমার সাথেই ফিরে আসবে নতুবা মা-কে দেখবার জন্য একবার দেশে যেতেও আমি হুকুম করতে পারি।

পাতিরামের এই প্রলাপোক্তি বা পাতিবাক্যের কোন জবাব দিলাম না।

কথা বলতে বলতে এমন স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে নর্মদার দিকে তাকিয়ে দেখি নর্মদা জলপ্রপাতের আকারে পর্বত ভেদ করে যেন নিচে নামছে। চারধারে বড় বড় গাছের মেলা আর সব গাছেরই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একরকমের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমন নিবিড় ভাবে গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রঙ দেখা যাচ্ছেনা।

শোভারাম বলল -
এইসব লতায় বর্ষাকালে একরকম ফুল ফোটে যার রঙ সোনালী, তার গন্ধে ঘুম পায়। এখানে বাঘ ভালুকও থাকতে পারে; মাইলখানেক পথ একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন। আমরা চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। রাস্তাটা ঢালুর দিকে যাচ্ছে। উঁচু থেকে নিচে নামলে এমনিতে পায়ে গতি বেড়ে যায়, মনে হয় পেছন দিকে কেউ যেন ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছে। সেই ঠেলা বা বেগের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে হয় নতুবা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পথটা তো পিচঢালা বা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো নয়। পাথরে ভর্তি, কাজেই আমাদের টাল সামলানো কঠিন হল। একে অন্যের উপর আমরা আছড়ে পড়লাম। একে অন্যকে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। ভক্তরা ত্রস্তব্যস্তে তাদের আরাধ্য দেবতার শ্রীঅঙ্গের লালধুলা ঝেড়ে মুছে দিল। গাঁঠরী এবং পোটলা পুটলি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, সব একে একে কুড়োল হল। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বড় বড় গাছের জঙ্গল পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে যেখানে গাছপালা পাতলা, ঝোপঝাড়ও কম, সেখানে পৌঁছেই সন্তমহারাজ একটা বড় পাথরের উপর ধপ করে বসে পড়লেন।

- শোভারাম মুঝে মুদ্রা দেও, থোড়াসা দুদুররামভি দেও। আপলোগভি মুদ্রা লেও, আনন্দরামভি পি সকতে হো। হম্ বহুত থক্ গয়ে।

শিষ্যদের একজন তাঁর পা থেকে জুতা খুলে নিয়ে পা দুটো দাবাতে লাগলেন। শোভারাম রুপার গ্লাসে 'দুদুররাম' দিয়ে গোটা আষ্টেক রুটি ও লাড্ডু একটা রুপোর থালাতে পরিবেশন করল। পাতিরাম তার সদব্যবহারে দেরি করলেন না।

বাকী চারজন রুটি খাওয়া শেষ করে আনন্দরাম অর্থাৎ গাঁজা টানতে লাগল। শোভারাম আমাকে খাবার খেতে অনুরোধ করেছিল, আমি সবিনয়ে অসন্মতি জানালাম। তাদের পান ভোজনে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। বেলা বোধহয় নটা সাড়ে নটা হবে। একদল কৃষ্ণসার মৃগ দৌড়ে চলে গেল। আমি বললাম, হরিণ থাকলেই বাঘের ভয়। এবার এস্থান ছেড়ে যাওয়াই উচিৎ। পাতিরাম বলল - হাঁ হাঁ চলিয়ে, আপনে ঠিক বোলা। একজন শিষ্য সযত্নে তাকে জুতা পরিয়ে দিল। দুদুররামের গুণে তার চলার গতি বেড়ে গেছে। এখন উল্টে আমাকে বললেন - জোস্ আ গিয়া। জোর কদমসে চলিয়ে।

আমাদেরকে চলতে হচ্ছে নর্মদার কিনার ধরেই। এই কিনারা বরাবর রয়েছে একটি পথরেখা। সেই পথের একপাশে পাথরের রাজ্য, অন্য পাশে জলের। ডান দিকে থাকে থাকে উঠে গেছে পাহাড়। সেই আকাশচুম্বি পাহাড়ের পাদদেশ আবার ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা, বড় বড় বনস্পতির ভীরে তা দেখা যায়না। বাম দিকে উথাল পাথাল তরঙ্গবাহু তুলে বয়ে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা নর্মদা। সূর্যকরস্নাত নর্মদাতটে আমার হাঁটতে ভালই লাগছে। এক জায়গায় কতকগুলো ময়ূরকে দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ ময়ূর চিড়িয়াখানার ময়ূর নয়, মুণ্ডমহারণ্যেও বড় বড় ময়ূর দেখেছি কিন্তু এই ময়ূরগুলির মত বড় ময়ূর এর আগে দেখিনি। অবশেষে আমরা ধর্মপুরীতে পৌঁছে গেলাম। নর্মদার তটে একটি বড় শিবমন্দির। পাহাড়ের গায়ে দেখলাম প্রায় একশ ফুট উঁচুতে তিন চারটি গুহা, গাছের ডালে গৈরিক বস্ত্র এবং কৌপিন ঝুলছে। বুঝলাম গুহায় কোন সাধু মহাত্মা তপস্যার জন্য বাস করেন। সন্তমহারাজ তার পকেট থেকে একটা রুপার পকেট ঘড়ি বের করে বললেন - মোটে বেলা সাড়ে দশটা। শোভারাম তুমি তাড়াতাড়ি লিট্টি তৈরীর ব্যবস্থা কর, শৈলেন্দ্ররামের জন্য 'ফুলরাম' বানাও। আচ্ছা ঘিউ ত হ্যায়ই হ্যায়। আমরা এখানে স্নান করব। শৈলেন্দ্ররামকে এখানেই খাইয়ে দাও। আমরা মাঝপথে কোথাও খেয়ে নেব আর আজ পামাখেড়িতে পৌঁছে রাত্রিবাস করব।

তাঁর মুখে আমার নূতন নাম শুনে বুঝলাম যে ইতিমধ্যেই তিনি আমাকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন। শিবমন্দিরে সব জিনিষ রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হলাম। সন্তশিরোমণির শ্রীমুখে আদেশ শুনে তিনজন ভোজন বানাবার আয়োজন করতে লাগল। মন্দিরের চাতালে বসে শোভারাম সন্তশিরোমণির শ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দন করতে আরম্ভ করল, আমাকে বললেন - সাপ তাড়ানোর মত বাঘ তাড়ানোর কোন মন্ত্র জান কি ?

বললাম - জানি বৈ কি! আমি স্নান করে সেই মন্ত্র পাঠ করব। আপনি শুনতে পাবেন।

নর্মদার ঘাটে নেমে মনে পড়ল শোভানন্দজী নর্মদার গল্প করতে করতে একবার শুনিয়েছিলেন যে এই ধর্মপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ তপস্যা করেছিলেন, এখানে বলে রাখা ভাল যমের অপর নাম ধর্মরাজ। পুরাণের মতে, ইনি ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এঁর বাহন মহিষ এবং অস্ত্র হল যমদণ্ড। বেদের মতে যম হচ্ছে বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু, 'যমেন বায়ুনা'। জীবের মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু ঊর্ধ্বপথে আকৃষ্ট হয়ে নবদ্বারের যে কোন একটি দ্বার দিয়ে উৎক্রান্ত হয়। এইজন্য সেই অন্তিমকালের ঊর্ধ্বগামী প্রাণবায়ুকে যম বা মৃত্যুর দূত বলে পুরাণকারেরা কল্পনা করেছেন।

স্নান করে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করার পর সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমি মধুছন্দার পুত্র জেতাঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রের স্তব করতে লাগলাম -

তবাহং সূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবাদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণোবিদুষ্টে তস্য কারবঃ॥ (ঋ ১/১১/৬)

আবার এনু তোমার পাশে সাধন-বিত্ত চাহি,
অশেষ তোমার কীর্তিগাথা বারে বারে গাহি।
পূর্বকালে ঋষি তোমায় ভজেছিল যাগে,
তাঁদের দেহ দুহাত ঢালি (তাইত) প্রভু ডাকি অনুরাগে॥

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং *শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংসি উৎতির॥ (ঋ ১/১১/৭)

মায়াবি যে শুষ্ণ অসুর করলে হনন তারে,
করলে তারে পরাজিত মায়ার অভিসারে।
মেধাবী সব যাজ্ঞিকেরা কীর্তি তোমার জানে
সিদ্ধ কর তাঁদের তুমি সত্য শ্রেয় দানে॥

ইন্দ্রং ঈশানং ওজসা অভিস্তোমাঃ অনুষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সাঃ॥ (ঋ ১/১১/৮)

ঈশান তুমি হে মঘবা, তোমার ওজঃ বলে
স্তোতৃগণের কীর্তনে যে তোমার খ্যাতি চলে।
তোমার উদার বদান্যতা সহস্রধারে নিত্য
উজাড় করি আরও ঢালুক যতেক সাধন বিত্ত॥

স্নান করে মন্দিরে আসতেই তিনি বললেন - আপকা কণ্ঠস্বর বহুত সুরিলা হ্যায়। লেকিন্ বাঘ ভাগানেওয়ালা ইস্ মন্ত্রমেঁ ভি ইন্দ্রকা জিকর আয়া।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। শিবলিঙ্গের উপর চন্দন, বিল্বপত্র ও প্রচুর বনফুল দেখে বুঝলাম, আমরা এখানে পৌঁছানোর পূর্বেই কেউ পূজা করে গেছেন, হয়ত বা গুহাবাসী সন্ন্যাসীরাই পূজা করে গেছেন। ঘনকৃষ্ণ শিবলিঙ্গকে খুব দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। আমি নর্মদার জল ঢেলে পূজা করলাম। জপ্ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। শোভারামজী সন্তজীকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেছেন। মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখলাম রান্না হচ্ছে। তিনখণ্ড পাথরের উপর একটা ছোট হাঁড়ি চাপিয়ে আমার জন্য ভাত রান্না হচ্ছে। কাঠের আগুনে গোল গোল কমলালেবুর মত বড় লিট্টি সেঁকা হচ্ছে। প্রায় চব্বিশ পঁচিশটা লিট্টি তৈরী হয়ে গেছে। স্নান করে এসেই আমাকে জোর করে খেতে বসালেন সন্তজী। ঘি ও গলা ভাত তৃপ্তি করে খেলাম। তারাও কিছু খেল। সব জিনিষ গুছিয়ে নেবার পর আবার যাত্রা শুরু হল। পাতিরামের ঘোষণায় জানলাম বেলা দেড়টা বেজেছে।

---

* শুষ্ণঃ - হৃদয়স্থ কামনাদি অসৎবৃত্তি নিচয়কে শুষ্ণ বলা হয়। কারণ তা জীবের সৎবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত শোষণ ও শুষ্ক করে দিচ্ছে

নর্মদার কিনারা ঘেঁসে যে পথচিহ্ন গিয়েছে সেই এবড়ো খেবড়ো পার্বত্য পথে কখন দ্রুততালে কখনও ধীরগতিতে হেঁটে বেলা পাঁচটা নাগাদ আমরা পামাখেড়ির শিবমন্দিরে এসে পৌঁছলাম। মন্দিরের চত্বরে সমস্ত জিনিষ রেখে সন্তপাতিরামের নির্দেশে দুজন মন্দিরের ভেতরটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল, একজন সমস্ত মন্দিরটা ধুয়ে সাফ করল। ঘাটে নেমে স্নান করে এসে দেখি চারটা পেতলের প্রদীপ জ্বেলে ফেলা হয়েছে।

সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখছি বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন ধাপে ধাপে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে। পর্বতের উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙীন আলোয় স্বর্গের স্বর্ণমন্দিরের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই অপরূপ শোভা বেশীক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম না।

সন্তমহারাজ চেঁচামেচি করে আমাকে মন্দিরের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করলেন। দরজা নিজ হাতে বন্ধ করে আমায় বললেন - 'অচ্ছিতরেসে সাপ ভাগানেবালা মন্ত্র জপ্ করোজী। আমি শিবলিঙ্গ হতে ফুট চারেক দূরে নিজের বিছানা পাতলাম। ভোগ ঘরে কিছু কাঠ পড়েছিল। তিনি শোভারামকে হুকুম করলেন - হমারা ওয়াস্তে ফুলরাম বানাও। তুমলোগকো লিয়ে 'মুদ্রা'। সবসে পহেলে চা বানাও। বহুৎ থক গয়ে। আমি চমকে উঠলাম তাঁর কথা শুনে। এই পাহাড় জঙ্গলে তিনি চা সংগ্রহ করলেন কিভাবে? নিজেই তার উত্তর দিলেন - কর্তাগুরু সন্তমহারাজ বলদিরাম-নে কলকত্তাকা শিবনারায়ণী সম্প্রদায়কা মোহান্ত থে। হম্ ভি উনকা সাথ দো তিন দফে কলকাত্তা গয়া। উহ্ লোগ্ হমারা পাশ চা ভেজতে হৈ। ওঁকারমান্ধাতাকা নজদিগ্ মোরটক্কামে হমারা গদী হ্যায়। রেল পার্শল মেঁ হমারা পাশ চা আতী হৈ।

চা বানানোর কথা বলতেই তাঁর অনুচরদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। চা হবার পর তিনি নিজ হাতে আমাকে একটা গ্লাস দিয়ে বললেন - পিয়ো জী, ইহ্ ত সিরিফ গরম পানি হৈ। আরাম মিলেগা। সারাদিন হাঁটার পরিশ্রমে পা আমার কনকন করছে। আমি খুশী মনেই চা নিলাম। তার অনুমতি নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। তাদের বন্দেগী অর্থাৎ উপাসনাদি 'দুদুররাম', 'আনন্দরাম' এবং ভোজনপর্ব কত রাত্রে যে শেষ হয়েছে, তা আমি জানতে পারিনি। অকাতরে ঘুমিয়েছি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি, সন্তমহারাজ জেগেছেন, একজন তার পদসেবা করছে আর তিনজন পোঁটলাপুটলি বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত। আমাকে দেখেই বললেন - আভি হমলোগ্ যাত্রা করেঙ্গে। ইধরসে দশমিল জানেসে হমলোগ্ কালাদেও পৌঁছ জায়েগা। উধর বহুৎ শিবনারায়ণী লোগকা নিবাস হ্যায়। উহলোগ মেরে দর্শকে লিয়ে তড়পাতে হৈ। কালাদেওমেঁ আজ ঠারেঙ্গে।

- আমি তাহলে স্নান করে এই মন্দিরের মহাদেবকে পূজা করে নেই।

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে স্নান করে এসে পামাখেড়ীর শিবকে পূজা করতে বসলাম। প্রায় দেড়ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ। এইরকম অদ্ভুত ধরণের শিবলিঙ্গ ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। যোনিপীঠের উপর গিট্টি দিয়ে তৈরী যেন একটা খড়্গা বসানো আছে। খড়্গোর মতই কণ্ঠকূপে ভাঁজ। মনে হচ্ছে যেন লালচে বড় বড় বালির দানা সিমেন্ট দিয়ে জমানো আছে। কিন্তু হাত দিয়ে দেখলাম, খুবই মসৃণ। এক কণা সিমেন্টও নেই। ছোট গিট্টি বা বালির বড় দানাকে সিমেন্ট দিয়ে খড়্গোর আকারে জমালে হাতে যে কর্কশ ভাঁজ লাগার কথা তা হাতে লাগলনা। নর্মদার জলে স্বতঃই উদ্ভূত এই লিঙ্গ। আমি বুঝতে পারলাম, অনুচরবর্গসহ পাতিরাম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, আমি তা গ্রাহ্য করলাম না, 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বের করে এই শিবলিঙ্গের পরিচয় খুঁজে বের করতে পারি কিনা দেখতে লাগলাম। বইয়ের লক্ষণ মিলিয়ে জানতে পারলাম যে এই লিঙ্গের নাম রাক্ষস লিঙ্গ বা নৈঋত লিঙ্গ। রাক্ষস লিঙ্গের লক্ষণ হল -

রাক্ষসং খড়্গাসদৃশং জ্ঞানযোগ ফলপ্রদম্।
কর্করাদি প্রলিপ্তঙ্গকুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা।
রাক্ষসং নিঋতে লিঙ্গং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্॥

এই লিঙ্গ গৃহীদের পূজনীয় নয়। কারণ গৃহীর কাম্য সুখ ও সাধের সংসার। কিন্তু এই লিঙ্গ সংসার-জ্বালার নিবৃত্তি ঘটায়, নির্বান দান করে, তাই হয়ত নির্বাণাকাঙ্ক্ষী সাধুরা উপরের ঐ গুহায় বাস করে এই নির্বাণপ্রদ শিবের তপস্যা করছেন। মহাদেবকে প্রণাম করে গাঁঠরীটি কাঁধে তুলে নিয়ে সন্ত পাতিরামের সঙ্গে যাত্রা করলাম কালাদেওয়ের দিকে। সাজ্বা ও সেগুনের জঙ্গল আরও যেন ঘন হয়ে উঠে গেছে পর্বতের উপর দিকে।

যেদিন অমরকন্টক থেকে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলাম সেদিন ছিল ১৯৫৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, বাংলা ১৩৫৯ সাল ১লা আশ্বিন, তাল নবমী। প্রায় ছয়মাস ধরে নর্মদাতটে হাঁটছি; ১৯৫৩ সাল গত হয়ে ১৯৫৪ সাল পড়েছে, আর পনেরদিন পরে বাংলা ১৩৫৯ সাল শেষ হয়ে ১৩৬০ সাল শুরু হবে। সন্তমহারাজ হঠাৎ জাপটে ধরতেই চিন্তাস্রোত ছিন্ন হল। প্রায় গোটা চারেক বাইসন তীরবেগে দৌড়ে আসছে। ঠিক গরুর মত দেখতে, তবে শিং দুটো প্রায় দুই ফুট করে লম্বা। আমাদের চলার পথ ধরেই আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি প্রায় দশ ফুট উপরে উঠে সাজ্বা ও সেগুন গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম, সন্ত পাতিরাম থরথর করে কাঁপছেন আর হাঁপাচ্ছেন। বাইসনগুলো চলে যেতেই নেমে এলাম।

তিনি শোভারামকে চোখ রাঙিয়ে বলতে লাগলেন, এইভাবে আমাকে আর সফর করিয়ো না। এবার থেকে যারা দীক্ষাপ্রার্থী হবে তাদেরকে আমার গদীতে আসতে হবে। যেখানে ট্রেনে বা বাসে যাওয়া যাবে, সেখানে কেবল যেতে পারি। তিনি রাগে ফুঁসছেন, সবই যেন শোভারামেরই দোষ। সাপ, বাইসন সবাই যেন শোভারামের সঙ্গে জোট বেঁধে চক্রান্ত করে গুরুমহারাজকে নাজেহাল করছে! আমি শোভারামকে তাঁর ভর্ৎসনা থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম - দেখিয়ে পেড়কা ডালমে কেতনা সুন্দর খুবসুরৎ বান্দর বৈঠা হ্যায়। তিনি বাঁদর দেখতে ব্যস্ত হলেন। শোভারামকে বললেন পাথর ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিতে। আমি বললাম - পাথর ছোঁড়ার দরকার কি ? পাথর ছুঁড়লেই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করবে। সাবধানে বাঁদর এড়িয়ে এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁটতে লাগলাম। এইভাবে মাইল তিনেক হাঁটার পর আবার নর্মদাকে একটু দক্ষিণদিকে বেঁকে বইতে দেখলাম। এই অঞ্চলে শিমুলগাছ এবং কুল গাছের ঝোপ বর বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে সাজ্বা, সেগুন গাছ ত আছেই তবে ছায়াহীন বিশাল বিশাল শিমুল গাছই বেশী। তাদের সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল বা আব বেরিয়েছে। আমি শোভারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অঞ্চলে কি মানুষজনের বসতি নেই ?

- কি করে থাকবে ? বাঘ, নেকড়ে, হায়না, গেঁউড়া আর চিতাবাঘের থাবার নিচে কে মাথা দিতে আসবে! তবে ঐদিকে নর্মদার দক্ষিণতটে মানুষজনের বসতি আছে। শিমুলফুলের জঙ্গল অতিক্রম করার পর আবার ঘন জঙ্গলে পা দিলাম। সেখানে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরঝর করে ঝরণা বয়ে আসছে, পথ পিচ্ছিল। একদল ময়ূর আর হরিণ দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করছে। এক-একটা ময়ূরকে তাড়া করে দুই তিনটে হরিণ আসছে, ময়ূরটা কেকারব করতে করতে গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসছে। কোন কোন ময়ূর পেখম মেলে ঝরণার জলে মুখ দেবার চেষ্টা করলেই হরিণ তাড়া করে আসছে, হরিণ জলে মুখ দিতে গেলেই ময়ূর তার গা ঘেঁষে ঠোকরাচ্ছে। আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য প্রায় দশ মিনিটকাল উপভোগ করলাম। সহসা সন্তমহারাজের হ্যাঁচো শব্দে চোখের পলক ফেলার আগেই হরিণগুলো পালিয়ে গেল। সবাই পা টিপে টিপে ঝরণার জলে ভেজা অংশটা পেরিয়ে এলাম। চোখে পড়ল একটা বড় নৌকায় চেপে নৌকাভর্তি লোক মাদল আর ভেরী বাজাতে বাজাতে নর্মদার দক্ষিণতট থেকে উত্তরতটে এসে নৌকা ভিড়ালো। শোভারাম সন্তমহারাজকে বললে - আপ ইধর পধারেঙ্গে ইহ্ বার্তা শিবনারায়নী লোগনে অবগত হুয়া। ইসলিয়ে উহলোগ কালাদেও মন্দিরমেঁ আপকে লিয়ে প্রতীক্ষা কর রহা হ্যায়। শুনে পাতিরাম খুবই পুলকিত হলেন। বললেন - ঘন্টিরাম বহোৎ কাবিল আদমী হৈ। উনোনে সবকো সংবাদ দে দিয়া। দেও মুঝে মুদ্রা দেও, থোড়াসা দুদুররাম ভি দেও। তিনি বিশ্রাম করার জন্য বসে পড়লেন। তাঁদের মুদ্রা-পর্ব, লাড্ডু-পর্ব, দুদুররাম ও আনন্দরাম-পর্ব শেষ হল। সন্তমহারাজ পাতিরাম আমাকেও সেই বাসিরুটি খাবার জন্য অনুরোধ

করেছিলেন, কিন্তু আমি জানালাম যে কিছুক্ষণ পরেই যখন কালাদেও মন্দিরে পৌঁছে যাচ্ছি, তখন মহাদেবকে পূজা করে তারপরেই একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করা যাবে।

- য্যায়সা আপকা মর্জি! গম্ভীর মুখে সন্তমহারাজ বললেন। সকালে পামাখেড়ীর মন্দিরে সেই নৈঋত বা রাক্ষসলিঙ্গকে পূজা করার সময় থেকেই তিনি আমার উপর চটে আছেন।

আধঘন্টা ধরে সেই জঙ্গলপথে হাঁটার পরেই কালাদেও মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। বিশ-পঁচিশজন নারী পুরুষ ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্তমহারাজকে দর্শন মাত্রেই তারা মাদল এবং ভেরী বাজিয়ে সম্বর্ধনা জানাল। বন্দেগী কর্তাপুরুষ পূরণধনী সন্তমহারাজ বলে সমস্বরে আওয়াজ তুলল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে সন্তমহারাজের হাত ধরে মন্দিরের চত্বরে বসালেন। সেখানে সন্তমহারাজের বসার জন্য জাজিম পূর্ব থেকেই পাতা ছিল। মন্দিরও ধুয়ে মুছে সাফ করা আছে। তিনি বসতেই তার হাত-মুখ-পা ধুইয়ে দেওয়া হল। দলের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ছিলেন, তারা তাদের মাথার চুল দিয়ে গুরুদেবের পা মুছিয়ে দিলেন। তারপরেই প্রণাম পর্ব, প্রত্যেকেই পায়ের কাছে ভেট দিয়ে প্রণাম করলেন। রেশমী বস্ত্র, লাড্ডু, খোয়া, দুধ, ঘি, ফল, মেওয়া ইত্যাদি নানাজাতীয় বস্তু স্তূপীকৃত হল। যা প্রণামী পড়ল, শোভারাম গুনে সন্তমহারাজকে জানালেন - 'ঢাই হাজার রূপেয়া'।

- রাখ্ দো রাখ্ দো। ইনলোগোঁকো পরসাদ দেও। একজন লোককে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন - ক্যা হুঁকা নেহি লায়া ? বটের ভি নেহি ?

লোকটি জিভ কাটল। অত্যন্ত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে জানালো- ভুল হো গয়া, মুঝে মাফি কিয়া যায়।

- আপ জানতে হৈ ঘন্টিরাম! এতনা বড়া সফরমেঁ ক্যাতনা তকলিফ হোতা হৈ, বিচ বিচমে হুঁকা বটের ঔর কাঁঠাল না খানেসে তবিয়ৎ কমজোরী হো জাতা হৈ। ঘন্টিরাম নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের এককোণে গাঁঠরীটা রেখেছিলাম, আমি শোভারামকে বলে নর্মদা স্পর্শ করতে নামলাম। ঘাটে যেতে যেতেই আমি শুনতে পেলাম, সন্তমহারাজ উপদেশ দিচ্ছেন -

দেখো, হরবখৎ সত্যপুরুষকা ভজন করনা চাহিয়ে, সত্য পথমেঁ সত্যকা সন্ধান মিলতা হৈ, যো দুখ পড়ে ত সত্য ব্যবহারা। সত্য কো জানো পুরুখ্ অপারা। অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে পড়লেও সত্য ব্যবহার করবে, যদি কোন মিথ্যা আচরণ করলে বুঝতে পার তোমার সাময়িকভাবে দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটবে,তবুও স্বার্থবশে সত্যকে ত্যাগ কোরনা। কায়মনোবাক্যে সত্যভাষণ, সত্যরক্ষা এবং সত্যপালনকেই সত্যপুরুষ অলখ্ নিরঞ্জন বলে জানবে।

ফিন্ বোলো, জোরসে বোলো -

তুঁহ দুখঃহরণ সকল সংসারা।
শিবনারায়ণ দাস তুমহারা॥

সকলেই তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দোঁহাটি উচ্চৈঃস্বরে বললেন। আমাকে দেখিয়ে তিনি সবাইকে বললেন - ইনকা নাম শৈলেন্দ্ররাম, বাঙাল মুলুকসে আয়া, আভিতক কাল করমকা ফান্দোমেঁ ফাঁস রহা হ্যায়। পরিক্রমা কর রহা হৈ, শিবলিঙ্গকা পূজা কর রহা হৈ, লেকিন ওঁকারমান্ধাতামেঁ পৌঁছকর হম্ ইনকো দীখছা দেগা, করম ভরমসে ছুটকারা হো জাবেগা। সাপ ঔর শেরকো ভাগানেবালা মন্ত্র ইনোনে অচ্ছিতরেসে ইস্তেমাল কর্ চুকা। একদফা হমারা চেলা-চেলিয়োঁকো শুনা দিজিয়ে ত!

আমি বললাম - আপনাকে যে মন্ত্র শুনিয়েছি; তা সাপুড়ে ভুতুড়ে মন্ত্র নয়, দুর্লভ বেদমন্ত্র, মহর্ষিদের সাধনার বস্তু। যখন তখন ঐ মন্ত্র শুনতে বা বলতে নেই। এই বলে কমণ্ডলু হাতে করে ঘাটের দিকে স্নান করতে নেমে গেলাম। আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন - বাচ্চা বহোৎ তেজী হ্যায়। আখেরমেঁ সিধা হো জাবেগা। হম্ ইনকো মোহান্ত বনায়েগা। জনৈক বশংবদ ভক্ত মন্তব্য করলেন শুনতে পেলাম - সত্যপুরুষ অলখ্ নিরঞ্জনকা জব্ নজরমেঁ আ গিয়া, তব উহ্ জাবেগা কঁহা, উনসে বহোৎ টেরাহ্ আদমীকো আপনে সিধা কিয়া।

নর্মদাতে স্নান করে ইচ্ছা করেই দেরী করে যাবার জন্য জলে দাঁড়িয়ে জপ করতে লাগলাম। যখন মন্দিরে ফিরে এলাম দেখলাম কর্তাপুরুষকে প্রণাম ও বন্দনার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। একজন তাঁর শ্রীদেহে তৈলমর্দন করছে। আমি একপাশ দিয়ে মন্দিরে ঢুকে শিবলিঙ্গের কাছে বসে প্রণাম ও পূজা সারলাম। পূজা করে বিশেষ তৃপ্তি হলনা। কারণ বিশাল শিবলিঙ্গটি দেখতে বড় কর্কশ ও রুক্ষ, আমার গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ীর শালগ্রাম শিলার কথা মনে পড়ে গেল, তাঁদের বাড়িতে যে শালগ্রামটির পূজা হত, সেটি এমনই অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল যে যতই পঞ্চগব্য ও ঘি মাখিয়ে স্নান পূজা বা চন্দন চর্চিত করা হোক না কেন, দু-তিন মিনিট পরেই দেখা যেত শালগ্রামের চন্দন শুকিয়ে ফেটে ফেটে পড়ছে আর কর্কশতা ও রুক্ষতা বিষমভাবে ফুটে উঠেছে। সকলেই বলত - বংশ নেশে ঠাকুর। সত্যি সেই সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ ভট্টাচার্যি পরিবারের ঘরে সেই শালগ্রাম আসার পর থেকে দশ-বারো বৎসরের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে নির্বংশ হয়ে গেল তারা। কালাদেও-এর শিবলিঙ্গটিকে নিন্দনীয় দুষ্ট লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হল। শাস্ত্রে আছে - কর্কশে বাণ লিঙ্গেতু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ। যাই হোক, নর্মদাতটের প্রাচীন বাণলিঙ্গকে শাস্ত্রকাররা 'নিন্দনীয় বা দুষ্ট' যা আখ্যাই দিন, আমার চোখে তিনি শিব, মঙ্গলময় দেবতা। পূজা করে বাইরে বেরিয়ে দেখি সন্তমহারাজ স্নান করে এসেছেন, ভক্তরা তাকে রেশমী বস্ত্র পড়িয়ে কর্পূর জ্বেলে আরতি করছে। শোভারামদের সন্ধান করতে গিয়ে দেখি তারা চারজনেই মন্দিরের ভোগ ঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। নবাগত চেলাদের মধ্যে চার পাঁচজন একসঙ্গে গিয়ে জঙ্গল থেকে বহু শুকনো কাঠ নিয়ে এসে জমা করে রেখেছে। নবাগত ভক্তরা কেউ এখানে খাবার খেলেন না, হাতে হাতে প্রসাদ নিয়ে কর্তাপুরুষের জয়ধ্বনি দিতে দিতে নৌকাতে গিয়ে উঠলেন। সন্তজী পকেট ঘড়ি দেখে শোভারামকে হুকুম করলেন - এক বাজ গিয়া, ভোজনকা ইন্তেজাম করো। এতক্ষণে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে খেতে বসলেন। আমাকেও পাশে বসালেন। পুরী, ডাল, সব্জী এবং পায়েস আমরা সবাই তৃপ্তি করে খেলাম। সন্তমহারাজ রুক্মিনী (ডাল) এবং সুধিতে (তরকারী) কিঞ্চিৎ রামরস (লবণ) বেশী পড়েছে বলে উষ্মা প্রকাশ করলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই একটু গড়িয়ে নিলাম, গরমকাল যে পড়ে গেছে তা ভালভাবেই অনুভব করছি। কয়েকটা সেগুন পাতা একত্র করে শোভারাম গুরুদেবকে সারা দুপুর হাওয়া করল। বেলা চারটা নাগাদ সবাই বাইরে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলাম। সূর্যাস্ত হতেই আমি নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। মন্দিরের দু'দিকে দুটো জানলা বন্ধ করলে গরমে হাঁফাতে হবে, কিন্তু সাপের ভয়ে তিনি জানলা খোলা রাখতে দেবেন না। অগত্যা আমি বললাম, দুটো জানলা স্পর্শ করে আমি মন্ত্র পড়ছি, তাহলে সাপ আসবে না, আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হতেই আমি ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট রুদ্রস্তবের একটি মন্ত্র জানলা স্পর্শ করে উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করতে লাগলাম -

ওঁ অবোচাম নমো অস্মা অবস্যব শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্র বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ (ঋ১ম, সূ১১৪, মন্ত্র১১)

স্মরণ করি রুদ্র তোমায় স্তবে গভীর নমস্কারে
মরুৎ সহ ডাকি তোমা আহ্বান করি বারে বারে।
পালন করুন মিত্রবরুণ, পালন করুন মা অদিতি।
পালন করুন সিন্ধু-সাগর পালন করুন দ্যুলোক ক্ষিতি॥

সন্তমহারাজ নিজেই গিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে এলেন। এইবার তার 'দুদুররাম' চাই। শোভারাম রূপোর গ্লাসে এনে দিতেই চুমুক দিলেন। তুমলোগ 'আজ্ঞেরি' লে আও, 'বন্দেগি' শুরু করো। এর মানে এইবার সেই রূপোর ধুনুচিতে ধূপধুনা কর্পূর লোবান ও জটামাংসী জ্বেলে বন্দনা পাঠ হবে। কিন্তু ভোগঘর হতে শোভারাম আসতে দেরী করছে। তিনি আবার 'শোভারাম, শোভারাম' বলে হাঁক পাড়লেন। শোভারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাতজোড় করে নিবেদন করল - প্রভু কর্তাপুরুষ, দুখীরাম ভুল করে ধুনুচিটা পামাখেড়ীর মন্দিরে ফেলে এসেছে। 'আজ্ঞেরি' ক্যায়সে হোগা? এই বলে সে কর্তাপুরুষের পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তিনি শোভারামকে পা দিয়ে ঠেলে হুঙ্কার ছাড়লেন - দুখীরাম!

দুখীরামের তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সে কাঁপতে কাঁপতে এসে পায়ে পড়ে কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল - মাফি, মাফি কর্তাপুরুষ...। রোষ কষায়িত লোচনে তিনি আবার হুঙ্কার ছাড়লেন - ধুনুচি কিধার বা ? ভয়ে থতমত খেয়ে বেচারা দুখীরাম বলে উঠল - বাজ্জারসে লে আঁউ ? আবার হুঙ্কার এবার আরও জোরে - বেকুফ ইধর জঙ্গলমেঁ বাজার কাঁহা ? ক্যা তুমহারা বাপ ইধার দোকান খোলকে বৈঠা হ্যায় ? দুখীরামের এখন তখন অবস্থা, তার মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে এল তা শুনে না হেসে থাকা যায়না, সে জবাব দিল - জী হাঁ।

আমি হাত জোড় করে তাঁকে শান্ত হতে বললাম। গজরাতে গজরাতে তিনি গ্লাসের বাকী দুদুররাম চুমুক দিতে লাগলেন। আমি শোভারাম ও দুখীরামের হাত ধরে পাশের ভোগঘরে পাঠিয়ে দিলাম। তার ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললাম - আপনি স্বয়ং পূরণধনী কর্তাপুরুষ, আপনার আর আজ্ঞেরি বা উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন নেই, আর আপনি নিজে যখন ওদের সামনে উপস্থিত আছেন, তখন ওদেরও মাঝে মাঝে এক-আধদিন উপাসনা না করলে এমন কি ক্ষতি হবে! আপনি দয়া করে ভাই দুখীরামকে ক্ষমা করুন।

আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি শুনুন। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের শ্রেণীতে গৌরহরি পাল নামে একজন সহপাঠী ছিল, সে একটু তোৎলা ছিল, লেখাপড়াতে ভাল ছিলনা। পঞ্চম শ্রেণীতেই সে দু'বছর ধরে পড়ছিল, বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। শ্রীযুক্ত মহেশ্বর কর নামে আমাদের বিদ্যালয়ের যিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি আমাদের অঙ্ক এবং বাংলা শিখাতেন। খুব যত্ন করে পড়াতেন কিন্তু তিনি খুব কড়া ধাতের লোক ছিলেন। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলেই তাঁকে খুব ভয় করত। তিনি বেত হাতে পড়াতে আসতেন, পড়া না পারলেই বেত খেতে হত। একদিন তিনি এসে পড়া বলতে না পারায় চারজন ছাত্রকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরহরিও পড়া পারেনি, সেও বেঞ্চের উপর কান ধরে দাঁড়িয়েছিল। মাষ্টারমশায় একে একে কৈফিয়ৎ নিচ্ছিলেন। একজন বলল দিদির বিয়ের জন্য তার পড়া হয়নি, আর একজন বলল তার কাকার বিয়ে ছিল তাই সে পড়তে পারেনি। এবার মহেশ্বরবাবু গৌরহরিকে বেত নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এমনিতেই সে একটু বোকা তার মধ্যে বেত দেখে আরও ভড়কে গিয়ে উত্তর দিল -

- কা..ল বাবার বি..বিয়ে ছিল।

গৌরহরির মত দুখীরামও ভয় পেয়ে আপনার কাছে আবোল তাবোল উত্তর দিয়েছে।

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। ভোগের ঘরে যারা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারাও বেরিয়ে এসে দাঁত বের করে হাঁসতে লাগল।

পান ভোজন সেরে তাদের শুতে দেরী আছে দেখে আমি কর্তাপুরুষের অনুমতি নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙল। জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্য জন্তুর ডাক ভেসে আসছে। বনের মধ্যে একটানা সোঁ..সোঁ শব্দ ছাড়াও আরও বিচিত্র থেকে থেকে ভেসে আসছে কানে। রহস্যময়ী বন্যপ্রকৃতি যেন জেগে উঠেছে। আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম তারায় ভরা আকাশের দিকে। একটা প্রদীপ নিভে গেলেও বাকি তিনটি প্রদীপ এখনও জ্বলছে। সন্তমহারাজকে দেখলাম, 'দুদুররামের' ঘোরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পস্রাবের বেগে বাইরে যেতে ইচ্ছা হল, উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম দুখীরামও জেগেছে। পা টিপে টিপে কাছে এসে সেও ইঙ্গিতে জানাল যে, সেও বাইরে যাবে। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আকাশে জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল অনেকদূরে আমার কালিয়াড়া গ্রামটিকে, সেখানেও আজ এইরকই সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ঐরকম একফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাতের চাদও জেগেছে। সেই পরিচিত আকাশ, নিজের প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে কতদূরে আজ এসে পড়েছি, আরও কতদূর যে যেতে হবে, শেষ পরিণতি যে কি হবে তা জানা নেই। বাবা আমাকে নর্মদাতটে আসতে বলেছিলেন, ভেবে চিন্তেই বলেছিলেন, কাজেই পরিণামে যাই ঘটুক তা আমার বিচার্য নয়। মা নর্মদে! বাবা এখন কোথায় আছেন তা আমার জানা নেই। তুমি দয়া করে তাঁকে জানাও যে আমি তাঁর কথা অমান্য করিনি। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমাকে কাঁদতে দেখে দুখীরাম এসে আমার হাত ধরল, নর্মদাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম মন্দিরে।

ঘুম ভাঙল সকালে। সন্তমহারাজ বাদে অন্যেরা সবাই উঠে পড়েছে। শোভারাম বলল - আজ বড়া লম্বে সফর হ্যায়। করীব সতের মিল জানেসে লাখড়াকোটকা মন্দর মিলেগা। লখড়াকোটকা জঙ্গল খতরনাক মহাজঙ্গল। আস্নান করকে তৈয়ার হো জাইয়ে। সন্তজীর এখনও ঘুম ভাঙেনি। তাঁকে জাগাবে এত সাহস কার! আমি গাঁঠরী বেঁধে স্নান করতে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি সন্তমহারাজ বিছানার উপর উঠে বসেছেন। সকলকে প্রস্তুত দেখে তিনিও জামা জুতা পরে 'তৈয়ার' হয়ে গেলেন। শোভারাম পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। কিছুটা যাবার পরেই ক্রমশঃ চড়াই শুরু হল। সাজা ও সেগুন গাছের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ প্রায় ছ'শো ফুট উপরে উঠে এলাম পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। সন্তজীর ঘড়ি বলছে সাতটা বেজে গেছে, তবুও সূর্যরশ্মির দেখা নেই। মাইল দুয়েক এইভাবে হাঁটার পর মালভূমিতে পড়লাম। দুপাশে এমন জঙ্গল যে আকাশ দেখা যাচ্ছেনা। এক জায়গায় দেখলাম পাথর ভেদ করে বড় বড় ঘাসের জঙ্গল, ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ঝরণা বয়ে আসছে। বুনো জাম কেঁদ সাজা ও বেলগাছ ছাড়া সেগুনগাছ একটাও দেখতে পেলাম না। আর একরকম গাছ দেখলাম যার প্রতিটি শাখায় কাশ্মীরের পিচফলের মত একরকম ফল অজস্র ফলে আছে। শোভারামকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল- তন্দুফল, মারাত্মক বিষ। ভীল আর কোরকারা তাদের তীরে এই ফলের রস আর আঁঠা মাখিয়ে রাখে। এক তীরেই একটা বাঘ খতম হয়ে যেতে পারে। তন্দুগাছের বনে কোন জন্তুই বাস করেনা। কাজেই পরিক্রমারত পথিকের পক্ষে এই বন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এই বনে বসে কোন খাবার খাওয়া এমনকি জল খাওয়াও নিরাপদ নয়। তন্দুবন পেরিয়ে আবার কিছুটা নিচে নামতে লাগলাম। বড় গাছের ফাঁক দিয়ে উপর দিকে তাকালে সূর্যরশ্মি চোখে পড়ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি দূরে নর্মদাকে দেখতে পেলাম, চকচকে উজ্জ্বল আলোর রেখা যেন। রেল লাইনে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে ইস্পাতের রেলপথ যেমন সরলরেখায় গিয়ে আবার বাঁক নেয়, বহুদূর হতে চোখে পড়ে তার ঝকঝকে দাগ, নর্মদাকেও তেমন দেখাচ্ছে। আমাদের পথে ভালভাবে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারছেনা, কিন্তু নর্মদা এবং তার চারপাশ রৌদ্রে ঝলমল করছে। উভয় তটের দিকে তাকিয়ে কখনো নীলাভ কখনও সবুজ গাছপালার সমারোহ এবং তার বর্ণাঢ্য শোভা দেখে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম - কী সুন্দর! শোভারাম কথাটা বুঝতে পেরে বলল - সুন্দর নয় বলুন ভয়ঙ্কর। লাখড়াকোটের জঙ্গলে জানবেন যেখানে সেখানে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে - পরমুহূর্তে কী ঘটবে তা কেউ বলতে পারেনা। এতক্ষণ সন্তজী কোন কথা বলেননি। এবারে তিনি গর্জে উঠলেন - ঘাবরা দেতা হেঁ কেঁও ? হরবখৎ তুম ডর দেখাতা হো। শোভারাম চুপ করে গেল।

আমি মনে মনে ভাবছি মুণ্ডমহারণ্য দেখে এসেছি, এখানেও দেখছি বনজঙ্গলের অদ্ভুত দৃশ্য। নর্মদাতে না এলে এ দৃশ্য দর্শন জীবনে ঘটতনা। আমরা আবার চড়াই-এর পথে উঠছি, ক্ষীণ পথরেখা লক্ষ্য করে। আমার বলা ভুল হল, আমরা কেউ লক্ষ্য করছিনা, করছে শোভারাম, আজ সেই আমাদের অগ্রপথিক নেতা, আমরা কেবল দেখছি, দুধারে নিবিড় বনানী, অজস্র রকমের মোটা লতা আর বনফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে লীলাময়ী, আপন সৌন্দর্যে আত্মহারা। আমরা একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লাম। আমাদের চলার পথে উভয় দিকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত জায়গা বেশ ফাঁকা মনে হল। পঞ্চাশ ষাট হাত দূরেই আবার ঘন বন শুরু হয়েছে, বনের গাছপালা হঠাৎ যেন যুক্তি করে এই একটা জায়গা ফাঁকা রেখে সারি সারি গাছ থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে দৃষ্টি দিয়ে পরিমাপ করলাম প্রায় আধমাইল ত বটেই; ফাঁকা মাঠের মত দেখা যাচ্ছে। বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা বের করেই সন্তজী বললেন - ন বাজ গিয়া। দেও মুদ্রা ঔর দুদুররাম দেও। তুমলোগভি মুদ্রা লেও, আনন্দরামভি পি লেও। শৈলেন্দ্ররামকো ফল বগেরা দেও। দুখীরাম তাড়াতাড়ি জাজিম পেতে দিল। তিনি বসলেন, আমাদের একটু বিশ্রামের প্রয়োজনও ছিল। তাঁদের সঙ্গে বসে আমিও কলা লাড্ডু এবং মেওয়া খেলাম। শোভারামকে দেখলাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে টাঙি দিয়ে গাছের দু'হাত লম্বা লম্বা পাঁচটা লাঠি বানিয়ে তাতে নেকড়া জড়িয়ে তেলে ডুবিয়ে নিল। আমাকে বলল - একটু পরেই আমরা এমন ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকব যেখানে দিনের আলো দেখা যাবেনা। পথ ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার,

হায়না নেকড়ে সব ওৎ পেতে আছে। মশাল জ্বেলে চলতে হবে, কথা বলতে বলতেই দেখতে পেলাম আমাদের কাছ থেকে প্রায় একশো হাত দূরে একটি চিতল হরিণ বন থেকে বেড়িয়ে এসে দৌড়াচ্ছে, আর তাকে তাড়া করে ছুটে চলেছে একপাল নেকড়ে। সন্তমহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে হাত মুঠি পাকিয়ে শোভারামের দিকে দেখাতে দেখাতে বললেন - দেখ্ শোভারাম, তুই আর ঘন্টিরাম যদি এর পরে আর কখনো জঙ্গলপথে হাঁটিয়ে দীক্ষা দেবার জন্য কোথাও নিয়ে যাস্ তাহলে তোদের জান নিয়ে নেব। শিবনারায়ণী সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা বাড়ল কি কমল তাতে আমার ঘোড়াই বয়ে গেল।

শোভারাম চুপ করেই রইল। আমরা আবার হাঁটিতে শুরু করলাম। সেই ফাঁকা প্রান্তরটা শেষ হয়ে একটা পাকদণ্ডীর মুখে শোভারাম দাঁড়িয়ে পড়ে দেশলাই জ্বেলে সন্তজী বাদে আমাদের সকলের হাতে একটা করে মশাল দিল। সন্তজী টর্চ হাতে নিয়ে আমাদের মাঝখানে থাকলেন। পাকদণ্ডী বেয়ে হাঁটিতে শুরু করলাম। যতই এগোচ্ছি জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে, বড় বড় গাছ বেয়ে লতার ঝোপ এমনভাবে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে যে, সূর্যরশ্মির সাধ্য কি এই জঙ্গলে প্রবেশ করে। যেন ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় ভৌতিক পরিবেশে এসে পৌঁচেছি। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। হঠাৎ বনের মধ্যে শব্দ হল - খিক্-খিক্-খিক্। মনে হচ্ছে প্রেতরা তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে। শোভারাম বলল - অনেকগুলো হায়না আমাদেরকে অনুসরণ করছে। এইজন্যেই মশাল জ্বেলে এই জঙ্গলে হাঁটিতে হয়। শুধু অন্ধকারের জন্যে নয়, বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও মশাল খুবই কাজের। সন্তজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, পাঁচ সেলের ব্যাটারীওয়ালা টর্চের আলো জঙ্গলের এদিকে ওদিকে ফেলছেন। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম আমাদের ডানদিকে পাঁচ-ছটা হায়না অন্ততঃ হাত দশেক দূর দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে চলেছে। আলো পড়ায় তাদের লকলকে জিহ্বা আর জ্বলন্ত চোখ দেখে বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। শোভারামক অকুতোভয় তেজস্বী পুরুষ বলে স্বীকার করতেই হবে। সে বলল, বাঁদিকে তিনজন আর ডানদিকে তিনজন মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর টর্চের আলো ফেলতে হবে এই বলে কিভাবে মশাল ঘোরাতে হবে তা দেখিয়ে দিল। সন্তজী ডানদিকে হায়না দেখেছেন, তাই তিনি সেই দিকেই আলো ফেলতে লাগলেন। শোভারাম এবং আমিও ডান হাতে ধরা মশাল ঘোরাতে ও দোলাতে লাগলাম। তাই দেখে দুখীরামসহ বাকী দুজন বাঁহাতে মশাল ধরে ঘোরাতে লাগল। টর্চের আলো যখনই পড়ে তখনই দেখি তাদের বীভৎস কাংস্যকণ্ঠ থেমে যায় আর দূরের দিকে পালিয়ে যায়। সন্তজীর ফোঁপানি বন্ধ হয়েছে, তিনি বেশ মজা পেয়েছেন বলে মনে হল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন - আরে জানোয়ার! সন্তপুরুষকা সাথ দিল্লাগি ছোড়্। দিওয়ানাজীকে দেখেছিলাম শুধু নমস্কার করেই হায়নাদের হঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে মহাপুরুষকে এখানে কোথায় পাবো! তাঁর কথা মনে হতেই 'রেবা রেবা' জপ্ করতে লাগলাম উচ্চৈঃস্বরে। শোভারাম তার গুরুভক্তি দেখাবার জন্য বলল - চুপ রহোজী। খুদ্ কর্তাপুরুস্ কা পাশমেঁ রেহকর্ ক্যা 'রেবা রেবা' চিল্লাতে হো! আমি তার কথায় কর্ণপাত করলাম না। সন্তমহারাজ আমাকে বেশ আবদারের সুরেই বললেন- আপত জী শের্ ভাগানেবালা মন্ত্র জানতা হ্যায়, এক দফে কহিয়ে ত। আমি বললাম সেই মন্ত্রই আমি জপ করছি, ভয় নেই চলুন। নর্মদাতীরে পরিক্রমা করতে করতে আমি কি মিথ্যা বললাম!

যতই এগোচ্ছি, ততই জঙ্গলকে আরও ভয়ঙ্করভাবে ঘন মনে হচ্ছে। বড় বড় গাছের ডালপালা লতাপাতা যেন পাকদণ্ডীর পথকে ঢেকে ফেলার উপক্রম করছে, পাকদণ্ডী যেন শেষ হতেই চায়না। মুণ্ডমহারণ্যের কথা মনে পড়ল। সেখানেও এইরকম নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটেছি, সেখানে হয়ত জঙ্গল আরও ঘন, আরও গভীর, কারণ সেখানে পাখী ডানা মেলে উড়তে পারে না। ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতে এই লাখড়াকোটের জঙ্গলেই দেখছি কিছু অংশ মুণ্ডমহারণ্যের মত। মুণ্ডমহারণ্য যখন অতিক্রম করতে পেরেছি, তখন এ জঙ্গলও অতিক্রম করতে পারব। তবে সেখানে সাথী ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন সিদ্ধ মহাত্মা শোভানন্দ আর এখানে রয়েছে পাতিরামের একজন তল্পীবাহক শোভারাম।

হায়নাদেরকে আর দেখা যাচ্ছেনা। মশাল ধরাই আছে। প্রায় দেড় ঘন্টা এইভাবে চলার পর পাকদণ্ডী শেষ হল, উৎরাই-এর পথে নেমে এলাম ফাঁকা মাঠে। নর্মদাকে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল, মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপ গায়ে লাগছে। অন্ধকার হতে আলোতে পৌঁছে মনে অনেক স্বস্তি ফিরে পেয়েছি। এক কমণ্ডলু জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম। চারপাশটা তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। নানা লতা গুল্মে পাথরের চাঙড়গুলো ঢাকা, কিছু লতা শুকিয়ে গেছে। কোথাও সেগুন গাছের জটলা। দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সন্তজীর কাছে জানতে পারলাম বেলা বারটা বেজেছে। শোভারাম জানাল আর এক মাইল হেঁটে গেলে ভাল স্নানের ঘাট পাওয়া যাবে, সেখানে খাওয়া দাওয়া করে ধীরে সুস্থে হাঁটলেও সন্ধ্যার আগেই লাখড়াকোটের মন্দিরে পৌঁছে যাবো। রূপার গ্লাসে একগ্লাস জল খেয়ে তিনি পুনরায় হাঁটবার অনুমতি দিলেন। মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। এখানে গাছপালার সংখ্যা কম হলে কি হবে, পথ খারাপ বলে সেই একমাইল রাস্তা হাঁটতেই একঘন্টা লেগে গেল। শোভারামের নির্বাচিত স্থানে এসে দেখলাম, নর্মদাতে স্নানের ঘাট সত্যিই পরিষ্কার। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা স্থানটা একটা ফুটবল খেলার মাঠের মত। এখানে যে অল্প কিছুকাল আগে পরিক্রমাবাসীরা ছাউনি ফেলেছিল তার চিহ্ন পড়ে আছে। ভাল কাঠের টুকরো এবং অনেক পোড়া কাঠের অংশ পড়ে আছে, ওগুলো ধুনি বা রান্না করার চুল্লির কাঠ। সন্তজীর জন্য এক শিষ্য জাজিম পেতে দিল। শোভারাম রান্না করার জন্য কাঠ কুড়িয়ে আনল, দুখীরাম সন্তজীকে তেল মাখিয়ে দলাই মলাই করতে লাগল।

সন্তজীর হুকুম অনুযায়ী শোভারাম স্নান করে এসে কড়াইভোগ অর্থাৎ আটা, ঘি খোয়া এবং মেওয়া দিয়ে একরকমের মোহন ভোগ পাকাতে বসল। আমি ঘাম জুড়িয়ে যেতেই নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। স্নান জপ সেরে ঘাট থেকে উপরে উঠে আসছি, হঠাৎ দেখে চমকে উঠলাম! কিছুটা দূরেই ঝোপে ঢাকা একটা বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে একটা বড় বাঘ গুটি গুটি করে এগিয়ে আসছে, চোখগুলো যেন জ্বলছে। আমি 'শের শের' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একটা হলুদ রঙের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। চোখ খুলে আর সন্তমহারাজকে দেখতে পেলাম না। বাঘের থাবার ঘায়ে দুখীরাম রক্তাক্ত দেহে পাথরের উপর গড়াচ্ছে। পলকের জন্য দেখতে পেলাম, গর্জন করতে করতে কালান্তক বাঘটা সন্তমহারাজকে পিঠে ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি উঠে শোভারামের কাছে গিয়ে দেখি তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। দুখীরামকে দেখে মনে হল সে আর বেঁচে নেই। বুক ও গলার মাঝখানে এক খাবলা মাংস খুবলে নিয়ে গেছে বাঘটা, ঘাড়টা ভেঙে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, জাজিম রক্তে ভেসে গেছে। শোভারামসহ আর দু'জনের চোখে মুখে আমি জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। হাত কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, টাল সামলে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, যাইহোক কোন রকমে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তারা চোখ খুলে তাকাল। আর্তনাদ কান্না ও বিলাপধ্বনিতে কিছুক্ষণ কাটল। আমিও কাঁদছি, দুখীরামের রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকানো যায়না। বেচারা কায়মনোবাক্যে কর্তাপুরুষের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছিল। তার প্রিয় পরিজন কিছুই জানতে পারলনা, নর্মদাতটের এই জঙ্গলপ্রান্তে তাদের পরিচিত দুখীরামের দেহটা পড়ে রইল।

সন্তমহারাজের জন্যেও মনটা কাতর হয়ে উঠল। তার সরল সদয় ব্যাবহার যতই মনে হতে লাগল ততই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। শোভারামরা তখনও কাঁদছে। আমি নর্মদাতে গিয়ে সন্তমহারাজ ও দুখীরামের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করে এলাম। আকাশে একপাল শকুন চক্রাকারে উড়ছে। শোভারাম নিজেকে সামলে নিয়েছে। দূরে বাঘের হুঙ্কার শুনতে পেলাম। শুনেছি, শিকার প্রাপ্তির পর বাঘ এইভাবে অনন্দে হুঙ্কার দেয়। হয়ত সন্তমহারাজের দেহটা কোন ঝোপের আড়ালে মুখের সামনে ফেলে সে এই হুঙ্কার দিচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ শোভারাম তার দুই গুরুভ্রাতাকে বলল- ঘন্টিরামকে আমি কিছুতেই গদীতে বসতে দেবনা। আমাকে এখনই লরি বা বাস ধরে মোরটক্কাতে পৌঁছতে হবে, গদী সামলাতে হবে। তুমলোগ মুঝে মদৎ দেগা তো?

- আলবৎ জী।

- তব মেরা সাথমেঁ চলিয়ে।

আমাকে বলল - পথের চিহ্ন ধরে দু'মাইল হাঁটলেই আপনি লাখড়াকোটের মন্দির পাবেন। আমরা এখান থেকে মাইল তিনেক গেলেই কোরকাদের মহল্লায় পৌঁছব। সেখান থেকে লরী ধরব। আচ্ছা চলি।

নিজেদের সামান্য কিছু কাপড়, কম্বলের মধ্যে টাকার থলি এবং রূপার বাসন ভাল করে বেঁধে তারা তিনজন চলে গেল। শোভারামের স্বরূপ দেখে আমি আর একবার শিউরে উঠলাম। মনুষ্য চরিত্রের এই গহণ ও বীভৎস দিকটির সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় ঘটেনি। লোকটা কিভাবে এতকাল গুরুভক্ত সেজে কপট অভিনয় করে এসেছে। হয়ত ভারতের গুরুবর্গের শিষ্যসমাজে কোন কোন অভিসন্ধি পরায়ণ ধূর্তব্যক্তি এইরকমই বা শুধু গদ্দীর লোভে গুরুর কাছে পড়ে থাকে।

শিবনারায়ণী সম্প্রদায়ের 'কর্তাপুরুষের' এইরকম শোচনীয় পরিণতি মনকে নাড়া দিয়ে গেল। দুখীরামের বিকৃত মৃতদেহের দিকে তাকানো যাচ্ছেনা। চারিদিকে তাদের জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রইল, উপরে শকুনের দল চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একে একে পাথরের উপর বসছে। জঙ্গলঘেরা এই পার্বত্য প্রান্তরে শ্মশানের দৃশ্য।

আমি আর দাঁড়ালাম না, পথের দাগ ধরে পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম। অনুমান করলাম বেলা চারটা সাড়ে চারটা হবে। সন্ধ্যার আগেই লাখড়াকোটের মন্দিরে যাতে পৌঁছতে পারি, সেজন্য দ্রুত হাঁটতে চাইলাম, কিন্তু সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল ও অবশ বলে মনে হচ্ছে। বুঝলাম, নিজের চোখের সামনে যে করুণ ও রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে আমার স্নায়ুর উপর চোট পড়েছে। দু'তিন ঘন্টার মধ্যেই সুস্থ ও তাজা মানুষটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। কোন মতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটছি। খুব শীঘ্রই পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে পা দিলাম, সন্ধ্যা না হলেও বনের মধ্যস্থলে যেন আবছা গোধূলি। ঝোলা থেকে আমার ছোট টর্চটা বার করে হাতে রাখলাম। গোধূলির সময় যেমন পথঘাট আবছা দেখা যায় সেইরকম পথ-ঘাট এখনও বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি, শোভারাম বলেছিল সেই শ্মশান-প্রান্তর থেকে দু'মাইল হাঁটলেই লাখড়াকোটের মন্দির পাওয়া যাবে। প্রায় দুঘন্টা হাঁটা হয়ে গেল, এখনও কি দুমাইল হাঁটা হয়নি! তবে কি পথ ভুল করেছি! একথা মনে আসতেই ভয়ের সঞ্চার হল। বনের প্রান্ত থেকে নানা বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। টর্চ টিপে টিপে পথ দেখে, বড় বড় পাথরের চাঙড় ও ঝোপ এড়িয়ে সাধ্যমত জোরে হাঁটতে থাকলাম। এক একটা সেগুন গাছকে মনে হচ্ছে তারা যেন অশরীরী প্রেতাত্মা অন্ধকারময় আকাশে মাথা উঁচু করে শিকারের সন্ধানে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের ব্যাটারী শেষ হল। আমি আর অন্ধকারে এগোতে সাহস করলাম না। একটা সেগুন গাছের গোড়ায় পাথরের উপর গাঠরীটা ফেলে দিয়ে বসে পড়লাম। গাছে পিঠ ঠেকিয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করতে লাগলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, দুখীরামের রক্তাক্ত দেহ, সেই হলুদ বিদ্যুতের মত বাঘের ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্তজীকে পিঠে ফেলে নরখাদক হিংস্র বাঘের তড়িৎগতিতে পলায়ন ও হুঙ্কার, উফ্ বীভৎস! হতাশভাবে ভাবতে লাগলাম - আমার নিজের পরিণতিও আজ রাত্রে কি দুখীরামের মত হবে! না না তা কেন হবে, আমি সুমেরদাসজী প্রদত্ত মন্ত্রে লাঠি দিয়ে নিজের চারদিকে গণ্ডী টানলাম। মনে এল গায়ত্রী জপ করি। যার মধ্যে গায়ত্রী জাগ্রত, তার কখনও অপাঘাতে মৃত্যু হতে পারে না। এইরকম পরিণতি অদৃষ্টে থাকলে আমাকে বাবা কি নর্মদা পরিক্রমা করতে বলতেন! রাত্রি বাড়ছে, গভীর রাত্রে অরণ্যের ভাষা মুখর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই নানা শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগল। কোন রাতচরা পাখী ডেকে যাচ্ছে, মিষ্টি সুর। দূর থেকে জলের শব্দ ভেসে আসছে -এ কি কোন ঝরণা, নাকি নর্মদার স্রোতধ্বনি! উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম, মনে হচ্ছে যেন শব্দটা বাঁ দিক থেকে ভেসে আসছে। আশ্চর্য সারাদিন দেহে মনে এত পরিশ্রম হয়েছে, কিন্তু ঘুম আসছে না কেন! চোখ খোলা রেখেই আমি ধ্যানে ডুববার চেষ্টা করছি। এই অবস্থাতেই হয়ত আমি ক্ষণিকের জন্য তন্ময় বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, আমার অজ্ঞাতসারেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ চোখে আলোর আভাস জাগল, কেউ যেন বলছে - বাচ্চা রোতা হ্যায় কেঁও ? দেখো বেটি, এ লেড়কা পরিক্রমাবাসী হো। তাঁদের কণ্ঠস্বরে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলাম।

দেখলাম - প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রৌঢ় এক হাতে মশাল, কাঁধে বিশাল ধনুক, আর এক হাতে বল্লম নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; দৃঢ়িষ্ঠ পেশীবহুল কালো মজবুত শরীর, পরিধানে কৌপিন, পাশেই তাঁর অষ্টাদশী কন্যা, রুক্ষ্ম ধূসর আলুলায়িত চুল, বুকে হ্রস্ব ব্যাঘ্রচর্মের চোলি; নাভির নিচে খয়েরী রঙের খাটো ঘাঘরা, হাতের শক্ত কব্জিতে মোটা কঙ্কণ, পায়ে আরো মোটা ঝুড়িমল; তার পিঠে বাঁধা তূণে কুড়ি পঁচিশটা লম্বা লম্বা তীর, বাম হাতে বল্লম আর ডান হাতে প্রজ্বলিত মশাল।

পিতা পুত্রীর মধ্যে যে ভাষায় কথা হল তা আমার হৃদয়ঙ্গম হল না। প্রৌঢ় মানুষটি আমার হাত ধরে উঠিয়ে তাঁদেরকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে অনেকগুলি মশাল জ্বলছে দেখতে পেলাম। আশা ও আনন্দে আমার মন ভরে উঠল। পিতা পুত্রী সেই আলোর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা অন্য একটা দিকে বাঁক নিলেন। আমি দু'তিন মিনিট তাঁদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারা দ্রুত হাঁটছেন ঢালু পথে, তাঁদের হাতের মশাল দপদপ করে ওঠা নামা করছে। আমি মনে মনে বলছি ভগবান নর্মদেশ্বর, তোমার 'বিপদ বারণ' নাম সার্থক। মশালের আলো অদৃশ্য হল কিন্তু সেই পথ থেকে ভেসে এল উদাত্ত ধ্বনি - হর নর্মদে হর। ওই ত পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর। তাঁরা বোধহয় বিদায় জানিয়ে দূর থেকে সাহস দিচ্ছেন।

আমি মশালের আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগলাম, কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই জঙ্গলের মধ্যেই নর্মদার তীর ঘেঁসে একটা ফাঁকা জায়গায় দেখলাম বহু সাধুর ছাউনি। নাঁগা সাধু এবং কৌপীন বা অল্পমাত্র বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে কিছু ভীল জাতিয় লোক শুয়ে আছে। চারটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাঁবুর বাইরে শুয়ে আছেন অন্ততঃ একশ জন মানুষ। ছাউনির চারদিকে ঘিরে বড় বড় মশাল জ্বলছে। ধুনি জ্বেলে কয়েকজন নাগা বসে আছেন; হাতে তীর ধনুক নিয়ে প্রায় জনাদশেক ভীল চারদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে লম্বা লম্বা ত্রিশূল হাতে কয়েকজন দীর্ঘদেহী নাগাও আছেন। আমাকে দেখেই একজন ভীল এবং একজন ত্রিশূলধারী আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমাকে পরিক্রমাবাসী জেনে বললেন - রাত বারা বাজ গিয়া, আভি লেট জাইয়ে, সবেরে গুরুমহারাজ কা দর্শন মিলেগা। জান্ পহচান ভি আচ্ছি তরে হোঙ্গে। আমি লাখড়াকোটের মন্দিরটি কোথায় জানতে চাইলে হেসে বলতে লাগলেন - লাখড়াকোটকি মন্দর বহোৎ দূরমেঁ আপ্ ছোড়কে আয়া। ইহ্ হ্যায় ভেটাখেড়াকী জঙ্গল, সবেরে ইধরকা শিউজীকা দর্শন করেগা। আপ রাস্তা ভুল কিয়ে হোঙ্গে। এখানে কাছাকাছি কোন ভীল বা কোরকাদের মহল্লা আছে কিনা জানতে চাইলে বললেন - হম্ দো দফে পরিক্রমা কর চুকা, আচ্ছিতরেসে জানতা হুঁ সাত আট মিল কা অন্দর কোই মহল্লা নেহি হ্যায়। চারো তরফ জঙ্গল হৈ। তিনি এরপর জলের ড্রাম দেখিয়ে দিলেন। প্রায় চারটা বড় বড় ড্রামে জল ভর্তি আছে। আমি হাত পা ধুয়ে সারি সারি নিদ্রিত নাঁগাদের শয্যার একপাশে গাঁঠরী মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সমস্ত মাঠটায় সতরঞ্চি পাতাই আছে। ঘুম আসতে দেরী হলনা। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম ঠিক যেন সেই পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর - হর নর্মদে হর। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। পাশের এক নাগা বললেন - ক্যা হুয়া, লেট যাও, আভি সুবাহ্ হোনেমে দের হ্যায়। আবার শুয়ে পরলাম। আবার ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম, সেই ধ্বনি, পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর - হর নর্মদে হর।

যখন ঘুম ভাঙল উঠে দেখি জমায়েতের সাধুরা জেগে উঠেছেন। ভোর হয়ে গেছে। তাঁদের অধিকাংশই স্নান করে এসে গায়ে ভস্ম মাখছেন। মাথায় লম্বা বেণীর জটা খুলে তা শুকোবার জন্য ঝাড়ছেন, মুছছেন। তাঁবু থেকে দূরে দেখলাম ইতিমধ্যেই কয়েকটি চুল্লী জ্বেলে প্রায় দশবারোজন নাগা 'রোটি' বানাচ্ছেন। একজন নাগাকে নর্মদার ঘাটটা কোনদিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি একজন ভীলকে সঙ্গে দিলেন। একটু দূরেই নর্মদা, ঘাটের পাশেই মন্দির। আমি স্নান শৌচাদি সেরে মন্দিরে ঢুকে একটি কালো পাথরের উপর প্রায় তিনফুট লম্বা সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ দেখতে পেলাম। এ মন্দিরেও কোন দরজা নেই। আমি শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে এলাম।

একজন নাগা এসে আমাকে বললেন - মোহান্ত মহারাজ আপকো তলব কিয়া। আমাকে সঙ্গে করে তিনি একটি তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন। তাঁবুর মধ্যে জাজিম পাতা। একটা বড় রূপার ত্রিশূল দাঁড় করানো আছে। ত্রিশূলে একটি লম্বা জটা জড়ানো রয়েছে, জটার মুখটা একটা সাপের ফণার মত। তার পাশেই আছে একটা রূপার থালায় ভস্ম বা বিভূতির সঙ্গে গিরিমাটি মাখিয়ে এটা বড় গোলা, দেখতে একটা এক নম্বর ফুটবলের মত। তা আবার চন্দনলিপ্ত। থালাতে চার পাঁচটা সোনার গিনিসহ দশবারটা রৌপ্যমুদ্রা। ধূপ জ্বলছে। পাশেই ভগবান দত্তাত্রেয় অবধূতের বিবস্ত্র বেশ-এ এক বিশাল তৈলচিত্র।

আমার সঙ্গী নাঁগা তাঁবুতে ঢুকেই সেই বিভূতির গোলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। জোরে আওয়াজ দিলেন - গুরুজী, উহ্ বঙ্গালকা সাধুকো লে আয়া। তাঁবুর মধ্যেই একটা প্রকোষ্ঠ থেকে পক্ক জটার কুণ্ডলী মাথায়, এক দীর্ঘদেহী প্রায় সাড়ে ছয়ফুট লম্বা গৌরবর্ণ ভস্মলিপ্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাধু হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর কোমরে মোটা লোহার শিকল, শিকলে লোহার আংটা ঝুলিয়ে লিঙ্গকে বিদ্ধ করা আছে। প্রথম দর্শনেই 'রঘুবংশে' মহাকবি কালিদাস, মহারাজ দিলীপের যে অঙ্গ সৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন সেই শ্লোকটি মনে পড়ে গেল -

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রোধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥

দীর্ঘ সুঠাম বপু, প্রশস্ত ললাট, শালগাছের মত মহাবাহু, বক্ষস্থল বিশাল, বৃষস্কন্ধের তুল্য স্কন্ধ বিশিষ্ঠ এই সাধুর ভীমকান্ত দেহ দেখে মনে হল, মূর্তিমান ক্ষাত্রধর্ম যেন আত্মকর্মক্ষম দেহ নিয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম।

-বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে সুমেরদাসজী আপকা বারেমেঁ বহুত কুছ বাতায়া হৈ। উনোনে হমারা দোস্ত হৈ। অমরকন্টকসে লোটতে বখৎ হমলোগ জলেরীঘাটমে ছাউনি ফেলা থা। উনোনে আপকা দেখভাল করনেকে লিয়ে বহুত বিনতি কিয়ে থে। লেকিন আপকো দর্শন নহী মিলা। পরমাত্মা অন্তঃমে আপকো মিলা দিয়া। এহি জমাৎ কো আপ আপনা সমঝো। হমসে যো কুছ হো, সেবা করনেমেঁ তৈয়ার হুঁ। মালুম হুয়া, সুমেরদাসজী আপকো বহুৎ পেয়ার করতা হ্যায়। হমারা সংগত কো আপ বেদ শোনায়েগা। আপ বেফিকর রহো। চব্বিশ অবতার মেঁ হমারা আস্তানা হৈ। উধর যা কর্ হমলোগ পরিক্রমা সমাপ্ত করেঙ্গে।

তিনি আসন পরিগ্রহ করলেন। তাঁর এক শিষ্য এসে রূপার গ্লাসে এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন- ভাঙ হ্যায়। বিভূতি-নারায়ণকি পরসাদী।

বিভূতি-নারায়ণ বলতে তিনি শিব না নারায়ণকে বোঝাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারলামনা। আমাকে প্রশ্ন করতে হলনা. তিনি নিজেই বলতে লাগলেন - আমরা দত্তাত্রেয় ভগবান প্রবর্তিত নাঁগা। অবধূতজীর গায়ের ভস্ম আমাদের সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা ক্রমে রক্ষিত হয়ে আসছে। সেই ভস্ম দিয়েই ঐ গোলকটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যুগযুগ ধরে ঐ বিভূতি গোলাই উপাস্য দেবতা হিসেবে পূজিত হয়ে আসছে। ওঁকেই আমরা বলি বিভূতি নারায়ণ। আমাদের নাঁগারা যখন বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করতে যায় তখন এইরকম বিভূতি-নারায়ণ সঙ্গে থাকে। শহর ও গ্রামের ভক্তরা সেই বিভূতির গোলায় ভিক্ষা সমর্পণ করে। সাধারণত স্বর্ণমুদ্রা বা রজতমুদ্রা ছাড়া গোলার থালায় সরাসরি কাউকে ভিক্ষা দিতে দেওয়া হয়না। অন্যান্য ভিক্ষাসামগ্রী নাঁগারা ঝোলায় গ্রহণ করে। যারা বিভূতি - নারায়ণের থালায় ভিক্ষা দেবার সুযোগ পায়, ভগবান দত্তাত্রেয়ের আশীর্বাদে তাদের সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।

এইসময় দেখলাম, একে একে নাগারা এসে বিভূতি-নারায়ণের উপর নানারকম বনফুল দিয়ে পূজা করে মোহান্ত মহারাজকে প্রণাম করে যেতে লাগলেন।

আমি এক ফাঁকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম -আমি কাশীতে মহানির্বাণী মঠ এবং নিরঞ্জনী আখড়া দেখেছি। জুনা আখড়া ও নির্মলী আখড়ার নাগাদেরকেও দেখেছি। প্রত্যেক আখড়ার মধ্যে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও যেমন আছেন তেমনি বিবস্ত্র নাঁগাও আছেন। মুসলমানরা যখন হিন্দু যাত্রীদের উপর নানারকম অত্যাচার চালাত, তা রুখবার জন্য আচার্য মধুসূদন স্বরস্বতী ত্রিশূল ও তরবারিধারী একদল যুদ্ধবিশারদ নাঁগাদল সৃষ্টি করেছিলেন। আপনারা কি সেই নাঁগা সম্প্রদায়! না কি - নির্বানী বা নিরঞ্জনী আখড়ার শাখা ?

- আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি আমরা দত্তাত্রেয় অবধূতের শাখা। নির্বানী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাঁগারাও দত্তাত্রেয় ভগবানকে মানেন এবং আমাদের মতই বিভূতি-নারায়ণের পূজা করেন বটে; তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে পরস্পরের পূজিত বিভূতি নারায়নের shape এবং size-এ তফাৎ আছে। নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের নাঁগাদের গোলা আমাদের মতই গোলাকার, তবে আমাদের চেয়ে আকারে ছোট আর নির্বানী আখড়ার বিভূতি-নারায়ণের আকার চতুষ্কোণ। আমাদের সম্প্রদায়ের নাম 'নাগা পহুরে নাগফণী'। সম্পূর্ন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। নির্বানী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাঁগারা উগ্রস্বভাব, কলহপ্রিয়। তাঁরা জবরদস্তি ভিক্ষা আদায় করে। কিন্তু আমদের সম্প্রদায়ের নাগারা শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে তাঁদের জটারও তফাৎ আছে। জটা সাধারণতঃ তিনপ্রকার - নাগজটা, শম্ভুজটা এবং বারবান্। আমরা নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগা। আমার জটার দিকে লক্ষ্য করে দেখ, দড়ির মত পাকানো সর্পাকৃতির জটা আমরা ধারণ করি। যে জটা, এইরকমভাবে পাকান নয় তার নাম - শম্ভুজটা। শম্ভুজটা ছোট হলে তাকে বড়বান্ বলা হয়। নির্বানী, নিরঞ্জনী, নির্মলী এবং জুনা আখড়ার নাঁগারা শম্ভুজটা বা বারবানজটা ধারণ করে। আমাদেরকে আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়, তারপর সেইসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা কষ্টসহিষ্ণু ও তপস্বী স্বভাবের হন, তাঁরাই দীক্ষাগুরু ত্যাগ করে নাগাগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে নাগা হন। এই ব্যাপারটাকে আমরা গুরুপক্ষ ত্যাগ করে দেবপক্ষ গ্রহণ বলি। দেবপক্ষ গ্রহণ করার পর আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হতে হয়। সেই সময় উগ্র ঠাণ্ডা বা উগ্র গরমের মধ্যে একমাসকাল সম্পূর্ণ ফাঁকা মাঠে বাস করতে হয়। ঐ সময় কোনমতেই কোন মঠ, বাড়ী বা গুহাতে বাস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এই সময় একজন নাঁগা এসে মোহান্তজীকে পূজা করার সময় হয়েছে নিবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়ে সেই জটা-বেষ্টিত রূপার বিশাল ত্রিশূলটি কাঁধে নিয়ে নর্মদাঘাটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো তুরী, ভেরী, শিঙা বেজে উঠল। প্রায় পনেরজন নাঁগা তাঁর অনুগমন করলেন। আমিও কৌতূহলবশে তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। মোহান্তজী মন্দিরে ঢুকে তাঁর ত্রিশূলটি শিবলিঙ্গে স্পর্শ করে স্তব করতে শুরু করলেন। অপর নাঁগারাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই স্তব উদাত্তকণ্ঠে একই ছন্দে এবং সুরে গাইতে লাগলেন -

ওঁ কপর্দিন ! সর্বভূতেশ ! ভগনেত্রনিপাতন !
দেবদেব ! মহাদেব ! নীলগ্রীব ! জটাধর !
কারণানামপি পরং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভুম্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব ! তৎপ্রসূতমিদং জগৎ ॥
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সদেবাসুরমানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিভদ্রায় বৈ নমঃ ॥
ললাটাক্ষায় শর্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে।
পিণাকগোপ্ত্রে সূর্যায় মঙ্গল্যায় চ বেধসে ॥
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্। সর্বভূতমহেশ্বর।
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণ কারণং ॥
প্রধান পুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্।
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্। ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর!
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোহহম্মীমং মহাগিরিম্
দয়িতং তব দেবেশ। তাপসালয়মুত্তমম্ ॥
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ ! সর্বলোক নমস্কৃতম্।
ন মে স্যাদপরাধোহয়ং মহাদেবাতিসাহসাৎ ॥
কৃতো ময়া যাদজ্ঞানাদ্বিমর্দ্দোহয়ং ত্বয়া সহ
শরণং সম্প্রপন্নায় তৎ ক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর ॥

অর্থাৎ হে মহাদেব! তুমি জটাজুটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দিয়ে তুমি মদনকে ভস্ম করেছ হে নীলকণ্ঠ! তুমি দেবতাদেরও দেবতা। আমি জানি তুমি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন সর্বব্যাপক, দেবগণেরও গতি এবং এই জগৎ তোমারই সৃষ্টি।

দেবদানব মনুষ্য সমন্বিত হে অজেয় পুরুষ! তুমি একাধারে বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণু; দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী হে বীরভদ্র! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি ললাটনেত্র অর্থাৎ মহাযোগীদের ধ্যানলভ্য তৃতীয় নেত্রস্বরূপ, জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, শূলপাণি, পিনাকধনুর্ধারী, সূর্যস্বরূপ, মঙ্গলময় এবং বিধাতা। তোমাকে পুনরায় প্রণাম করি।

ভগবন্! মহেশ্বর! তুমি প্রমথদের অধিপতি, জগতের মঙ্গলবিধানকারী; সৃষ্টিকর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি পুরুষের অতীত; শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, পরমসূক্ষ্ম তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ, হে দয়াল! তুমি প্রসন্ন হও; আমি যে অপরাধ করেছি, তা নিজগুণে ক্ষমা কর। দেবাদিদেব! আমি তোমারই দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে তপস্বীদের উত্তম আশ্রয় তোমার প্রীতিপদ এই মহাপর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভগবন্! তুমি সমগ্র জগতের দ্বারা নমস্কৃত পুরুষ, তুমি কৃপা কর, প্রসন্ন হও, আমি যে তোমার দর্শন লাভের জন্য দুঃসাহস দেখিয়েছি, তাতে আমার কোন অপরাধ নিওনা প্রভু।

আমি তোমার শরণাগত। সুতরাং আমি যে সংঘর্ষ করেছি অর্থাৎ যে পথে ইষ্টসিদ্ধি হয়, সে পথে না গিয়ে বিপরীত মার্গে এতকাল ভ্রমণ করেছি, তার জন্য আমার অপরাধ মার্জনা কর, ক্ষমা কর।

স্তবপাঠ শেষ হলে মোহান্তজী নতমস্তকে দু'মিনিটকাল দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে। নাঁগা ভক্তরা জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন -

হর নর্মদে হর। নর্মদা মাতাকী জয় হো।
বিভূতি-নারায়ণকী জয় হো॥
নর্মদাতটবাসী সাধুয়োঁকী জয় হো।
বিশ্বকী কল্যাণ হো॥

এই বিচিত্র পদ্ধতিতে পূজা শেষ করে মোহান্ত মহারাজ সেই নাগজটা সমন্বিত ত্রিশূলটি কাঁধে নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরলেন। আমাকে মৃদু কণ্ঠে জানালেন - এই যে স্তব শুনলে এইটি সিদ্ধমন্ত্র।

অর্জুন হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়ে ইন্দ্রকাল পর্বতে যখন কিরাতবেশী মহাদেবের দর্শন পান, তখন তিনি এই স্তবেই ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। মহাদেব তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে দিব্য পাশুপত অস্ত্র দান করেছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে এই মন্ত্র পাবে। ভগবান দত্তাত্রেয় আমাদের নাগফণী সম্প্রদায়ে এই স্তবের প্রবর্তন করে গেছেন। নির্বাণী নিরঞ্জনী প্রভৃতি নাঁগাদের আখড়ায় এই স্তব পাঠের প্রচলন নেই। এইটি আমাদের সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই মন্ত্র তেজ-বীর্যের সাধনা, অর্জুন যেমন সিদ্ধকাম হয়েছিলেন, তেমনি সকলের পক্ষেই এই মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ।

তাঁবুতে ফিরে আসতেই ভোজন পর্ব সুরু হল। রুটি পুরী ঘৃতসিক্ত অড়হর ডাল, কড়াই প্রসাদ প্রভৃতি এই ভোজন তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভোজনের শেষে মোহান্ত মহারাজ হুকুম দিলেন - কৌপীন বাঁধো, ছাউনি উঠাও। সঙ্গে সঙ্গে সেনা তৎপরতায় তাঁবুর অসবাবপত্র বাঁধা সুরু হয়ে গেল, সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এক টুকরো করে কৌপীন কোমরে জড়িয়ে ফেললেন। পথে চলার সময় নাঁগা সাধুরা মন্ত্রপাঠ করে এই কৌপীন পরেন। মন্ত্রটি হল -

ওঁ গুরুজী বন্ধকর, বন্ধকর, বজ্রকর বজ্রকর।
না মরে যোগী না পড়ে ফন্দ, চৌষট্‌ যোগিনী খেলৈ ছন্দ।
সাতকা ধাগা সন্তোষকী কৌপীন, নাগা-পহরে নাগফণী হনুমান বাঁধে লেঙ্গোটি।
বালগোপাল কৌপীন্ বাঁধে অনন্তকোট্‌ সিদ্ধাকী ওট্‌॥

শিঙা ভেরী ও তুরী বাজাতে বাজাতে যাত্রা সুরু হয়ে গেল। প্রায় দেড়শ নাঁগা সাধুর সঙ্গে পঞ্চাশ জন ভীল কুলি। যখন লাইন দিয়ে সবাই কৌপীন বাঁধেন তখন গুনেছিলাম প্রায় ত্রিশ জনের কোমরে মোহান্তজীর মত মোটা শিকল এবং একই রকম ভাবে লোহার আংটায় লিঙ্গ বিদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক নাঁগাসাধুই দীর্ঘদেহী, প্রত্যেকের হাতেই চিমটা ও বড় ত্রিশূল; প্রত্যেকেরই মাথায় বড় বড় জটাকে কুণ্ডলী করে জড়ানো আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে নর্মদাতটে পুরো একটা রেজিমেন্ট চলেছে অভিযানে। নর্মদার তট ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে, সেগুন, বুনোনিম, অগস্তি গাছের জঙ্গল, সেই একই রকম পাথরের চাঙড়। বেলা বারটায় আমরা যাত্রা করেছিলাম, বেলা তিনটার সময় আমরা সাকলখেড়া নামক একটা জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। বড় বড় গাছ, নানা রকম কাঁটা ঝোপ ও লতা পাতা এমন জড়াজড়ি করে আছে যে সূর্যের আলো খুব ক্ষীণভাবে সেখানে ঢুকছে। এই ঘন বনে ঢুকবার আগে একজন প্রবীণ নাঁগা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলেন - হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। একসঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা তুরী ভেরী শিঙা বেজে উঠল। একদল বুনো কুকুর এবং শেয়ালের ডাক শোনা গেল। তুরী ভেরীর আওয়াজ ছাপিয়ে বহুদূর হতে ভেসে এল বাঘের গর্জন। বাঘ দূরেই থাক আর

যাই হোক, এই জঙ্গলকে তো আর লাখড়াকোটের জঙ্গলের মত অন্ধকারময় এবং দুস্প্রবেশ্য বলে মনে হচ্ছে না। এখানে জঙ্গল যতই ঘন হোক না কেন, এখানে তো আলোর আভাস জেগে রয়েছে। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর ঐ ঘন বনটা পেরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত পাতলা বনে ঢুকলাম। এখানে দেখছি ময়ূরেরই রাজত্ব। এত মানুষের পদশব্দ এবং চিমটার আওয়াজে ময়ূর ও অন্যান্য পাখীরা ভয় পেয়ে উড়ে পালাতে লাগল। একটু পরেই ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়লাম। কোমরের শেকলে ঝোলানো একটি সোনার পকেটঘড়ি দেখে মোহান্তজী বলে উঠলেন - ছ' বাজনেসে ঔর পন্দর মিনট্ বাকী হ্যায়। আভী বস্ করোজী, আজ রাতমেঁ ইধরই ঠারেঙ্গে। সবেরে পাঁচ মিল জানেসে পেমগড়মেঁ পোঁছ জাবেগা। আভি রুকো। মোহান্তজীর হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ও কাঁধের বোঝা ফেলে সেই পার্বত্য প্রান্তরে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। মোহান্ত মহারাজ কোন তাঁবু খাটাতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ চৈত্রমাস শেষ হয়ে আসছে, গরম পড়েছে, সেই ফাঁকা প্রান্তরে সবার সঙ্গে তিনিও শুয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু কয়েকজন প্রবীণ নাগা সাধু তা হতে দিলেন না। শুধু তাঁর জন্যই একটি তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুর মধ্যে কেবল সেই ত্রিশূল ও বিভূতি-নারায়ণ তথা ভস্মের গোলাসহ মোহান্তজীর শোবার ব্যবস্থা হল। কয়েকজন ভীল কুড়ুল টাঙি দিয়ে সেগুন গাছের ডাল কেটে চারদিকে সেগুলি পুঁতে দিয়ে মশাল বানিয়ে জ্বালালো। আমি কয়েকজন নাগার সঙ্গে গিয়ে নর্মদাতে স্নান করে এলাম। বড় সতরঞ্চি পেতে যে যার আসন পাতলেন, আমিও আসন বিছালাম। আধঘন্টা ধরে শিঙা ও ভেড়ী বাজিয়ে বিভূতি-নারায়ণের আরতি ও স্তব করা হল। মোহান্ত মহারাজ তাঁবুর ভেতরে ঢুকে যেতেই গাঁজার আসর বসে গেল। প্রতি প্রহরে চারজন করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে পাহারাদাররা ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়লেন।

বিজন কান্তারে মুক্ত আকাশের তলায় এইরকমভাবে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা পরিক্রমাকালে এই প্রথম হল। এতদিন যে পরিক্রমা করছি, প্রায় সবদিনই নর্মদাতটের কোন না কোন শিবমন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি। শুয়ে শুয়ে আকাশের তারার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলাম। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে বিচার করতে লাগলাম যে বৈদিককাল হতে এই যে নর্মদা-তপস্যার কথা চলে আসছে, এ কি শুধু একটি বিশিষ্ট জলধারার গতিপথকে তার উৎপত্তিস্থল হতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত কোনমতে পরিক্রমা মাত্র ? না - এর মধ্যে তপস্যারও কিছু আছে ? পরিক্রমাবাসীদের জপ্ তপ্ ও বিভিন্ন সাধুসঙ্গ ও নূতন নূতন জ্ঞানলাভ ছাড়াও পরিক্রমায় যে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে পড়ে স্বতঃই সম্ দম্ ত্যাগ তিতিক্ষা, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রতিপদে যে ঈশ্বর নির্ভরতা বাড়ছে, সঙ্কটকালে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ছি, নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবছি, তখন যেভাবে আচম্বিতে অভাবনীয়ভাবে রক্ষা পাচ্ছি, হঠাৎ যেভাবে দরদী সঙ্গী সাথী জুটে যাচ্ছেন, তাতে স্পষ্টতই মনে হচ্ছে কেউ যেন আড়াল থেকে রক্ষা করছেন। যেহেতু নর্মদা পরিক্রমা করছি, তাই যেন কেবলই মনে হচ্ছে নর্মদামাতা রক্ষা করছেন, নর্মদেশ্বর শিব রক্ষা করছেন। এই শরণাগতির ভাবটাই এই তপস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

কিছুক্ষণ বসে জপ করলাম, তারপর কখন যে শুয়েছি আর ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। স্বপ্ন দেখছি, আমার শিয়রের কাছেই একটা তুবড়ীর আলোর মত আলো জ্বলে উঠল। আলোর ঝরণা ক্রমে উর্ধ্বগামী হচ্ছে, আলোর ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে আমার মাথায়, কপালে, নাকে, মুখে, বুকে, নাভিতে। ফোঁটাগুলো নিভছে না, আমার সারা শরীরের উপর আলোর ফুল ফুটে উঠেছে যেন। আলোর শিখা আরও উর্ধ্বগামী হচ্ছে, আকাশ ভেদ করে উঠে যাচ্ছে সেই শিখা। তুবড়ীটা হঠাৎ যেন ফেটে গেল প্রচণ্ড শব্দে। লক্ষ যোজন দূরে আকাশের অনেক অনেক উপরে শোনা যাচ্ছে - ওঁ ওঁ ওঁ।

আমি জেগে উঠলাম, কিন্তু চোখ খুলতে পারছিনা। অনেক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাতে পারলাম। পূব আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢেকে থাকলেও বুঝতে পারলাম ভোর হয়ে আসছে, উঠে বসলাম।

পাহারাদার বদল হয়েছে। তাঁরা ত্রিশূল হাতে ধীরে ধীরে পায়চারী করছেন। বনের মধ্যে বনমোরগ ডেকে উঠল। হঠাৎ বনের মধ্যে শব্দ তুলে কয়েকটা বন্য জন্তু দৌড়ে গেল যেন। মুহূর্তের মধ্যে চারজন নাঁগার হাতে চারটা বড় বড় টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম সাত-আটটা নেকড়ে আমাদের ঘিরে ধরেছে, তাদের হিংস্র চোখগুলো জ্বলছে। কেবল মশালের আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে বলে তারা কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস করেনি। পলকের মধ্যে দুজন ভীল নেকড়ের দিকে সাঁই সাঁই শব্দে তীর ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তন্দুর বিষ মাখানো তীর গিয়ে দুটো নেকড়ের গায়ে বিঁধল। গোঁ গোঁ করে আর্তনাদ করতে লাগল নেকড়েদুটো আর বাকিগুলো হুড়মুড় করে দৌড়ে পালাল। মোহান্তজী তাঁবুর মধ্য থেকে হাঁক পাড়লেন - ক্যা হুয়া ?

একজন নাঁগা উত্তর দিলেন - হুড়াল বা।

একে একে সবাই জেগে উঠলেন। তুরী, ভেরী, শিঙা বেজে উঠল। এবার মঙ্গল আরতি হবে বিভূতি-নারায়ণের। আরতির পর সবাই প্রাতঃকৃত্য করতে গেলেন। যাত্রদলের সাথে যেমন নানা আকৃতির বাক্স থাকে সেরকম বাক্স পেঁটরা প্রচুর আছে যেগুলি গতকাল থেকেই বাঁধা ও গুছানো আছে। তাঁবু গুটিয়ে সতরঞ্চি প্রভৃতি বাঁধা হয়ে গেল। সকাল সাতটা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হল। আবার সেই রকম তুরী, ভেরী আর শিঙার আওয়াজের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ সৈন্যদের মতই মার্চ করে চললেন দুর্ধর্ষ নাঁগাসাধুর দল। প্রায় পাঁচশ গজ হাঁটার পর একজন ভীল দেখতে পেল সেই তীরবিদ্ধ নেকড়ে দুটো একটু দূরে পাথরের গায়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। মারাত্মক তন্দুর বিষের জ্বালা সহ্য করেও এই দুটো প্রাণী এতদূর দৌড়ে আসতে পেরেছিল এটাই আশ্চর্য। দুদিন আগে লাখড়াকোটের প্রান্তরে দেখে এসেছি, দুখীরামের রক্তাক্ত মৃতদেহ, এখানে ভেটোখেড়ার জঙ্গল পেরিয়ে দেখতে পেলাম তীরবিদ্ধ দুটো নেকড়ের মৃতদেহ। নিরীহ দুখীরামকে হত্যা করেছিল রক্তখেকো বাঘ আর এখানে রক্তখেকো নেকড়েকে খতম করেছে মানুষ। প্রকৃতির রাজ্যেও প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে - এ যুগের ঋষিপ্রতিম এই উপলব্ধি সর্বৈব সত্য।

এবারে জঙ্গলের মধ্যে চড়াই শুরু হল। আমাদের জমায়েৎ ধীরে ধীরে চড়াই-এর পথে উঠে এল নর্মদার জলস্রোত থেকে প্রায় পাঁচ-ছশ ফুট উঁচু দিয়ে আমরা চলেছি। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। নিচের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নর্মদাকে দেখতে হচ্ছে। একপাল নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের পথের প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচ দিয়ে একদল বন্য বরাহ দৌড়ে গেল। নাঁগারা শিঙা ও ভেরীর আওয়াজ তুললেন। সেই শব্দে বরাহগুলো পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পালাল। পরিক্রমাকারী নাঁগারা জানেন কোথায় নীরবে কোথায় সরবে হাঁটতে হবে। চড়াই পথে প্রায় আধাঘন্টা হাঁটার পর উৎরাই শুরু হল। ক্রমে নামতে নামতে আমরা নর্মদার সন্নিকটস্থ পার্বত্যপথে এসে পৌঁছলাম। এখানেই আমরা দেখতে পেলাম একপাল কৃষ্ণসার মৃগ। নর্মদার বিস্তার যেন ক্রমেই বাড়ছে। বেলা সাড়ে নটায় আমরা পেমগড় এসে পৌঁছে গেলাম। তটের ধারেই বিশাল শিবমন্দির। মন্দিরের পেছনেই বিশাল প্রান্তর। সেগুন, সাজা, বেল ও নিমগাছ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এখানে কিছুকাল আগে বোধহয় কোন বড় জমায়েৎ এসে ছাউনী ফেলেছিল। যত্রতত্র নিভে যাওয়া ধূনির চিহ্ন, ছাই আর আধপোড়া কাঠ পড়ে আছে। মোহান্তজী জানালেন - আজ ঔর কাল দো-রোজ হমলোগ ইধরই ঠারেঙ্গে। আচ্ছিতরেসে ইন্তেজাম করো। কাল গুরুজীকা জনম তিথি হ্যায়। ইহ্ পেমগড়মেঁ প্রেমিকপুরুষ কা পূজা করনেসে আচ্ছাই হোগা। এইবলে তিনি একজন নাঁগাকে কাছে ডেকে বললেন - ক্যা কোঠারীজী, আপকা পাশ জো সামান হ্যায়, উসিমেঁ দো-রোজ চলেগা ? নেহি ত সদাবর্তসে মাঙ্গবানা হোগা। কোঠরী অর্থাৎ তাঁর আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ জানালেন - ভগবন্! আপকা জমাৎমেঁ কোঈ চিজ্ কা কমি নেহি হ্যায়, সদাবর্তসে কোঈ চিজ্ লেনেকা জরুরৎ নেহি। দো রোজকা বাদ হমলোগ্ ত চব্বিশ অবতারমেঁ আপনা আস্থানমেঁ পৌঁছ যাবেগা। এঁদের কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য নাগারা বসে নেই, তাঁবু খাটানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। রান্না, কাঠ কাটা, ধূনির ব্যবস্থা, তাঁবু খাটানো, সতরঞ্চি পাতা, জল আনা, পূজার ফুল সংগ্রহ - প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্ব এক এক দলের উপর সুষমভাবে ন্যস্ত আছে বলে এরা সব কাজ তৎপরতার সঙ্গে অতি দ্রুত সেরে ফেলতে পারেন। চোখের সামনে এক ঘন্টার মধ্যে সব সাজানো গোছানো হয়ে গেল।

আমি মোহান্তজীর অনুমতি নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। একে একে নাগারাও এসে স্নান ও মন্ত্রপাঠ করে গেলেন। মন্দিরে দেখলাম দশ-বারোজন লোক পূজা করতে এসেছেন। এখানে সদাবর্ত আছে, আগেই শুনেছি, এই লোকগুলিকে দেখে বুঝলাম - এ অঞ্চল জনশূন্য নয়। স্নান-তর্পণাদি সেরে মন্দিরে পূজা করতে ঢুকলাম। প্রায় তিনফুট উঁচু সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ। যাঁরা পূজার্থী, তাঁদের মধ্যে একজন জানালেন - মহাদেওজীকা নাম পেমেশ্বর অর্থাৎ প্রেমেশ্বর বা পরমেশ্বর। প্রাণভরে পূজা জপ্ সেরে ফিরে আসব ভাবছি, এমন সময় শিঙা ভেরী বেজে উঠল, বুঝলাম মোহান্তজী আসছেন পূজা করতে। সেই নাগফণী জড়িত রূপার ত্রিশূলটি নিয়ে মোহান্তজী সেই একই পদ্ধতিতে শিবলিঙ্গে ত্রিশূল ঠেকিয়ে মহাভারতোক্ত সেই অর্জুনকৃত শিবস্তব পাঠ করলেন। মোহান্তজীর সঙ্গেই ফিরে এলাম। রন্ধনপর্ব চলছে, খেতে দেরী হবে, তাই ভাঙ-এর সরবত সকলেই খাচ্ছেন। দশজন নাঁগা সিদ্ধি বেটে সরবৎ বানাতে ব্যস্ত। মোহান্তজী তাঁবুর ভেতরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সিদ্ধি খেতে রাজী না হওয়ায় তিনি আমাকে লাড্ডু দিলেন, বললেন - সুমেরদাসজী পঁহুচে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়। হমলোগ অলগ্ অলগ্ সম্প্রদায় কি হ্যায়, লেকিন দোনো দোস্ত একই গাঁওমে পয়দা হুয়া। উনকা পাশ আপনে দীকছা লিয়া ?

আমি বললাম- আমার বাবাই আমার দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং ইষ্টদেবতা। ১৯৪৯ সালে আমি বাবার হুকুমে অমরকণ্টক যাই, তখন বিলাসপুরে নেমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেই থেকে তিনি আমাকে স্নেহ করেন। তাঁর এই অহৈতুকী ভালবাসার কারণ আমার জানা নেই।

- তুমি আসন মুদ্রা যোগক্রিয়াদি জান কি ? নৌলী, ধৌতি, কপালভাতি, যোনিমুদ্রা, মহামুদ্রাদি হঠযোগের প্রক্রিয়া না জানলে যোগে উন্নতি করা যায়না। বিশেষতঃ সমাধিলাভ করতে হলে খেচরীমুদ্রা আয়ত্ত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই বলে তিনি একজন নাঁগাকে ডেকে খেচরীমুদ্রা দেখাতে বললেন। সেই নাঁগা তাঁর জিহ্বা কণ্ঠকূপের মধ্যে আলজিহ্বার উপর দিয়ে চালিয়ে হাঁ করে দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিহ্বার ঐ অবস্থা স্বাভাবিকভাবে ধ্যান বা মন্ত্র জপের দ্বারা হয়েছে? নাকি - মর্দন, দোহন, ছেদনাদি দ্বারা বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে হয়েছে।

- খেচরীমুদ্রায় সিদ্ধ হতে হলে ছেদন, দোহন ও মর্দনক্রিয়া অপরিহার্য। যোগশাস্ত্রে আছে -

জিহ্বাধো নাড়ীং সংছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রণ কর্ষয়েৎ ॥
এবং নিত্যং সমব্যাসাল্লাম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।
যাবদগচ্ছেৎ ভ্রূবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতি খেচরী ॥

অর্থাৎ জিহ্বার নিম্নভাগের সঙ্গে মুখগহ্বরের মধ্যে নিচের দিকে যে শিরা সংলগ্ন আছে তা ছেদন করে জিহ্বার অগ্রভাগকে চালনা করতে হবে। জিহ্বাকে প্রতিদিন ননীমাখন দিয়ে দোহন করে লৌহযন্ত্র দ্বারা কর্ষণ করতে হয়। কিছুদিন এইভাবে করতে করতেই জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়ে যাবে। যখন দেখা যাবে যে জিহ্বা ভ্রূমধ্যস্থান স্পর্শ করতে পারছে, তখন ঐ জিহ্বাকে তালুর মধ্যপথে ঊর্ধ্বদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করিয়ে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করতে হয়। এর নাম খেচরী মুদ্রা। খেচরী মুদ্রায় ভালভাবে অভ্যস্ত হলে তবেই সাধকের নাদযোগ সমাধি অভ্যাসের অধিকার জন্মে।

মোহান্তজী খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে খেচরী মুদ্রার প্রশংসায় আরও বলতে লাগলেন - ভগবান দত্তাত্রেয় রচিত দত্তাত্রেয় সংহিতা ছাড়া শিবসংহিতাতেও খেচরীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে -

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্ধ্বেষু গর্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্ ॥

যোগী ব্যক্তি জিহ্বাকে বিপরীতগামী করে লম্বিকার অর্থাৎ আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্ত তালুকুহরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐস্থানে জিহ্বাকে স্থির রেখে ধ্যান করতে থাকবেন, তাতে সকল রকম কর্মবন্ধনের ভয় দূর হয়। ঐ ধ্যান পরিপক্ক হলে, প্রগাঢ় ধ্যানের অবস্থায় সহস্রার চক্রক্ষরিত সুধা বা মধুক্ষরণ হতে থাকে, সেই সুধাপান করলে শরীর রোগহীন হয়, অতীন্দ্রিয় জগতের অনেক অলৌকিক দৃশ্যের দর্শন ঘটে। আমাদের নাগফণী

সম্প্রদায়ের সাধকদেরকে প্রথমে নৌলি, ধৌতি, কপালভাতি প্রাণায়াম ও যোনিমুদ্রা, মহামুদ্রাদির শিক্ষা দিই। দ্বিতীয় স্তরে তাদেরকে খেচরী মুদ্রার কৌশল শেখাই। এই দুটি স্তর অতিক্রম করলে ভগবান দত্তাত্রেয় কথিত তৃতীয় ক্রিয়ার ধ্যানকৌশল শিক্ষা করতে হয়। সেই ধ্যানকৌশল হল -

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাৎ বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ ॥

অর্থাৎ সাধ যদি শিবনেত্র হয়ে অর্থাৎ দুটো চোখের তারাকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত দিব্য জ্যোতির্ময় অন্তরাত্মার ভাবনা করেন, তাহলে বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হয়। ব্রহ্মজ্যোতি প্রত্যক্ষ হলে আর কি কোন সাধনা বাকী থাকে!

এবার তুমি বল, তোমার বাবার কাছে তুমি কি উপদেশ পেয়েছ ? তিনি কি তোমাকে খেচরী মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলেননি ? তাঁর এতগুলি বাণী বচনের উত্তরে বললাম - জিহ্বার শিরাছেদন, জিহ্বাকে দোহন মর্দন আকর্ষণ করে যেভাবে যোগীসমাজে জিহ্বাকে খেচরী মুদ্রার উপযোগী করা হয়, এই কৃত্রিম পদ্ধতিকে বাবা আদৌ পছন্দ করতেন না, এ বিষয়ে বরং তাঁর স্পষ্ট নিষেধবাক্য আছে। ঐসব ক্রিয়া-কসরৎ এর চেয়ে 'ক্রিয়াযোগ' প্রবর্তক কাশীর সুপ্রসিদ্ধ যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী যেভাবে খেচরী মুদ্রার কৌশল শিখিয়ে গিয়েছেন, সেই ক্রিয়াকে তিনি সহজতর নিরাপদ পদ্ধতি বলে ভাবতেন।

মোহান্তজী - সেই পদ্ধতিটি জানতে পারি কি ?

আমি বললাম - যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীজীও খেচরী মুদ্রার জন্য ছেদন দোহনাদির বিষম বিপক্ষে ছিলেন। তালুতে জিহ্বার অগ্রভাগ বিপরীতভাবে ঠেকিয়ে টাকরায় মৃদুভাবে তালে তালে ঠোক্কর মারতে থাকলে কিছুদিন পরে জিহ্বা স্বতঃই তালুকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বর্তমানে ক্রিয়াযোগী সম্প্রদায়ে এই মূল পদ্ধতির বিকৃতি ঘটেছে। তাঁদের দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ গুরুবর্গ পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বাকে বিপরীতগামী করে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে বলেন। তাতেও দীর্ঘকাল অভ্যাসের পর জিহ্বা তালু কুহরে প্রবেশ করে সন্দেহ নেই;
কিন্তু যোগীরাজ প্রবর্তিত মূল পদ্ধতি হতে তা ভিন্ন। লাহিড়ী মহাশয় যে পদ্ধতির উপদেশ দিতেন, তার নাম তালব্যমুদ্রা। তিনি রহস্য করে বলতেন ঠোক্করের ক্রিয়া।

মোহান্তজী - লাহিড়ীজী কি বলতেন সেকথা থাক। তোমার বাবা কোন পদ্ধতিতে খেচরী করতেন তা আমাকে বল।

আমি - আমার বাবা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বেদপন্থী। বৈদিক ঋষিদের আচরিত মার্গই ছিল তাঁর সাধ্যসাধন তত্ত্ব। ঋগ্বেদের একটি বিশেষ মন্ত্র আছে। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বার অগ্রভাগ উলটিয়ে তালুতে ঠেকিয়ে সেই সিদ্ধ বেদমন্ত্র ছন্দানুসারে উচ্চারণ করতে থাকলে, সেই মন্ত্রের এমনই বর্ণবিন্যাস যে তা উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেই প্রতি বর্ণের উদ্ঘাৎ ও স্পন্দন অভ্যাসকালের মধ্যেই জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য করে। বেদে কুত্রাপি 'খেচরী' শব্দের উল্লেখ নেই, বৈদিক ঋষিরা নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বমিৎ'। বেদোক্ত সেই বিশ্বমিৎ ক্রিয়াকেই বাবা খেচরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলতেন। এই বাহ্য অর্থাৎ কোনপ্রকার ক্রিয়া কসরৎ করে জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবেশ করানোকে বাবা 'খেচরী' হিসেবে স্বীকারই করতেন না। তিনি বলতেন - খেচরীর অর্থ 'খ' তে বিচরণ করা। 'খ' এর অর্থ আকাশ। আকাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে 'কাশৃ' ধাতু থেকে। কাশৃ ধাতু দীপ্তৌ। কাজেই আকাশ অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে তা সম্ভব হয়। প্রভুর জন্য যদি প্রাণে আর্তি থাকে শরণাগতির ভাব নিয়ে বুকভরা কান্না নিয়ে ধ্যান করতে থাকলে নিবিড় ধ্যানে প্রভুর দর্শন মেলে। প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় জিহ্বা স্বতঃই বিপরীতগামী হয়ে যায়। ধ্যান ভাঙলে সাধক অনুভব করতে পারেন দিব্যানুভূতির কালে বিনা চেষ্টায়, বিনা কসরতেই তাঁর জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট ছিল। শিবনেত্র হয়ে চোখের তারা দুটোকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার জ্যোতির্ময় রূপ কল্পনা করতে করতে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে থাকে, বাবার ভাষ্যানুসারে সে জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির আভাস হতে পারে, সর্বাংশে তাকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলা যাবেনা। 'কান্না' শব্দের অর্থ বাবা করতেন - কেঁদে আনা।

সাধকের আকুতি এবং আশুতোষের কৃপা - এই হল ব্রহ্মানন্দের মূল কথা। বাবা বারবার আমাদেরকে একজন মুসলমান সুফী সাধকের একটি উক্তি শোনাতেন - 'রোবে ত রব পাবে'। ফারসী ভাষায় 'রব' মানে পরমেশ্বর বা আল্লাহ্। 'রোবে' অর্থ কাঁদবে। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বাবার মতে ব্রহ্ম কোনমতেই কোন ক্রিয়া সাপেক্ষ বস্তু নন। খেচরীমুদ্রা সাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া কসরতেই তাঁকে প্রকট করা যায়না। ব্রহ্ম নিজেই প্রকটিত হন।
চোখ কান মুখ টিপে খেচরী বা শাম্ভবী দ্বারা সাময়িকভাবে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে সে জ্যোতিকে দিব্যজ্যোতি বলে না। বাবার মতে -

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশিতম্।
অকস্মাদ্ দৃশ্যতে জ্যোতিস্তৎ জ্যোতিঃ পরমাত্মনি॥ (যোগসন্ধ্যা)

অর্থাৎ যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায় সেই জ্যোতি পরমাত্মায় অবস্থিত বলে জানবে। সেই দিব্যজ্যোতিই যথার্থতঃ - ব্রহ্মজ্যোতিঃ।

মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখে মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন পরিস্ফুট। তিনি হয়ত আমাকে কিছু বলতেন, কিন্তু তার আর সুযোগ পেলেন না। তাঁবুর বাইরে সহসা সোরগোল উঠল - হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! একসঙ্গে শিঙা, তুরী, ভেরী বেজে উঠল, দাপাদাপি দৌড়াদৌড়ির সঙ্গে গোঁ গোঁ ফোঁস ফোঁস ক্রুদ্ধ গর্জন। দুজনেই তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি তাঁবু থেকে প্রায় একশ হাত দূরে একদল বুনো মহিষ এসে ফোঁস ফোঁস করছে। নাগা ও ভীলরা পাথর ছুঁড়ছে, কয়েকটা জ্বলন্ত মশালও মোষগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারা হল। তবু কোন কাজ হচ্ছেনা। ক্রমাগত পাথর বৃষ্টি এবং মশালের ছেঁকা উপেক্ষা করে তারা ক্রুদ্ধ আবেগে তেড়ে ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে চায়। মোহান্তজী একজন নাগাকে ডেকে বললেন আরে সেবাদাস মশাল কি খেল খেলো। মোহান্তজীর নির্দেশ পেয়ে সেবাদাস দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি একটা প্রায় সাতফুট লম্বা লাঠির দু'দিকে মশাল জ্বালিয়ে ওস্তাদ লাঠিয়ালের মত সেই অগ্নিদণ্ড মহিষদের সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। পাথর ছোঁড়া বন্ধ করা হল। সেই ঘূর্ণায়মান অগ্নিগোলকের চক্র দেখে মহিষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোষগুলোর গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তবুও তারা রণে ভঙ্গ দেয়নি, কিন্তু অগ্নিচক্র দেখে তারা বনের মধ্যে পালাতে লাগল। পশু-মানুষের এই তাণ্ডবযুদ্ধ থামল।

প্রায় আড়াইটা নাগাদ ভোজনপর্ব সমাধা হল। এখন বিশ্রাম। বেলা পাঁচটার সময় মশাল জ্বালার সব ব্যবস্থা করে রাখা হল। জমাতের চারদিকে চারটা ধূনি জ্বালারও বন্দোবস্ত হল। সন্ধ্যার পরেই মোহান্তজী কর্পূর জ্বালিয়ে বিভূতি-নারায়ণের আরতি করলেন। আরতির পর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে একটা পৃথক জাজিমের উপর বসলেন। মশাল জ্বালা হয়েছে, পাহারাদার মোতায়েন করা হল। আরম্ভ হল ভজন কীর্তন। দত্তাত্রেয় বন্দনার পর শিব, নর্মদামাতা, বিভূতি-নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার সমবেত বন্দনাগান হল। দত্তাত্রেয় অবধূত থেকে এই মোহান্ত পর্যন্ত সকলের নাম ও কীর্তিগাথা তাঁদের প্রত্যেকের অলৌকিক ঋদ্ধি-সিদ্ধির কাহিনী- কীর্তনের মত করে গাওয়া হল। কীর্তন শুনে জানতে পারলাম যে এই মোহান্ত মহারাজের নাম মহেশ গিরি। তাঁর গুরুর নাম মদন গিরি। এইবার আরম্ভ হল মোহান্ত মহারাজের উপদেশ। তিনি হঠযোগের প্রশংসা করে প্রথমেই বললেন -

হঠবিদ্যা পরা গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেৎ বীর্যবতী গোপ্যা নির্বীর্যা তু প্রকাশিতা॥

হঠযোগ সাধনা গোপনে করতে পারলে তবেই তা বীর্যবতী হয়। যারা নাগফণী সম্প্রদায়ের নয়, তাদের কাছে আমাদের গুরুপরম্পরাগত সাধনা প্রকাশ হয়ে পড়লে সেই সাধনার ক্রম নির্বীর্য হয়ে পড়বে। হঠযোগ অভ্যাসে শরীরের দৃঢ়তা, ইন্দ্রিয়গণের স্থিরতা, মনের শান্তভাব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনতে হলে হঠযোগই তার একমাত্র চাবুক। সাধনায় উন্নতি করতে হলে আগে চাই দৃঢ়িষ্ট বলিষ্ট দেহ, শান্ত মন তারপর বুদ্ধিকে ঈশ্বর বিষয়ে সমাধান করবার যোগ্য করে তুলতে হয়।

খুব যত্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করবে অত্যন্ত সংগোপনে। আজকাল অনেকে সহজে খেচরীমুদ্রা আয়ত্তের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায়। তোমরা কাশী বা বাংলা মুলুকে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণকালে যদি কোথাও ঐ সব পন্থার বিবরণ শুনতে পাও, সেসব কথায় কর্ণপাত করবে না। ছেদন-দোহন-মর্দন ছাড়া খেচরী মুদ্রা সম্পন্ন করা যায় না, তালু গহ্বরে ঢুকিয়ে কপাল কুহরে জিহ্বাকে উলটিয়ে তুলতে হলে জিহ্বাকে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘতর করতেই হবে। নতুবা কোনভাবে জিহ্বা উলটিয়ে সামান্য ভেতরে গেলেও তা কণ্ঠকূপে গিয়ে হিল্ হিল্ করে নড়তে থাকবে - তাঁর ভাষায় 'লুড়র লুড়র' করবেই করেগা।

মোহান্তজীর ভাষণ শুনে বুঝতে পারলাম যে, সকালে খেচরী প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছিল, তিনি পরোক্ষভাবে তারই জবাব দিলেন। এর বেশী তাঁর কাছে আর কিছু আশা করিনি। কারণ জানি, যে সম্প্রদায়গত সংস্কার বা গোঁড়ামি এমনি এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার বিনাশ নেই। মোহান্তজী বাণী বচন দিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্রই নাঁগারা পর্যায়ক্রমে গাঁজায় দম দিতে বসে গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই মোহান্তজীসহ সকলেই ঘটি ঘটি সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছেন; এখন টানছেন গাঁজা। যেদিন যে নাঁগাদের উপর পাহারার দায়িত্ব থাকে তাদেরই কেবল, পরিমিত পরিমাণে সিদ্ধির সরবৎ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ ধরে গাঁজার ধোঁয়া এবং গন্ধে ঘুম এলনা। শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলাম। নির্জন নিশুতি রাত, গভীর নিঃশব্দের মধ্যে অনন্ত আকাশের পরমাশ্চর্য রূপ আমাকে ধীরে ধীরে মোহাবিষ্ট করে তুলল।

ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, যখন জেগে উঠলাম ভোর হয়ে আসছে। কয়েকজন নাঁগা সাধুকে দেখলাম স্থির হয়ে বসে ধ্যান করছেন, হয়ত খেচরী মুদ্রার সাহায্যে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তীস্থানে কপালকুহরে জিহ্বা ঢুকিয়ে তাঁরা প্রণব বিজড়িত জ্যোতির কল্পনা করে ধ্যানে বসেছেন।

দু'তিনজন নাগাকে দেখলাম লোটা হাতে নর্মদাঘাটের দিকে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও নর্মদা স্নান সেরে এলাম। সকাল হয়ে গেছে, মশালগুলো নেভানো হয়েছে। দলে দলে নাগারা স্নান করে এসে ভস্ম মাখতে লাগলেন। এখনও সূর্যোদয় হয়নি। এদিকে সূর্যোদয় হতে দেরী হয়। একে ত ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত তার উপর বিন্ধ্য-সাতপুরার সুউচ্চ পর্বতের আড়াল পার করে সূর্যকে প্রকট হতে হয়। রাত্রে বেশ গরম পড়েছিল। এখন স্নান করে আসার পর ভোরের বাতাস লেগে মন প্রফুল্ল হয়েছে। মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করার ইচ্ছা হল। কমণ্ডলু হাতে মন্দিরের দিকে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় মোহান্তজীর তাঁবুতে টং করে একটা আওয়াজ হ'ল। একজন নাঁগা দৌড়ে গেলেন তাঁবুর ভেতরে। মোহান্তজীর কাছে একটা পেটা ঘড়ি আছে দেখেছি, কাউকে ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি ঘড়িতে ঠুকে আওয়াজ করেন। সেই নাঁগা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি যেতেই মোহান্তজী বললেন - আজ হমারা গুরুজীকা জনম্ তিথি হ্যায়। আপ্ বেদমন্ত্রসে উদ্বোধন করিয়ে, এহি হমারা বিনতি হ্যায়। বেদমন্ত্রে জন্মতিথির উদ্বোধন, এ বড় বিচিত্র অনুরোধ বটে। কোন মন্ত্র পাঠ করব ভাবছি, তিনি নিজেই বললেন-সূর্য উদিত হচ্ছেন, বেদে যদি সূর্যের বন্দনা থাকে, সেই সূর্য বন্দনা গেয়ে শোনাও। সূর্যের উদয় হলে যেমন অন্ধকারের পর্দা সরে গিয়ে দিনের উদ্বোধন ঘটে, তেমনি বেদমন্ত্রের স্নান করে আমরা গুরুদেবের শুভ জন্মদিনের উদ্বোধন করতে চাই।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাইরে এসে যুক্তকরে দাঁড়ালেন পূর্বদিকে মুখ করে। বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশ অতিক্রম করে সূর্যরশ্মির প্লাবন জেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে নাগারাও আমাদের দুজনকে চক্রাকারে বেষ্টন করে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি বলতে লাগলাম, বৈদিক ঋষিরা জড়সূর্যের উপাসনা করতেন না। জড়সূর্যের অন্তরালে যে হিরন্ময় ভর্গজ্যোতিঃ তাঁরই উপাসনা করতেন। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি কণ্বের পুত্র প্রকণ্ব ঋষি সেই ভর্গ সূর্যের দর্শন পেয়ে যেসব মন্ত্রে তাঁর আবাহনি স্তুতি গেয়েছিলেন, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চুয়াল্লিশ সূক্ত হতে পঞ্চাশৎ সূক্ত পর্যন্ত সেইসব মন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্চাশৎ সূক্তের দশটি মন্ত্র আমি গেয়ে শোনাচ্ছি -

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ* । দৃশে বিশ্বায় সূর্যম ॥ ১ ॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্তি অক্তুভিঃ । সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২ ॥

বিশ্বজগৎ দেখবে বলে রশ্মি তাঁহার উর্দ্ধে বহে ।
দীপ্তসূর্য জানেন সবই বিশ্বে প্রাণী যতেক রহে ॥
বিশ্বপ্রকাশ সূর্য এলে রাত্রি সহ চোরের মত ।
নিমেষ মাঝে অপগত আকাশ ভরা তারা যত ॥

অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনাঁ অনু । ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩ ॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃত অসি সূর্য । বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥ ৪ ॥

কিরণ তোমার বিশ্বজনে একে একে দীপ্ত করে,
দীপ্তিমন্ত সূর্যশিখা দ্যুতিছটা ছড়ায় ঘরে ।
ক্ষিপ্র তুমি বিশ্বদ্রষ্টা জ্যোতির্লোকের কর্তা তুমি,
জগৎ তোমার দিব্যভাতি দীপ্ত কর বিশ্বভূমি ॥

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ । প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫ ॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু । ত্বং বরুণঃ পশ্যসি ॥ ৬ ॥

উদয় তব দেবলোকে উদয় তব মানুষ লাগি,
স্বর্গলোকের দৃষ্টপথে নিত্য তুমি রহ জাগি ।
বিশ্বজনে পোষণ করি দেখছ তুমি যে আলোকে,
পাবক সূর্য টারি মোরা স্তুতি করি বিশ্বলোকে ॥

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ । পশ্যান্ জন্মানি সূর্য ॥ ৭ ॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য । শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮ ॥

প্রকাশ কর দিবারাত্র, দৃষ্টি কর বিশ্বজগৎ
বিস্তৃত ঐ অন্তরীক্ষে যখন তোমার যাত্রা জ্বলৎ ।
হে দেব তুমি দীপ্ত ভান, জ্যোতি তোমার জ্বলছে কেশে
হরিৎ নামক সপ্তরশ্মি বইছে তোমার চারু বেশে ॥

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ । তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্ । দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১০ ॥

রথে আপন জুড়ে নিলেন সাতটি শোভন রশ্মি-নারী
স্বয়ংযুত সে রথে আজ আকাশ পথে ভ্রমণ তাঁরি ।
তিমির পারাবারের পারে দেখব মোরা জ্যোতির্ময়ে,
ভজব তাঁরে শ্রেষ্ঠ যিনি দিব্য কিরণ সমুচ্চয়ে ॥

---

* উল্লেখিত মন্ত্রে কেতব শব্দের অর্থ সায়নাচার্যের মতে - সূর্যাশ্বাঃ যথা সূর্যরশ্ময়ঃ অর্থাৎ সূর্যের অশ্ব বা সূর্যরশ্মি । যাস্কাচার্যের নিঘন্টুতে অশ্ব শব্দের অর্থ দেওয়া আছে - সূর্যরশ্মি বা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মজ্যোতিঃ । বরুন সূর্যেরই অপর নাম । শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে । তদনুসারে পুরানকারদের মতে আদিত্য বারজন, কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৭২ সূক্তে ৮ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে । তাঁরা হলেন - ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ । সূর্যালোকে নিহিত সপ্তবর্ণ রশ্মিকেই সূর্যের সপ্তাশ্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে ।

বন্দনা শেষ হল। মোহান্তজীর অনুরোধে আবার এক একটি মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে হল। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরাও সমবেত কণ্ঠে গাইলেন। সমবেত কণ্ঠের সেই বেদধ্বনিতে নর্মদাতটে এক অপূর্ব ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল। নদী সৈকতে গাছপালায় ঘেরা সেই অরণ্য-প্রান্তরে এতজন জটাজুট সাধুর উপস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বৈদিক যুগেরই কোন তপোবনে দাঁড়িয়ে আছি।

বেদমন্ত্র পাঠের পরেই মোহান্তজী স্বয়ং গুরুবন্দনা করলেন। ঘটা করে বিভূতি-নারায়ণের পূজা করলেন। তারপর জনা পাঁচেক নাঁগাসাধুকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গেলেন শিবপূজা করতে। আমিও সঙ্গে গিয়ে শিবের পূজো করে এলাম। তাঁবুতে রূপার ত্রিশূলটি রেখে সিদ্ধির সরবৎ পান করলেন। আমাকে ডেকে বললেন - বৈদিক খেচরী ইয়া বিশ্বমিৎ ক্রিয়া মুঝে একদফা দিখলাইয়ে ত। যো মন্ত্রসে জিহ্বা উলট্ যাতা হৈ, উহ্ আয়েস্তা আয়েস্তা বলিয়ে, হম্ লিখ্ লেঙ্গে। আমি বললাম - এ পদ্ধতি বা মন্ত্র আপনার জেনে লাভ কি? বিশ্বমিৎ ক্রিয়া বা যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী প্রবর্তিত পন্থায় জিহ্বা ত কাল সন্ধ্যাতেই আপনি জানিয়েছেন 'লুড়র লুড়র করবেই করেগা'। আপনি ত খেচরীসিদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনার জিহ্বা নিশ্চয়ই ছেদন দোহন মর্দন আকর্ষণ প্রভৃতির প্রভাবে এত লম্বা হয়ে গেছে যে অবলীলাক্রমে তা কপাল কুহরে গিয়ে ঠেকে যায়। কাজেই আমাকে বিড়ম্বিত বা ছলনা করে লাভ কি প্রভু!

তিনি গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। হয়ত তিনি রুষ্ট হয়েছেন। তা হোন, স্পষ্ট কথায় আর কষ্ট কি!

একটু পরে ভোজনপর্ব আরম্ভ হল। আজ গুরুর জন্মতিথি বলে ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই মোহান্তজী ঘোষণা করে দিলেন আপনা আপনা সামান বাঁধকর তৈয়ার রহেগা। কাল সবেরে যাত্রা করেঙ্গে। চব্বিশ অবতারমেঁ পৌঁছকর পরিক্রমা সমাপ্ত করেঙ্গে। কাল ত আপনা মোকামমেঁ যাউঙ্গা। নাঁগাদের মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেল। প্রায় ছ'মাস ধরে তাঁরা জমায়েৎ নিয়ে পরিক্রমা করছিলেন, আগামী কালই তার সমাপ্তি ঘটবে। আমার ত এখনও অনেক দেরী। গাঁজা সেবার পর উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা জমাতের আসবাবপত্র গোছাতে লাগলেন। আমি শুয়ে থাকতে থাকতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দুজন নাঁগার মধ্যে মারামারি হওয়ায় উঠে বসলাম। একজন আরেকজনের গাঁজা নিয়েছিল, সেইজন্য উভয়ের মধ্যে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি এবং গালাগালি থেকে মারামারি সুরু হয়ে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে মোহান্তজী উভয়কে থামালেন।

সন্ধ্যার পর আজও ভজন-কীর্তন সুরু হল। মোহান্তজী নিজের গুরুর কিছু মহিমা বর্ণনার পর নাগফণী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা বলতে লাগলেন - আমাদের নাগফণী সম্প্রদায় স্বয়ং ভগবান দত্তাত্রেয়ের নিজস্ব সম্প্রদায়। উলঙ্গ হলেই কেউ নাঁগা হয়না। সাধনা করে তবে নাগফণী নাঁগা হওয়া যায়। নির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, নির্মলী এবং অটল প্রভৃতি সম্প্রদায়েও নাঁগা দেখা যায়। তাঁরাও হঠযোগের কিছু ক্রিয়া অভ্যাস করে। কিন্তু নাগফণী সম্প্রদায়কে ভগবান দত্তাত্রেয় খেচরী ও শাম্ভবী মুদ্রা শিখিয়ে গেছেন। শংকরাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, বন, পর্বত, অরণ্য, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীদের যেমন দণ্ড কেড়ে শংকরাচার্য কেবল আশ্রম, তীর্থ ও সরস্বতী নামা সন্ন্যাসীদেরকেই দণ্ড ধারণের অধিকার দিয়ে গেছেন, তেমনি ভগবান দত্তাত্রেয়, নিরঞ্জনী ও নির্বাণীরা যতই দত্তাত্রেয়ের নাম নিক, তাঁদেরকে তিনি খেচরী বা শাম্ভবী ক্রিয়া সরাসরিভাবে দিয়ে যাননি। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা যোগে উন্নত ছিলেন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব চিহ্নিত করার জন্য নাগজটা ধারণের অধিকার দিয়ে গেছেন। অপরাপর আখড়ার নাঁগারা শম্ভুজটা বা বারবাণ্ জটা ধারণের অধিকার পেয়েছে। দণ্ড ধারণের অধিকার থাকায় যেমন দণ্ডী সন্ন্যাসীদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে তেমনি আমরা নাগফণী সম্প্রদায়ের নাঁগারাও অন্যান্য আখড়ার নাগাদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার পাত্র। কত বড় গর্বের কথা একবার তোমরা ভাব দেখি! ভগবান দত্তাত্রেয় বারবার বলে গেছেন -

অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্ত বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপোষা মুদ্রাভবতি খেচরী ॥

অর্থাৎ কপাল বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত্ত ও বন্ধ করে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করবে। এরই নাম খেচরী। এই খেচরী সাধনার অধিকার একমাত্র নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগাদের নিজস্ব বস্তু। কারণ যোগেশ্বর দত্তাত্রেয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপদিষ্ট। অনেকে নিজেদের ইচ্ছামত অন্যভাবে খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করে থাকে। তাতে জিহ্বা কপালকুহরে প্রবিষ্ট হলেও, তাতে সিদ্ধিলাভের আশা সুদূর পরাহত। য্যায়সে কঁহা যাতা হৈ -

রামানুজকে ফৌজমে বারা গাড়ি পোল।
আপাপন্থী মনমুখী ফিরে টোলে টোল॥

অর্থাৎ রামানুজের সৈন্যদলে অনেকগুলি ভগ্নগাড়ী আছে। মনমুখী (আপাপন্থী) গলিতে গলিতে ঘুরে ফেরে। মোহান্তজীর শেষের কথাগুলি স্পষ্টতই আমার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। যেহেতু আমি বাবার কাছে খেচরী শিখেছি, বাবা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, আমিও কোন সম্প্রদায়ে নাম লেখাইনি, কাজেই আমি আপাপন্থী, কারণ নিজেই নিজের মতানুসারেই চলছি। কোন জমায়েতের সঙ্গে না এসে 'আপই আপ' নর্মদাতটের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজেই মন্-মুখী। বুঝলাম, সকালে তিনি যে বেদোক্ত বিশ্বমিৎ-ক্রিয়া শিখবার জন্য আবদার ধরেছিলেন, তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় তাঁর মনে বড় বেশী তাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে মনে হাসলাম। বাকি রাত্রি নিরুপদ্রবেই কাটল।

ভোরে উঠেই দেখি সাজ্ সাজ্ রব। একজন নাগা জানালেন যে এক ঘন্টার মধ্যেই জমায়েতের যাত্রা শুরু হবে। আমরা তের মাইল হেঁটে গেলেই চব্বিশ অবতারে গিয়ে পৌঁছে যাব। সেখানেই গিয়ে স্নান পূজা সেরে পরিক্রমা শেষ করব। আমি তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। শিঙা, তুরী, ভেরী বাজিয়ে নাগা বাহিনী চলতে থাকল। পার্বত্যপথে মিনিট পনের হাঁটার পরেই একটা স্থানে কুড়ি-পঁচিশ জন সন্ন্যাসীসহ কিছু লোককে দূর থেকে দেখতে পেলাম। একজন নাগাকে জিজ্ঞেস করায় বললেন - রেওয়া মহারাজের সদাবর্ত। বুঝলাম, মোহান্ত মহারাজ এই সদাবর্তের কথাই সেদিন বলেছিলেন, বড় সদাবর্ত। অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ। আটা, ডাল, বাজরা, গম সাধুদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সদাবর্তের ধার দিয়েই আমরা হেঁটে চলেছি। একজন বৈরাগীর কণ্ঠে তুলসীর মালা, দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' করছিলেন। আমাদের দলের একজন নাঁগা বৈরাগীর চিবুক নাড়িয়ে হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন -

নীকী নীকী বাত করো হক, না হক করতে দুঁদা।
কণ্ঠী বান্ধে হরি মিলেঁতো, বান্দা বাঁধে কুঁদা॥

- ভাল কথা, বৃথা চীৎকার করে মরছো কেন; গলায় কণ্ঠী বাঁধলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে এই বান্দা কাঠের কুঁদা গলায় বাঁধবে।

এই কথায় আরও কয়েকজন নাঁগা হো হো করে হেসে উঠল। সদাবর্তের লোক এবং কয়েকজন সাধু এই ইৎরামির প্রতিবাদ করতেই নাঁগারা তাদেরকে মারধোর সুরু করে দিল। মোহান্তজী অনেকটা আগে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে ঝগড়া থামালেন। বুঝলাম অহেতুক কলহ-প্রিয় ও উগ্র প্রকৃতির বলে নাঁগাদের যে বদনাম আছে, তা নিছক রটনা নয়।

সেই সদাবর্ত অতিক্রম করার পরেই আবার ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। নাঁগারা যেহেতু চব্বিশ অবতারে তাঁদের নিজেদের ডেরায় আজ পৌঁছে যাবেন, এজন্য তাঁদের উল্লাস দেখে কে! তাঁরা সমবেত কণ্ঠে 'মোহান্ত মহারাজ জী কী জয়, মহেশ গিরিজী কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে দ্রুত হাঁটছেন। চলতে চলতে কেউ গাছের গায়ে ত্রিশূলের খোঁচা মারছেন, কেউ বা চিমটার আঘাতে ঝোপঝাড় ছিঁড়ছেন। কেউ নিজের মাথার বোঝা, কাঁধের বোঝা একবার পাথরের উপর ফেলছেন আবার তুলে নিচ্ছেন। যেন যুদ্ধ জয় করে কোন সেনাবাহিনী ঢুকছে নিজেদের রাজধানীতে। গোটা পাঁচেক কৃষ্ণসার মৃগ আমাদের হাঁটা পথের ঢাল দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। একজন নাঁগা অহেতুক নিজের ত্রিশূলটা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। হরিণের গায়ে লাগল না, লাভের মধ্যে ত্রিশূলটা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্য করছে কে! এমনই স্ফূর্তির বহর।

নাঁগাদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। প্রায় ছয়-সাত মাইল হাঁটা হয়ে গেল। একটা পাথরে হোঁচট্ খেলাম, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। চার পাঁচজন খুব সমবেদনা জানালেন। একজন তাঁর ঝোলা থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া বের করে, আঙুলটায় পটি বেঁধে দিলেন। আমি পেছনের দিকে ছিলাম। কাজেই পেছনের নাঁগারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন; অগ্রবর্তী দল, যে দলে মোহান্তজী আছেন, তাঁরাও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় একজন নাগা চীৎকার করে খবর দিলেন - বঙ্গাল কী ব্রহ্মচারী বাবাকো চোট লাগা হৈ। আমরা একটু পরেই গিয়ে তাঁদের সঙ্গ ধরলাম। আমার দিকে তাকিয়ে মোহান্তজী বললেন - কাঠিয়াজী ইহ্ ওঁকার কী ঝাঁড়ি হ্যায়, মা কী গোদ নেহী, এর মানে এটা ওঁকারেশ্বরের জঙ্গল, মায়ের কোল নয়। আমি কাঠের কৌপীন পরি বলে আমাকে কাঠিয়াজী বলে বিদ্রুপ করা হল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দলের সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটিতে লাগলাম, মনে মনে সংকল্প করলাম, কোনমতে চব্বিশ অবতারে পৌঁছে এদের সঙ্গ বর্জন করতে পারলেই মঙ্গল।

যতই জঙ্গল অতিক্রম করে চব্বিশ অবতারের নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই নাগাদের উল্লাস উদ্দাম হয়ে উঠল। শিঙা, তুরী, ভেরী বাজিয়ে নিরন্তর জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। বেলা এগারটা নাগাদ চব্বিশ অবতারের ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সেখানেই একদল নাঁগা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের নাগজটা দেখে বুঝলাম, তাঁরাও এই নাগফণী সম্প্রদায়েরই লোক। তাঁরা এগিয়ে এসে মোহান্তজীর পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করলেন। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। একটু দূরেই বিরাট মন্দির এবং আরও কিছু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। আমাকে মোহান্তজী বললেন - কহিয়ে কাঠিয়াজী আপ হিঁয়াসে আপনা পথমে চলেঙ্গে, ইয়া ফির হিঁয়াসে এক মিল দূর হমারা আশ্রমমেঁ পধারেঙ্গে? উস্ তরফ্ দক্ষিণতটমেঁ কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ, ইসকা বাদ এরণ্ডী সঙ্গম, ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গমেঁ সমঝো আ গিয়া। আমি তাঁকে জানালাম, আপনার দয়ার কথা কোনদিন ভুলবনা। আমাকে এখনও বহু পথ পরিক্রমা করতে হবে, এখন আমাকে বিদায় দিন। আমাকে দয়া করে বলুন, এখানে কমলভারতীজী, যিনি মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রবর্তিত নর্মদা-পরিক্রমাকে সাধুসমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন, তাঁর কি কোন আশ্রম আছে? আমি বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর জীবনীগ্রন্থে তাঁর অনেক যোগৈশ্বর্যের কাহিনী পড়েছি।

- উহ্ কেতাব মেঁ হমারা নাগফনী সম্প্রদায়কা বারেমেঁ, হমারা গুরু মদন গিরিজীকা জমাৎ কী বারেমেঁ কুছ লিখা হ্যায় কি নেহি?

- না, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই। তাঁর জীবনীতে সংক্ষেপে কমলভারতীজী, গৌরীশংকরজী এবং কিছু কিছু নর্মদাতীর্থের নামোল্লেখ আছে মাত্র। আপনাদের নাগফনী সম্প্রদায়ের কথা এই বইতে পড়িনি।

আমার কথা শুনেই তিনি নাগাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন - কাঠিয়াজী বলতে হেঁ কোঈ বালানন্দ-ফালানন্দনে চব্বিশ অবতারমেঁ কোঈ বখৎ আয়েথে। উনকা কেতাবমেঁ কমলভারতীকা বারেমেঁ লেখা হ্যায়, লেকিন হমারা মহাযোগী গুরুজী ঔর নাগফণী জমাৎ কী বারেমেঁ কুছ নেহি লিখ্যা। উহ্ কেতাব ভি ফালতু হ্যায়, ইস বাতভি বেকার হ্যায়। লেও তুমলোগ পরিক্রমা সমর্পণকী ইন্তেজাম করো।

আমার মনে খুব আঘাত লাগলো। মহাপুরুষ বালানন্দজী নর্মদা পরিক্রমান্তে দেওঘরে আশ্রম করলেও বহু বাঙালীর তিনি পূজনীয় মহাত্মা ছিলেন। আমরা বাঙ্গালীরা তাঁকে নিজের বলেই ভাবি এবং ভালবাসি। তাঁর সম্বন্ধে এইরকম হীন মন্তব্যে মন আমার বিরক্তিতে ভরে গেল। আমি কোনমতে শিষ্টাচার রক্ষার জন্য সকলকে নমস্কার জানিয়ে মন্দির লক্ষ করে হাঁটিতে লাগলাম।

চৈত্রমাস শেষ হতে আর মাত্র তিনদিন বাকী, সূর্যের তাপে চলার পথও তেঁতে উঠেছে। আমি নর্মদার ঘাটে নেমে আগে স্নান পূজা শেষ করলাম। গিয়ে পৌঁছলাম চব্বিশ অবতারের মন্দিরে। ভক্তের ভীড় এখন কম দেখছি। মন্দিরে চব্বিশ জন অবতারের মূর্তি আছে। জয়দেবকৃত দশ অবতার ছাড়াও দত্তাত্রেয় ঋষভদেব বেদব্যাস কপিল প্রভৃতিকে অবতার হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক মূর্তি আছে। আমি এইখানে মন্দিরের এককোণে বসে রেবাখণ্ড খুলে ভাণ্ডারী তীর্থ সম্বন্ধে পড়তে লাগলাম। বালানন্দজীর জীবনীতে পড়েছিলাম যে ভাণ্ডারী তীর্থে কুবের একমাস ছয় দিনের সংকল্প করে যজ্ঞান্তে তপস্যা করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সেই তপস্যায় তাঁর একশত বৎসর কেটে যায়। প্রসন্ন হয়ে মহাদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে কুবের মহাদেবের নিকট যক্ষের রাজ্য সকল প্রার্থনা করেন।

মহাদেবের বরে কুবের সর্বযক্ষপতি হন। রেবাখণ্ডে মার্কণ্ডেয়জী অন্যরকম বিবরণ দিয়েছেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছে, কুবের এখানে পদ্মসম্ভব ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন, শিবের নয়। বিবরণ এইরকম -

ধনদেন তপস্তপ্তবা প্রসন্নে পদ্মসম্ভবে।
তত্রৈব স্বল্পদানেন প্রাপ্তং বিত্তস্য রক্ষণম্॥
তত্র গত্বা তু যো ভক্ত্যা স্নাত্বা বিত্তং প্রযচ্ছতি।
তস্য বিত্ত পরিচ্ছেদো ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ ভাণ্ডারী তীর্থে ধনদ কুবের তপস্যা দ্বারা পদ্মযোনি ব্রহ্মার সন্তোষ সাধন করেন এবং অল্পমাত্র দান করে ধনের রক্ষাধিকার প্রাপ্ত হন। যে মানুষ ভাণ্ডারী তীর্থে গিয়ে ভক্তিপূর্বক স্নান ও দান করে সে কোনদিন ধনহীন হয়না। এই তীর্থ 'দারিদ্রচ্ছেদকরণং' অর্থাৎ দারিদ্রনাশকারী। হুণ্ডিয়াতে সিদ্ধিনাথের মন্দিরে শুনে এসেছিলাম যে, সেখানের উত্তরতটে কঠোর তপস্যা করে শিবের বরে কুবের দেবতাদের ধনাধ্যক্ষতা এবং সর্বযক্ষপতিত্ব লাভ করেছিলেন।

সে যাইহোক, পুরাণের বিবরণে একটু আধটু বৈপরীত্য না থাকলে তা পুরাণ পদবাচ্য হবে কেন! প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে, এদিকে ঝুলিতে কন্দমূল ছাড়া কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত কি কন্দমূল খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে! আমিতো রান্না করতেও জানিনা, সদাবর্ত থেকে কিছু আটা যে এনে রুটি তৈরী করে নেব, সে বিদ্যাও জানা নেই। বাইরে রোদের তাপ বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে স্নান করে এসে মন্দিরের এককোণে বসে আছি বলে কোন কষ্ট হচ্ছেনা। মন্দিরের চারপাশের পরিবেশ দেখে স্থানটিকে তপোবনের মত স্নিগ্ধ শান্ত এবং মনোরম বলে মনে হচ্ছে। কন্দমূল বের করে তার কিছু অংশ খাবার উপক্রম করছি, এমন সময় শতছিন্ন জামা গায়ে, একটা ময়লা কাঁথা বগলে একটি লোক এসে আমার সামনে একটা বড় তাজা কন্দমূল ফেলে দিয়ে বলল চিবিয়ে খা। কন্দমূলের গায়ে মাটি লেগে আছে। আজই বা দু'একদিন আগে এই কন্দমূল সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হল। লোকটির হাবভাব পাগলের মত। কিন্তু তাঁর মুখে বাংলা বুলি শুনে আমি চমকে উঠলাম। কতদিন প্রাণের ভাষা বাংলা শুনতে পাইনি। দীর্ঘকাল নর্মদাতটের কত তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম, আর কোথাও ত বাঙ্গালী দেখতে পাইনি। মধুনিস্যন্দিনী মাতৃভাষাও কানে ঢোকেনি। মানুষটি পাগল হোন বা পাগল সেজে থাকুন, তাঁর খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুল, অতি অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা সত্ত্বেও তাঁকে আমার অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলে সেই মুহূর্তে মনে হতে লাগল। মন্দিরের বাইরে রোদে পাথরের উপর বসে তিনি বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছেন। মন্দিরের একটা প্রকোষ্ঠ থেকে একজন ব্রাহ্মণ যুবক বেরিয়ে এসে লোকটিকে তাড়া করতেই তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। সেই যুবক আমাকে বলল - উহ্ আদমী পাগল হ্যায়, বঙ্গাল দেশসে আয়া। আজ তিন সাল ইধরই হ্যায়। এক শেঠ উজ্জয়িনীসে তীর্থ করনেকে লিয়ে আয়ে থে। উনকে লিয়ে একঠো কুটীর বানা দিয়া। পাগল দিনভর জঙ্গলমেঁ ইধর উধর ঘুমতা হৈ। কভী আপনা কুটীরমেঁ কভী জঙ্গলমেঁই পড়া রহতা হৈ। সাধুজী আপ্ পরিক্রমাবাসী হ্যায় ?

আমি তাঁকে বললাম - পরিক্রমা করতে করতেই এখানে এসে পৌঁচেছি। লাখড়াকোটের জঙ্গল পেরিয়ে নাগফণী সম্প্রদায়ের একটা জমায়েতের সঙ্গে এখানে এসেছি। তুমি ভাই বলতে পার এখানে কমলভারতীজীর আখড়া কোন দিকে!

যুবক উত্তর দিল - বাবুজীর মুখে শুনেছি কমলভারতীজী উচ্চকোটির মহাত্মা ছিলেন। তাঁকে এ যুগের মার্কণ্ডেয় মুনি বলা হত। এইখানে একটু দূরে তাঁর একটা আশ্রম আছে বটে তবে তিনজন সন্ন্যাসী ছাড়া এখন সেখানে কেউ নেই। ঐ আখড়ার মোহন্তজী এখন মর্কটিসংগমে আছেন বা পরিক্রমায় বেরিয়ে অন্য কোথাও আছেন তা বলতে পারবনা। নাগফণী নাঁগাদের সঙ্গে যে আপনি কিছুদিন কাটাতে পেরেছেন, সেটাই আশ্চর্য। ওরা খুব 'ঝাপ্পাটি আদমী'। বছর তিনেক আগে কমলভারতীজী প্রতিষ্ঠিত আখড়া তুচ্ছ কারণে ওরা আক্রমণ করেছিল। দুর্দান্ত নাঁগাদের বারবার অত্যাচারের জন্যই মোহান্তজী তিক্তবিরক্ত হয়ে কমলভারতীজীর মর্কটি সংগমস্থ আশ্রমে গিয়ে বাস করছেন। তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু সাধক প্রকৃতির শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীরা দুর্দান্ত নাগাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কিভাবে! ভাল কথা, আপনার এখনও ভিক্ষা হয়নি। আমি মন্দিরের প্রসাদ এনে দিচ্ছি।

এই বলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শালপাতায় করে ঠাকুরের ভোগ এনে দিল। ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য নর্মদামাতার দয়া দেখে আমার চোখে জল এল। পুরী, লাড্ডু, ডাল, ক্ষীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। যুবক বলল, বেলা একটা বেজেছে। আমার বাবা এবং চাচাজীই এই মন্দিরের পুরোহিত। এখন গরমকাল তাই তীর্থযাত্রীর ভীড় কম। গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া আর সব ঋতুতেই এখানে তীর্থযাত্রীর ভীড় হয়। হাজার হাজার পরিক্রমাবাসীরা এখানে আসেন। হোলকারদের এস্টেট থেকে এই মন্দিরের সমূহ খরচ চলে। ওঁকারেশ্বর মহাতীর্থে যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকেই এখানে আসেন, কুবের ভাণ্ডারী তীর্থেও যান।

কথায় কথায় জানতে পারলাম - ব্রাহ্মণ যুবকের নাম দীনদয়াল পাণ্ডে। সে ওঁকারেশ্বরের সংস্কৃত পাঠশালায় এখন পাণিনি ব্যাকরণের মধ্যমা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমাকে বলল - মন্দিরের পেছনেই খালি ঘর পড়ে আছে। আপনি সেখানেই স্বচ্ছন্দে রাত্রিবাস করবেন। আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।

আমি তাকে বললাম - কাল সকালেই আমি ওঁকারেশ্বর যাত্রা করব।

-দু'একদিন থেকে যান, আমি অনুরোধ করছি। কারণ তাহলে আপনি একজন উচ্চকোটির মহাত্মার দর্শন পাবেন। আমাদের গুরুদেব মহাত্মা রামদাসজী কাল সকাল ন'টা দশটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছে যাবেন। দু'একদিন থেকেই তিনি পুনরায় তাঁর ওঁকারেশ্বর আশ্রমেই ফিরে যাবেন। তাঁর আশ্রমে থেকেই আমি লেখাপড়া করি, তাঁর সঙ্গে আমিও যাব। আপনিও আমাদের সঙ্গেই যেতে পারবেন।

আমি তার প্রস্তাবে সন্মতি দিলাম। সে মন্দিরের পিছন দিকে একটা পৃথক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরের দরজা খুলে দিল। নর্মদামুখী দক্ষিণ দুয়ারী ঘর। মন্দির থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে চব্বিশ অবতারেই দীনদয়ালের বাড়ী। আমি গাঁঠরী পেতে শুয়ে পড়লাম। দূরে সাতপুরা পর্বতের গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। এখানেও ঘনঘোর জঙ্গল আছে, তবে অনেকটা দূরে। বেলা তিনটা নাগাদ দীনদয়াল আবার এল। এসেই বলল- বাবুজী এবং দুই কাকাকে আপনার কথা বলেছি। তাঁরাও খুব খুশী হয়েছেন। আমার বাবা খুব ভক্ত এবং ধার্মিক মানুষ। এসময়ে ত এখানে সাধু সন্ন্যাসী আসেন না। একজন পরিক্রমাবাসী এসে মন্দিরের অতিথি হয়েছেন জেনে তিনি খুবই আনন্দিত।

- শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছেনা। আমাকে সেই পাগল সাধুর আস্তানায় নিয়ে যাবে?

- বদ্ধ পাগলের আস্তানায় অহেতুক যাবেন কেন? সে কুটীরে আছে বা হেথায় সেথায় ঘুরছে তার ঠিক নেই।

- দেশওয়ালী ভাইকে কার ভাল লাগেনা বল! চল একবার যাই, তিনি না থাকলে ফিরে আসব। তার সঙ্গে প্রায় আধমাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে পাগল সাধুর আস্তানায় পৌঁছলাম। আস্তানা বলতে প্রায় সাতফুট উঁচু একটা পাথরের ঘর, ছাউনী তালপাতার। ঘরের মধ্যে বসে সাধু বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন। আমাদেরকে দেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর পূর্বের মত বিড়বিড় করে কখনও মৃদুকণ্ঠে কখনও উচ্চৈঃস্বরে বকতে লাগলেন - পরিস্কার বাংলা ভাষায় বলছেন -

১ - বলি রাঁধুনী নাই ত রাঁধলে কে, রান্না হয়নি ত খেলেন কি ? উনি আবার বলেন, রাঁধতে জানেন না। যে রাঁধলে সেই খেলে, এই ত দুনিয়ার ভেল্কি !

২ - যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই! আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি। গোঁসাইয়ের একি বিষম চাতুরী। গোঁসাইয়ের একি বিষম চাতুরী।

৩ - তুমি যাই, তিনি তাই। যা তুমি, তাই তুমি। তুমি আমি ভেবে হায়রে মোরা অধোগামী। (এই বলে তিনি কপালে করাঘাত করে কাঁদতে থাকলেন)।

৪ - যম বেটা ভাই দু'মুখো থলি, তাই জন্য বেটার আঁত খালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে?

৫ - চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়। নিরন্তর ইহাই হয়।

৬ - সাধনা, সাধনা- সেধে আনা। সাধলে তিনি আসেন না। যখন আসেন, নিজেই আসেন, ওরে আমার রসিক নাগর!

৭ - দুনিয়া, দুনিয়া! দুই-নিয়া, তাই দুনিয়া। যতক্ষণ দুই, ততক্ষণ তুই আর মুই। দুই নাই ত তুইও নাই, মুইও নাই। বলি, দুই তোকে করতে বলেছিল কেরে মুখপোড়া? (এইবলে একটা লাঠি নিয়ে দেওয়ালে মারতে লাগলেন)।

৮ - দে দোল দে দোল। বুকে তোল বুকে তোল, বলি, বুকে তুলে লুটোপুটি খেলে তোমার রসের খেলাটি জমবে কি করে? রসের লীলা তখন যে শুকিয়ে চচ্চড়ি হবে! (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

৯ - ওলো রেবা, তুই ত মা বিয়েও করিসনি বাচ্চাও হয়নি। আঁটকুড়ি! বাঁজি। সন্তানের বেদনা তুই বুঝবি কি করে লো? সবাই বলে তোর সন্তানরা নাকি সন্তদের মধ্যে স্থান পায়। তবে আজ আমার এ দশা কেন? (এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন)।

অঝোরে কাঁদছেন তিনি। কান্না কিছুতেই থামছেনা দেখে আমি প্রণাম করে উঠে পড়লাম। আমাকে প্রণাম করতে দেখে দীনদয়ালও প্রণাম করল। কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে পারলাম না। দীনদয়াল জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এই পাগলটাকে সাধক ভাবছেন ?

- শুধু সাধক নয়, ভাবোন্মাদ সিদ্ধ সাধক। উনি যেসব কথা বলে গেলেন, তা ব্যাখ্যা করে ভাষ্য লিখলে, একটা বই হয়ে যাবে। এঁর ভাষা তোমরা বোঝনা বলে এঁকে পাগল বলে অনাদর কর। এঁর প্রত্যেকটি কথা দ্ব্যর্থবোধক, গভীর অর্থবহ। কি নেই এঁর কথায়? ভাবজগতের নিগূঢ় তত্ত্ব ছাড়াও এঁর প্রত্যেকটি কথায় অদ্বৈত চেতনার আভাস পরিস্ফুট। রসের উচ্চতম ভূমিতে ইনি নিরন্তর বিচরণ করছেন। প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা জ্ঞান করে এই ধরণের সাধক আত্মগোপন করে থাকেন, পাগল সেজে থাকেন। ইনি এমন স্থানে এসে আস্তানা পেতেছেন যেখানে এঁর ভাষা কেউ বোঝেন না। সাধুর ভাষা না বুঝলে সাধুর ভাব ধরা যায় কি? এই অঞ্চলের লোক যদি এঁর ভাষা বুঝতে পারতেন, তাহলে দেখতে, এখানে হাজার হাজার লোকের ভীড় জমে যেত, মঠ মন্দির গড়ে উঠত। প্রচার প্রতিষ্ঠা এঁরা চাননা। তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। ভারতের কোণে কোণে পাহাড়ের গুহায় জঙ্গলে এই ধরণের কত মহাত্মাই আছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বুজরুকদেরই আড়ম্বর বেশী, প্রচার প্রতিষ্ঠা বেশী। তারা সেটাই চায়, তাই তা পায়। এঁরা চাননা, তাই পাননা।

কথা বলতে বলতে মন্দিরে ফিরে এলাম। আরতির পূর্বেই ফিরব এই বলে আমি নর্মদার ঘাটে চলে গেলাম। স্নান সন্ধ্যা সেরে যখন ফিরে এলাম তখন আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ত্রিশ-চল্লিশ জন লোকের ভীড় হয়েছে। দীনদয়ালের বাবা এবং দুই কাকা আরতি করছেন। প্রতিটি মূর্তির কাছে ঘুরে ঘুরে আরতি পর্ব শেষ করতে দুঘন্টা সময় লাগল। আস্তানায় গিয়ে দেখি, দীনদয়াল ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছে। যতক্ষণ ঘুম না ধরল, ততক্ষণ ঐ দিব্যোন্মাদ বাঙালী সাধকের কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। আমি প্রচণ্ড ক্ষুধায় যখন কাতর, তখন ছুটে এসে কন্দমূল দিয়ে গেলেন, একি কোন কাকতালীয় ঘটনা, নাকি অন্য কিছু! মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমই এলনা। পাগল মানুষটির এক একটি বাণীর মর্মার্থ যতই চিন্তা করতে লাগলাম ততই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর কথাগুলি প্রলাপ নয়, গভীর অনুভূতির কথা। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল দেখি সূর্য উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি নর্মদায় গেলাম। নর্মদার জলে শরীর মন জুড়িয়ে গেল। কাকচক্ষু স্নিগ্ধ জলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হল। কিন্তু বাবার নিষেধ বাক্য মনে পড়ল - নর্মদায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করবি, কিছুতেই তার বেশী জলে নামবিনা। স্নান তর্পণ সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করে মন্দিরে গেলাম। দীনদয়ালের বাবা ও কাকারা সবাই মন্দিরে এসে পূজার আয়োজন করছেন। দীনদয়ালের বাবা এগিয়ে এসে বললেন - আপনার কথা ছেলের কাছে শুনেছি। আপনি নাকি এখানকার পাগলটাকে দিব্যোন্মাদ সাধক বলে মনে করেন! আজ আমাদের গুরুদেব আসছেন ওঁকারেশ্বর থেকে। তিনি রাম নামে তন্ময় হয়ে থাকেন। চিত্রকূট থেকে এসে তিনি আজ দশ বৎসর কাল ধরে ওঁকারেশ্বরে রয়েছেন। তাঁকে দেখলে আপনার খুব ভাল লাগবে।

এই বলে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন পূজা করতে। আমি আমার আশ্রয়স্থলে এসে ভেজা গামছা রোদে শুকোতে দিয়ে পাগল মানুষটির আস্তানার দিকে রওনা হলাম। দীনদয়ালকে দেখতে পেলাম না। সে বোধহয় মন্দিরে গিয়েছে। রাস্তা চিনে সেই মানুষটির আস্তানায় পৌঁছে দেখি, সেখানে তিনি নেই। ছেঁড়া কাপড় চোপড়, ময়লা কাঁথা, একটা ছেঁড়া কম্বল, গোটা কয়েক মাটির ভাঁর এবং কলসী পড়ে আছে। ফিরে আসব বলে মুখ ঘুরিয়েছি, এমন সময় দেখি একটা মাটির ভাঁরে পোয়া খানেক দুধ নিয়ে তিনি আসছেন বিড়বিড় করতে করতে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, তিনি বলছেন - দেখ্ ভেক্কি! দেখ্ দেখ্, মন্দিরে মন্দিরে নকল দানারই চল বেশী। নকলি দানা, ভুলিয়ে দিয়েছে মিছরীর পানা। ওঁকারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর সাজলেন, পড়ে রইলেন আকাশের নিচে, কালোমুখো আর সাদামুখোর জন্য প্রাসাদ হয়েছে।

দুধের ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন - হয় এই দুধটুকু খা নয়ত যমের বাড়ী যা।
উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলে চললেন - যম বেটা ভাই দুমুখো থলি, তাই জন্য বেটার আঁত খালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে? থাকছে, থাকছে ?
আমি বসে বসে তাঁর হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি এঁর কাছে কিছু সাধনতত্ত্ব জেনে নেব কিনা। পাগল সেজে নাচছেন, ইনি বলবেন কি! ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাছে এসে বাঁ হাতে আমার চিবুক নেড়ে, ডানহাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলতে লাগলেন - সে গুড়ে বালি! সে গুড়ে বালি! কেন বকাস্ খালি! বলি ও মা রেবা, তখন ত সেই জলে ভাসা মর্কট মুনিটার (বোধহয় মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কথা বলছেন) কাছে বড় মুখ করে বলেছিলি, তোর পাড়ে পাড়ে যে ঘুরে মরবে তার পেট তুই ভরিয়ে দিবি। তবে দে না এই বামুনের ছেলের পেটটা ভরিয়ে। হ্যাগা! বুড়ো হয়ে কি তোর চোখে ছানি পড়েছে! আঁটকুড়ির আবার 'ছেলে ছেলে' বলে আদিখ্যেতা। ঝেড়ে দে, ঝেড়ে দে, ধরনা বায়না, বসে বসে কাঁদনা ! কান্নার বন্যায় বেটিকে দে চুবিয়ে - তখন দেখবি বেটিও আসছে, তাঁর বাপও আসছে। বেটি! তুই নাকি বাপসোহাগী! তবে ক্যানে এই বাপ-সোহাগে বামুনের ছেলেটাকে দেখবিনা?
এই বলে পলক ফেলতে না ফেলতে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। কতক্ষণ আর বসে থাকব। আমি চব্বিশ অবতারের মন্দিরে ফিরে এলাম। এসে দেখি দীনদয়ালের গুরুদেব এসেছেন। মনে হল এই মহল্লার সব লোক এসেছে মহাত্মা রামদাসজীকে দর্শন করবার জন্য। সাধু দাঁড়িয়ে আছেন, স্ত্রী পুরুষ যেই প্রণাম করছে, তিনি সকলেরই দুটো হাত জরিয়ে ধরে 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলে ভক্তদের হাতে মাথা ঠেকাচ্ছেন। সৌম্যকান্তি সাধুর মস্তক মুণ্ডিত গলায় মোটা তুলসীর মালা, চোখগুলো অস্বাভাবিক ভাবে শিশুদের চোখের মত সাদা। চোখের এই স্বচ্ছতা নির্মল হৃদয়ের লক্ষণ। প্রথম দর্শনেই সাধুকে ভাল লাগল।
আমাকে দেখতে পেয়েই ভীড় ঠেলে দীনদয়াল এগিয়ে এসে বলল - আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? বাবা চিন্তা করছিলেন। গুরুজী বিশ মিনিট আগে এসেছেন। চলুন পরিচয় করিয়ে দিই। আমি বললাম - ভক্তের ভীড় কমুক, আমি দেখা করব। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসে থাকলাম। মিনিট পনের পরেই স্বয়ং সাধুজী 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলতে বলতে আমার ঘরে ঢুকলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।
- দীনদয়াল বলতে থে আপ্ চিত্রকূট ভি গয়ে থে? উহ্ হমারা অভীষ্ট তীর্থ হৈ, মহাতীর্থ হৈ।
- আপনি নর্মদাতটে এসে বলছেন, চিত্রকূট মহাতীর্থ। আর আমি ওঁকারেশ্বরকেই মহাতীর্থ জ্ঞানে ছুটে এসেছি। সারা ভারতের লোকই আমাদের রাজ্যে মহর্ষি কপিলের তপস্যা ক্ষেত্র গঙ্গাসাগরকে মহাতীর্থ জ্ঞানে দেখতে যায়, আর আমরা বাংলার মানুষরা উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন দুর্গম স্থানে ভগবানের লীলাক্ষেত্রকে মহাতীর্থ জ্ঞানে সহস্র কষ্ট সহ্য করেও দেখতে ছুটে যাই।
- ইহ্ বাত সচ্ হ্যায়। চিত্রকূটমেঁ কোন কোন স্থান আপনে দর্শন কিয়া ?
- মন্দাকিনী তটের তুলসীঘাট থেকে সতী অনুসূয়া স্থান পর্যন্ত সব জায়গাতেই গিয়েছি, কামদগিরির শ্রীমুখারবিন্দম্ দেখেছি এবং পরিক্রমা করেছি।
- আচ্ছা কহিয়ে ত, কামদগিরিমেঁ কুছ লিখা হ্যায় ?
- সারা চিত্রকূট জুড়ে পথে ঘাটে মহাত্মা তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের বহু দোঁহা এবং শ্লোক লেখা আছে। তার মধ্যে কামদগিরির প্রধান ফাটকে যে দোঁহাটি লেখা আছে তা বলছি শুনুন -

কামদ ভয়া গিরি রাম পরসাদা।
অবলোকন টুটিত সব অবসাদা॥

অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্রের অনুগ্রহে পর্বতটি সর্বাভীষ্ট প্রদানকারীর মর্যাদা পেয়েছে। এই পর্বতশিখর (যেখানে প্রভু বনবাসকালে মা জানকীকে সঙ্গে নিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন) দর্শন করা মাত্র মনের সব অবসাদ দূর হয় - বলুন, পরীক্ষায় পাশ ত ?
সাধু আমাকে জড়িয়ে ধরে 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলে আদর করতে লাগলেন। বললেন - আভি চলিয়ে মন্দির পরিক্রমা করুঙ্গা।
আমি তাঁর সঙ্গে চব্বিশ অবতারের মন্দিরে এলাম। দীনদয়ালও সঙ্গে এল। সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে সমগ্র মন্দির পরিক্রমা করলেন।

আমার পাশের ঘরটিতেই সাধুর থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিক্রমা সেরে এসে বসতেই আমি সাধুকে বললাম - এখান থেকে ভাণ্ডারী তীর্থ কোন পথ দিয়ে যাবো ?

তিনি বললেন - বেফিকর রহিয়ে। ওঁকারেশ্বরের মহাতীর্থ হতে দু'মাইল পূর্ব দিকে গেলেই নর্মদা ও কাবেরীর সংগমে ভাণ্ডারী তীর্থ। আমি নিজে সঙ্গে করে ভাণ্ডারী তীর্থ এবং এরণ্ডী সংগম দেখিয়ে আনব। ওঁকারেশ্বরে আমার একটা 'ভজনকুটীর' আছে। সেখানেই তুমি থাকবে। আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়বনা। আমিই তোমাকে ওঁকারেশ্বরের সব মন্দির দর্শন করিয়ে দেব। কাল সকালেই আমরা ওঁকারেশ্বরে যাত্রা করব।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যে যার ঘরে ভোগ পরিবেশন করা হল। কিন্তু সাধুজী দীনদয়ালকে হুকুম করলেন, আমার ভোগও তাঁর পাশে পরিবেশন করতে। আমি পাশের ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর। আমার নিজেরই খুব সঙ্কোচ বোধ হল। কাল থেকে এই ভক্ত পরিবারকে দেখছি, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত যখন গুরুকে ভোগ নিবেদন করে সে ত কেবল খাদ্যসম্ভার মুখের কাছে এগিয়ে দেওয়া নয়, সেও এক রকমের পূজা। আমি তাঁকে সাড়া দিয়ে বললাম - আমার একা একা খেতে ভাল লাগে। আমি এ ঘরেই বসে খাই! কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। নিজে এসে আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসতে বাধ্য করলেন।

ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তাঁকে পাগলা সাধুর বিবরণ বললাম। সেই মানুষটির কথা যা লিখে রেখেছি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তাও ব্যাখ্যা করে শোনালাম। সব শুনে তিনি বললেন - এতো সিদ্ধ অবধূতের লক্ষণ। ভক্তিপথের পথিকরাও অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চল দেখি গিয়ে আমরা তাঁর দর্শন পাই কিনা। দীনদয়ালের বাবা কাকারা বাধা দিলেন। বললেন - গুরুজী ইহ্ বেহদ্ পাগল হ্যায়, কিন্তু সাধুজী কারো কথাই শুনলেন না। দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাগলা সাধুর আস্তানা অভিমুখে যাত্রা করলাম। কিন্তু আস্তানায় তিনি নেই। কুটীর ফাঁকা। সকালের সেই দুধের ভাঁড় পড়ে আছে। প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেও তাঁর দেখা পাওয়া গেলনা। ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে আমি নর্মদায় গেলাম। স্নান, সন্ধ্যা সেরে আসার সময় দেখি মন্দিরে আরতি শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে লোক এসে মন্দিরে জমায়েৎ হয়েছে। দীনদয়াল আমাকে বললো - আপনি ঘরে গিয়ে ভিজা গামছা এবং কমণ্ডলু রেখে আসুন। মন্দিরে বসে গুরুজী জপ্ করছেন। আজ তিনি রাম মহিমা গাইবেন। তাই মহল্লার লোকজন এসেছে। এক ঘন্টার মধ্যে আসর শেষ হবে, পাহাড় জঙ্গল এলাকাতে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। আমি ঘরে গিয়ে গামছা কমণ্ডলু রেখে মন্দিরে ফিরে এলাম। সাধু জপ্ সেরে বাইরে এসে বসেছেন। লাঠি, বল্লম, টাঙি সঙ্গে নিয়ে ভক্তরাও বসে আছে। আমাকে দেখেই সাধুজী বললেন, প্রভু রামচন্দ্রের দোহাই, তুমি একটা স্তব শোনাও। তাঁর কথার ভঙ্গীতে আর না বলার উপায় রইলনা। আমি কেবল বললাম, সংস্কৃতে একটা স্তব করছি, কিন্তু হিন্দিতে তা ব্যাখ্যা করতে পারবনা। আপনি এঁদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। আমি স্তবপাঠ করতে লাগলাম -

ওঁ ভবোদ্ভবং বেদবিদ্যাং বরিষ্ঠম্
আদিত্য-চন্দ্রানল-সুপ্রভাবম্।
সর্বাত্মকং সর্বগতস্বরূপম্
নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
নিরঞ্জনং নিষ্প্রতীম্ নিরীহং
নিরাশ্রয়ং নিষ্কলম্ প্রপঞ্চম্।
নিত্যং ধ্রুবং নির্বিষয়স্বরূপম্
নিরন্তরং রামমহং ভজামি ॥
ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং ত্বং
ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপম্।
ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং ত্বং
ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥

সাধুজী এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করবেন, তাই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দেখি, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি 'সিয়ারাম, সিয়ারাম' বলে কেঁদে উঠলেন। আর ব্যাখ্যা! সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক বাজিয়ে রামা হো রামা হো কীর্তন শুরু হয়ে গেল। ভগবানের নাম উচ্চারণ হচ্ছে বলে 'কীর্তন' বললাম, আসলে চীৎকার, হৈ হল্লা। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে হাত তুলে তিনি ভক্তদেরকে নিরস্ত করলেন। বলতে আরম্ভ করলেন - সবাই বলে শিবভূমি বলে নর্মদাতটে শিবই উপাস্য। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, বেদ-পুরাণে মহাপুরুষরা বলে গেছেন, যিনি শিব তিনিই রাম। মা জানকী এবং আদ্যাশক্তিতে কোন ভেদ নেই। ত্রেতাযুগের বাল্মিকী মুনি এযুগে তুলসীদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তুলসীদাসজী রচিত 'রামচরিতমানস' এ যুগের নব রামায়ণ। রাম নামে মুক্তি হয়, সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। রামভক্তের মৃত্যুকালে অন্নপূর্ণারূপিনী মা জানকী মৃত ব্যাক্তির কর্মপাশ ছেদন করেন। বিশ্বনাথ মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে মৃত ব্যাক্তির সুক্ষ্মদেহের কর্ণকুহরে তারক ব্রহ্ম নাম অর্থাৎ রাম মন্ত্র দান করেন। অহরহ রাম নাম করলে মহাদেব তুষ্ট হন, সব দেবতাই তুষ্ট হন। 'রামচরিতমানস'-এর প্রত্যেক দোঁহাতেই অমৃত আছে। তোমরা তা নিত্য পাঠ করবে। যেখানে 'রামচরিতমানস' পাঠ হয় সেখানে প্রভু রামচন্দ্র সপরিবারে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন।

রামচন্দ্র শিবের মতই আশুতোষ, করুণাময় এবং ভক্তবৎসল। ভগবান তুলসীদাসজীর জীবনের একটা ঘটনা বলছি, মন দিয়ে তোমরা শোন। চিত্রকূটে মন্দাকিনীতটে বসে তুলসীদাসজী একদিন তাঁর নিত্যপূজার আয়োজন করছেন। ঝোলা থেকে চন্দনকাঠ ও শিলা বের করে চন্দন ঘষছেন, হঠাৎ একটি অপূর্ব সুন্দর বালক সেখানে এসে উপস্থিত হল। শ্যামলকান্তি বালকের চোখে মুখে অপরূপ লাবণ্যের ছটা, হাতে আবার একটি ছোট ধনুক। এসেই বালক আবদার করতে লাগল - ওগো তুমি আমার কপালে একটা চন্দনের তিলক এঁকে দাওনা গো। তুলসীদাসজী যতই বলেন, ঠাকুরের জন্য চন্দন ঘসছি, আগে ঠাকুরকে দিই, ততই বালক কচি দুটি হাত দিয়ে তাঁর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে আব্দার করতে থাকে - একটুখানি চন্দন আমার কপালে লাগিয়ে দাওনা গো। বালকের হস্তস্পর্শে তুলসীদাসজী ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি বালকের কপালে তিলক এঁকে দিতে দিতে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন -

বালক শুনহ বিনয় মম এহুঁ।
তুম শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহুঁ॥

তাঁর চোখের সামনে ভগবান রামচন্দ্রের মঞ্জুল মোহন দিব্যমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হওয়ার পর প্রেমাশ্রু মুছে লিখে রাখলেন -

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সব সন্তন কী ভীড়।
তুলসীদাস চন্দন ঘসে তিলক দেই রঘুবীর॥

তামাম হিন্দুস্থানের সব লোকই এই ঘটনা জানে। এইভাবে দিব্যানুভূতি হবার পরে তুলসীদাসজী রামচরিতমানসের প্রতিটি শ্লোকে তা লিখে গেছেন। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে রামনাম কীর্তন কর। এই বলে তিনি কীর্তন ধরলেন। ঢোলক বাজিয়ে তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সকলেই কীর্তন করতে লাগলেন। মহাত্মা রামদাসজীর কণ্ঠ খুবই মিষ্টি, তার উপর রামনামের মাদকতা কীর্তনস্থলীতে এমন ভাবে হিল্লোল তুলেছে যে সবাই স্থান কাল সময়ের কথা ভুলে গেছে। রাত্রি বোধহয় আটটা বা সাড়ে আটটায় কীর্তনের আসর ভাঙল। সকলেই একে একে সাধুকে প্রণাম করে যে যার ঘরের পথে রামনাম করতে করতে চলে গেলেন। প্রত্যেকের মুখে চোখে এমন একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির ভাব দেখলাম, যাতে আমারও মন ভরে উঠল। দূর থেকে তাদের ঢোলকের শব্দ এবং রামনাম ভেসে আসছে। রামনামে সবাই এতক্ষণ ধরে এমন মাতোয়ারা ছিল যে, ওঁকারের ঝাড়ির বাঘ হায়না নেকড়ের ভয় তাদের চিন্তার মধ্যে স্থান পায়নি।

বাসায় এসে সাধুজীর সঙ্গে গল্প করতে থাকলাম। তিনি এখন আমাকে একান্তে পেয়ে বললেন- সকাল থেকে আমি তোমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চাইনি, কেন জান ? জব্বলপুর হতে মহাত্মা সুমেরদাসজী পরিক্রমাকারী জমায়েতের জনৈক সাধুর হাতে একটি পত্র দিয়েছেন তিনমাস আগে। তাতে লিখেছেন- একজন কাঠের কৌপীনধারী বাঙালী যুবক-সাধু পরিক্রমা করতে করতে ওঁকারেশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি তার দেখা পেলে গরম কালটা তোমার কাছেই আটকে রেখো। এই ভিক্ষা আমি তোমার কাছে চাচ্ছি। আজ আটদিন আগে একটা জমায়েৎ মুণ্ডমহারণ্য থেকে ওঁকারেশ্বরে এসে তাদের জপ্ সমর্পণ করেছে। সেই দলেরই একজন আমাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে, এই দেখ। বলে তাঁর ঝুলি থেকে হিন্দীতে লেখা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন - দেখিয়ে আপকা উপর উনকা মহব্বৎ ক্যায়সা হ্যায়।

চিঠিটা পড়ে দেখলাম, তিনি আমার নাম ধাম শিক্ষা দীক্ষা, বেদ এবং পিতার প্রতি অন্ধভক্তি, পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য নর্মদা পরিক্রমার ব্রত গ্রহণ সব কিছুই লিখেছেন। এমনকি আমার তার্কিক প্রকৃতির কথাও বাদ দেননি। পত্রের ছত্রে ছত্রে আমার জন্য তাঁর আকুলতা ফুটে উঠেছে। চিঠি পড়তে পড়তে জব্বলপুর ভিড়াঘাটের সেই বৃদ্ধ মহাত্মার স্নেহ ও দয়ার কথা ভেবে বুকের মধ্যে কান্না উজিয়ে আসতে লাগল। আর একবার অনুভব করলাম যে ভালবাসা অন্ধ হয়।

ভাবতে লাগলাম, আমি তাঁর শিষ্যও নয়, ভক্তও নয়, তাঁর কোন সেবাও করিনি, তবুও আমার প্রতি তাঁর অহেতুক ভালবাসার কারণ কি। ১৯৪৯ সালে প্রথম যখন অমরকণ্টক যাই, তখন পেণ্ড্রা রোডে নেমেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই থেকে তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত ভালবেসেছেন। একি কোন জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ, নাকি - অন্য কিছু !

রামদাসজীর কণ্ঠস্বরে আবার যেন জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, একবার তিনি মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করে মান্দালায় এসে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পথের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। মহাত্মা সুমেরদাসজী তাঁকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে 'ভীষ্মাশ্রমে' তিন মাস রেখে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। সেই থেকে ইনি সেই মহাপ্রাণ মানুষটির কাছে ঋণী আছেন। সেই ঋণ শোধের সুযোগ তিনি এতদিন পরে পেয়েছেন। সুমেরদাসজীর স্নেহের পাত্র অর্থাৎ আমাকে যত্ন করে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করতে চান। বললেন - মহাত্মা সুমেরদাসজী হমারা শ্রদ্ধাভাজন দোস্ত হ্যায়। হম্ উনকা বচন জরুর রক্ষা করেঙ্গে। অব্ ত আপ্ হমারা বন্দী হো গিয়া। ইহ্ গরমী কা বখৎ আপকো ছোড়েঙ্গে নেহি। কাল সুবাহ্-সে ১৩৬১ সন কি পহেলা তারিখ শুরু হোগা। বিহানমেঁ আপকো সাথমেঁ লেকর ওঁকারেশ্বর যাত্রা করেঙ্গে। এই বলে হাসতে লাগলেন। তাঁর দোস্ত কথাটাতেই আমি চমকে উঠলাম। নাগফণী সম্প্রদায়ের শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ নাঁগা মোহান্ত মহেশ গিরিও ত মহাত্মা সুমেরদাসজীর দোস্ত ছিলেন। ইনি কিরকম 'দোস্তির' পরিচয় দেবেন! কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব প্রকৃতি এবং প্রসন্ন সাত্ত্বিক মুখমণ্ডল দেখে মন আশ্বস্ত হল। আমি তাঁকে নমস্কার করে এসে পাশের ঘরে শয্যা পাতলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম ১৩৬০ সালের ১লা আশ্বিন অমরকণ্টক থেকে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলাম। আগামীকাল ১৩৬১ সালের ১লা বৈশাখ ওঁকারেশ্বরের পদতলে গিয়ে প্রণাম করব। সাতমাস সময় কেটে গেল, এখনও রেবা-সংগম কতদূরে? কানে ভেসে এল রামদাসজীর কণ্ঠস্বর। তিনি গুণগুণ করে গাইছেন -

বিশ্বরূপ রঘুবংশমণি করহু বচন বিশ্বাসু।
লোক-কল্পনা বেদ কহ্ অঙ্গ প্রতি জাসু ॥
পদ পাতলা, শীস অজধামা অপর লোক অঙ্গ অঙ্গ বিশ্রামা,
ভ্রূকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা, নয়ন দিবাকর কচ্ ঘনমালা।
জাসু ঘ্রাণ অশ্বিনীকুমারা নিশি অরু দিবস নিমেষ অপারা।
শ্রবণ দিশা দশ, বেদ বখানী, মারুত শ্বাস, নিগম নিজবাণী।
অধর লোভ, যম দশন করালা, মায়া হাস্য বাহু দিগপালা।

অর্থাৎ 'রামচরিতমানসে' তুলসীদাসজী দোঁহা মুখে বলেছেন - আমার কথা বিশ্বাস কর - রঘুবংশমণি রামচন্দ্র বিশ্বরূপে পরিব্যাপ্ত। পাতাল তাঁর চরণকমল, শিরোদেশ ব্রহ্মলোক, অন্যান্য ভুবনও তাঁর বিভিন্ন অবয়বে অবস্থিত। তাঁর ভ্রূকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কাল, দিবাকর তাঁর চক্ষু, মেঘমালা তাঁর কুণ্ডল, অশ্বিনীকুমার তাঁর নাসিকা, তাঁর অশেষ অবিরাম পলকপাতেই দিন ও রাত্রি, দশদিক তাঁর কর্ণ, স্বয়ং বেদ এই কথা বলেছেন। বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, নিগম তাঁর শ্রীমুখের বাণী, লোভ তাঁর অধর, তাঁর করাল দ্রংষ্ট্রা হল যম, মায়া তাঁর হাসি এবং দিকপালগন তাঁর বাহু।

বুঝলাম, রামদাসজী শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে সর্বব্যাপী মহাবিষ্ণুরূপের অনুধ্যান করছেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠেই উভয়ে স্নান করে এলাম। তিনি চব্বিশ অবতারের মন্দির সাষ্টাঙ্গে পরিক্রমা করে এসে ভক্তদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে দীনদয়াল ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। আমরা দুজন

তাঁর পেছনে হাঁটতে লাগলাম। আমাকে বললেন - আমরা নীমাড় জেলার মধ্য দিয়ে চলেছি নর্মদাতটের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ওঁকারমান্ধাতার দিকে। ১৩৬১ সালের ১লা বৈশাখের এই দিনটিকে (বুধবার, ১৪।৪।১৯৫৪) তুমি তোমার জীবনের পরম শুভদিন বলে মনে রাখবে। কারণ তুমি আজ দর্শন পাবে সূর্যবংশের সম্রাট মান্ধাতা প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্লিঙ্গ ওঁকারেশ্বরের।

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম - কারও প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু হন কি করে ?

মহাত্মা রামদাসজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন সম্রাট মান্ধাতা বৈদূর্য পর্বতে এমন কঠোর শিব তপস্যা করেছিলেন যে, তার তপস্যা প্রভাবে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকটিত হয়েছিল।

মান্ধাতার তপস্যায় ওঁকারেশ্বরের উদ্ভব বলে নর্মদার বুকে জেগে ওঠা ঐ পর্বতের নাম - ওঁকারমান্ধাতা। এই দ্বীপে বহু মন্দির আছে। সেইগুলি শিবপুরী, ব্রহ্মাপুরী এবং বিষ্ণুপুরী - এই তিনভাগে বিভক্ত। এই তিনপুরীর চারদিকে নর্মদা এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে মনে হয় যেন 'ওঁ' এই অক্ষরের আকারে তা বিছিয়ে আছে, জলের প্রবাহ সেইভাবেই এঁকেবেঁকে গেছে। দ্বীপটি প্রায় সাড়ে তিন মাইল লম্বা এবং দুই মাইল চওড়া। দ্বীপের মধ্যবর্তী সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী একটি উপত্যকা দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকে নদী থেকে চার-পাঁচশো ফুট উঁচু পর্বতমালা উঠে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশেছে। মান্ধাতার বিপরীত দিকে নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্বত সমাকীর্ণ। কাবেরী এবং নর্মদার মধ্যস্থলে ওঁকার মান্ধাতা আর দুই নদীর সংগমস্থলে কুবেরের তপস্যাস্থল ভাণ্ডারী তীর্থ। তাই তোমাকে বলছিলাম, ভাণ্ডারী তীর্থে যেতে হলে এই ওঁকার মান্ধাতা থেকেই যাওয়া সুবিধাজনক। আচ্ছা তুমি বল দেখি মান্ধাতা সম্বন্ধে তোমার কতটুকু জানা আছে ?

- রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে যা বলা আছে, সেটুকুই কেবল জানি, যে মান্ধাতা সূর্যবংশের সম্রাট। নর্মদার তট থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রায় পুরো আর্যাবর্তেই তিনি আপন আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞও করেছিলেন। আমি গত বছর কৈলাস-মানস সরোবর গিয়েছিলাম। মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদের উত্তর-পশ্চিমে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। তার নাম গুরেলা - মান্ধাতা। সেখানকার হিন্দু এবং লামা সাধুদের মতে গুরেলা মান্ধাতাও মহারাজ মান্ধাতার তপস্যাক্ষেত্র। তাঁর যজ্ঞাগ্নি এখনও আগ্নেয়গিরির মত দেদীপ্যমান।

বৈবস্বত মুনির পুত্র ইক্ষাকু ছিলেন মান্ধাতার আদি পূর্বপুরুষ। মান্ধাতার পিতার নাম যুবনাশ্ব, পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। মান্ধাতার জন্মরহস্য বড়ই বিচিত্র। অপুত্রক রাজা যুবনাশ্ব পুত্রলাভ কামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ শেষ হলে মুনিরা মন্ত্রপুত জল একটি কলসীতে রেখে নিদ্রা যান, এদিকে রাত্রি শেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা সেই জল পান করেন, ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়। পরে তাঁর পার্শ্বদেশ ভেদ করে মান্ধাতা ভূমিষ্ঠ হন। মাতৃস্তনের অভাবে শিশু কিভাবে বেঁচে থাকবে এই চিন্তায় যুবনাশ্ব কাতর হলে ইন্দ্র সেখানে আবির্ভূত হয়ে বলেন - ধাস্যতি মাময়ং। এই বলে ইন্দ্র তাঁর দক্ষিণ হস্তের 'প্রদর্শিনী' অর্থাৎ তর্জনী শিশুর মুখে পুরে দিয়ে বললেন - মামধাতা মামধাতা। আমার দ্বারা তুমি পালিত হও। ইন্দ্রের সেই উক্তি অনুসারেই শিশু মন্ধাতা নামে প্রসিদ্ধ হন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে মান্ধাতা রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিনপুত্র এবং পাঁচকন্যা জন্মগ্রহণ করে। অম্বরীষ অসাধারণ হরিভক্ত ছিলেন। দুর্বাসার কোপে পড়ে অম্বরীষ নানা দুঃখ নির্যাতনে পড়লে স্বয়ং ভগবান তাকে রক্ষা করেন। সুদর্শনচক্র সর্বত্র মহর্ষিকে তাড়া করে ফিরতে থাকে। দুর্বাসা অম্বরীষের সঙ্গে প্রসন্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হন। মান্ধাতা একবার স্বর্গজয় করতে গেলে, ইন্দ্র তাঁকে বলেন যে, তিনি যেন সমগ্র পৃথিবী জয় করার পর স্বর্গ জয়ের স্বপ্ন দেখেন। মধুদৈত্যের পুত্র লবনাসুর ত এখনও তাঁর অধীনতা স্বীকার করেনি। এই কথা শুনে মান্ধাতা লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান এবং সেইখানেই তিনি লবণাসুর কর্তৃক নিহত হন।

- মান্ধাতার কনিষ্ঠ পুত্র মুচকুন্দ পিতার মতই দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি এই নর্মদাতটে এক বিরাট নগরী স্থাপন করেন। মুচকুন্দের মৃত্যুর পর হৈহয়রাজ মাহিষ্মতী সেই নগরী জয় করে নেন এবং তাঁর নামানুসারে নগরীর নাম হয় মাহিষ্মতী। মহারাজ কৃতবীর্যের পুত্র রাবনজয়ী কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন হৈহয়

বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর আমলে মাহিষ্মতী দূর্জয় দুর্গনগরীতে পরিণত হয়। এখন সেই মাহিষ্মতী নগরীর চিহ্নমাত্র নেই। তবু লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে জেগে আছেন মান্ধাতা পূজিত ওঁকারেশ্বর, অমর হয়ে আছে নর্মদা বক্ষের ঐ শৈলদ্বীপ মান্ধাতা ক্ষেত্র। ঐ দেখ সেই মান্ধাতা ক্ষেত্র, ওঁকারেশ্বরের ঘাটে পৌঁছে গেছি। আজ পয়লা বৈশাখের শুভদিনে এখান হতে প্রণাম কর নর্মদাবক্ষের বৈদূর্যপর্বতস্থিত ওঁকারেশ্বর মহাদেবকে।

ঘাটে দুটি নৌকা ভিড়ানো আছে। বেলা হবে দশটা। আমি নর্মদাস্পর্শ করেই রামদাসজীকে জিজ্ঞাসা করলাম - নর্মদার উপর দিয়ে নৌকাতে করে যে ওঁকারেশ্বর দর্শন করতে যাব, তাতে আমার পরিক্রমা খণ্ডিত হবে না ? তাছাড়া আমি কপর্দকহীন পরিব্রাজক, নৌকার পারানি ত আমি দিতে পারবনা।

- সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনা। তুমি ত পরিক্রমাবাসী, পরিক্রমাবাসীকে বিনা শুল্কে পারাপার করাবার জন্য মাঝিরা নাগপুরের রাজদরবার হতে পয়সা পায়। তাদের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করা আছে। আর পরিক্রমা খণ্ডিত হবে কেন ? তুমি ত নর্মদাকে লঙ্ঘন করে একেবারে দক্ষিণতটে পৌঁছাচ্ছ না। নর্মদা বক্ষের দ্বীপে যাবে। ওঁকারক্ষেত্র দর্শন করে পুনরায় ত এখানে এই উত্তরতটে এসে পরিক্রমা আরম্ভ করবে। তাহলে লঙ্ঘনটা হচ্ছে কিভাবে! আমি জানি, অনেক পরিক্রমাবাসী উত্তরতট দিয়েই হোক আর দক্ষিণতট দিয়েই হোক পরিক্রমা করাকালীন পরিক্রমা ভঙ্গের ভয়ে ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করতে যায়না। এটা তাঁদের মনের অন্ধ সংস্কার এবং গোঁড়ামী মাত্র। তুমি বল, নর্মদাতটের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্যোতির্লিঙ্গ ওঁকারেশ্বরের দর্শন ও পূজা না করে তাঁর মন্দিরের নিকট দিয়ে চলে যাওয়ায় কি অপরাধ হবেনা! সে অপরাধ কি শিবপুত্রী নর্মদা ক্ষমা করবেন! তিনি কি তাতে প্রসন্না হবেন ? তুমি অহেতুক কোন আশঙ্কা কোরোনা। এতে যদি অপরাধ হয়, সে পাপ আমার হবে। এস নৌকাতে ওঠ - এই বলে তিনি আমার হাত ধরে নৌকাতে উঠিয়ে নিলেন।

নর্মদার নিস্তরঙ্গ শান্ত সবুজ স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে নৌকা তরতর করে বয়ে চলল। মহাত্মা রামদাসজী জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সিয়ারাম কী জয়, জয় ওঁকারেশ্বরকী জয়। কোটিতীর্থের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোটিতীর্থের ঘাট অতি অতি বিশাল। বৈদূর্য পর্বতের ঢাল ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকার এই ঘাট। পর্বতের ঢালুদেশ সোজা বাঁধানো ঘাটের উপর নেমে এসেছে। কাশীতে দশাশ্বমেধঘাট প্রয়াগঘাটে যেমন এখানেও সেইরকম ছায়া-ঢাকা চৌকি স্নানার্থীদের জন্য পাতা আছে। কোণে কোণে কয়েকটা গহ্বর, এইগুলো সাধুদের আশ্রয়। কয়েকজন সাধুকে সেই গুম্ফাতে বসে থাকতে দেখলাম। সিঁড়ির ধারে কয়েকজন ভিক্ষুক এবং শিবপূজার বেলপাতা ও ফুল সাজিয়ে নিয়ে বিক্রীর জন্য কয়েকজন স্ত্রীলোকও বসে আছেন।

ঘাটে নেমেই রামদাসজী দীনদয়ালকে বললেন - ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম করেই দ্রুত 'ভজন আশ্রমে' চলে যাও। মঙ্গলদাস ও অচ্যুতদাসকে আমাদের কথা জানাবে। ঠাকুরজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা যেন যথাসময়ে করা হয়। আমরা বারটা সাড়ে বারটা নাগাদ আশ্রমে পৌঁছাব। দীনদয়াল চলে গেল। তিনি কোটিতীর্থের জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দিয়েই বললেন - ওঁকারেশ্বরের মহাতীর্থের আমিই তোমার তীর্থপাণ্ডা বা তীর্থগুরুর কাজ করব, সমস্ত ভাল করে দেখিয়ে দেব। ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমা করিয়ে দেব।

হাসতে হাসতে বললেন - জান ত, তীর্থগুরুর কথা মান্য করতে হয়। মহাত্মা সুমেরদাসজীর দয়ায় আমি করাল ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। একথা তোমাকে আগেই বলেছি। তাঁর সেই সেবার ঋণ আমাকে শোধ করতে দাও। গরমকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক। সেই হবে আমার তীর্থপাণ্ডা হিসাবে দক্ষিণা। আমি কোন উত্তর দিলাম না। কোটিতীর্থের ঘাটে কমণ্ডলুতে জল ভরে আমি তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠেছে। পাহাড়ের ঢালুতে লোকজনের ঘরবাড়ী চোখে পড়ছে। পাহাড়ের ঢালুতেই মন্দির। দুপাশে ছোট বড় অনেক মন্দির, অনেক বিগ্রহ দেখতে দেখতে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের সামনে এলাম। সুন্দর শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি। তার প্রান্তে শ্বেত ধবল সুউচ্চ মন্দির, যার সামনে নর্মদার সবুজ জল শান্ত স্থির, পেছনে পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছপালার সমারোহ, এই অপূর্ব পটভূমিকায় এই মন্দিরকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মন্দিরের সামনে এবং আশেপাশে কত যে দেবমূর্তি। জালেশ্বর, নন্দী, গনপতি, মহাবীর (হনুমানজী), দুর্গা, অবিমুক্তেশ্বর, শুকদেব, মান্ধাতা সবাই আছেন।

রামদাসজী একে একে সব বিগ্রহ দর্শনান্তে আমাকে নিয়ে ঢুকলেন মূল ওঁকারেশ্বর মন্দিরের নাট মন্দিরে। পশ্চিমমুখী মন্দির। বিশাল বিশাল লাল পাথরের স্তম্ভ পর্বতগাত্রে এই মহাদেব মন্দিরকে সুউচ্চ ভিত্তির উপর খাড়া রেখেছে। স্তম্ভগুলি কারুকার্যমণ্ডিত। নাটমন্দিরের কক্ষতলে সাদা এবং কালো চৌকো পাথর বসানো আছে। নাটমন্দিরের প্রান্তে মন্দিরের গর্ভগৃহ, তার দরজা উত্তরমুখী। সেই গর্ভগৃহে মান্ধাতা পূজিত ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ স্বমহিমায় বিরাজমান।

প্রচণ্ড গরমের জন্য এ সময় তীর্থযাত্রীর ভীড় নেই বললেও চলে। নাটমন্দিরে কয়েকজন সাধু বসে জপ করছেন, দু'চারজন পাণ্ডাও ঘোরাফেরা করছেন পূজার্থী ভক্তের প্রতীক্ষায়। নাটমন্দিরের একপাশে গাঁঠরী এবং লাঠিটি ফেলে রেখে কমণ্ডলু হাতে এগিয়ে যাচ্ছি গর্ভমন্দিরের দিকে, এমন সময় পেছন থেকে আলখাল্লায় টান পড়ল। চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম একজন লোলচর্ম বৃদ্ধ সাধু আমার আলখাল্লাকে ধরে আছেন। আমি থমকে দাঁড়াতেই রামদাসজী সেই সাধুকে উদ্দেশ্য করে বললেন-ক্যা মাঁগতে হো জী ?

বৃদ্ধ সাধু উত্তর দিলেন - মুঝে একদফে রেবাখণ্ডসে ওঁকারেশ্বরজীকা মহিমা শুনা দিজিয়ে।

রামদাসজী - আভী ইনকো ছোড় দো। পূজা করকে আপকো পাঠ শোনায়েগা।

বৃদ্ধ সাধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন - ঔর ভি দো চার আদমী এ্যায়সাহি বোলকে গেয়া। লেকিন্ পূজাকা বাদ কোঈ আদমি লৌটকে আয়া নেহি। আঁখ হমারা খরাব হো গেয়া। কুছ নেহি দেখাই দেতা।

আমি রামদাসজীকে বললাম - কে কখন কোন্ মূর্তিতে দেখা দেন তার কোন স্থিরতা নেই। ভক্তের কথা না রাখলে, ভক্তকে তুষ্ট না করে পূজা করতে গেলে হয়ত ওঁকারেশ্বর আমার পূজাই গ্রহণ করবেন না। ভক্তকী বড়াই ভগবানসে জ্যাদা হৈ। এই বলে আমি মেঝেতে কমণ্ডলু রেখে বৃদ্ধ সাধুর কাছে বসে পড়লাম। ময়লা গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো দেবনাগরী অক্ষরে ছাপানো 'স্কন্দপুরাণম্' নামক বিরাট পুঁথি খুলে তিনি কম্পিত হস্তে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলেন - বড়ি কিরপা, বড়ি কিরপা। ভগবান ওঁকারেশ্বর আপকা ভালা করেঁ। আমি পুঁথি খুলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কথিত ওঁকারেশ্বর মহিমা পড়তে লাগলাম -

শ্রী বিশ্বেশ্বর উবাচ -

দ্ব্যধিকং দেবি জানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্।
ওঁকারেশ্বর ইত্যাখ্যা যস্যাস্তি ভুবনত্রয়ে॥
প্রাকৃতে কল্পসংজ্ঞস্তু প্রথমে প্রথমং ময়া।
বক্ত্রাদুৎপাদিতো দেবি পুরুষঃ কপিলাকৃতিঃ॥

অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মহাদেব পার্বতীদেবীকে বলছেন, হে দেবি, যিনি জগতে ওঁকারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ, আমি সেই দ্বিপঞ্চাশত্তম লিঙ্গের (স্কন্দপুরাণের অবন্ত্যখণ্ডে 'চতুরশীতিলিঙ্গ মাহাত্ম্যম্' নামক অধ্যায়ে ৮৪ টি লিঙ্গের বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনায় ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ ৫২ তম) মাহাত্ম কীর্তন করছি, তুমি শোন। আমি পূর্বে প্রাকৃত কল্পে মুখ হতে এক কপিলাকৃতি পুরুষ সৃষ্টি করি। তাঁকে বলি - তুমি নিজের আত্মাকে বিভক্ত কর। 'কিভাবে আত্মাকে বিভক্ত করি' - সেই চিন্তায় যখন ধ্যানাবিষ্ট, সেই সময় আমার প্রসাদে তাঁর দেহ ভেদ করে ত্রিবর্ণস্বররূপী চতুর্বর্গফলপ্রদ ঋক্-যজুঃ - সাম নামক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঁকার স্বীয় প্রভাবে অখিললোক পরিব্যাপ্ত করে আবির্ভূত হলেন। ঐ সময় আমার উদার বাণী দ্বারা সমলঙ্কৃত হয়ে ঐ ওঁকারের হৃদয় হতে বষটকার ধ্বনি উত্থিত হল। আর ছন্দঃশ্রেষ্ঠা চতুর্বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট পঞ্চশীর্ষা মধুরভাষিণী দেবী গায়ত্রীও তাঁরই পাশে প্রকট হলেন। এই দেবী গায়ত্রী - সাবিত্রী নামে জগতে প্রসিদ্ধ।

গায়ত্রী মধুরা ভাষা সাবিত্রী লোকবিশ্রুতা॥
স চোঙ্কারো ময়া প্রোক্তো গায়ত্র্যা সহ পার্বতি।
সৃষ্টিং কুরু মমাদেশাদ্বিচিত্রামনয়া সহ॥

হে পার্বতি! আমি গায়ত্রী অনুস্যূত ঐ ওঁকারকে বললাম - তোমরা উভয়ে বিচিত্র সৃষ্টির প্রবর্তন কর। আমার কথা শুনে হিরন্ময় ত্রিশিখ ওঁকার স্বীয় জ্যোতিঃ থেকে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। সর্বপ্রথমে বেদ প্রকট হলেন; পরে ক্রমে ৩৩ জন বৈদিক দেবতা, কয়েকজন ঋষি ও মানুষ সৃষ্টি হল ঐ ওঁকার থেকে। হে পর্বতাত্মজে! এই জগৎপ্রভু ভগবান ওঁকার কল্পান্তকালে দেবতা অসুরসহ সমগ্র জীবকুল সংহার করে নিজের মধ্যে লীন করে নেন পুনরায় সমগ্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। ওঁকারদেব অব্যক্ত, শাশ্বত এবং সর্বজগতের স্রষ্টা।

কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ মহাংস্তু যঃ।
ওঁকারপূর্বকা বেদা যজ্ঞাশ্চোঙ্কার পূর্বকাঃ॥
ওঁকারপূর্বকং জ্ঞানং তপশ্চোঙ্কার পূর্বকম্।
স্বয়ম্ভুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ॥

ওঁকারই কর্তা, বিকর্তা, সংহর্তা ও মহান্। ওঁকার হতেই বেদ, যজ্ঞ, জ্ঞান ও তপস্যার উৎপত্তি ঘটেছে। ওঁকারই ভুবনাধিপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বায়ু, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সপ্তর্ষি, বসু, যক্ষরক্ষ-পিশাচ, দৈত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি, চতুষ্পদ ও তির্যকযোনি; সর্বভূতে তিনি, ভূতনাথও তিনি। সমস্ত সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হলে ওঁকার আমার কাছে তাঁর স্থিতিযোগ্য পবিত্র স্থান নির্দিষ্ট করে দিতে বললে, আমি শূলেশ্বর দেবের পূর্বভাগে (শূলপাণি ঝাড়ির শূলপাণির পূর্বদিকে) মহাকাল বনকে (ওঁকারেশ্বর ঝাড়িস্থিত এই স্থানটি) তাঁর আবাসস্থল হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিই -

মহাকালবনং দিব্যং সর্বসম্পৎকরং শুভং।
তত্র তে ভবিতা কীর্তিঃ শাশ্বতী নাত্র সংশয়ঃ॥
শূলেশ্বরস্য দেবস্য পূর্বভাগে ব্যবস্থিতম্।
ত্রিকল্পপ্রভবং লিঙ্গং তন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি।
ওঙ্কারেশ্বর ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি জগত্রয়ে॥
ইত্যুক্তো হি ময়া দেবী ওঁকারো হৃষ্টমানসঃ।
দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ॥

এই মহাকাল বনে ত্রিকল্পকালে ব্যেপে যে লিঙ্গ বিরাজমান আছেন ঐ লিঙ্গ তোমার নামে ওঁকারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আমার এই কথা শুনে ওঁকার আনন্দিত হয়ে ঐখানে ঐ লিঙ্গকে দর্শন করে তাতেই লয়প্রাপ্ত হন। তদবধি ব্রাহ্মণগণ যাগ যজ্ঞ তপস্যা এবং যে কোন পুণ্য কার্যে ওঁকারকেই প্রথমে স্থান দিয়ে আসছেন। সহস্র যুগাদ্যায়, শত ব্যাতিপাত যোগ এবং সহস্র অয়নে তপস্যায় নিমগ্ন থাকলে কিংবা চতুর্বেদ অধ্যয়ন করলে যে পুণ্য হয়, ওঁকারেশ্বর দর্শনে সেই পুণ্যই লাভ হয়ে থাকে।

পুঁথি পাঠ করে বৃদ্ধ সাধুর দিকে তাকাতেই দেখলাম, লোলচর্ম বৃদ্ধ মেরুদণ্ড খাড়া রেখে 'সমকায়শিরোগ্রীব' হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গরিয়ে পড়ছে। আমি কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম। চলেছি গর্ভ মন্দিরের দিকে ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে। এইমাত্র ওঁকারেশ্বরের যে মহিমার কথা পড়ে এলাম, তাতে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। ত্রিকল্পকাল ব্যেপে যে মহাজ্যোতির্লিঙ্গ এখানে স্বমহিমায় প্রকট আছেন, তাঁকে স্বহস্তে পূজা করতে যাচ্ছি, মনের দৈন্য ধরা পড়ছে। সাধন-ভজনের অভাব, তপোবীর্যের অভাব, ভক্তির অভাব - সব কিছু মনে করিয়ে দিতে লাগল যে আমি অযোগ্য, অ উ ম - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমন্বয় মূর্তি ওঁকার। তাঁর পূজা করার মত উপকরণ আমার নাই। যিনি একাধারে প্রণব ও পরপ্রণবতত্ত্ব, তাঁর সেই অতলান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বা রহস্য আমি ত স্বাধ্যায় করিনি। ওঁকারের মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে বৃদ্ধ সাধুর যেমন ধ্যানলোকে, চৈতন্যভূমিতে উত্তরণ ঘটে গেল; তেমন সাধনা বা সাধ্য আমার কোথায়? দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ, দেবং ভজেৎ, দেবং রসেৎ - ঋষিদের এই চেৎবাণী আমার মনে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে আমার গোত্রপুরুষ, সেই প্রকৃষ্টরূপে বরণীয় ঔর্ব, চ্যবন, জামদগ্ন্য, শুক্রাচার্য প্রভৃতি ঋষিরা আমার দিকে ভ্রূকুটি করে বলছেন - এই মহাপূজায় তুই অনধিকারী! আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাতের কমণ্ডলুটাও কাঁপছে, এই বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। আমি থমকে দাঁড়িয়ে জলপূর্ণ কমণ্ডলু জাপটে ধরলাম। সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল - বাবার তেজোদীপ্ত মুখখানি। তিনি বলছেন - তুই অনধিকারী কিসে? আমার দীক্ষাবীর্য এবং মহাদেবের সপ্তাক্ষর মহাবীজই ত তোকে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরের পূজাবেদী মূলে টেনে এনেছে। নিজেকে অযোগ্য এবং অনধিকারী ভাবছিস্, লজ্জা করে না? ওঁকারেশ্বরের মহিমা যতই থাক, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-তিনি ভক্তবৎসল আশুতোষ! তাঁকে পুণ্যপাবন কেউ বলে না, বলে পতিতপাবন। তাঁকে ধনী-বন্ধু আখ্যা কেউ দেয়নি, সবাই তাঁকে ডাকে দীনবন্ধু, দীনদয়ালও বলে! এইসব কথা মনে জাগা মাত্রই আমি গর্ভগৃহের চৌকাঠ দ্রুত অতিক্রম করে ওঁকারেশ্বরের সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম।

প্রণাম করে উঠে দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলাম, অমল-ধবল ওঁকারেশ্বরের মহালিঙ্গকে। লিঙ্গমূলে নর্মদার সঙ্গে যোগ আছে, তাই নিত্য জলপূর্ণ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মত একটি কুণ্ডের মধ্যস্থলে জেগে আছেন ওঁকারেশ্বর। ডানদিকে জ্বলছে ঘি-এর জাগ-প্রদীপ যার শিখা কখনও নেভেনা। পিছনে রয়েছে শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি মা পার্বতীর একখানি বিগ্রহ। অন্যান্য জ্যোতির্লিঙ্গের মত ওঁকারেশ্বরের কোন যোনিপীঠ নেই। মহাত্মা রামদাসজী আমাকে জানালেন যে প্রকৃত জ্যোতির্লিঙ্গে কোন যোনিপীঠ থাকেনা।

আমি কম্পিতহস্তে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম -

ওঁ নমো শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ॥
ওঁ মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং কলানিধিং কল্মষনাশহেতুম্
পরাৎপরং যৎ পরমং পবিত্রং নমামি শিবং মহতো মহান্তম্।
নমামি শিবং মহতো মহান্তম্।
নমামি রামং মহতো মহান্তম্॥

পূজা করে বেরিয়ে এলাম। তিন চারজন পাণ্ডা রামদাসজীকে বললেন - সিয়ারাম সিয়ারাম! ইহ্ মূর্তি কাঁহাসে আয়াজী ?

- বঙ্গালসে। ইনোনে পরিক্রমাবাসী হৈ।

এখানকার পাণ্ডারা পরিক্রমাবাসীদের পূজা করান না। এরা ধরেই নেন, পরিক্রমাবাসী মাত্রেই পূজাপদ্ধতি জানেন। অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গেও এঁরা অত্যন্ত ভদ্র এবং সদয় ব্যবহার করে থাকেন। পাণ্ডাদের সামনেই রামদাসজী আমাকে বললেন - ওঁকারেশ্বরের দর্শন ও পূজা করলেই পূজা সম্পূর্ণ হয়না।

এই মন্দিরের পঞ্চশিবের মধ্যে মাত্র একজনেরই পূজা করলে। আজ অনেক বেলা হয়েছে। কাল আবার নিয়ে আসব। দুমাস ত থাকবে। শিবপুরীসহ ব্রহ্মাপুরী বিষ্ণুপুরীস্থ সমস্ত শিবের পূজা করিয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁকারেশ্বর পরিক্রমা করাব। এই সবকিছু নিয়ে ওঁকারেশ্বর।

নাটমন্দিরে এসে দেখি, সেই বৃদ্ধ সাধু এখনও ধ্যানস্থ। আমি গাঁঠরীটি তুলে নিয়ে রামদাসজীর পেছনে চলতে থাকলাম। দ্বীপের দক্ষিণগাত্র দিয়ে পশ্চিমদিকে চলতে থাকলেন তিনি। যেদিকের ঢালুতে জনপদ দেখেছিলাম সেইদিকে। হাঁটছি সরু পাহাড়ী পথ দিয়ে। মনে ভাবছি স্কন্দপুরাণ পাঠের পর আমার মন এত বিহ্বল হয়ে উঠেছিল কেন? পুরাণের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার লোকতো আমি না। আমার মানসিকতায় ভক্তিরসের লেশমাত্র নেই। তবে কি, বাবা যে বলতেন - Spirituality is neither bought nor taught but can be caught like any other infection from the Master soul, অর্থাৎ আধ্যাত্মচেতনা কারও কাছ হতে কিছু মূল্য বা দক্ষিণা দিয়ে কেনা যায়না, শেখাও যায়না, যে কোন সংক্রামক রোগের বীজের মত আধ্যাত্মচেতনাও সংক্রামিত বা সঞ্চারিত হয় আধ্যাত্মপুরুষের চিন্ময় স্পর্শ থেকে! বৃদ্ধ সাধুর ভাবাবেগই সংক্রামিত হয়েছিল আমার মধ্যে, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত চোখের জলই আমার চোখে বান ডেকে এনেছিল। এমনও হতে পারে আমার এই সাময়িক ভাব বিহ্বলতা নিশ্চয়ই বস্তুগুণ; ওঁকারেশ্বরের অমোঘ ও অনিবার্য প্রভাব।

- ব্যস্, ভজনাশ্রমমেঁ হমলোগ আগেয়া জী। সামনে তাকিয়ে দেখি, একটি ছোট একতলা পাকা বাড়ীকে ঘিরে চারটি ছোট ছোট কুটীর, ফটকে গৈরিক পতাকা উড়ছে। একটি ছোট সাইনবোর্ডে হিন্দীতে লেখা আছে - 'ভজন আশ্রম'। আশ্রম থেকে মৃদু ভেসে আসছে - শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

মনে পড়ল, এই ত্রয়োদশাক্ষর যুক্ত মহাসিদ্ধ রামবীর সমর্থ রামদাসস্বামী দিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজীকে; অভীষ্ট এবং আদর্শ-রামচন্দ্রের মত চরিত্রবল, দেশাত্মবোধ, ক্ষাত্রবীর্য এবং সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি লোকদুর্লভ গুণ সঞ্চারিত হয়ে জেগে উঠেছিলেন শিবাজী ঐ মহামন্ত্রেরই বলে।

আশ্রমে প্রবেশ করলাম। দীনদয়াল দৌড়ে এসে আমার গাঁঠরী ও কমণ্ডলু নিয়ে আমাকে একটি কুটিরে নিয়ে গেল। খুবই পরিচ্ছন্ন কুটীর, পাথরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে মাজা। একটা জলের কলসী ও ভাঁড় ছাড়াও মেঝেতে পাতা আছে একটি বড় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম। আমি প্রথমেই গেলাম আশ্রম দেবতাকে প্রণাম করতে।

একতলা মূল বাড়ীটির একটি প্রকোষ্ঠে রামদাসজী বাস করেন, অন্যটিতে ঠাকুরঘর। সীতারাম হনুমানজীর মূর্তি ছাড়াও একটি স্ফটিক লিঙ্গ এবং একটি শালগ্রাম শিলাও আছেন, প্রণাম করলাম। রামদাসজী আশ্রমিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন - মঙ্গলদাস, অচ্যুতদাস এবং ষড়ঙ্গী মহারাজ। প্রথমোক্ত দুজন ব্রহ্মচারী, তৃতীয়জন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী - তিনজনই রামদাসজীর শিষ্য।

পূজা ও ভোগ নিবেদন সমাপ্ত হয়ে গেছে। সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম।

কুটীরে ঢুকে মৃগচর্ম গুটিয়ে রেখে নিজের কুশাসনটা বিছিয়ে নিলাম। এমন গরম পড়ে গেছে যে কুশাসনে শুয়েও অস্বস্তি হচ্ছে। শুধু মেঝেতেই গড়াতে লাগলাম।

বেলা চারটা নাগাদ উঠে পড়লাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম - সবাই যে যার ঘরের বারান্দায় বসে মৃদুকণ্ঠে ভজন করছেন।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখতে পেলাম। ভজন আশ্রমটি যে মূল মন্দিরের এত কাছে সেটা আগে আন্দাজ করতে পারিনি। রামদাসজী বললেন- রেডি হো জাইয়ে, আভি এক জাগা আপকো লেকর যাউঙ্গা। চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আঁকা বাঁকা পথে এ বাড়ী সে বাড়ীর ধার দিয়ে মিনিট পনের হাঁটার পর আমাকে এক বিশাল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড় করালেন। বাড়ীটি এখনও তৈরি শেষ হয়নি, পাঁচতলা বিরাট অট্টালিকার তিনতলায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র। একেবারে নদীর কিনার থেকে এই অট্টালিকার বুনিয়াদ গেঁথে তোলা হয়েছে। সমস্ত ঢাল জুড়ে মোটা মোটা পাথরের থাম, তার উপরে পাথরের দুর্জয় খিলান। স্তম্ভের সারিগুলো একে একে নদীগর্ভ থেকে উঠেছে, সেই স্তম্ভগুলির উপর ভর দিয়ে চারদিকে প্রসস্ত বারান্দা টানা হয়েছে। অট্টালিকার পশ্চিমদিক থেকে লাল পাথরের পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে নর্মদার ঘাট পর্যন্ত। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে এই অট্টালিকা যে এক বিশাল প্রাসাদের রূপ নেবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনতলার বারান্দায় একটি সাইনবোর্ড ঝোলানো আছে, তাতে লেখা আছে - বিকানীর নিবাসী গোপীকিষণ জয়কিষণ বাহাতী ধর্মশালা। এটি ওঁকারেশ্বর শৈলদ্বীপের বৃহত্তম ধর্মশালা।

ভেবে অবাক হলাম, রামদাসজী আমাকে ধর্মশালায় নিয়ে এলেন কেন! সিঁড়ি বেয়ে রামদাসজী উপরে উঠতে লাগলেন, দোতালাও অতিক্রম করলাম। প্রত্যেক তলাতেই সারি সারি অজস্র ঘর; গরমকালের জন্য ধর্মশালা খালি পড়ে আছে। তিনতলাতে আমরা উঠছি, এমন সময় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের একজন গৌরকান্তি মানুষ শশব্যস্তে এসে রামদাসজীকে প্রণাম করলেন।

- সিয়ারাম, সিয়ারাম। লাডলীলালজী অব দেখিয়ে ইনকো তালাস কে লিয়ে আপকা পাশ হম্ তিন চার দফে আয়ে থে। ইনকা বারেমেঁই মহাত্মা সুমেরদাসজী মুঝে লিখ্যা থা।

লাডলীলালজীর পরিচয় দিতে গিয়ে আমাকে বললেন - এর নাম লাডলী লাল মুনিম। এই ধর্মশালার নির্মাণকার্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার এঁর উপর ন্যস্ত আছে। কথা বলতে বলতেই আমরা তিনতলার বারান্দায় উঠে এসেছি। মুনিমজী সেখানে বসার জন্য দুটি মৃগচর্ম পেতে দিলেন, কিন্তু রামদাসজী বসলেন না। একেবারে পাঁচতলার ছাদে উঠতে চাইলেন। মুনিমজী বললেন- কৃপা করকে থোড়া ঠারিয়ে। এই বলে বারান্দা থেকে মাথা নুইয়ে দুজন মজুরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদেরকে বললেন, সিঁড়ির উপর লোহা লক্কড়াদি থাকলে সাফ করতে। চারতলা পাঁচতলার ছাদ সবে ঢালা হয়েছে মাত্র। ছাদ ঢালার সময় ছাদের তলায় যেসব সেগুন কাঠের ঠেকো দেওয়া হয়, সেগুলো এখনও দাঁড় করানোই আছে। লোহালক্কড় ছাড়াও ইঁট পাথর চারদিকে ছড়ানো। কোথাও আঘাত লেগে যেতে পারে, এইজন্য মুনিমজী কয়েকবার নিষেধ করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! রামদাসজী সর্বোচ্চতলার শেষ ছাদে উঠবেনই। অগত্যা মুনিমজী অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচতলার সর্বোচ্চ ছাদে উঠে এলেন। বলতে লাগলেন - গোপীকিষণজীকো হালৎ বহুৎ বুরা হ্যায়, উনকা ভারী বীমারি হুয়া। নর্মদামায়ীকা কিরপাসে উনকা তবিয়ৎ আচ্ছা হো জাবেগা ত দো-চার সালকা অন্দর ইহ্ পুরা কাম হাসিল হোগা, নেহি ত সারেকাম খতম করনেমে বহোতই মুস্কিল হোগা।

রামদাসজী তাঁর কথাগুলো কানে নিলেন বলে মনে হল না, তিনি ছাদে উঠেই আমাকে বললেন, ঐ দেখ সামনে বিষ্ণুপুরী, ঐ দেখ ব্রহ্মাপুরী, ঐ দেখ অমরেশ্বর বা মামলেশ্বরের মন্দির। বাঁ দিকে তাকাও, ঐ দেখ ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া সূর্যকিরণে ঝকঝক করছে, সূর্যোকরোজ্জল ঐ স্বর্ণদ্যুতি মনে করিয়ে দিচ্ছে ওঁকারেশ্বরের দিব্য হিরন্ময় দ্যুতিকে। ডানদিকে দেখ নর্মদামায়ীর বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহও কি রকম চিকচিক করছে। নর্মদাধারার দুইতটের গহন অরণ্যানী অদ্ভুত শোভা ধারণ করেছে।

খোলা ছাদের উত্তর পূর্বকোণে আমাকে টেনে এনে বললেন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ, এই দ্বীপ থেকে মাইল দুই পূর্বে কুবের ভাণ্ডারী। সেইখানে দক্ষিণ থেকে কাবেরী নদী এসে নর্মদার সঙ্গে মিলেছেন, আর দ্বীপের পূর্বতট ছুঁয়ে কাবেরী কিছুটা পূর্বদিক দিয়ে দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করে দ্বীপের উত্তর তীর ধরে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছেন। সেই প্রবাহ আবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে উত্তর থেকে নর্মদায় গিয়ে মিশেছে। ওঁকারদ্বীপকে মাঝখানে রেখে কাবেরী নর্মদার যুগলধারা কেমন সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক ওঁকারচক্র সৃষ্টি করেছে। দেখতে পাচ্ছ তো?

সত্যি বলতে কি! আমি পূর্বদিকের দু'মাইল দূরে অবস্থিত কুবের ভাণ্ডারী বা নর্মদা-কাবেরীর যুগল সংগমকে আদৌ চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে তিনি ঐ দূরবর্তী স্থান এবং ওঁকারের আকারে নর্মদার গতিপথ যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলে চলেছেন - ওঁ এর তলার দিকের শেষ বিন্দুটি যদি "অ' অর্থাৎ ব্রহ্মা হন্ মধ্যস্থলের মণ্ডলটা 'উ' অর্থাৎ বিষ্ণু এবং শিরোদেশের প্রথম বিন্দুটা 'ম' অর্থাৎ মহেশ্বর। এই তিন তত্ত্বই উদ্ভূত হয়েছে ওঁকার বা প্রণব থেকে। তটস্থা পেরিয়ে চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটাই পরপ্রণবতত্ত্ব। নর্মদামায়ী বুকে করে ধরে রেখেছেন এই প্রণব ও পরপ্রণবতত্ত্বকে; তাই মায়ের জলধারাও সেই তত্ত্বকে সূচিত করবার জন্য ওঁ এর আকারে বাঁক নিয়েছেন। রামদাসজীর চোখের দৃষ্টি ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এ দৃষ্টি আমি চিনি, তাই সকলে তাঁকে জাপটে ধরে খোলা ছাদের প্রান্ত থেকে টেনে এনে ছাদের মধ্যস্থলে বসিয়ে দিলাম। দু-তিন মিনিট পরেই ধাতস্থ হলেন, বললেন - অব্ চলিয়ে নিচা মেঁ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে যাতে এক নজরে ব্রহ্মাপুরী, বিষ্ণুপুরী এবং শিবপুরীসহ নর্মদার গভীর অর্থব্যঞ্জক গতিপথকে দেখতে পারি, সেইজন্যই তিনি আমাকে এই ধর্মশালাতে টেনে এনেছেন। তিনতলায় এসে বারান্দায় বসতেই, মুনিমজী তাঁর ঘর থেকে ওঁকার দ্বীপের একটি চিত্র এনে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। রামদাসজী ছাদে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে আমাকে যা বুঝাবার ও দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, মানচিত্রের এই চিত্রখানিতে সেইসব স্থান দেখতে পেলাম। চিত্রে নর্মদা-কাবেরীর গতি ওঁকারের মতই দেখাচ্ছে। আমি সেইকথা মহাত্মাকে বলতেই তিনি বললেন - হাঁ হাঁ, আমি যখন তোমাকে ওঁকারেশ্বর দ্বীপ পরিক্রমা করাব, তখন নিজের চোখেই নর্মদামায়ীর এই রূপ দেখতে পাবে, স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। আমরা 'ভজন আশ্রমে' যখন ফিরে এলাম তখন সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন। একটু পরেই সন্ধ্যারতি ও ভজন আরম্ভ হয়ে গেল।

আশ্রমের প্রতিটি ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। আরতির পর দীনদয়াল তার ঘরে প্রদীপের আলোতে পাণিনি ব্যাকরণ পড়তে বসল। আর সকলে যে যার ঘরে বসে ভজন ও ধ্যানে মন দিলেন। আমি আশ্রমের প্রাঙ্গণে নেমে পায়চারী করতে লাগলাম। হঠাৎ পেছন ফিরে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের চূড়ায় আলোকস্তম্ভ। বৈদ্যুতিক আলোর প্রভায় শ্বেতশুভ্র মন্দিরটিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। ওঁকারেশ্বরের স্ফটিক লিঙ্গ স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যুক্তকরে প্রণাম করতে করতে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম -

ওঁ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতম্ হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥

- যে পশুপতির গাত্র ভস্ম দ্বারা শুভ্র, যাঁর হাসি শুভ্র, যাঁর হস্তধৃত নরকপাল এবং খট্টাঙ্গ শুভ্র, যাঁর বৃষভ শুভ্র, কানের দুটি কুণ্ডলও শুভ্র, যাঁর জটা গঙ্গার ফেনায় শুভ্র এবং যাঁর মস্তকস্থিত চন্দ্র শুভ্র - এইভাবে যিনি সর্বশুভ্র তিনি আমায় পাপক্ষয়ের আশীর্বাদ (ঐশ্বর্য) সর্বদা দান করুন।

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সাবধান হলাম। অন্যান্য আশ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে বিবেচনা করে, মনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। শিব এবং বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরবেলা মঙ্গল আরতির শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। আজ ২রা বৈশাখ। ষড়ঙ্গী মহারাজ আরতি করছেন, রামদাসজী বসে আছেন ধ্যানাসনে। ঠাকুরকে প্রণাম করে আমি প্রাতঃকৃত্য করতে গেলাম। সকাল সাতটা নাগাদ রামদাসজী বললেন - চল ওঁকারেশ্বর মন্দিরে। কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান করে আজ ওঁকারেশ্বরসহ শূলপাণির অন্যান্য রূপের দর্শন ও পূজা করবে। আমরা ঢাল বেয়ে সরু পাহাড়ী পথে উপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে প্রবেশ করলাম শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। নাটমন্দিরে ঢুকে আজ আর সেই গতকালকার বৃদ্ধ সাধুকে দেখতে পেলামনা। অন্যান্য কয়েকজন সাধু বসে ধ্যান করছেন। এই শৈলদ্বীপ এবং কাছাকাছি এলাকা থেকে কিছু ভক্ত এসেছেন পূজা করতে। পাণ্ডারা তাঁদেরকে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন। এক ফাঁকে আমি এবং রামদাসজীও ওঁকারেশ্বরকে পূজা করলাম।

গর্ভগৃহেরই এক কোণে একটি ছোট দরজা দিয়ে রামদাসজী একটি সরু সিঁড়ির মুখে আমাকে এনে দাঁড় করালেন।

উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ উপরের দিকে উঠে গেছে। রামদাসজীর পেছনে পেছনে সেই ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলাম। বাইশটি ধাপ ওঠার পরেই একটি কক্ষতলে পৌঁছলাম। এতক্ষণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছি আধো অন্ধকারে। দু'পাশে অন্ধকার পাথরের দেওয়াল। মন্দিরের এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে একটি মাত্র বড় জানালা। সেই জানালাই একমাত্র আলো-বাতাসের প্রবেশপথ। এই কক্ষে এক শিবলিঙ্গ সমাসীন। রামদাসজী ওঁ নমো ভগবতে মহাকালেশ্বরায় বলে প্রণাম করলেন। বুঝলাম ইনি মহাকালেশ্বর। আমি শিবলিঙ্গে কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম -

মহাকালং মহাঘোরং তারকং ব্রহ্মরূপিনম্।
সর্বভূতাত্মভূতস্থং মহাদেবং নমাম্যহম্॥

আবার উঠতে লাগলাম অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, তৃতীয় কক্ষতলে পৌঁছে দেখলাম সেখানেও মহাদেব। রামদাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলে উঠলেন - ওঁ নমহ্ ভগবতে সিদ্ধনাথায়। সিদ্ধনাথের মাথায় জল ঢেলে আমিও প্রণাম করলাম -

নমাম্যহং সিদ্ধনাথং শ্রীনিবাসং পরাৎপরং।
ভূতেশং উমাপতিং ভদ্র বিভূতিং ভূতিভূষণম্॥

সিদ্ধনাথ দর্শনের পর এবার চতুর্থতলে উঠতে হবে। যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, সেই সিঁড়ি আরও সরু, অন্ধকার আরও ঘন। সেই শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারে ঠাণ্ডা পাথরের দেওয়ালে হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কোনমতে একটি প্রকোষ্ঠে পৌঁছানো গেল। এই প্রকোষ্ঠের জানালা এত ছোট যে কেবল একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মি ঢুকছে সেই ঘরে। ঘরে ঢুকেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন রামদাসজী। আমি কার্যতঃ কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। অপেক্ষা করছি রামদাসজী কি বলেন তা শোনার জন্য, রামদাসজী বারবার বলতে লাগলেন -

ওঁ নমো ভগবতে গুপ্তেশ্বর-মহাদেবায় জন্মকর্মবিনাশিনে॥

ইতিমধ্যে আমার চোখ অন্ধকারে সয়ে গেছে। আমি দেখতে পেলাম প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একটি ছোট নর্মদালিঙ্গ। মহাদেবের কাছে গিয়ে লিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করলাম -

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থং গুপ্তেশ্বরং নমাম্যহম্।
মায়ামোহবিনাশায় প্রপন্নজনসেবিনে॥

রামদাসজী এবার বললেন - দর্শন এখনও বাকী। আরও একতলা বাকী, সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারবেনা। একপেশে হয়ে গুঁড়ি মেরে উঠতে হবে। এই বলে তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে গুঁড়ি মেরে একপেশে হয়ে উঠতে লাগলেন। রামদাসজীর বয়স হয়েছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন। আমিও তাঁকে অনুকরণ করে একই ভঙ্গীতে অনুসরণ করলাম। অনেক কষ্টে উঠে এলাম সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে, পাঁচ তলায় মন্দির চূড়ার ঠিক নিচে, ক্ষুদ্র গোলাকার প্রকোষ্ঠ - সামনের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে জানালা, আলো হাওয়ার ঝর্ণা বইছে যেন। ঘরটির মাঝখানে সিঁদুর মাখানো একখানা ত্রিশূল, ত্রিশূলের গায়ে রক্তপতাকা। রামদাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন - ইনি ওঁকারের পঞ্চম রূপ, নাম ধ্বজাধারী।

ত্রিশূলের মাথায় কমণ্ডলুর শেষ জলটুকু ঢেলে দিয়ে আমি প্রণাম করলাম -

শ্রীত্রিশূলং মহাবাহুং মহান্তং দীপ্ততেজসম্।
সর্বদৈত্যনিসূদনং নমস্তে ধ্বান্তধ্বংসিনম্॥

ওঁকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সিদ্ধনাথ, গুপ্তেশ্বর এবং ধ্বজাধারী - শিবপুরীস্থিত ওঁকারেশ্বর মন্দিরের এই পঞ্চ শিবের পূজা হয়ে গেল। একই পথে সেই হাঁফধরানো অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে পিতৃদত্ত মহাবীজ জপ করতে করতে নেমে এলাম একতলার সেই গর্ভগৃহে, যেখানে ওঁকারেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। পুনরায় ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করা বিধি। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা আমার কমণ্ডলু খালি দেখে জল ভরে দিলেন। আমি মন্ত্রোচ্চারণ করে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢালার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পেছন থেকে কেউ বলে উঠলেন - হম্ মন্ত্র বাতাউঁ ? চমকে তাকিয়ে দেখলাম - সেই বৃদ্ধ সাধু যাঁকে গতকাল নাটমন্দিরে আমি স্কন্দপুরাণ পড়ে ওঁকারের মাহাত্ম্য শুনিয়েছিলাম। তিনি আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করলেন না, বম্-বম্,-ববম্-বম্ গালবাদ্য করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন -

ওঁ প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার-উকার-মকার ইতি।
ওঁ সর্বভূতস্থং একং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষং অকারণম্ পরং ব্রহ্ম ওম্॥
ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতি ব্রহ্ম।

অর্থাৎ অকার উকার মকারাত্মক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তিনিই সর্বজীবের অন্তরশায়ী কারণস্বরূপ নারায়ণ। অন্তরশায়ী প্রত্যগাত্মা তাই নারায়ণই শিব, শিবই নারায়ণ, নরগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি স্বয়ং কোন কারণসম্ভূত নন, তিনিই পরমব্রহ্ম ওঁকার। ওঁকারই ব্রহ্ম। ওঁকারই ব্রহ্ম।

আমি যতক্ষণ শিবের মাথায় জল ঢাললাম, এক একটি করে চন্দনলিপ্ত বিল্বপত্র সমর্পণ করলাম, ততক্ষণই বৃদ্ধ সাধু মন্ত্রটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে গেলেন। সাধুর মন্ত্র পড়তে কোন ক্লান্তি নেই। প্রণাম করে উঠে দেখি, রামদাসজী বৃদ্ধ সাধুর হাত ধরে নাটমন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। নাটমন্দিরে তাঁকে বসিয়ে দেয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - এইমাত্র মন্দিরে যে মন্ত্রপাঠ করলেন, ঐ মন্ত্র কোথায় আছে ?

- নারায়ণ উপনিষৎ মেঁ, ঔর অর্থবশির উপনিষৎ মেঁ।

তিনি আর কথা বললেন না। আমি তাঁকে প্রণাম করে রামদাসজীর সঙ্গে 'ভজন আশ্রমে' ফিরে এলাম। ষড়ঙ্গী মহারাজ আশ্রম দেবতার পূজা করছেন। মঙ্গলদাস ও অচ্যুতদাস সমস্বরে গাইছেন - শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

পূজারতি ও ভোগ নিবেদনের পর আমরা প্রসাদ পেলাম। এই আশ্রমে প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহে তিনদিন সৎসঙ্গ হয়। ত্রয়োদশাক্ষর রামনামের ভজনগান ত অহরহ হচ্ছেই। আজ বৃহস্পতিবার, তাই সৎসঙ্গের আসর বসল। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও এসেছেন, ধর্মশালার কার্যাধ্যক্ষ লাডলীলালজীও এসেছেন। আশ্রম প্রাঙ্গণেই ভক্তদের জন্য আসন পাতা হয়েছে। আমি দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মুখ হাত ধুয়ে আমিও আসরে বসলাম। তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস হতে রামদাসজী বন্দনা গেয়ে শোনালেন। তারপর বললেন - কাল শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ওঁকারেশ্বরজীকে যে মন্ত্রে পূজা করছিলেন, সেই মন্ত্র আমার খুব ভাল লেগেছিল। মন্ত্রের তাৎপর্য এই - যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু - নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায়, শিবরূপায় বিষ্ণবে। একথা ধ্রুবসত্য যে রামচন্দ্র, মহাদেব এবং বিষ্ণুতে কোন ভেদ নেই। তবে যে যার ইষ্টনিষ্ঠা থাকা ভাল। শিবের কৃপা না হলে রাম নামের রহস্য বোঝা যাবেনা, আবার রামের কৃপা না হলে শিবতত্ত্বের অতল রহস্য কিছুতেই উপলব্ধিতে ফুটবেনা। তবুও যদি কেউ রামচন্দ্রের উপাসক হন, শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহে রামচন্দ্রকেই দর্শন করার রতি থাকা চাই। আবার শিব বা বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক হলে শ্রীরাম বিগ্রহের মধ্যে নিজের ইষ্টকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল প্রাণে কান্না চাই। এরই নাম ইষ্টনিষ্ঠা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রামগতপ্রাণ ভক্তরাজ মহাবীরজী বিষ্ণু ভগবানকে দর্শন করে বলেছিলেন -

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ রাজীবলোচনঃ॥

প্রভুঃ ! আপনি লক্ষ্মীপতি স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান। আপনাতে এবং সীতাপতি রামচন্দ্রে কোন প্রভেদ নেই। আমি জানি উভয়ে একই পরমাত্মা। তথাপি আমার হৃদয় সর্বস্ব হলেন কমললোচন রামচন্দ্র। আপনি দয়া করে আমার কাছে সেই পরমারাধ্য রূপে প্রকট হউন। ভক্তরাজের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সুদর্শনধারী বিষ্ণু ধনুর্ধারী রামচন্দ্ররূপেই ভক্তরাজকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। তুলীদাসজীর জীবনেও এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, এ যুগের ঋষি বাল্মীকিতুল্য যিনি, সেই তুসীদাসজী নিজেই 'রামচরিতমানস' মহাগ্রন্থে সেই ঘটনা উল্লেখ করে গেছেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে বৃন্দাবনে গিয়ে পৌছান। গোটা বৃন্দাবন জুড়ে রাধে রাধে, রাধাকৃষ্ণ নামের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে তাঁর মনে ধাক্কা লাগে, কৈ কোথাও ত তাঁর আরাধ্য দেবতা সীতারামের নাম কীর্তন হয়না। বৃন্দাবন তাঁর ভাল লাগলনা, মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে বিষন্ন অন্তঃকরণে বসে থাকেন তিনি। ঝুলন পূর্ণিমা এসে গেছে। সেদিন সারা বৃন্দাবনে মহামহোৎসব। রাধাকৃষ্ণের নামকীর্তনে সারা বৃন্দাবন মুখরিত। একজন ভক্ত তুলসীদাসজীকে একরকম জোর করেই মদনগোপালজীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মনোরম সাজে শ্রীবিগ্রহকে সাজানো হয়েছে সেদিন। শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করে তাঁর মত ভক্তের কিছুতেই মন ভরছেনা। একি ভাব বিপর্যয়! শ্রীবিগ্রহকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেও তাঁর ইচ্ছে করছে না। ভক্তচূড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহনজীর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন-

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হে নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুরবাণ লো হাথ ॥

অর্থাৎ হে নাথ। আজ তোমার এই নয়নাভিরাম সুষমার কি বর্ণনা আমি দেব! অপরূপ মনোহরণ বেশে তুমি সেজে রয়েছ, কিন্তু তুলসী তখন তোমার চরণকমলে মাথা নত করবে যখন তুমি বাঁশী ফেলে হাতে ধনুর্বাণ নেবে দয়াল, রাজীবলোচন রঘুনাথকে না দেখতে পেলে তার মনে ত তৃপ্তি আসবে না।

তুলসীদাসজীর জীবনী পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ভক্তের এই প্রার্থনা পূরণের জন্য সেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মদনমোহনজী ধনুর্ধারী রামচন্দ্র রূপেই প্রকট হয়েছিলেন, তুলসীদাসজী স্বয়ং তাঁর এই দিব্যদর্শনের কথা লিখে গেছেন -

কিরীট মুকুট মাথে ধরো ধনুষ বান লিয়ো হাথ।
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥

অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান সেদিন নিজজন তুলসীদাসের আবদার রক্ষার জন্য মাথায় নেন রাজমুকুট, হাতে তুলে নেন ধনুর্বাণ।

সৎসঙ্গ সাঙ্গ হল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে আরতির আয়োজন চলছে, ঘন্টা বাজছে, ঢং..ঢং..ঢং। রামদাসজী বললেন - দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে আরতি দেখে এস। কাল ভোরেই তোমাকে নিয়ে ব্রহ্মাপুরী বিষ্ণুপুরী দেখিয়ে নিয়ে আসব। মন্দিরের ঢাল বেয়ে আমরা দুজনে মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের সমস্ত প্রকোষ্ঠ আলোকমালায় সুসজ্জিত। ওঁকারেশ্বরের সামনে জ্বলছে - ঘৃতপ্রদীপ, অনির্বাণ এই দীপশিখা। স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি, তাঁর পেছনেই রয়েছেন বিশ্বার্তিহারিণী মা পার্বতী।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জয়ানন্দ গোঁসাই। ভক্তিভরে আরতি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। প্রাণভরে আরতি দেখলাম। মন্দিরে যেসব বাসিন্দা থাকেন, গৃহী ও সাধু, নারী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ত্রিশজন ভক্ত আরতি দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। আরতির পর গর্ভমন্দিরের সামনে একটি রৌপ্যনির্মিত দোলা খাটালেন পূজারীরা। এবার ওঁকারেশ্বর শয়ন করবেন, বিশ্রাম করবেন, মন্দিরদ্বার বন্ধ হবে। ভক্তরা অন্তরের অনুরাগ মিশিয়ে এইভাবে সেবার ভাব ফুটিয়ে তোলেন, কারণ আত্মবৎ সেবা করাই বিধি, নতুবা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বিধাতা কারণজগৎ শয়ন করে থাকে ! (শেরতে শেতে ইতি শিবঃ) শিব যদি শয়ন করেন অর্থাৎ জগদাদি কার্য হতে নিবৃত্ত হন, তাঁর সেই শয়ন বা বিভ্রান্তিই ত মহাপ্রলয় ডেকে আনবে!

মন্দির থেকে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসছি, সামনেই দেখলাম সেই বৃদ্ধ সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে 'নমো নারায়নায়' বলে অভিবাদন করা মাত্রই আমার হাতটা ঝাঁপটে ধরে বললেন - শিবমস্তু! শিবমস্তু! বেটা তুমহারে লিয়ে হম্ ইধর খাড়া হ্যায়! আইয়ে হমারা সাথমেঁ।

দীনদয়ালকে বললেন - বেটা তুম ইধর সিঁড়িকা উপর পন্দর-বিশ মিনট্ কে লিয়ে ব্যায়ঠো, নর্মদামাতাকো স্পর্শ করকে আভি আ যাউঙ্গা।

সেদিন দেখেছিলাম - চোখে ছানি পড়ায় ইনি ভালভাবে দেখতে পাননা। অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি। এই শৈলদ্বীপের কোথায় কোন কোটরে থাকেন তাও আমার জানা নেই। এখন অবশ্য মন্দির চূড়ার অত্যুজ্জ্বল আলোতে কোটিতীর্থের ঘাট আলোকিত হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারে ঘাট বেয়ে ইনি এলেন কি করে! কৈ কাউকে ত সঙ্গে দেখতেও পাচ্ছিনা। বয়স যে কত তাও অনুমান করতে পারছিনা। সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম - আপকা ইহ্ শরীরকা উমর ক্যাতনা হুয়া জী ? ইহ্ মূর্তিকা শুভনাম কেয়া ?

- শ'সাল ত জরুর বীত গয়া। গুরুনে ইহ্ শরীরকা নাম দিয়া প্রলয়দাস। প্রলয় কী ক্যা মতলব, মুঝে বাতাইয়ে ত ? উমর কিসকো কহা যাতা হৈ ?

আমি বললাম - প্রলয় মানে ত সকল কিছুর ধ্বংস বা লীন হওয়া বুঝায়। আর উমর বলতে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার কাল হতে এ পর্যন্ত যে সময় গত হয়েছে, সেই সময়টাকে উমর বলে।

- না, তোমার উত্তর ঠিক হলনা। মাতৃজঠরে আবদ্ধ থাকার মত কাল ও কর্মের কারাগারে জীব যতদিন আবদ্ধ থাকে, তা সন্ন্যাসীদের বয়স গণনা কালে ধর্তব্যই নয়। গুরু কৃপায় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পর যখন মহেশ্বরের দিব্য চেতনায় জীব আলোর জগতে উদ্ভাসিত তুরীয় চৈতন্যে জেগে ওঠে, কাল ও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই সময় হতেই সন্ন্যাসীর বয়স গণনা করাই যুক্তিযুক্ত। আর প্রলয় শব্দের যথার্থ অর্থ একটু পরেই বলব। এখন নর্মদার কাছে গিয়ে কোথাও বসি চল।

কথা বলতে বলতে আমরা নর্মদাধারার কাছে পৌঁছে গেছি। উভয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে বাঁধানো ঘাটের এক কোণে সিঁড়ির উপর বসলাম। পেছন ফিরে একবার দেখে নিলাম দীনদয়ালকে, সে মন্দিরের নিচেই শ্বেতপাথরের সিঁড়ির উপর বসে আছে।

প্রলয়দাসজী আমাকে বলতে লাগলেন - তোমার বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়ে কৃতার্থ করেছেন। এই স্থান যে কিরকম অসাধারণ বৈশিষ্ঠপূর্ণ তা বেদব্যাসের উক্তিতেই শোন। তাঁর রচিত মহাভারতের বনপর্বে ১০১ অধ্যায়ে আছে, লোমশ মুনি তীর্থভ্রমণরত যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন -

দেবনামেতি কৌন্তেয় ! তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্।
বৈদূর্যপর্বতম্ দৃষ্টবা নর্মদামবতীর্থ চ ॥
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এতমাসাদ্য কৌন্তেয় ! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ হে কুন্তীনন্দন! ঐ দেখ সামনে বৈদূর্যপর্বত দেখা যাচ্ছে। এখানে নর্মদা নদীতে স্নান করলে দেবলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৈদূর্য পর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে জন্মেছিল। এই স্থানে আগমন করলে মানুষ সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়।

স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস লোমশ মুনির মুখ দিয়ে শ্লোকের মধ্যে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন - 'সন্ধিরেষ', মানে হল এই নর্মদাতটস্থ বৈদূর্য পর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থল। এই সন্ধিস্থলে বসে তোমাকে যে কথাগুলি বলছি তা মন দিয়ে শোন। অর্থবশির উপনিষদে আছে -

সকৃদুচ্চরিতমাত্রং স এষ উর্ধ্বমুৎক্রাময়তি ইতি ওঁকারঃ।
প্রাণান্ সর্বান্ পরমাত্মনি প্রণাময়তীতি তস্মাৎ প্রণবঃ।

অর্থাৎ ওঁকার একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই দেহস্থ স্বাভাবিক নিম্নগ ক্রিয়া সুষুম্নাপথে (উৎ) উর্ধ্বগামী হয় বলেই এর নাম হয়েছে - ওঁকার। প্রাণাদি অভ্যন্তর বায়ু এই ওঁকারধ্বনিতে প্রলীন হয় বলেই এর দ্বিতীয় নাম - প্রলয়। এই ওঁকারই প্রাণাদিকে পরমাত্মার অভিমুখে নমিত করে বলে এর তৃতীয় নাম - প্রণব।

ওঁকারস্তু প্লুতোস্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ
অকারস্তু অথ ভূর্লোক উকার ভুব উচ্যতে ॥
স ব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্থ বিধীয়তে
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥

অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অপর নাম 'ত্রিনাদ' কারণ এটি তিনটি শব্দবিশিষ্ট - অকার, উকার এবং মকার। অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক এবং মকার স্বর্লোক। এই ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকারেই পরমাত্মা অবস্থিত।

অকার অর্থাৎ পৃথিবীর বর্ণ পীত, উকার অর্থাৎ আকাশ বিদ্যুৎবর্ণ আর মকার অর্থাৎ স্বর্লোক হল শুক্লবর্ণ। ওঁকারের সাধনা করতে করতে যখন পীতজ্যোতি মণ্ডিত আকাশ ভেসে উঠবে তখন জানবে ভূলোক ভেদ করলে, যখন বিদ্যুৎময় আকাশ ভাসবে তখন ভুবর্লোক ভেদ হল আর যখন শুক্লজ্যোতির্মণ্ডিত আকাশ পূর্ণ করে ওঁকারের ধ্বনি শুনবে তখন বুঝবে স্বর্লোকে তোমার গতি হল। ওঁকারই তোমাকে চিদাকাশ, দহরাকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, সূর্যাকাশ একে একে ভেদ করে মহ, জন, তপঃ এবং সত্যলোকে নিয়ে ব্রহ্মময় ব্রহ্মস্বরূপ করে তুলতে সমর্থ।

এই ওঁকার কোন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, নাসিকা দ্বারা ওঁ উচ্চারণ করা যায়না। যদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ। এর কোন কালে অনুমাত্রও ক্ষয় হয়না বলে একে অক্ষয় বলা হয়। ওঁকার শব্দাতীত এবং আকাশ সদৃশ নির্মল ও অনন্ত। এই ওঁকারের সাধনাই বৈদিক ঋষিদের উদগীথ উপাসনা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাধনা। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদের স্পষ্ট ঘোষনা -

ওমিত্যেদক্ষরং ব্রহ্মনুদগীথমুপাসীত।

মূর্ধ্বাস্থানে এই ওঁকারের সাধনা করতে হয়। সাধনা করতে করতেই ওঁ শব্দ ক্রমে নিঃশব্দে পরিণত হয় - নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে।

আজ এই সন্ধিস্থলে ওঁকারেশ্বরের পাদমূলে বসে তোমাকে যা বললাম নিত্য তা মনন করবে। কোন এক সময় ঋষিদের সেই গুহ্যতম ওঁকার সাধনা তোমাকে আমি শিখিয়ে দেব। এখন তুমি যাও, আগামী কাল তোমার বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরী যাবার কথা আছে। কিন্তু সাবধান! বিষ্ণুপুরীর মন্দিরে বিষ্ণু ভগবান এবং লক্ষ্মীমাতাকে দর্শন কিংবা ব্রহ্মাপুরীতে ব্রহ্মেশ্বরকে দর্শন করতে গেলেই রামদাসজী যাই বলুন তোমার পরিক্রমা ভঙ্গ হতে বাধ্য। ওপারের দক্ষিণতটে বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরীর মাঝখানে আছেন অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর। উনি জ্যোতির্লিঙ্গ, সেখানে ইন্দোরের মহারাজা হোলকারদের নিযুক্ত বাইশজন ব্রাহ্মণ দৈনিক ত্রিশহাজার শিবলিঙ্গ তৈরী করে সেইসব পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার পর নর্মদার জলে বিসর্জন দিতেন। সম্প্রতি রাজার রাজত্ব গেছে, কিন্তু পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা এখনও বন্ধ হয়নি। অমরেশ্বরের মন্দিরের পাশেই আছেন বীরেশ্বর শিবমন্দির। কিন্তু এ সবই দক্ষিণতটে। তুমি উত্তরতট ধরে পরিক্রমা করছ। নর্মদা মাতার বক্ষে জেগে ওঠা এই বৈদূর্য পর্বতে এসে ওঁকারেশ্বর দর্শন করলে বা এই সারা শৈলদ্বীপটিকে পরিক্রমা করলে পরিক্রমা ভঙ্গ হয়না। এসে ভালই করেছ, বরং না এলেই অপরাধ হত।

কিন্তু খবরদার! ভ্রমক্রমে বা কারও উপদেশে দক্ষিণতটে যাবেনা। রেবাসংগমসে লোটনেকা বখৎ দক্ষিণতটস্থ অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং পুনরায় ওঁকারেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করবে। আমি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমি পরিক্রমার শপথ নিয়েছ। এ বস্তু বড়ই কঠিন। শাস্ত্রানুসারে এই ব্রত উদযাপন করতে পারলে স্বয়ং মা রেবাই তোমাকে শিবতপস্যার সিদ্ধি দান করবেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম - চলুন আপনাকে আপনার গুফায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যাই।

- কোঈ জরুরত নেহি। মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন - অন্ধেকো নয়ন কা জ্যোতি মন্দর মেঁ বৈঠল হ্যায়। এই বলে হাসতে লাগলেন।

আমি সিঁড়ি বেয়ে দীনদয়ালের কাছে পৌঁছে গেলাম। বড়জোর এখন রাত্রি আটটা হবে। মন্দির ও পথঘাট সবই এর মধ্যে জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। 'ভজন আশ্রমে' পৌঁছে দেখি রামদাসজী আশ্রম প্রাঙ্গণে পায়চারী করছেন। আমাকে দেখেই বললেন - প্রভুজীকে আরতি দর্শন আচ্ছিতরেসে কিয়া ত ? আভি বিশ্রাম করিয়ে, ভজন করিয়ে, জপ করিয়ে, জো আপকা মর্জি।

হাসতে হাসতে আরও বললেন যে কাল সকালে তোমাকে বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মাপুরী নিয়ে যাব বলেছিলাম বটে, কিন্তু পরে ভাল করে ভেবে দেখলাম দক্ষিণতটস্থ ঐসব মন্দির দেখতে গেলে তোমার পরিক্রমার ব্রত ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে বরং কাল সকালে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এই দ্বীপ পরিক্রমা করিয়ে নিয়ে আসব।

– তথাস্তু! আমি আর কি উত্তর দেব!

নিজের ঘরে ঢুকে এক কমণ্ডলু জল পান করে আমার একমাত্র সম্বল কুশাসন শয্যার উপর বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। সকালে এই আশ্রমে বসে রামদাসজী যে আমাকে আগামীকাল বিষ্ণুপুরীর মন্দির বা অমরেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা প্রলয়দাসজী জানলেন কি করে! আবার কোটিতীর্থের ঘাটে বসে প্রলয়দাসজী দক্ষিণতটে যেতে আমাকে যে নিষেধ করেছেন, রামদাসজী তা জানলেন কি করে! দীনদয়াল ত আমাদের কাছ থেকে অনেকদূরে বসেছিল, তার পক্ষে সেসব কথা শুনতে পাবার কথা নয়। তা ছাড়া শুনতে পেলেও সে যে আশ্রমে এসে রামদাসজীকে জানাবে তারই বা অবকাশ কোথায়! আশ্রমে প্রবেশ করেই ত সে তার ঘরে ঢুকে গেছে। আশ্রমের উঠোনে রামদাসজী পায়চারী করছিলেন, আমি আশ্রমে পৌছন মাত্রই তাঁর মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করলেন। বাবার আদেশেই যে পরিক্রমা করতে এসেছি এ কথাই বা প্রলয়দাসজী জানলেন কিভাবে! এমনও হতে পারত যে আমি স্বেচ্ছায় কিংবা পিতা ছাড়া অন্য কোন মহাত্মা আমার দীক্ষাগুরু হলে তাঁর আদেশেও ত নর্মদা পরিক্রমায় আসতে পারতাম। শুলজা গ্রামের ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কিংবা হোলিপুরা থেকে হুণ্ডিয়া পর্যন্ত যিনি আমার সঙ্গী ছিলেন সেই দিওয়ানাজীর কথাতে দেখতাম, কোন কথাই তাঁদের অবিদিত নেই। এঁরা কি সবাই অন্তর্যামী! নর্মদাতে আসার পূর্ব হতে এখন পর্যন্ত যখন যেখানে যাঁর সঙ্গে কথা বলে থাকি না কেন সব কথার শব্দতরঙ্গ কি ইথারের মাধ্যমে vibrated হয়ে এইসব রহস্যময় সাধুদের কানে এসে প্রবেশ করেছে ! চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল রামদাসজীর মধুর কণ্ঠস্বরে। তিনি ভক্তিস্নিগ্ধ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন -

রাম নাম মণি দীপ ধরু, জীহ্ দেহরি দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরউ, জো চাহসি উজিয়ার ॥

অর্থাৎ দেহমন্দিরের যে প্রকোষ্ঠের মধ্যে জীবাত্মার বাস, সেই প্রকোষ্ঠের দুয়ারে রাম নামের মণি-প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, তুলসীদাস বলেছেন, তাহলে ভিতর ও বাহির আলোয় আলো হয়ে উঠবে।

নাম রাম কো কল্পতরু কলি কল্যাণ নিবাস।
জো সুমিরত ভব ভাঁগতে, তুলসী তুলসীদাস ॥

অর্থাৎ তুলসীদাস এই দোঁহায় বলেছেন - রামনাম কল্পবৃক্ষসদৃশ। কল্পবৃক্ষের কাছে যে যা প্রার্থনা করে তা যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি রামনাম করলে জীবের কোন কামনাই অপূর্ণ থাকেনা। এই ঘোর কলিযুগে রামনামে সকল কল্যানের বীজ নিহিত। রামনাম স্মরণ ও জপ করলে ভববন্ধন ঘুচে যায়।

মধুর চেয়ে মধুরতর, মধুময় রামনাম শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। আশ্রমের মঙ্গলারতির শব্দে খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বাইরে এসে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। ইষ্টদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রামদাসজী বললেন - চল পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ি। এই শৈলদ্বীপ সাড়ে তিন মাইল লম্বা, প্রস্থে প্রায় দু'মাইল। এখনই বেরিয়ে না পড়লে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। মঙ্গলদাসজীকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন। ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে লাঠি এবং কমণ্ডলু হাতে আমিও তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। ভোরের বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে গেল। হাঁটতে আজ আরও আরাম লাগছে, আজ কাঁধে আমার গাঁঠরীর বোঝা নেই।

দ্বীপের দক্ষিণ গাত্র দিয়ে পশ্চিম দিকে দুজনে হাঁটতে লাগলাম। পর্বতের ঢালু দিয়ে ওঠা নামা করতে হচ্ছে। সরু পথে মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকের কাঁচা পাকা বাড়ীঘর অতিক্রম করতে অত্যন্ত সংকীর্ণ রাস্তায় পাথর ডিঙাতে ডিঙাতে প্রায় আধ মাইল হেঁটে প্রথমেই পৌছলাম খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দিরে।

মহাবীরের মূর্তি দর্শন করে রামদাসজী সাষ্টাঙ্গ দিলেন। আমাকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন- ভগবান রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহাবীরজী। সিদ্ধ রামনামের চাবিকাঠি এই ভক্তরাজের হাতে। রামনামের অমৃত ইনিই কলির জীবদের জন্য বিলিয়ে চলেছেন। তুলসীদাসজী রামচরিতমানসে মহাবীরের বিশেষণ দিয়েছেন 'কলিবিটপ কুঠারী', অর্থাৎ কলিরূপ বৃক্ষের বিনাশকারী কুঠার। তুমি জান কিনা জানিনা, তুলসীদাসজী যখন কাশীর তুলসীঘাটে ছিলেন, সেই সময় তিনি গঙ্গাস্নান করে এসে একটা গাছের তলায় পা ধুয়ে অবশিষ্ট জলটুকু সেই গাছে ঢেলে দিতেন। সেই গাছে ছিল এক ব্রহ্মদৈত্যের বাস। তুলসীদাসজী প্রদত্ত সেই জলে সে পিপাসা মেটাত। একদিন গভীর রাত্রে সে আত্মপ্রকাশ করে সে তুলসীদাসজীকে - আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার ইষ্টদর্শনের যদি অভিলাষ থাকে, তবে দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে যেখানে নিত্য রামায়ণ পাঠ হয়, সেখানে স্বয়ং হনুমানজী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে পাঠ শোনেন। তুমি তাঁকে ধর তবেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হবে। সেই প্রেতের নির্দেশমত তুলসীদাসজী সেই রামায়ণ পাঠের আসরে গিয়ে একজন জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণকে দেখতে পান। পাঠ শেষে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে তাঁর পদতলে তুলসীদাসজী লুটিয়ে পড়েন। তুলসীদাসজী তাঁর এই সদগুরুর উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন -

বন্দউঁ গুরুপদ কল্প কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।

অর্থাৎ তুলসীদাসজীর ধ্যানদৃষ্টিতে হনুমানজী শৈব শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, বিশেষ করে সুমেরদাসজী তাঁর চিঠিতে তোমার যে বৈদান্তিক বিচারনিষ্ঠ মনের পরিচয় লিখেছেন, তাতে বলতে ভয় পাচ্ছি, তবুও বলছি, আমরা তুলসীদাসজীর ভক্তরা বিশ্বাস করি যে, স্বয়ং মহেশ্বরই রামনাম কীর্তনের লোভে ত্রেতাযুগে হনুমানজীরূপে প্রকট হয়েছিলেন।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দির থেকে একটু দূরেই কেদারেশ্বর মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের দরজা খুলে কেদারেশ্বরকে দর্শন করে তাঁর মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম। কাশীর কেদারঘাটের কেদারেশ্বর এবং হিমালয়ে গৌরীকেদার দর্শনের সৌভাগ্যও আমার ইতিপূর্বে হয়েছে, নর্মদাতটের এই কেদারেশ্বরজীকেও দর্শন করলাম। তিন স্থানেই দেখছি শিবলিঙ্গের আকৃতি একই প্রকার - ঠিক যেন একটি পাথরের ধামা উল্টানো আছে। প্রভেদের মধ্যে কোথাও কিঞ্চিৎ ছোট; কোথাও বড়, কিন্তু রঙ রূপ একই।

কেদারেশ্বর মন্দির অতিক্রম করে পাথর ডিঙিয়ে আরও আধ মাইল হাঁটার পর এমন একস্থানে এলাম যেখানে জলের ধারা প্রচণ্ড শব্দে বয়ে চলেছে। রামদাসজী বললেন - এ হল নর্মদা-কাবেরী সংগম। সামনে যে মন্দির দেখছ, ঐ মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্তি আছে। এইখানে কুবের তপস্যা করেছিলেন। রাবন যুদ্ধে কুবেরকে পর্য্যুদস্ত করে তাঁর নবনিধি সহ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়েছিলেন। হৃতসর্বস্ব কুবের এইখানে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে পুনরায় নবনিধি প্রাপ্ত হন এবং যক্ষপতি রূপে অভিষিক্ত হন। এইজন্য এই স্থানের নাম - কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ। আমরা ওঁকারেশ্বরের মন্দির হতে উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় দু'মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছি। নর্মদার উত্তরতটের দিকে সোজা তাকিয়ে দেখ, এই ভাণ্ডারী তীর্থের ঠিক বিপরীত দিকে চব্বিশ অবতারের মন্দিরের চূড়া অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল দীনদয়ালের বাড়ীতে। এই নর্মদা-কাবেরী সংগম পরম পবিত্র স্থান। তুমি সংগমের জল মাথায় নাও এবং কিছুক্ষণ জপ কর। এখানে জপের ফল সহস্রগুণ।

আমার জপ শেষ হলে তিনি বললেন - ঔর কয় কদম আগে বারাহী সংগম, উসকা বাদ চণ্ডবেগা সংগম, চলিয়ে উধার। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, ওঁকারেশ্বরের পর্বতশৃঙ্গ হতে পরপর ঝরণার আকারে দুটি ছোট নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে। দুটি সঙ্গমস্থল অতিক্রম করার পর পাথরের ছোট ছোট চাঙড় ভরা পার্বত্য পথে হাঁটতে হাঁটতে রামদাসজী বললেন - চণ্ডবেগা সংগম পেরিয়ে কিছু আগে পুরাণ প্রসিদ্ধ এরণ্ডী ক্ষেত্র। আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। শৈলদ্বীপের এই অংশটি ছোট জঙ্গলের মত। সেগুন, বুনো নিম এবং বেলগাছে ভর্তি। পথ বলতে বিশেষ কিছু নেই। উঁচু নিচু খণ্ড খণ্ড পাথরের উপর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে।

পথ নেই কিন্তু পাথরের উপরেই গভীর দাগ দেখে অনুভব করা যায় যে এপথে মানুষের যাতায়াত আছে। কুড়ি পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর জঙ্গলের বাইরে এসে দেখলাম এই শৈলদ্বীপের ঢালুতে গর্জন করতে করতে নর্মদা আছড়ে পড়ছে। অতি প্রাচীন একটি পাথরের মন্দির। মন্দিরে পনের কুড়িজন নারীপুরুষের ভীড়। সবাই পূজা দিতে এসেছেন। পাঁচজন মহিলা হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। এখানে ভক্ত ছাড়াও পাণ্ডা পুরোহিতরাও আছেন, মন্দিরে পূজা করছেন পুরোহিত। শঙ্খ, ঘন্টা, শিঙা, ডম্বরুর বাদ্যে এবং মহাদেবের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। অমরকন্টক মুণ্ডমহারণ্য থেকে ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির দুই তৃতীয়াংশ মত নর্মদাতট আমি অতিক্রম করে এসেছি, কত প্রসিদ্ধ তীর্থ ও শিবমন্দির দর্শন করে এলাম, এখান ছাড়া আর কোথাও গৃহস্থ বধুকে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে দেখিনি। আমি এর কারণ জিজ্ঞসা করতেই রামদাসজী বললেন - উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখ, ঐখানে বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষ হতে এরণ্ডী নদী প্রবাহিত হয়ে এসে ভীষণ বেগে নর্মদাতে পড়েছে। বেগের সেই প্রচণ্ডতার জন্যই এরণ্ডীর ধারা নর্মদার জলকে উথাল পাথাল করে তুলেছে, তার ফলে ওঁকারেশ্বর পর্বতের এইখানটাতে জল পর্বতের গায়ে এসে ঢেউ তুলে আবার ভেঙে পড়েছে নর্মদার বুকে। একটি নদী প্রবাহিত হয়ে এসে ঠিক যেখানটাতে অপর নদীতে মেশে, সেই স্থানকেই সাধারণতঃ সংগম বলা হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আক্ষরিক অর্থে উত্তরতটে এরণ্ডী ও নর্মদা নদীর সংগম স্থানকেই এড়ণ্ডীসংগম বলা উচিৎ। কিন্তু নর্মদার সঙ্গে মিশে এরণ্ডীর ধারা এখানেও এসে ধাক্কা দিচ্ছে বলে সংগমস্থল হতে এই শিবমন্দির পর্যন্ত ক্ষেত্রকে এরণ্ডীসংগম বা এরণ্ডীক্ষেত্র বলা হয়। মন্দিরস্থ এই শিবের নাম মন্মথেশ। স্বয়ং মন্মথ এই সুপ্রাচীন শিব স্থাপন করেছিলেন বলে এই শিবের নাম মন্মথেশ। মন্মথের অপর নাম কামদেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বলে মহাদেব এখানে কামদ। এ প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে শিববাক্য হল - ভ্রূণহত্যাহরং দেবি কামদং পুত্রবর্ধং। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এইস্থানে তপস্যা করে এই শিবের মহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন -

অনপত্যা যা চ নারী স্নায়ন্বৈ পাণ্ডুনন্দন।
পুত্রং সা লভতে পার্থ সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতং॥

অর্থাৎ বন্ধ্যা নারীও এই তীর্থে স্নান করলে সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত সন্তান লাভ করে। এখানে রাত্রি জাগরণ ও নৃত্যগীতাদির দ্বারা এই মন্মথেশের পূজা করে যাঁরা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ পুত্রলাভ করেছেন এমন কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বন্ধ্যা মায়েদের ভীড় বেশী হয়। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে সেখানে কি ভক্তের কোন অভাব হয়! বিশেষতঃ মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে হিংস্র জন্তুর যে উপদ্রব আছে, এখানে সে ভয় নেই বললেও চলে। সেই সুপ্রাচীন যুগ হতেই এরণ্ডীক্ষেত্রে এই ধারা চলে আসছে। অন্যে পরে কা কথা। মহর্ষি অত্রির পত্নী মহাসতী অনসূয়াদেবীও পুত্রলাভ কামনায় এই এরণ্ডী সংগমে এসে এরণ্ডীক্ষেত্রাধিপতি মন্মথেশের তপস্যা করেছিলেন।

তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একসঙ্গে তাঁর কাছে প্রকট হয়ে বর দিতে চাইলে তিনি প্রার্থনা করেন - আপনারা তিনজনেই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন।

মহাদেব তখন বললেন -

এবং ভবতু তে বাক্যং যত্ত্বয়া প্রার্থিতং শুভে।
প্রত্যক্ষা বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নাম নামতঃ॥
যস্যা দর্শন মাত্রেণ নশ্যতে পাপসঞ্চয়ঃ॥

- ভদ্রে! তুমি যা প্রার্থনা করলে, আমরা তা পূর্ণ করব। শুধু তাই নয়, যাঁর দর্শনে সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই প্রত্যক্ষ বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে এই স্থানে বিরাজ করুন।

অযোনিজা ভবিষ্যামস্তব পুত্রা বরাননে।
যোনিবাসে মহাপ্রাজ্ঞি দেবা নৈব ব্রজন্তি চ॥

- দেবতারা গর্ভবাসে গমন করেন না, অতএব আমরা যোনিজন্ম ব্যতীত তোমার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হব।

তদনুযায়ী ব্রহ্মা সোম নাম নিয়ে, মহেশ্বর দুর্বাশা নাম নিয়ে, এবং বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নাম নিয়ে অনসূয়ার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রেবাখণ্ডে এরণ্ডীক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণ পড়ে নিও। এখন যাও, মন্দিরে প্রবেশ করে মন্মথেশ এবং বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবী এরণ্ডীমাতাকে দর্শন করে এস। সেইমাত্র পূজা হয়েছে, ফুল বেলপাতায় শিবলিঙ্গ ঢাকা, ভাল করে স্বরূপ দর্শন হলনা। এরণ্ডীমাতার বিগ্রহ এতই সিন্দুরলিপ্ত যে তাঁরও বিগ্রহ কারও পক্ষে স্পষ্টভাবে দেখার উপায় নেই। মন্মথেশ এবং এরণ্ডীমাতার শ্রীচরণে জল ঢেলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

রামদাসজীর সঙ্গে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। তিনি ঢালু থেকে বৈদূর্য পর্বতের চূড়ার দিকে, পূর্বমুখে চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলেন। ভাবলাম চূড়ায় ওঠার মতলব নাকি! নাহ্, মিনিট দশেক এইভাবে উঠে তিনি পশ্চিম দিকে বাঁক নিলেন। সেইদিকে কিছুটা হাঁটার পর পাথরের গায়ে পরিস্কার পথরেখা চোখে পড়ল। কোটিতীর্থের ঘাট থেকেও একটি পরিস্কার পথরেখা এসে এই রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখান থেকে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই দূর থেকে একটি মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের কাছাকাছি আরও একটি পাকা বাড়ী, একটু দূরেই স্থায়ী বাসিন্দাদের কিছু বাড়ী ঘরও চোখে পড়ল। মন্দিরে পৌঁছেই রামদাসজী বললেন - এই হল ঋণমুক্তেশ্বর শিব। আচার্য শংকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই আছেন রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণ। এইখানের পূজার ধারা বড় বিচিত্র, মন্দিরে পৌঁছে যা দেখবে তাতে তোমার মনে হবে পূজার নামে তামাসা চলছে। রোজই এখানে ভক্তদের ভীড় হয়, দূরদূরান্ত থেকে দক্ষিণতটের বিষ্ণুপুরী ঘাট থেকে খেয়া নৌকায় পেরিয়ে ভক্তরা এসে যাঁরাই ওঁকারেশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁদের অধিকাংশ লোকই ঋণমুক্তেশ্বরের চরণে পাঁচপোয়া অড়হর ডাল ঢেলে যান। ভক্তদের বিশ্বাস এই পাঁচপোয়া ডাল ঋণমুক্তেশ্বরের চরণে অর্পণ করলেই পার্থিব সমূহ ঋণের দায় থেকে অব্যহতি পাওয়া যাবে।

- তামাসা ভাবব কেন! অমরকন্টক হতে আসার পথে মুণ্ডমহারণ্যের নিকটস্থ এক পল্লীতে কুকুরামঠেও শংকরাচার্য কর্তৃক স্থাপিত আর একটি শিবমন্দির দেখে এসেছি, তিনিও ঋণমুক্তেশ্বর; সেখানেও পূজার পদ্ধতি এই রকমই - মহাদেবের শ্রীচরণে পাঁচপোয়া অড়হর ডাল সমর্পণ। উভয় স্থলে ভক্তদের সংস্কার ও বিশ্বাস এক। দেবতার চরণে পাঁচপোয়া ডাল ঢেলে দিলেই সর্বঋণ হতে মুক্তি, এই সংস্কারকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারিনি একথা সত্য, কারণ তাহলে ত একজন মহাজনের কাছে কিংবা নিকট আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কাছে সহস্র সহস্র টাকা ধার করে এখানে এসে পাঁচপোয়া মাত্র ডাল ঢেলে দিয়ে বলতে পারে - ব্যস্ আমার বিবেক পরিস্কার, আমি ঋণমুক্ত হয়ে গেলাম।

এত লঘু অর্থে আচার্য শংকর কোন শিব প্রতিষ্ঠা করে নাম দেবেন ঋণমুক্তেশ্বর, একথা ভাবতে আমার মন সায় দেয়না।

মানুষ জন্মানো মাত্রই কতগুলি ঋণ তার ঘাড়ে চাপে। মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও সমাজ বা দেশঋণ - এই পঞ্চঋণে আমরা সবাই আবদ্ধ। তারমধ্যে মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ অপরিশোধ্য; ভক্তিভরে তাঁদের আমৃত্যু সেবা পরিচর্যা করতে হয়। শাস্ত্রকারদের মতে ঋষিঋণ শোধ হয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, মনন, স্বাধ্যায় এবং ভাষ্য প্রভৃতি রচনার দ্বারা। পূজা জপ তপস্যা যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়। জনহিতকর কার্যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবং দেশকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলে দেশঋণও শোধ হয় বলে শুনেছি। শিবকল্প মহাযোগী শংকরাচার্য ঋণমুক্তেশ্বর প্রতিষ্ঠা করে হয়ত মানুষকে ঐসব ঋণ বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন; ঐসব কাজ যাতে সার্থক ভাবে সুসম্পন্ন করতে পারা যায়, সেইজন্য ঋণমুক্তেশ্বর নামা মহাদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

এখন চলুন, মন্দিরে গিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করি। মন্দিরের চত্বরে দেখলাম কয়েকজন ভস্মমাখা সাধু জপ-ধ্যানে নিরত আছেন। মন্দিরের পাকা বাড়ীতে পুরোহিত থাকেন যাত্রীরাও সেখানে থাকতে পারেন। মন্দিরে ঢুকে দেখি ভক্তরা পাঁচপোয়া করে ডাল শিবের কাছে ঢেলে দিয়ে; হর নর্মদে হর, জয় ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেও বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। এখানেও পাণ্ডারা কোন দক্ষিণা ভক্তদের কাছে দাবী করছেন না। যে যা দিচ্ছেন গ্রহণ করছেন। না দিলেও কিছু বলছেন না। পাঁচ পোয়া ডাল দিলেই তাঁরা খুশী হচ্ছেন। এই শিবলিঙ্গও কুকুরামঠের ঋণমুক্তেশ্বরের অনুরূপ। এরপর রণছোড়জীর বিগ্রহও দর্শন করলাম। মুরলী ও শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

আমি রামদাসজীকে জিজ্ঞাসা করলাম - দ্বারকাতে রণছোড়জীর বিশাল মন্দির এবং নয়নাভিরাম রণছোড়জীর বিগ্রহ আমি দর্শন করেছি। কৃষ্ণগতপ্রাণা মহাসাধিকা মীরাবাঈ-এর আরাধ্য দেবতা এই নর্মদা-সৈকতের পর্বতশীর্ষে কিভাবে অধিষ্ঠিত হলেন ?

- তুমি দৈত্যরাজ বলীর পুত্র বাণাসুর এবং তৎকন্যা ঊষার কাহিনী পড়নি ?

- পড়েছি ত বটেই, আমাদের বাংলাতে ঊষা অনিরুদ্ধকে নিয়ে যাত্রাভিনয়ও আমি দেখেছি। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের গুণধর পৌত্র অনিরুদ্ধ দৈত্যরাজ বানের কন্যা ঊষার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ঊষাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করলে দৈত্যরাজ বাণ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। 'পেয়ারের' নাতিকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্নকে নিয়ে বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। বাণ পরাজিত হন। শ্রীকৃষ্ণ ঊষা ও অনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যান।

- হ্যাঁ, কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধান্তে এই পর্বতশীর্ষে বসে যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করেন। সেই ঘটনারই স্মারকচিহ্ন এই মন্দির এবং বিগ্রহ। এখানে রণবেশ ছেড়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'রণছোড়জী'।

বাণরাজার রাজধানী ছিল এই নর্মদাতটে। প্রবল পরাক্রান্ত বাণ শুধু যে অসাধারণ শৌর্যবীর্যেরই অধিকারী ছিলেন এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ শিবভক্ত। মহারাজ বাণের উগ্র শিব তপস্যায় ভক্তিবশ ভগবান মহাদেব এতই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই 'বাণ' নাম গ্রহণ করে ভক্তের অতুলনীয় ভক্তি ও তপস্যাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। তাই বাণ শব্দের অর্থও হয়েছে শিব। তিনি বাণলিঙ্গরূপে স্বতঃই নর্মদার জলে উদ্ভুত হয়ে নিয়ত নর্মদাতে বিরাজমান থাকবেন, এ বর তিনি বাণকে দিয়েছিলেন। তোমার পরিক্রমা পথে যখন ধাবড়ীকুণ্ডে পৌঁছবে তখন সেখানে অজস্র বাণলিঙ্গ দেখতে পাবে। ঐ ধাবড়ীকুণ্ডই ছিল বাণের যজ্ঞকুণ্ড এবং তপস্যাস্থল। এ বিষয়ে স্বয়ং মহাদেবের উক্তি হল -

স্বয়ং সংশ্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্মদাজলে
পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিত নর্মদাতটে।
অবিবসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোঽর্থাজ্জগতীতলে ॥

ঋণমুক্তেশ্বর ও রণছোড়জী দর্শন করে রামদাসজী পশ্চিমদিক থেকে পাহাড়ের উত্তর ঢাল বেয়ে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ উৎরাই-এর পথে হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম বিশাল এক ধ্বংসস্তূপের কাছে। পাহাড়ের উত্তর দক্ষিন পৃষ্ঠ জুড়ে এই ধংসস্তূপ। চারদিক বেষ্টন করে আছে বিরাট চওড়া চওড়া পাথরের প্রাচীর, কোথাও আধভাঙা দু-একটা তোরণ। প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, আদিতে তা যে কত বড় ছিল তা অনুমান করার উপায় নেই, তবুও ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীরের উপর দিয়ে বার চৌদ্দ ফুট চওড়া রাস্তা চলে গেছে দেখে বোঝা যায় যে একসময় হয় এখানে কোন বিরাট দুর্গ কিংবা কোন দুর্ধর্ষ সম্রাটের বিশাল রাজপ্রাসাদ ছিল। কোথাও কোথাও বিরাট চওড়া সিঁড়ির ধাপও দেখতে পাচ্ছি। নর্মদাবক্ষে জেগে ওঠা শৈলদ্বীপের উপরে পর্বতের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে কে যে এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাসাদ বা দুর্গনগরী গড়ে তুলেছিলেন তা জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই রামদাসজী নিজেই উত্তর দিলেন - এই হল মান্ধাতা পুত্র, মহারাজ মুচকুন্দ নির্মিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। একদিন এই রাজপ্রাসাদের প্রতাপে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ নতশির হয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং বেদমন্ত্রের ধ্বনিতে এই প্রাসাদ একসময় সর্বদাই মুখর থাকত। কালক্রমে তাঁদের সেই শৌর্যবীর্য-সমন্বিত স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। হৈহয় বংশের রাজা মহিষ্মৎ এই নগরী জয় করে নেন, তাঁর নামানুসারে নগরীর নাম হয় মাহিষ্মতী, যে বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখন দেখছো কাঁটা বাবলা আর নিমগাছ গজিয়ে উঠেছে, একসময় এই দুর্গনগর সর্বতোভাবে দুর্লঙ্ঘ্য এবং অজেয় ছিল। মুচকুন্দ এই নগরীর আদি প্রতিষ্ঠাতা হলেও হৈহয় বংশের দিগ্বিজয়ী মহারাজা কার্তবীর্যার্জুনের আমলে মাহিষ্মতীর গৌরাবগাথা আসমুদ্রহিমাচলে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শুধু দেবদৈত্যজয়ী রাবণকে পরাজিত করে ক্ষান্ত হননি, নর্মদার মোহনা হতে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি জয় করে নেন।

মহাভারতে বেদব্যাস তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন - 'অনুপপতিবীরঃ কার্তবীর্যঃ' (বনপর্ব, ৯৭ অধ্যায়, শ্লোক ১৯) মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'অনুপপতিঃ' শব্দের অর্থ করেছেন - সমুদ্রজলপ্রায়দেশস্য রাজা, অর্থাৎ সমুদ্রতীর পর্যন্ত দেশসমূহের রাজা। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে কার্তবীর্যার্জুনকে 'অনুপনিবৃৎ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত পার্জিটার তাঁর Ancient Indian Historical Tradition নামক পুস্তকে এবং ক্যনিংহাম প্রণীত Ancient Geography-তে নর্মদার মধ্যবর্তী শৈলদ্বীপস্থ এই গ্রামকে মাহিষ্মতী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে মধ্যপ্রদেশের নিমাড় জেলার খাণ্ডব তহশীলের মধ্যবর্তী নর্মদা দ্বীপস্থ একটি গ্রামের নামই মাহিষ্মতী।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ পড়লে জানা যায় যে নর্মদা বা রেবানদীর তীরে বহু প্রাসাদ শোভিত 'মাহিষ্মতী' একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। মহাকবি তাঁর অনুপম ভাষায় যেভাবে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বিবরণ দিতে গিয়ে নর্মদা মধ্যস্থ এই মাহিষ্মতী রাজপ্রাসাদের আলেখ্য এঁকেছেন, তা তোমাকে শোনাবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। সেই স্বয়ম্বর সভার প্রধান দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পাণিপ্রার্থী রাজা মহারাজাদের পরিচয় দিতে দিতে যখন কার্তবীর্যের বংশধর মহারাজ প্রতীপের নিকট এসে পৌছলেন, তখন দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে বলছেন -

অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জলবেণিরম্যাম্, রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ॥
(রঘুবংশ, ষষ্ঠ সর্গ, ৪৩)

অর্থাৎ মহারাজ প্রতীপের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর প্রাকাররূপ নিতম্বে মেখলার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। সেই প্রাসাদের গবাক্ষ হতে যদি রেবা নদীর রমণীয় জলপ্রবাহ তোমার দর্শন করার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই দীর্ঘবাহু নরপতির অঙ্কলক্ষ্মী হও।

সাঁচীর অনুশাসন লিপিতেও মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে, মাহিষ্মতী হতে বহু দর্শক সাঁচীর স্তূপ দেখতে আসতেন। পারমারদের রাজা দেবপালের মান্ধাতা অনুশাসনলিপি হতে জানা যায় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহিষ্মতী নগরে অবস্থান কালে রাজা দেবপাল, ওঁকার শীর্ষে বহু শিবমন্দির নির্মাণ এবং সংস্কার করান; তারপর নর্মদাতে স্নান করে এই দানপত্র লিখে দেন।

তাহলে ভেবে দেখ মান্ধাতা, মুচকুন্দ, কার্তবীর্যার্জুন, প্রতীপ হতে আরম্ভ করে পারমাররাজ দেবপাল পর্যন্ত এতগুলি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজধানী হওয়ায় মাহিষ্মতীর রাজপ্রাসাদ বা দুর্গ যে কিরকম বিশাল এবং ঐশ্বর্য আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল তা এখনকার এই ধ্বংসাবশেষকে দেখে শুধু তুমি আমি কেন কারও পক্ষে তার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এখন মান্ধাতার স্থায়ী অধিবাসীদের সংখ্যা কোনমতেই হাজার খানেকের বেশী নয়। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল যাঁদের অধিকারে ছিল, তাঁদের রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ কিরকম ঐশ্বর্যময় এবং সুরক্ষিত হওয়া উচিৎ তা অনুমান করা কি খুব শক্ত কাজ!

ভগবান পরশুরাম কিভাবে কার্তবীর্যার্জুনের সহস্রবাহু বিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈর্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্' অর্থাৎ শাণিত ভল্লের দ্বারা ছেদন করে তাঁকে নিহত করেন এবং পরে কার্তবীর্যের পুত্রগণ ধ্যানমগ্ন মহর্ষি জমদগ্নিকে হত্যা করলে তিনি 'প্রতিযজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্বক্ষত্রস্য' - সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন, সে সকল বিবরণ নিশ্চয়ই তুমি মহাভারতে পড়েছ, কাজেই সে সব কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু একটি কথা স্মরণ করাতে চাই যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য পরশুরাম যখন নির্বিচারে ক্ষত্রিয় নিধন করছিলেন, সেই সময় তাঁর পিতামহ মহর্ষি ঋচিক সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অহেতুক নরহত্যা বন্ধ করে তপস্যায় ব্রতী হতে নির্দেশ দেন। পিতামহের প্রত্যাদেশে পরশুরাম এইখানে এই মহেন্দ্র পর্বতে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তপঃ সুমহদাস্তায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপ!
অস্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যামিতবিক্রম!
(মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৯৮)

মহাভারতের এই ব্যাসবাক্যে বোঝা যাচ্ছে যে মাহিষ্মতী সংলগ্ন এই ওঁঙ্কারেশ্বরই মহেন্দ্র পর্বত - পরশুরামের তপস্যাস্থল। মহর্ষি অত্রি এবং অনসূয়াও এইখানকার এরণ্ডী সংগমে তপস্যা করে গেছেন। এমনকি মণ্ডন মিশ্র দিগ্বিজয়ের মতে এইখানে তিনি শংকরাচার্যের নিকট পরাজিত হন। শংকরাচার্য এবং তাঁর গুরু আচার্য গৌবিন্দপাদেরও সিদ্ধিক্ষেত্র এই মাহিষ্মতী। চল এবার এই সিদ্ধ তপস্যাক্ষেত্র এবং প্রাচীন কীর্তিমতী নগরীকে প্রণাম করে এই স্থানের সোমনাথ মন্দিরে যাই।

বৈদূর্য পর্বতের গা বেয়ে চড়াই উৎরাই এর পথে ছোটবড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পরেই পর্বতের উত্তর কোণে চোখে পড়ল চারতলা উঁচু এক শিবমন্দির। মন্দিরের রঙ বালিপাথরের লালচে আভাযুক্ত গৈরিক। রামদাসজী বললেন - এই মন্দিরই সোমনাথ মন্দির। কেউ কেউ বলেন - গৌরীসোমনাথ। সোমনাথ বললেই যথেষ্ট, পৃথকভাবে গৌরী সোমনাথ বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ, সূতসংহিতার ঋষি বলেছেন -

ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
উমাশংকরয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

অর্থাৎ শিব ভিন্ন শক্তি থাকেন না, আর শক্তি ছাড়া শিবও থাকেন না। শিব মানেই একত্রে অর্ধনারীশ্বর। যে উমাশংকরের ঐক্য দর্শন করে, সেই যথার্থ দর্শন করে।

এই প্রসঙ্গে রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ-এর একটি শ্লোক মনে আসছে, সেটিও তোমাকে বলছি শোন -

ব্যক্তং সর্বমুমারূপমব্যক্তন্তু মহেশ্বরম্।
উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগ বিষ্ণুরুচ্যতে॥

অর্থাৎ যা কিছু বস্তু বা ব্যক্তি সবই উমার ব্যক্তরূপ, মহেশ্বরও আছেন তবে তিনি অব্যক্ত। উমাশংকরের এই যোগকেই বিষ্ণু বলা হয়।

সারকথা, শিব বিষ্ণু এবং শংকরীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। তুমি প্রথমদিন ওঁকারেশ্বরজীর পূজা করতে গিয়ে সেই যে নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায় মন্ত্রটি পড়েছিলে, তা শুনে আমার গভীর পরিতৃপ্তি হয়েছিল। আজ স্কন্দোপনিষৎ এর ঐ মন্ত্র তোমাকে আমি পড়াব। তুমি পূজা করবে। চল গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। সোমনাথকে দর্শন করে তুমি চমকে যাবে। মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখলাম নন্দিকেশ্বর ভৈরব, হনুমান, গণেশ, ষাঁড় প্রভৃতির মূর্তি বিরাজিত। মন্দিরে দুজন পাণ্ডা, দুজন সাধু এবং মোটে পাঁচজন ভক্ত ছাড়া আর কেউ নেই।

দেখবার মত শিবলিঙ্গই বটে। বিশাল শিবলিঙ্গ, ঘন কৃষ্ণবর্ণ - এমন ঝকঝক করছে মনে হচ্ছে যেন সবেমাত্র কয়েকদিন আগেই পালিশ করা হয়েছে। এত বিশাল কলেবর যে দুজন লোক পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরলেও শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করতে পারবেনা। একজন পাণ্ডা আমাকে এই শিবলিঙ্গের ইতিবৃত্ত শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন যে আদিতে সোমনাথজী ছিলেন স্ফটিকস্তম্ভ। দর্শক পরজন্মে কি হবে, জানবার ইচ্ছা নিয়ে শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়ালেই ত তার চোখের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে উঠত। একবার বাদশাহ্ আওরঙজেব হিন্দুদেবতার এই খ্যাতি শুনে তাঁর ভবিষ্যৎ জন্ম জানবার জন্য ছদ্মবেশে এসে সোমনাথজীর সামনে দাঁড়ান। তিনি দেখতে পেলেন, লিঙ্গগাত্রে এক ঘৃণিত শূকর-মূর্তি ভেসে উঠেছে। ক্রুদ্ধ বাদশাহ শিবলিঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেন। তার ফলেই শ্বেতলিঙ্গ কৃষ্ণলিঙ্গে পরিণত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, পাণ্ডার এই গল্পের একটি অক্ষরও বিশ্বাস করতে পারলামনা। বুঝলাম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত, হলাহল মাখানো এই কিংবদন্তী রটনা করে সমকালীন হিন্দুরা প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী মোগল সম্রাটের হিন্দু নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

যাই হোক রামদাসজীর ইঙ্গিতে একটা পাথরের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে তুলে শিবের মাথায় জল ঢালতে লাগলাম, রামদাসজী মন্ত্র পড়লেন -

যথা শিবময়ো রামস্বেবং রামময়ঃ শিবঃ
যথা হন্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি
যথাহন্তরং ন ভেদাঃ স্যুঃ শিবরাঘবয়োস্তথা॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র যেরকম শিবময়, শিবও সেইরকম রামময়; আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হোক যেন আমি ভেদদর্শন না করি। অবান্তর ভেদসমূহের বিনাশের মত শিব ও রামচন্দ্রের ভেদদর্শন নষ্ট হোক।

'আমি যেন ভেদদর্শন না করি' - এই অভেদ ভাবের দ্যোতক মন্ত্র পাঠ করে আমার মনে খুব তৃপ্তি হল। মনে মনে এই ভেবে রামদাসজীকে ধন্যবাদ দিলাম যে, তিনি স্থান কাল বিবেচনা করে যথোপযুক্ত মন্ত্র শুনিয়েছেন আমাকে। সোমনাথকে প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম - প্রভু! তুমি মঙ্গলময় শিবশংকর। তুমি ভূতনাথ, প্রতি জীবের মধ্যে তুমি নিত্যকাল ধরে বিরাজ করছ। তোমার যাঁরা উপাসনা করেন তাঁদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকবে কেন! হে রুদ্ররূপী মহাকাল - তুমি মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, অজ্ঞানতাবশতঃ যে ভেদবুদ্ধি আছে, তা দূর কর প্রভু!

মন্দিরের বাইরে এসে রামদাসজী বললেন - চল এবার ফেরা যাক্। যেটুকু বাকী থাকল, কাল সকালে মঙ্গলদাস ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সেসব স্থান পরিক্রমা এবং দর্শন করতে পাঠাব।

আমরা সোমনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরকোণের ঢাল ধরে পশ্চিমদিকে প্রায় আধঘন্টা হেঁটে কোটিতীর্থের ঘাটে এসে পৌঁছুলাম। উভয়ে স্নান করলাম নর্মদায়। ওঁকারজীকে প্রণাম করে বেলা একটা নাগাদ ফিরে এলাম ভজন আশ্রমে। আশ্রমে তখন পূজা এবং ভোগারতি শেষ হয়েছে। রামনামের ভজন চলছে - শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

মধ্যাহ্নভোজন এবং দিবানিদ্রার পর সন্ধ্যার মুখে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে ওঁকারেশ্বরের আরতি দেখতে গেলাম। মন্দিরের সর্বত্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম প্রলয়দাসজীর সাক্ষাৎ পাই কিনা। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলামনা। আরতির শেষে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ কোটিতীর্থের ঘাটে বসলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম - তুমি তোমাদের গুরুদেবের পূর্বাশ্রমের কিছু বিবরণ জান কি ?

- তাঁর বিষয়ে ষড়ঙ্গী মহারাজই বেশী বলতে পারবেন। আমি শুনেছি গুরুজী পূর্বাশ্রমে এলাহাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। খুবই কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি; এম এ পাশ করে পি. এইচ. ডি. করেছেন। কিছুদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে করতেই তিনি একবার চিত্রকূট যান। সেখানকার জানকী কুণ্ডে তখন তিলকদাসজী নামে একজন রামায়েৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মহাত্মা বাস করতেন। তিনি অহোরাত্র রামনামে বিভোর থাকতেন। মাঝে মাঝেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। একদিন তিনি অর্ধবাহ্যদশায় আমাদের গুরুজীকে স্পর্শ করেন। তাঁর সেই দিব্যস্পর্শ পাওয়ার পর কি যে হল গুরুজীর, তিনি আর এলাহাবাদে ফিরলেন না। ঘর সংসার সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী সবই ভেসে গেল। তিনি সেই জানকী কুণ্ডে গুরুজীর কাছেই পড়ে রইলেন। মহাত্মা তিলকদাসজীর অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর তিনি চিত্রকূট এবং অযোধ্যাতে কাটানোর পর প্রায় বছর দশেক হল ওঁকার মান্ধাতাতে এসে বাস করছেন। এখনও প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি একবার করে চিত্রকূট গিয়ে দু'একমাস বাস করে আসেন। গুরুজীর কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা কামদগিরির দক্ষিণ পার্শ্বে ভরত-মিলাপ নামক মন্দিরের একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে ভজনে মগ্ন আছেন। তিনি সেখানে 'পাঞ্জাবী ভগবন' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পাঞ্জাবী শরীর বলে ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঐ নামে ভূষিত করেছেন।

আমরা কোটিতীর্থের ঘাট থেকে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমে ঢুকতে ঢুকতে রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি কাতর কণ্ঠে রামচন্দ্রের পুণ্য চরিত্র অনুস্মরণ করছেন। অন্যান্য কুটীরেও মঙ্গলদাস, অচ্যুতদাস, ষড়ঙ্গী মহারাজ - সকলেই রামভজনে রত। আমি চিত্রকূটের এক মহাত্মার মুখে শুনেছিলাম যে বিশিষ্ট চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের মাধুর্য তথা রামলীলার অমৃত কারও পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নয়। সেই চিত্তপ্রসাদ সম ও দৈন্য, শরণাগতি এবং আত্মনিবেদনের ভাব হতেই জন্মে থাকে। সেই আধ্যাত্মিক মনোভাব এই আশ্রমের সর্বত্র পরিস্ফুট দেখছি। ঘরের মধ্যে কুশ-শয্যায় বসে আমি রামদাসজীর আকূতি নিবেদনের মর্মস্পর্শী ভাষা স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গাইছেন -

নান্যস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়ে অস্মদীয়ে সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

- হে রঘুপতি, আমার অন্তরে অন্য কোন বাসনা নেই, একথা সত্য করে বলছি আর তুমিও তা জান, কারণ অখিল জগতের তুমি অন্তর্যামী, আমাকে পরিপূর্ণ ভক্তি দাও। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমার অন্তরকে কামনা বাসনা প্রভৃতি কলুষ হতে মুক্ত করে তোমার রাতুল চরণে শরণাগতি দাও প্রভু।

পরদিন সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আসার পরই রামদাসজী মঙ্গলদাসজীকে ডেকে বললেন - তুমি শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকে নিয়ে ভৈরব শিলা, রাবণনালা, আশাপুরী মাতার মন্দির এবং সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি দেখিয়ে নিয়ে এস। ঠাকুর সেবার কাজ আমি করব। তাঁর নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলদাসজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে চলা সরুপথ নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে। উভয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছি। মঙ্গলদাসজী জানালেন - ওঁকারেশ্বরের মন্দির হতে গোপীকিষণ জয়কিষণ বাহাতী ধর্মশালা পর্যন্ত এই আধমাইল রাস্তার দুপাশে যা কিছু বাড়ী ও দোকানপাট। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে চাষী, গোয়ালা এবং পাণ্ডাদের কয়েকটা বাড়ী আছে। একটি সংস্কৃত পাঠশালাও আছে। সেগুলো বোধহয় গুরুজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখেছেন। তবে দক্ষিণতটে বিষ্ণুপুরীর পেছনে পোষ্ট অফিস, প্রাইমারী স্কুল, লাইব্রেরি, গ্রাম পঞ্চায়েৎ দপ্তর এবং একটা পুলিশ চৌকী আছে। অনেকগুলি পাকাবাড়ী, ধর্মশালা এবং চার পাঁচটা মন্দিরও আছে সেখানে। এই শৈলদ্বীপে লোকজন কম, কিন্তু গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে এইস্থান হাজার হাজার সাধু মহাত্মা এবং গৃহী ভক্তের ভীড়ে পূর্ণ থাকে।

এইসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ মঙ্গলদাসজী কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট কুটীর দেখিয়ে বললেন - এই কুটীরে আমার এক পরিচিত লোক থাকে; নাম শম্ভুনাথ। সে নাগপুরে বি.এ. অবধি পড়েছে। রাবণনালা প্রভৃতি সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু পড়াশুনাও করেছে। তাকে ডেকে নিয়ে আসছি, সে সঙ্গে থাকলে আপনাকে সবকিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারবে। শম্ভুনাথের জীবনটা বড় দুঃখের, খাণ্ডোয়ায় বাড়ী, এখন বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। বেশ সম্পন্ন পরিবারের সন্তান, ক্ষেতি উতি বেশ আছে। আমাদের এ দেশের যা রীতি, অল্প বয়সেই সে বিবাহ করেছিল, একটি চার পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলেও আছে। হঠাৎ কোথা থেকে কি যে হল! শম্ভুনাথের এক বিধবা দিদি আছে, সেই দিদি শম্ভুনাথের মনে তার স্ত্রী-এর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল। মাথার উপর মা-বাবা নেই, তাঁরা বহুকাল আগেই গত হয়েছেন, দিদিই অভিভাবক। দিদির প্ররোচনায় শেষপর্যন্ত সে নিজের ধর্মপত্নী এবং একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করে এইখানে পালিয়ে আসে। ঐ কুটীরে একজন সাধু থাকতেন। তিনি গত হওয়ার পর ঐ কুটীরটা খালিই পড়েছিল। ঐখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কি খায়, কিভাবে সে থাকে তা একমাত্র রামচন্দ্রই জানেন। ওর স্ত্রী শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। মাঝে মাঝেই শম্ভুনাথ কিষেণ কিষেণ বলে কাঁদে। লোকে ভাবে ও হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছে, কিন্তু আমি জানি কিষেণ ওর ছেলের নাম। কুটীরে দ্বারে এসে আমরা পৌঁছে গেছি। একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় ব্রহ্মচারীদের মত করে পরা, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত বটে তবে চোখের কোণে কালি, রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন, বেশভূষা মলিন। মঙ্গলদাসজী আমার পরিচয় দিয়ে ভৈরবশিলা যেতে অনুরোধ করতেই সাগ্রহে সে উঠে পড়ল খান দুই চটি বই হাতে নিয়ে। মঙ্গলদাস জানালেন - যখন যাত্রীদের ভীড় হয় তখন শম্ভুভাই অনেক সময় গাইডের কাজ করে।

যাইহোক, আমরা তিনজন উত্তরদিকের পাহাড়ের ঢাল থেকে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম দক্ষিণদিকের ঢালু পর্বত পৃষ্ঠে। নর্মদাতটের এই পর্বতরেখা দ্বীপের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত পৌঁচেছে। সেখানেই নর্মদা-কাবেরী সঙ্গম। স্নানের উপযোগী ঘাট সেখানে নেই, এত ঢালু যে একটু পা পিছলোলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমরা পর্বতের শিরোরেখা ধরে অতি সাবধানে চলতে চলতেই দূরে একটা জৈন মন্দির দেখতে পেলাম, তার অদূরেই এক বিষ্ণুমন্দির। এই দুই মন্দিরের মধ্যস্থল দিয়ে বয়ে আসছে একটি নালা। শম্ভুনাথ বললেন - এই নালার নামই রাবণনালা। সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে সেই নালার ধারে পৌঁছে দেখি এক বিরাট রাক্ষুসে মূর্তি দণ্ডায়মান। মূর্তিটির দশটি বাহু, লম্বায় মূর্তিটি দশফুট। মূর্তির গলদেশে সাপের হার, হাতে তলোয়ার এবং নরমুণ্ড। মূর্তির শূন্য উদর মনুষ্যরক্তে পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, সেই উদরে বাঁকানো এক বৃশ্চিক মূর্তি।

ঐ বীভৎস ভয়াবহ মূর্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই শম্ভুনাথজী বললেন - কেউ বলেন এটি রাবণের মূর্তি, আবার কারও কারও মতে এটি ভৈরবপত্নী মহাকালীর মূর্তি। মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে দেখুন ঐ যে পর্বতশৃঙ্গ, পূর্বে ঐখান থেকে ভৈরবের ভক্তরা লাফিয়ে নিচে শিলাময় পাদদেশে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে মহাকালীর রক্তপিপাসা মেটাত। ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভরত সিংহ মান্ধাতা দখল করেন, তখন ঐ মহাকালী বা ভৈরবের পূজারী মাত্র একজনই ছিলেন, তাঁর নাম গোঁসাই দরিদ্রনাথ। অন্যেরা ভয়ে কেউ পূজার কাজে এগিয়ে আসত না। কিংবদন্তী এই যে গোঁসাই দরিদ্রনাথ কঠোর তপস্যাবলে মহাকালীকে ভূনিম্নস্থ এক গহ্বরে আবদ্ধ করে রাখে এবং সেখানে আর একটি কালীমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন। দরিদ্রনাথের পূজায় মহাকালী সন্তুষ্ট হন। ভৈরবের কাছে দরিদ্রনাথ মানত করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিবৎসর অন্তর তিনি নরবলি দিয়ে ভৈরব ও মহাকালীর উদর নররক্ত দিয়ে পূর্ণ করবেন, তবে শর্ত এই যে, তাঁরা অপরাপর যাত্রীদের প্রাণ হরণ করে যখন খুশী নিজেদের উদর পূর্তি করতে পারবেন না।

এই নরবলিপ্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন মান্ধাতা দ্বীপ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল। সুতরাং তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তা এই 'ভৈরবশিলায়' নরবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ছি শুনুন। এই বলে শম্ভুনাথজী হাতের একটি ছোট ইংরাজী বই পড়ে শোনাতে লাগলেন। বইটির লেখক বলছেন - 'যেদিন নরবলির উৎসব হবে, সেদিন আমি খুব ভোরে উঠে ভৈরব মূর্তির কাছে গেলাম। যে ভক্ত ভৈরবের কাছে আত্মবলি দেবে সে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে উপস্থিত হল, তার চোখে মুখে দুরন্ত উল্লাস। আমি কিছু পরে তার কাছে গেলাম এবং তাকে এই ভীষণ কাজ হতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনেক করে বোঝালাম; সারাজীবন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ করব, এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। আমার সঙ্গে নৌকো ছিল, আমি তাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনতার কাছ হতে দূরে পালিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সব অনুরোধ ব্যর্থ হল; সে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল যে ভৈরবের বলি বন্ধ করা মনুষ্যশক্তির অতীত। দেখলাম এই অবস্থায় বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সে যখন ভৈরবমূর্তির সন্মুখীন হল, তখন তার চারদিক থেকে বর্বর ভীল জনতা চেঁচিয়ে আর হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে থাকল। সে তার দৃপ্তভঙ্গী দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, সে আমার কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছে। প্রথমেই সে ভৈরবের সামনে নারকেল উৎসর্গ করে নৈবেদ্য দিল। তারপর একটা শুকনো লাউ বের করে তার ভেতর থেকে তার সঞ্চিত অর্থ পূজারিণীর সামনে ঢেলে দিল। পূজারিণী এক নারকেলের মালায় কতকটা মদ ঢেলে তাকে পান করতে বলল। মদ দেবার পূর্বে পূজারিণী খানিকটা তার ছেলেকে খাইয়ে দেখাল যে তাতে বিষাক্ত পদার্থ কিছু নেই। কিছুটা মদ ভৈরব বা সেই মহাকালীর মূর্তির উপর ঢেলে দিয়ে ভীলভক্ত তা পান করল।

পূজারিণী ভক্তকে তার হাতের রূপোর আংটিগুলো খুলে দিয়ে দিতে বলল। ভক্তটি তার প্রথম আংটি খুলে নিজের মুখে রেখে দিল, তারপর একে একে দু'হাতের আংটিগুলি খুলে পূজারিণীর হাতে সমর্পণ করল। জনতার দিকে উচ্চৈঃস্বরে সে ডেকে বলল, উজ্জয়িনী থেকে যে লোকটি তার সঙ্গে এসেছে, তাকে কাছে আসতে দাও। সে লোকটির নাম ধরে ডাকতে লাগল, লোকটি ভীড় ঠেলে কাছে এগিয়ে আসতেই তার হাতে সে মুখের ভেতর থেকে বের করে আংটিটি উপহার দিল। এই সময় দেখা গেল অনেক লোক তাদের হাতের রূপার বাজু, গয়না, সুপারি প্রভৃতি সেই ভক্তটির হাত দিয়ে স্পর্শ করাতে চায়। সে প্রত্যেকের দ্রব্যগুলি নিজের মুখে রেখে আবার তাদেরকে ফিরিয়ে দিল। এইবার পূজারিণী তাকে একটা পান খেতে দিল। পান খেয়েই সে পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল। জনতা হাততালি দিতে লাগল। সে যখন পাহাড়ে চড়ছিল, তখন মাঝে মাঝেই লতাগুল্মে তার দেহ ঢেকে যাচ্ছিল। অবশেষে সে পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। যদিও সে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান তবুও ঐ সময়তেও তার ঋজুদেহের বীরত্বব্যাঞ্জক হাবভাব দেখে আমি অবাক হলাম।

সেইখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুবাহু দোলাতে দোলাতে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করল, বলে মনে হল। দু'হাত জোড় করে জনতাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে কোমরের থলি হতে নারকেল, আয়না, চিরুণী, এবং চূর্ণ ইত্যাদি ছুঁড়ে জনতার উদ্দেশ্যে ফেলতে লাগল। পরম পবিত্র জ্ঞানে তা কুড়াবার জন্য জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এরপর কয়েক মুহূর্ত কিছুটা পিছু হটে দৌড়ে এসে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিল। প্রথমে সে সামনে পা রেখে প্রচণ্ড বেগে নিচে পড়তে লাগল, কিন্তু অর্ধপথে একটা টিলার চূড়ায় লেগে মাথা নিচু হয়ে পা দুটো উলটে গেল এবং সেই অবস্থায় ৯০ ফুট নীচে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে মারা গেল। সেই বীভৎস রাক্ষুসে মূর্তির সামনে চাতালে (যার নাম ভৈরববেদী বা ভৈরবশিলা) পড়ে রইল তার বিধ্বস্ত দেহ, গলগল করে রক্ত পড়ছে; পূজারিণী দৌড়ে গিয়ে একটা নারকেল মালায় সেই রক্ত ধরে ভৈরবের সেই বৃশ্চিক চিহ্নিত উদরের মধ্যে ঢেলে দিল। এদৃশ্য যেমনই বীভৎস তেমনই হৃদয়বিদারক'। শম্ভুনাথ বিবরণ শেষে বইটি বন্ধ করে বলল পরিশেষে ইংরাজ শাসক মন্তব্য করেছেন - 'হায় ঐ বর্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুবক, তার ভেতর যে দৃঢ়তা শৌর্য এবং বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তা যদি সে এইভাবে ধ্বংস না করে জগতের কোন বড় কাজে লাগাত!'

শম্ভুনাথ বলতে লাগল - কার্তিক মাসের প্রথম ভাগে মান্ধাতার বাৎসরিক মেলা বসত। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার যাত্রী জমায়েৎ হত। এই সময়েই হত ঐ নরবলির আয়োজন। ১৮২৪ সালের পর যখন মান্ধাতা ইংরেজের অধীনে আসে, তখন নরবলি অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে ভৈরবের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবলির প্রথা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাধারণত এই মেলায় ভক্তদের প্রদত্ত সমূহ বস্ত্র নজরাণা হিসেবে মান্ধাতার রাজারই প্রাপ্য। কিন্তু ভীলদের প্রাচীন প্রথানুসারে ভীল পরিবারের লোকেরা চারদিনব্যাপী মেলায় নজরাণা জোর করে লুট করে নিত। এর ফলে রাজার লোকদের সঙ্গে ভীলদের প্রকাশ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেত। মেলার বহু পূর্ব হতেই উভয়পক্ষের লোকজন প্রস্তুত হয়ে আসত। উভয়পক্ষের লোকেরাই নাকি বেশ লম্বা লম্বা নখ রাখত যাতে নজরাণা ও নৈবেদ্য কেড়ে নিতে পারে।

মান্ধাতার রাজা জাতে 'ভীলালা'। এই রাজারা চৌহান রাজপুত ভরতসিংহের বংশধর; ইনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভীল সর্দারের কবল হতে মান্ধাতা অধিকার করে নেন। দরিদ্রনাথ গোঁসাই এর আমন্ত্রণে চৌহান ভরতসিংহ এসে সর্দার মাথু ভীলকে হত্যা করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাদের বংশধররাই বর্তমানে 'ভীলালা' নামে পরিচিত। ভীল খাঁটি পার্বত্যজাতি কিন্তু ভীলালা হচ্ছে রাজপুত ও পার্বত্যজাতির সংমিশ্রণ।

বর্তমানে ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের পুরোহিতরা পূর্বোক্ত দরিদ্রনাথ গোঁসাই এরই বংশধর।

ভৈরবশিলা হতে কিছুদূর হাঁটার পর একটি পুরাতন পাথরের দোতলা বাড়ী দেখিয়ে শম্ভুনাথ বললেন - ঐ বাড়ীতে ওঁকারের বর্তমান রাজবংশের লোকেরা বাস করেন। জাতিতে এঁরাও ভীলালা। রাজবাড়ীর কাছেই তাঁদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আশাপুরী মাতার মন্দির। দেখতে যাবেন নাকি!

- আজ পরিক্রমার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত শিবভূমি ওঁকারতীর্থের নূতন কোন শিবমন্দির সকাল থেকে দেখতে পাইনি। রাবণনালা, ভৈরবশিলা ইত্যাদি দেখতেই অনেক সময় নষ্ট হল। এখন এখানে যদি কোথাও প্রসিদ্ধ শিবমন্দির থাকে, সেইখানে আগে চলুন। সারা গ্রীষ্মকালটাই এখানে থাকব। কোন একসময় এসে আশাপুরি মাতাকে প্রণাম করে যাব। কোন মূর্তি বা বিগ্রহ দেখে চরিতার্থবোধ করার মত ভক্ত চরিত্রের লোক আমি নই। প্রাচীন যুগ হতে যে সমস্ত সিদ্ধক্ষেত্রে তপস্যা করে ঋষিরা ঋষিত্ব অর্জন করেছেন , সেই সব ঋষিদের আরাধ্য মহাজাগ্রত শিবলিঙ্গ যদি কোথাও থাকেন, যা এখনও আমি দর্শন করিনি, দয়া করে আমাকে সেই সব পবিত্রস্থানে নিয়ে চলুন।

- তাই হবে, আপনাকে আমি ওঁকারতীর্থের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম স্থান সিদ্ধনাথের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন। এখান থেকে বেশীদূর নয়। এঁকে কেউ কেউ সিদ্ধেশ্বরও বলে থাকেন। প্রাচীনকালে এই মন্দিরই ছিল ওঁকার-তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। প্রাচীন ঋষি মুনিগণ এবং বর্তমানেও যাঁরা শ্রেষ্ঠ তপস্বী, তাঁরা ধ্যান-দৃষ্টিতে নাকি দেখেছেন, ইনিই আদি ওঁকারেশ্বর। মার্কণ্ডেয় মুনি যে ওঁকারলিঙ্গের মাহাত্ম্য উচ্ছসিতভাবে বর্ণনা করেছেন, এই সিদ্ধেশ্বর নাকি সেই মহাদেব, ওঁকারেশ্বর পর্বতের পূর্ব কিনারে অবস্থিত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে, পর্বতপৃষ্ঠের শির বেয়ে উঠতে হবে।

তিনজনে হাঁটিতে হাঁটিতে খাড়াই বেয়ে উঠে এলাম বিশাল এক চাতালের সামনে। মোটা মোটা পাথরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। বিরাট এক প্রস্তরের তৈরী আয়তক্ষেত্র, নিখুঁত জ্যামিতিক নিয়মে পাথর কুঁদে যেন আয়তক্ষেত্রটি স্থাপন করা হয়েছে। তার ধার ঘেঁষে লাল পাথরের একের পর এক স্তম্ভ। মন্দিরের যেটি মূল গর্ভগৃহ ছিল তার দুপাশে মোট আঠারটি স্তম্ভ, প্রায় চৌদ্দ ফুট করে উঁচু, তার উপরে ছাদ ছিল, কিন্তু সে ছাদের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। স্তম্ভগুলিতে এবং মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগাত্রে পাথর কুঁদে কুঁদে বহু হস্তীমূর্তি খোদাই করা আছে, হস্তীযুথের কোন কোনটির পদতলে মনুষ্যমূর্তি শায়িত। হস্তীগুলির অধিকাংশ যুদ্ধ করার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, এই সব রণহস্তীর রণোন্মত্ত ভঙ্গীমা নিপুণ ভাস্করদের শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। খোদিত হস্তী ছাড়াও স্তম্ভগুলিতে আরও বহু কারুকার্য আছে।

শম্ভুনাথ জানালেন যে কালক্রমে মন্দির জীর্ণদশায় পতিত হওয়ায় অনেকগুলি মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ছয়টি নাগপুর সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে।

প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় পাথরের মোটা মোটা খিলানও লক্ষ্য করবার মত। মধ্যে দুই খিলানের উপর চড়ানো রয়েছে পাথরের ভারী ভারী কড়ি, তার উপরে আর কিছুই নেই। সহজেই অনুমান করা যায়, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট মুচকুন্দ, কার্তবীর্য প্রভৃতির কালে যখন ওঁকার মান্ধাতার স্বর্ণযুগ ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই সব খিলান কড়ি আর স্তম্ভরাজির মাথায় ছাদ এবং কারুকার্যমণ্ডিত সারি সারি স্বর্ণকলস সহ স্বর্ণচূড়াও ছিল। সেই সময় এই সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ওঁকারদ্বীপে ত বটেই হয়ত সারা ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ শিবমন্দির রূপে পরিগণিত ছিল। সে সকল কালের করাল আঘাতে বহুকাল আগেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে, কেবল যাঁর ক্ষয় নেই শাশ্বত পুরাণ পুরুষ সেই মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর লিঙ্গরূপে মুক্ত আকাশের নীচে, অদ্ভুত নির্জন পরিবেশে এখনও বিরাজমান আছেন। যোনিপীঠ হতে প্রায় একফুট উঁচু মধুপিঙ্গলবর্ণের আদি ওঁকারেশ্বরের কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। কমণ্ডলুর জল ঢেলে হাত দিয়ে ঘষে লিঙ্গটিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। লিঙ্গের মধ্যে কালো কালো কুণ্ডলী পাকানো রেখা চোখে পড়ল। সবচেয়ে অবাক হলাম এই দেখে যে উন্মুক্ত আকাশতলে বৈশাখের খরতাপে পাথরের লিঙ্গ গরম হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু লিঙ্গটি বড়ই স্নিগ্ধ, লিঙ্গস্পর্শে আমার ভক্তিহীন হৃদয়েও যেন ভক্তির আবেশ যেন উথলে উঠল।

আমার নিত্যসঙ্গী 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক বইটি ঝোলা থেকে বের করে এই শিবলিঙ্গের লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। পাতার পর পাতা উলটিয়ে অবশেষে 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে' দেখতে পেলাম, নারদ একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে বলছেন -

> অথ বক্ষ্যামি তে বিপ্র গুহ্য চিহ্নং অতঃপরম্।
> শ্রবণাৎ যস প্রাপানি নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ ॥
> মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকায়ুতম্।
> স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ ! অতঃপর তোমাকে মহাদেবের একটি গোপন চিহ্নের কথা বলছি, যা শ্রবণ করা মাত্রই সমস্ত পাপের নাশ হয়। শিবলিঙ্গটি যদি মধুপিঙ্গল বর্ণের হয় এবং তা কৃষ্ণকুণ্ডলযুক্ত হয়, তবে তাঁকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে জানবে। সকল সিদ্ধপুরুষদের দ্বারা তিনি পুজিত হন।

আদি ওঁকারেশ্বর নামে কথিত স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বরকে পুনরায় প্রণাম করে উঠে পড়লাম। আমি। শম্ভুনাথজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি কোন লোক আসেনা ? পূজা করেনা ? ফুল - চন্দন - বিল্বপত্র কোথাও কিছু দেখছিনা কেন !

- এখানে লোক বলতে ত দেখছেন দূরে দূরে কিছু ভীল এবং গোয়ালাদের বাড়ী। ভৈরবশিলার কাহিনী শুনেই ত বুঝতে পারছেন, একশ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেও এখানকার লোকের মানসিকতা কিরকম ছিল! তাদেরই বংশধররাই এদিকে সেদিকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মন্দির নেই, কোন জাঁকজমক নেই, মন্দিরে এসে প্রসাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, এইরকমভাবে নিরাভরণ ও সর্বরিক্ত হয়ে বসে আছেন যিনি, সেই ঠাকুরের পূজা করতে গৃহী আসবে কিসের আশায়! ভক্তদের

ভীড় যদি নাই থাকে, যথেষ্ট প্রণামী যদি না পড়ে, তবে পাণ্ডারাই বা আসবে কেন! আজকের সমাজে দেখছেন তো লম্বশাটপটাবৃতদেরই কদর বেশী। গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে অন্য সময় যখন তীর্থযাত্রীদের ভীড় হয়, তখন কিছু কিছু ভ্রমণকারীরা আসেন এই মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ঠ অংশটুকুর কারুকার্য দেখার জন্য। এখানকার এক বৃদ্ধের মুখে শুনেছি, এই পর্বতগাত্রে নাকি অনেক গোপন গুহা আছে। গভীর রাত্রে সেইসব গুহা থেকে অনেক সিদ্ধ মহাত্মা এই আদি ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে আসেন। এখানে জনশ্রুতি এই যে, এখানে সূক্ষ্মদেহীরা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের কণ্ঠস্বর এবং মন্ত্র পাঠের শব্দ গভীর রাত্রে দূরাগত শব্দের মত কেউ কেউ শুনেছেন। ভৌতিক কাণ্ড ভেবে তাই কোন লোকই এই ভূতনাথের কাছে আসেনা।

যে পথে গিয়েছিলাম, আবার সেই উৎরাই-এর পথে পর্বতের শিরোরেখা ধরে, রাজপুরীর ভৈরবশিলা প্রভৃতি অতিক্রম করে শম্ভুনাথের কুটীরের কাছে পৌঁছে গেলাম। মঙ্গলদাসজীর ক্রমাগত সংকেতের ফলে, আমি শম্ভুনাথজীকে বললাম - আমি এখন ভজন-আশ্রমে থাকব, রোজই ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে আসব আরতি দেখতে। আপনি যদি বেড়াতে বেড়াতে ওখানে যান, তাহলে কোটিতীর্থের ঘাটে বসে দুজনে গল্প করা যাবে। মঙ্গলদাসজী ত সন্ধ্যাকালে ঠাকুরসেবায় ব্যস্ত থাকেন।

- জরুর যাউঙ্গা। তবে এখানে ইয়াদওদের বাড়ীতে আমি দু'তিনটি ছোট ছেলেকে হিন্দী ও ইংরাজীর বর্ণ পরিচয় শেখাই। তাদেরই বাড়ীতে আমি আহার করি। আমি নিজেও ইয়াদও অর্থাৎ যাদব গোষ্ঠীভুক্ত। দু'বেলা আহার ছাড়াও সেই শিশুদের একটি আমার ছেলে কিষেণের মত দেখতে। পড়াতে পড়াতে তাকে আদর করতে আমি বড় তৃপ্তি পাই। এই বলে শম্ভুনাথজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মঙ্গলদাসজী তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তিনি কুটীরের দিকে চলে গেলে আমরা দুজনে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের ধার দিয়ে বেলা এগারটা নাগাদ ভজন-আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। রামদাসজী জিজ্ঞাসা করলেন - ক্যা পরিক্রমা সমাপ্ত হো গয়ি ? অব্ ঔর এক দফে আস্নান কর লিজিয়ে।

কুটীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় স্নান করতে গেলাম। শম্ভুনাথজীর কান্না দেখার পর থেকে মনটা ভারী অস্থির হয়েছিল। নর্মদার কাকচক্ষু স্নিগ্ধ জলে স্নান করে শরীর ও মন দুই জুড়োলো।

আশ্রমে ভোগ নিবেদন হচ্ছে। শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি সহ মধুর রামনাম গানে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে। রামদাসজী শ্রুতিমধুর কণ্ঠে রামচন্দ্রের বন্দনা করছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনাদির পরে ঘরে বসে নানা কথা চিন্তা করতে করতে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর দর্শনের জন্য মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমি চলে এলাম ওঁকারেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরে ঢুকেই আমি সভামণ্ডপম্ অর্থাৎ নাটমন্দিরের চতুর্দিকে প্রলয়দাসজীকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলামনা। মন্দিরের একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম - আপনি ত সেদিন দেখেছিলেন, একজন বৃদ্ধ সাধুকে পুঁথি পড়ে শুনিয়েছিলাম, তিনি কি সকালে মন্দিরে এসেছিলেন ?

- ঐ 'বুঢ্যা অন্ধা' সাধুর মন্দিরে আসা যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনও সকালে কখনও সন্ধ্যায় আসেন। আবার হয়ত দু'দশদিন এলেনই না। 'বাচপনসে' অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই আমি তাঁকে ঐরকমই দেখছি। আমার ঠাকুরদাকেও বলতে শুনেছি, তিনিও তাঁর 'বাচপনসে' ওঁকে ঐভাবে মন্দিরে যখন তখন আসতে যেতে দেখতেন। কারও সঙ্গে কোন 'বাৎচিৎ' করেন না, কোথাও কোন্ গুহাতে পড়ে থাকেন তাও কারও জানা নেই। ওঁকে খুঁজে বেড়ানো আর মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করা একই কথা।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসে কোটিতীর্থের ঘাটেও চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু নাহ্ - তিনি কোথাও নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেল, মন্দিরে আরতির ঘন্টা বেজে উঠল। জানিনা কেন আরতিতে আমার মন লাগছিল না। ওঁকারেশ্বরজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি ফিরে এলাম। ভজন আশ্রমেও তখন আরতি হচ্ছে। সকলেই রামনাম করছেন। আমি ঘরে ঢুকে বসে থাকলাম। আরতির শেষে মঙ্গলদাসজী চুপি চুপি এসে জিজ্ঞাসা করলেন - শম্ভুনাথ ভেইয়া মন্দির মেঁ আয়ে থে ?

- নেহী জী। আমার অতি সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

প্রদীপের পলতেটা কমিয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আশ্রমিকদের সেই ত্রয়োদশাক্ষর রাম ভজন শুনতে লাগলাম। রামদাসজীও তাঁর ঘরে বসে যথারীতি তুলসীদাসজীর দোঁহা গুণগুণ করে আবৃত্তি করছেন। কিন্তু আজ সেদিকে আর মন লাগল না। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে আবার উঠে বসলাম। প্রদীপের পলতেটা উসকে দিয়ে ডায়েরী খুলে পড়তে লাগলাম। প্রলয়দাসজী ওঁকারেশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, তা এক ফাঁকে ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলাম। ডায়েরী খুলে সেইসব কথা পড়তে লাগলাম।

'সকৃদুচ্চারিতমাত্রং স এষ উর্ধ্বমুৎক্রাময়তি' - ওঁকার একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই দেহস্থ প্রাণন ক্রিয়ার নিম্নগামী ধারা শুষুম্না পথে উর্ধ্বগামী হয়। এ ত সাংঘাতিক কথা। তাই যদি হয়, তবে তা সকলের বোধে ফোটেনা কেন? অজস্র লোক সারাদিনই ত বহুবার 'ওঁ' উচ্চারণ করে। আচমন থেকে আরম্ভ করে যে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে গেলেই ত 'ওঁ' বলতে বাধ্য হয়। গুরুদত্ত যে কোন সিদ্ধবীজও ত 'ওঁ' দ্বারা পুটিত থাকে। একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই সুষুম্নামার্গে প্রাণশক্তি যদি উর্ধ্বপথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে, তবে সকলেরই সিদ্ধিলাভ হয়না কেন! তাহলে নিশ্চয়ই ওঁকার উচ্চারণের কোন গুপ্ত পদ্ধতি, গূঢ় সাধন সংকেত আছে! কিন্তু সেই পদ্ধতি কে আমাকে দেখাবেন! প্রলয়দাসজী বলেছেন - মূর্ধ্বাদেশে ওঁকার উচ্চারণ করবার চেষ্টা করবে। মূর্ধাদেশে ওঁকার মনন করবে। একি এত সহজ নাকি ? বাবার মুখে ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ (১২/২৩) এর একটি মন্ত্র শুনেছিলাম -

কাংস্যঘন্টা নিনাদস্তু যথা লিয়তি শান্তয়ে।
ওঁকারস্তু থা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্বমিচ্ছতা।
যস্মিন্ সংলীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥

অর্থাৎ কাঁসানির্মিত ঘন্টায় আঘাত করলে (ঢং) শব্দ যেমন ধীরে ধীরে লীন হয়ে শান্ত হয়, ঠিক সেইভাবে ওঁ উচ্চারণ ধারণা করতে হয়। ওঁ শব্দ যাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাকেই পরমব্রহ্ম বলে জানবে।

বাবা আমাকে ওঁ উচ্চারণের ক্রম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তো মূর্ধাতে মনন করা নয়। যাইহোক কাল থেকে আমি সেই পিতৃ উপদিষ্ট পদ্ধতিই অভ্যাস করব। ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রই প্রণব সাধনার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান...।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে রামদাসজীর স্বগোক্তি ভেসে এল কানে -

কাল করে সো আজ করো,
আজ করো সো আব্।
পলমে পরলে হোয়েগী,
বহুরী করোগে কব্ ?

তুলসীদাসজীর এই দোঁহার অর্থ হল - আগামীকাল যা করবে বলে ঠিক করেছ, তা আজই সমাধা কর এবং আজ করবে বলে যা ঠিক করেছ, সেটা এখনই কর। কোন মুহূর্তে মৃত্যু হবে, তার কোন ঠিক নেই। মৃত্যু এলে তখন আর কবে কি করবে ?

নর্মদাতীরের সব বেটাই অন্তর্যামী নাকি। আমি যেই ভেবেছি কাল থেকে পিতৃ নির্দিষ্ট পন্থায় ওঁকারের সাধন অভ্যাস করব, অমনিই উনি দোঁহা আওড়ালেন - কাল করে সো আজ করো! কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে হানা দেবে! মৃত্যু কি এতই সোজা নাকি! বেদপাঠী ব্রাহ্মণকে শতবর্ষ হবার পূর্বে মৃত্যুর সাধ্য নেই গ্রাস করে। আমি শুয়ে পড়লাম। রামদাসজীর সহসা উচ্চারিত দোঁহাকে আমি কাকতালীয়বৎ একটি ঘটনা মনে করলাম। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। মাথার মধ্যে বিপরীত চিন্তাস্রোত বইতে শুরু করল। আচ্ছা - ভূতানি গুরুঃ ভুবনানি গুরুঃ, এই ঋষিবাক্য যদি সত্য হয়, গুরুসত্ত্বা ত কখনই সাড়ে তিনহাত দেহের মধ্যে আবদ্ধ নন, তাহলে এমনও ত হতে পারে যে রামদাসজীর মুখ দিয়েই আমার বিশ্বব্যাপ্ত গুরুসত্ত্বা আমাকে চেৎবাণী শোনালেন! তাছাড়া বাবাই ত বলতেন -

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥ (যোগবশিষ্ট, ৬/২/১৬২/২০)

অর্থাৎ যা শ্রেয়ঃ, তা আজই করতে লেগে যাও, এখনই করতে লেগে পর, বৃদ্ধ হয়ে আর কতটুকু করতে পারবে! তখন ত নিজের শরীরই নিজের কাছে একটা ভারি বোঝা বলে মনে হবে, তখন শ্রেয়ো সাধনার অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

কুশশয্যা থেকে উঠে বসলাম। বাবা এবং ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে ওঁকারতত্ত্ব মননের চেষ্টা করতে লাগলাম।

ক্রিয়া করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, সহসা এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হতে লাগল -

অনন্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে ধ্বনি যাঁর
সেই ত ওঁকার -
বিশ্বের চেতনা।
ক্রিয়া নিষ্ক্রিয়া পারে
আনবিক অনুলোম প্রতিলোমাঘাতে
বাজে তারই অনন্ত মূর্চ্ছনা।
...... আমি উদ্বোধনা।
অনন্তের শ্রবণ কুহরে
বিরাম বিহীন অনিবার
ওঠে কার মধুর ঝঙ্কার
গুণগুণাত্মক সগুণ নির্গুণ
সেই ত ওঁকার ॥

এ কার কণ্ঠস্বর! বাবার! কিন্তু তাঁর স্বর বলে ত মনে হচ্ছেনা! তাঁর স্বর চিনতে এ অভাগার কোনদিন ভুল হবেনা। তবে কি প্রলয়দাসজীর! না, তাও ত নয়। তাছাড়া তিনি ত বাংলা জানেন না। একটা অদ্ভুত সুখাবেশে দেহ-মন আচ্ছন্ন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শরীর টলছে। আবার ধপ্ করে বসে পড়লাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি; রৌদ্রে ঝলমল করছে চারিদিক। মঙ্গলদাসজীকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকেই হাতের ইসারায় ডাকলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - মঙ্গলারতি হো চুকা ?

- কব্ হো গয়ে। জাগনে মেঁ আপকো আজ দের হুয়া। আভি করীব সাড়ে ছয় বাজ গিয়া।

- আপকা গুরুজী কাঁহা হৈ ?

- জপ মেঁ বৈঠা হৈ। আভি উনকা হোঁস নেহি।

আমি ধীরে ধীরে প্রাতঃকৃত্য সেরে কোটিতীর্থের ঘাটে গেলাম স্নান করতে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। কিছুক্ষণ রেবামন্ত্র জপ করে প্রণাম করতে লাগলাম নর্মদা মায়ের উদ্দেশ্যে -

ওঁ শিবস্বেদোদ্ভবে দেবি সর্বপাপা প্রণাশিনি।
নমামি নর্মদে মাতঃ। ভূয়ো ভূয়ঃ নমাম্যহম্।

কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে ওঁকারেশ্বরের পূজা করার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মন্দিরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখে নিলাম, আজ মন্দিরে অনেক ভক্ত। কিন্তু নাহ্, প্রলয়দাসজীকে কোথাও দেখতে পেলামনা। পাণ্ডারা মন্ত্রোচ্চারণ করে ভক্তদেরকে পূজা করাচ্ছেন। এক ফাঁকে জয়রাম গোস্বামীজী আমাকে পূজা করার সুযোগ করে দিলেন। আমি অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে লাগলাম -

ওঁ ঈড্যো বন্দ্যশ্চ। (অথর্ব, ৫/১২/৩)
ওঁ ইমা ব্রহ্ম ক্রিয়ত আবর্হিঃ সীদ। (অথর্ব, ২০/২৩/২৩)
স চেতসো মে শৃণুতেদ মুক্তম্। (অথর্ব, ১/৩০/২)
দেহিনু মে যন্ মে অদত্তো অসি।
সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ ॥ (অথর্ব, ৫/১১)

হে অর্চনীয়! হে বন্দনীয়! এই কয়টি ব্রহ্মবাণী দিয়ে পূজা করছি। তুমি আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ কর, দয়া করে মনোযোগ দিয়ে আমার এই বেদমন্ত্রগুলি শ্রবণ কর। তোমাকে আমার যা দেয়া হয়নি, তাই আজ তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করছি। তুমিও আমাকে যা এখনও দাওনি, তাই আমাকে দাও দয়াল। তুমি যে আমাদের সকলের সখা, আমাদের সকলের পরম বন্ধু।

ওঁকারেশ্বরকে পূজা ও প্রণাম করে নাটমন্দিরে এসে বসে রইলাম। আজ বৈশাখ মাসের সাত তারিখ, মঙ্গলবার। ১লা বৈশাখ বুধবার ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে এসে প্রথম দিনেই বৃদ্ধ সাধুর দর্শন পেয়েছিলাম, সেদিন দুবেলাই তাঁর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু এ কয়দিনের মধ্যে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছেনা কেন ? আর কি দেখা পাবনা! বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভজন আশ্রমে ফিরে এলাম। এসে ঘরে বসেছি, এমন সময় রামদাসজী নিজেই এক গ্লাস সরবৎ হাতে করে আমাদের ঘরে ঢুকে বললেন - পি লিজিয়ে।

আমি তাঁকে সেই বৃদ্ধ সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, আর একটিবার তাঁর দর্শন পাবার জন্য মনে ব্যাকুলতার কথাও অকপটে জানালাম। তিনি বললেন এর আগে কখনও আমি ঐ বৃদ্ধ সাধুকে দেখিনি। সেইদিনই যা তোমার সঙ্গে দেখেছি। এই তপোভূমিতে কোথায় কে যে কোন মূর্তিতে বিরাজমান আছেন, তা কারও পক্ষেই সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। তবে উনি যে একজন মহাযোগী তা প্রথম দর্শনেই বুঝেছি। তুমি তাঁকে যখন ওঁকার মাহাত্ম পড়ে শোনাচ্ছিলে, তখন তাঁর ধ্যানাবিষ্ট দেহের চারদিকে আমি এক অলৌকিক জ্যোতির আভা দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর জন্য তোমার ব্যাকুলতার কারণ, হয়ত তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্বজন্মের কোন সম্বন্ধ আছে, হয়ত কোন লেনদেনের ব্যাপার আছে, নতুবা যাঁর কথায় তুমি দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছ, তোমার গুরু পিতাজী কিংবা যাঁকে লক্ষ্য করে যাঁর মুখ চেয়ে তুমি ভয়ঙ্কর মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথ নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারলে সেই বরাভয়দায়িনী মাতা নর্মদাই হয়ত চাইছেন কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ মহাত্মার সঙ্গে তোমার দেখা হোক। তুমি প্রভুর ওপর ভরসা রাখ; প্রয়োজন থাকলে তিনি যথা সময়ে উভয়কে মিলিয়ে দেবেন। তুমি আমার ঘরে চল। আমি তোমাকে একখণ্ড রামচরিতমানস পড়তে দেব। রামকথা পড়লে তুমি শান্তি পাবে, সাধনায় সাহায্য পাবে। সাধনার অনেক গূঢ় সঙ্কেত তুলসীদাসজী রামায়ণে মধুর ভাষায় লিখে গেছেন। ঠেঁট এবং খোড়িবোলি ভাষার সংমিশ্রণে লেখা বলে যদি কোন শব্দার্থ কঠিন মনে হয় তবে আমার কাছে জেনে নিও।

চিত্রকূটে থাকার সময় রামচরিতমানসের কিছুটা আমি পড়েছিলাম, তাতে রসও পেয়েছিলাম। কাজেই রামদাসজীর কাছ হতে সাগ্রহে বইখানি নিয়ে এলাম।

বিকেলে পাঁচটা বাজবার কিছু আগেই ওঁকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। কোটিতীর্থের ঘাট থেকে মন্দিরের সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম। একটাই উদ্দেশ্য প্রলয়দাসজীকে যদি একবার দেখতে পাই, কিন্তু আজও হতাশ হতে হল। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে আছি, এমন সময় শম্ভুনাথজী এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে বললাম - ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে আসুন। মন্দিরে কিছু ভক্তের সমাগম হচ্ছে। বোধহয় সবাই আরতি দেখতে আসছেন। মন্দির থেকে কাঁদতে কাঁদতে শম্ভুনাথজী বেরিয়ে এসেই আমার হাত ধরে টানলেন। নিয়ে গেলেন নাটমন্দিরে। গৌরকান্তি একটি দু-তিন বছরের উলঙ্গ শিশুকে দেখিয়ে তিনি বললেন - দেখিয়ে উহ্ লেড়কা হমারা কিষেণ কী মাফিক। শিশুটি দেখতে সত্যই বড় সুন্দর। শম্ভুনাথজীর চোখে জল। আমি তাঁর হাত ধরে কোটিতীর্থের ঘাটের একধারে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম - মঙ্গলদাসজীর মুখে আপনার পারিবারিক অশান্তির কিছু কিছু বিবরণ আমি শুনেছি। যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আপনি আপনার ধর্মপত্নীকে কেন ত্যাগ করেছেন বলবেন কি! বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করছি, কোন অপরাধ নেবেন না। আপনি কি তপস্যা করার জন্য পত্নী ও পুত্র ত্যাগ করে এসেছেন।

- না, না, অপরাধের কোন প্রশ্ন নয়। আমি আপনাকে সব কথা বলতে পারলে বরং অনেক হাল্কাবোধ করব। আমি অল্প বয়সে বাবা মাকে হারিয়েছি। আমাদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। আমার কাকারা এখনও জীবিত, তাঁরাই আমার জমি জায়গার দেখাশোনা করেন, আমাকে তাঁরা ভালওবাসেন। খাণ্ডোয়া হতে তিন মাইল দূরে আমাদের মহল্লা। খাণ্ডোয়াতে আমার দিদির বাড়ী। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল।

তিনি বিধবা। দিদিই আমাকে কাকাদের কাছ থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন, লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা করেন। আপনি বোধহয় জানেন আমাদের দেশে অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। বি.এ. পড়তে পড়তেই দিদি আমার বিবাহ দেন। বিবাহের বছর দুই পরেই কিষেণ জন্মায়। বিন্নী এবং কিষেণকে নিয়ে আমার আনন্দের শেষ ছিলনা। তাদেরকে ছেড়ে নাগপুরে থেকে লেখাপড়ায় আর মন বসছিলনা। বি.এ. পরীক্ষায় ফেল করে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম। এই সময় হতেই আমার জীবনে অশান্তি দেখা দিল। দিদির সঙ্গে বিন্নীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে প্রায়ই খিটিমিটি লেগেই থাকত। কানহাইয়া নামে আমার এক বন্ধু ছিল, নিকটতম প্রতিবেশী। স্কুলজীবনে আমরা সহপাঠী ছিলাম। সে আমার কিষেণকে খুব ভালবাসত। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসত, আমিও তার বাড়ীতে যেতাম। ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে লাগলাম দিদি আকারে ইঙ্গিতে বিন্নী এবং কানহাইয়াকে জড়িয়ে আমার কাছে অনেক অশোভন মন্তব্য করেছেন, কিন্তু বিন্নীর সরল মুখখানির দিকে তাকিয়ে এবং তার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ জাগত না। দিদির ব্যবহার দিন দিন উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠল। বিন্নী প্রায়ই রাতে কাঁদাকাটা করত। আমি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করতাম। ঐ সময় আমার কাকার খুব শক্ত অসুখ হয়। খবর পেয়ে আমি তাঁকে দেখতে চলে যাই। পাঁচদিন পরে ফিরে এসে দেখি আমার কপাল পুড়েছে। দিদি জানালেন তিনি খাণ্ডোয়া হতে মাইল খানিক দূরে তাঁর এক চাষীর কাছে ভুট্টা আর মকাই এর দাম আদায় করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমার শোবার ঘরে বিন্নী এবং কানহাইয়াকে একসঙ্গে দেখতে পান। এতবড় অনাচার তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই মারধর করে বিন্নীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বিন্নী কিষেণকে নিয়ে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে। আমি কানহাইয়ার খোঁজ করতে গেলাম। তার মা বাবা দুজনেই আমার দিদিকে গালাগালি করতে লাগল। শুনে এলাম, কানহাইয়া তার মামাবাড়ী গেছে। আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামেই কানহাইয়ার মামাবাড়ী। আমি শ্বশুরবাড়ী রওনা দিলাম। খাণ্ডোয়া থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরেই সেই মহল্লা। সেখানে পৌঁছে দূর থেকে দেখতে পেলাম, কানহাইয়া কিষেণকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্নী হাসতে হাসতে তার সাথে কথা বলছে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, তার সঙ্গে দুরন্ত অভিমান। আমি সেই মুহূর্তেই রাস্তা থেকে ফিরে এলাম। দিদির বাড়ীতেও গেলাম না। মোরটক্কাতে এসে আশ্রয় নিলাম একটি মন্দিরে। তার পরদিন বিষ্ণুপুরীর ঘাটে নৌকা পেরিয়ে ওঁকারেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। প্রথম তিনদিন এইখানে এই মন্দিরেই কাটল। তারপরে এক সাধুর পরিত্যক্ত কুটীরের সন্ধান পেয়ে সেইখানেই বাস করছি। আমার থাকবার স্থান আপনি ত দেখেইছেন। বিন্নী বিশ্বাসঘাতিনী হলেও তার চোখ মুখ চোখের চেহারা আমার সামনে মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে। তার ব্যভিচারের কথা ভেবে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা আনার চেষ্টা করেও পারিনি। শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারছিনা, আমার কিষেনের চাঁদের মত কচি মুখখানা। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তার কলকলে হাসি মাখা মুখখানা মানসচক্ষে ভেসে উঠে আমাকে ব্যাকুল ও বিহ্বল করে তুলেছে।

এই বলে শম্ভুনাথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি কোন বাধা দিলামনা, কোন সান্ত্বনাবাক্যও বললাম না। কিছুক্ষণ পরে শম্ভুনাথ নিজেই স্থির হয়ে বলতে লাগলেন - সত্যি কথা বলতে কি, আমি তপস্যা করার মনোভাব নিয়ে এখানে আসিনি। অনির্বচনীয় মানসিক যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম ওঁকারেশ্বরের পদতলে। তারপর এখানে থাকতে থাকতে নানা সাধুর সঙ্গ করতে করতে এখন ভাবছি, কোন সিদ্ধ মহাত্মার দর্শন পেলে দীক্ষা নিয়ে জপ ধ্যানে মন দেব। রামদাসজীর সৎসঙ্গ কিছুদিন শুনেছি। তিনি তুলসীদাসজীর জীবনী শোনাতে শোনাতে বলেছিলেন যে তাঁর পত্নীর কাছে তিনিও নাকি মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রামচন্দ্রের তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। কাজেই রাম নাম নিয়ে পড়ে থাকলে আমারও সিদ্ধিলাভ হতে পারে। পত্নী পুত্র সবই মায়ার বন্ধন। মায়ার বন্ধন কাটাতে পেরেছি, এ নাকি আমার সৌভাগ্য।

- সত্যিই কি আপনি মায়ার বন্ধন কাটাতে পেরেছেন ?

- না, না, এই পবিত্রস্থানে বসে মিথ্যা কথা বলব না। আমি স্ত্রী-পুত্রের কথা ক্ষণেকের জন্যেও ভুলতে পারিনি। দিদি বলেছেন বিন্নী ব্যভিচারিনী, কিন্তু তার ব্যভিচারের কথা আমার মনে পড়েনা; তার প্রেমপূর্ণ

ব্যবহার এবং নানা খুঁটিনাটি মিষ্টি কথাই মনে পড়ে। রামনাম জপ করতে করতে কিষেণ কিষেণ বলে ফেলি। রামচন্দ্রের শ্রীমূর্তি ধ্যান করতে গেলেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিষেণের হাসিভরা মুখখানি, সেই ঢলঢল লাবণ্যভরা মুখ, তার আধো আধো বুলিতে 'বাবা' ডাকই আমার কানে ভেসে আসে। যেকোন শিশুকে দেখলে আমার কিষেণের কথা মনে পড়ে, তাকে কোলে নিতে ইচ্ছে হয়; ইচ্ছে করে কিষেণকে কাঁধে নিয়ে যেমন ঘুরে বেড়াতাম, তেমনি সেই বাচ্চাটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেইভাবে ঘুরে বেড়াই। এই একটু আগে মন্দিরে কিষেণের মত একটি বাচ্চাকে দেখে তাই আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

আমার বুকে দিবারাত্র সাহারা মরুভূমির জ্বালা। মাঝে মাঝে নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। এই বলে শম্ভুনাথ দু'হাতে কপাল চেপে নীচের দিকে মুখ করে বসে রইল। বুঝতে পারলাম তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

- মহাত্মা রামদাসজী আপনাকে যা বলেছেন, সে তো বৈরাগীদের কথা। যে কোন বৈরাগী সাধুই আপনাকে ওই একই কথা শোনাবেন। তিনি আপনাকে শুনিয়েছেন - তুলসীদাসজী তাঁর পত্নী রত্নাবলীর কাছে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রাম ভজনে মেতেছিলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধ মহাত্মারূপে সর্বজনবন্দিত হয়েছিলেন, কাজেই আপনিও যখন স্ত্রীর কাছে আঘাত পেয়েছেন তখন রামনাম জপ করলে আপনিও একদিন দ্বিতীয় তুলসীদাস হয়ে উঠবেন। সহজ সমাধান এবং সহজতর সিদ্ধান্তই বটে! কিন্তু জগৎ ও জীবন এইরকম সহজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলেনা। আপনি দিদির কথায় স্ত্রীকে ব্যভিচারিনী ভেবে মনঃকষ্টে ভুগছেন এবং তা থেকে শান্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে 'রাম নাম' করছেন। রামদাসজী আপনাকে কোন্ দৃষ্টিকোণ হতে ঐ ধরণের উপদেশ দিয়েছিলেন জানা নেই, তবে তিনি একথা বলেননি? যে কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলে সাধকের জীবনে যখন মহাসিদ্ধিলাভের মহালগ্ন উপস্থিত হয়, তখন গুরু বা যে কোন লোকের মুখনিঃসৃত একটি শব্দের তড়িৎকণাই সাধকের জীবনে ঈশ্বরপ্রেমের সুপ্তবীজকে ফুটিয়ে তোলে, তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়!

তুলসীদাসজী পত্নীকে ছেড়ে একমুহূর্ত থাকতে পারতেন না। মহল্লার মানুষ তাঁকে স্ত্রৈণ বলে নিন্দা করত। একবার তুলসীদাসজীর শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় এই সংবাদ পেয়ে রত্নাবলী তুলসীদাসজীর অনুপস্থিতিতে পিতৃগৃহে চলে যান। সে সময় তুমুল জল ঝড় হচ্ছিল, সে সব উপেক্ষা করে বর্ষণসিক্ত কাদামাখা ছিন্নবস্ত্রে একান্ত উদভ্রান্তের মত শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছোন তুলসীদাসজী। রত্নাবলী তাঁর এই স্ত্রৈণ স্বভাব দেখে সহসা কঠোর ভাবে ভৎর্সনা করেন, যেন ভগবানই তাঁর মুখ দিয়ে বললেন রূঢ় জাগরণী মন্ত্র -

অস্থিচর্মময় দেহ মেরী, তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী শ্রীরাম মেঁ হো ত ন তু ভবভীতি ॥

অর্থাৎ আমার এই হাড় মাংসের দেহটার প্রতি তোমার যে আসক্তি, তাকে প্রেম বলেনা। এ শুধু কামের জ্বালা। এই পরিমাণ আসক্তি বা অনুরাগ যদি রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করতে পারতে, তবে তোমার ভববন্ধন ঘুচে যেত, তোমার সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হত।

পত্নীর রূঢ় বাক্যে তুলসীদাসজীর চৈতন্যোদয় ঘটল, জন্মার্জিত তীব্র বৈরাগ্য সাধনার ফল স্ফুটনোন্মুখ হল, তাঁর মানসপটে ঝলসে উঠল রামচন্দ্রের মঞ্জুলমোহন দিব্যরূপ; অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি; সেই মোহনরূপের সন্ধানে তক্ষুণই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে।

বলুন শম্ভুনাথজী আপনার জীবনের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য আছে কি? আপনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন আশাভঙ্গ মনস্তাপ এবং তীব্র অন্তর্বেদনা বুকে নিয়ে। এখন আপনি বলছেন, এখানে তিন চার বছর থাকাতে সাধুর কথায় রামনামে মন বসাতে চেষ্টা করছেন, অথচ আপনার মনকে অধিকার করে আছে পত্নী-পুত্রের সুখস্মৃতি। এখানে বৈরাগ্য নেই, আছে বিরহের অন্তর্দাহী জ্বালা। একে বড়জোর মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য বলা চলে, হয়ত সেটাও নয়। ঈশ্বরপ্রেম বা প্রকৃত বৈরাগ্য ছাড়া সাধনা সফল হয়না। মর্কট বৈরাগ্য এবং শ্মশান বৈরাগ্যে মানুষের ইষ্টসিদ্ধি হয়না, বরং ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে, যাতে বলা যেতে পারে - না ঘরকা, না ঘাটকা। এটা সম্পূর্ণ ভাবের ঘরে চুরি। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ নিয়ে সসেমিরা অবস্থায়

সাধু সাজলে বড়জোর আর একজন ভিখ মাঙ্গা বৈরাগীর সংখ্যা বাড়বে মাত্র। ভেখ্ এবং ভেস্ মানুষকে কখনই প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে নিয়ে যায়না। প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মার্জিত সাধনার ফলেই জন্মে থাকে; যেমন জন্মেছিল তুলসীদাসজীর জীবনে।

আমি শম্ভুনাথকে বলতে লাগলাম - ভাই, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনি আমার কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি শুনুন - পূর্বে মোগল সম্রাটদের হারেমে প্রত্যেক সম্রাটেরই বহুসংখ্যক বেগম থাকতেন। সম্রাট আকবরেরও কয়েকজন বেগম ছিলেন। তারমধ্যে পরমাসুন্দরী উদিপুরী বেগমের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। অন্যান্য বেগমরা সেজন্য উদিপুরী বেগমকে হিংসে করত। আপনি ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সর্বদা অসংখ্য খোজা প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও তার মধ্যেও হারেমে অনাচার ব্যভিচার খলতা হিংসা এবং ষড়যন্ত্রের কোন অভাব ছিলনা। মোগল হারেমের ষড়যন্ত্রে অনেক রাজপুরুষের উত্থান পতন ঘটত। উদিপুরী বেগমও এইরকম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। অন্যান্য বেগমরা ঈর্ষাবশতঃ যে কোন ভাবে সম্রাটের কানে একথা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে উদিপুরী বেগমের হারেমে গোপনে পরপুরুষের যাতায়াত আছে। আকবর লঘুচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি অন্যান্য মোগল সম্রাটের মত হলে এই সংবাদ শোনামাত্রই উদিপুরী বেগমকে কোতল করতে হুকুম দিতেন। তিনি তার পরিবর্তে উদিপুরী বেগম ও তাঁর বিবাহের যিনি মাধ্যম ছিলেন, তাঁর সেই রাজস্ব-সচিব টোডরমলকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে সবকিছু জানালেন। বিচক্ষণ টোডরমল তাঁকে বললেন - জঁহাপনা, আপনি চঞ্চল হবেন না,এই গুজবের মূলে হয়ত কোন ষড়যন্ত্র আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে আছে যব তক্ না দেখো নিজ নয়নী, তব তক্ না মানো গুরুকা বাণী। জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত গুরুর কথাকেও বিশ্বাস করতে নেই। শোনা কথা প্রায়শই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। আপনি দয়া করে ধৈর্য ধরুন, সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এখন নির্ভরযোগ্য কোন মহিলা গুপ্তচর নিযুক্ত করুন। বেগম যখন হাতেনাতে ধরা পড়বেন, আপনি নিজের চোখে যখন দেখবেন, তখন আমার আর কিছু বলার থাকবে না। আকবর বরাবরই তাঁর এই রাজস্ব সচিবের পরামর্শকে মূল্য দিতেন, কাজেই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিহাসের বিজ্ঞতম সম্রাট হলেও, তবুও ত তাঁর রক্তমাংসের শরীর। আপন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্যা সম্বন্ধে ঐ রকম সর্বনাশা সন্দেহ মনে ঢুকিয়ে দিলে, যে কোন মানুষের মনে ক্রোধ ও অভিমান স্বতঃই জন্মে থাকে। আপনার যেমন হয়েছে, সেই সময় তেমনি দশা হয়েছিল সম্রাটের, তিনি উপযুক্ত মহিলা গুপ্তচর নিযুক্ত করে উদিপুরীর মহলে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন উদিপুরী স্নানের সময় গোসলখানায় ঢুকেছিলেন। খোজা ভৃত্য তাঁর শয্যা রচনা করার জন্য বেগমের ঘরে ঢোকে। পালঙ্কের গদির উপর বহুমূল্য দুগ্ধফেনিভ শয্যা রচনা করার পর, সেই ভৃত্যের লোভ হয় একটিবার বিছানাটিতে শুতে। সে মনে মনে ভাবে বেগম দুধে স্নান করবেন, গাত্র মার্জন করে সুগন্ধি গোলাপ জলে স্নান করবেন। তাঁর ফিরতে অনেক দেরী হবে। এই ভেবে সে সেই শয্যায় শুয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে, ঘুমিয়ে পড়তেও সময় লাগল না। রাণী স্নান করে এসে দেখলেন, কেউ একজন তাঁর শয্যায় শুয়ে আছে। সম্রাট ছাড়া এত সাহস আর কার হতে পারে! তিনি ভাবলেন পরিহাসপ্রিয় সম্রাটই শুয়ে আছেন। তিনিও নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর মারফৎ বিকৃত সংবাদ সম্রাটের কানে পৌঁছে গেছে। তিনি দ্রুত টোডরমলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। উত্তেজিত সম্রাট তরবারি কোষমুক্ত করতেই টোডরমল তাঁর হাত ধরে মিনতি জানালেন - জঁহাপনা! শিকার আপনার হাতের মুঠোয়, আপনার পায়ে ধরছি, আর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পর খোজা ভৃত্যের ঘুম ভাঙতেই সে বেগমকে পাশে দেখে আঁতকে উঠে ধড়ফড় করে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। উদিপুরী বেগম তাকে 'কুত্তা কাঁহাকা' বলে ছুরি ছুঁড়ে মারলেন।

বন্দেগী জঁহাপনা বলে হাসতে হাসতে টোডরমল দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সম্রাট সব শুনে ভৃত্যকে ক্ষমা করলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটল।

ভাই শম্ভুনাথজী! আপনি এই ঘটনা থেকে বুঝে নিন মুহূর্তের ভুলে কিভাবে সংসার ভেঙে যায়। সাপ কামড়ালে তার ঔষধ আছে, কিন্তু মানুষ কামড়ালে তার বিষ সহজে যায়না। আপনি নিজের চোখে আপনার পত্নীর ব্যভিচারের কোন প্রমাণ পাননি। আপনার দিদি বলেছে আর আপনি তা সঙ্গে সঙ্গে

বিশ্বাস করে বসে আছেন। ধিক্ আপনাকে, ধিক্ আপনার প্রেমকে। অনেক সংসারেই তো শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূ,ননদ ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে দ্বন্দ রয়েছে। শাশুড়ীর অহেতুক বিদ্বেষবশে কিংবা ভ্রাতৃবধূর প্রতি ননদের ঈর্ষানলে কত সংসার যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই রকম ঘটনা কি কখনও শোনেন নি? এর মূলে থাকে অনেক মনস্তাত্বিক রহস্য। আপনার দিদি আপনাকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু বিবাহের পর আপনি হয়ে পড়লেন স্ত্রীর অনুরক্ত। লেখাপড়াও বিসর্জন দিলেন। এটা আপনার দিদি ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। অল্পবয়সে যারা বিধবা হন তাঁদের অধিকাংশই অবদমিত কামচেতনার প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা এবং ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের হয়ে পড়েন। আপনার দিদি অল্পবয়সে শুধু বিধবাই হননি, তিনি বন্ধ্যা, অপুত্রিকা, অশিক্ষিতা বলে তিনি আরও বেশী সন্দেহবাতিক হয়েছেন।

আপনার সমূহ ঘটনা ধৈর্য ধরে বিচার এবং পর্যালোচনা করা উচিৎ ছিল। দিদি বলেছেন আর আপনি সুবোধ বালকের মতন তা বিশ্বাস করেছেন। আপনার পত্নী, শিশুপুত্র এবং নিজের এই তিনটে জীবন আপনি তছনছ করতে চলেছেন। আপনি নিজেই একটু আগেই আমাকে বলেছেন যে আপনার প্রতিবেশী বন্ধু কানহাইয়া কিষেণকে খুব ভালবাসে। কাজেই আপনার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে তার মামাবাড়ী বেড়াতে গিয়ে যদি আপনার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে যায়, সেটা কি খুব দোষের হয়েছিল ? বিশেষতঃ সন্দেহবশে আপনার দিদি যে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন, সেই ঘটনার পরে মামাবাড়ী গিয়ে আপনার স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ নেওয়া ত স্বাভাবিক; আর সেই খোজ নিতে গিয়ে যদি আপনার বাচ্চাটি তার কোলে ওঠে, তবে তাকে কোলে নেওয়া কিংবা আপনার স্ত্রীর পক্ষে সেই দৃশ্য দেখে হাসির কোন অপরাধ হয়েছে বলে মনে হয়না। অথচ আপনি সেই দৃষ্য দেখে গৃহত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন। আপনার মনে স্ত্রী-পুত্রের জন্য অহরহ কষ্ট হচ্ছে। আর আপনি! রামনাম মুখে নিয়ে তপস্যার আঁচলে মুখ লুকোবার চেষ্টা করছেন। এইরকম আত্মপ্রতারণা করে কোন লাভ আছে কি! আমার অনুরোধ শুনুন, আপনি ভাই ঘরে ফিরে যান। তাতে স্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

আমার কথা শুনে শম্ভুনাথজী বললেন - যে কোন ঘটনায় হোক আমি গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি। স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় এখনও কাঁদছি বটে, কিন্তু এইভাবে মহাতীর্থে পড়ে থাকতে থাকতে হয়ত একদিন আমার তপস্যায় মন বসবে, তখন রাম নামে শান্তি পাবো। আর আপনি বলছেন আবার ঘরে ফিরে মায়ার ফাঁস গলায় পরতে! আপনার কথায় আমার তৃপ্তি আসছে কিন্তু যে দু'চারখানা ধর্মপুস্তক পড়েছি, তাতে ত স্পষ্ট লেখা আছে স্ত্রী-পুত্র বন্ধনের কারণ। শংকরাচার্য বলেছেন - কা তব কান্তা কস্তে পুত্র ! বৈরাগ্যশতকেও পড়েছি, সাধুরা ত বলেন, সংসার ত্যাগ করতে না পারলে তপস্যা হয়না। মায়ার কারাগারে থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

বললাম - বৈরাগ্যশতকে যে বৈরাগ্যের প্রশংসা আছে, তা মেকী বৈরাগ্য, না খাঁটি বৈরাগ্য ? বৈরাগী সাধুরা বৈরাগ্য শব্দের স্থূল অর্থ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বৈরাগ্য শব্দের অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। অন্তর থেকে আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে তবেই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ হয়। নতুবা সেটা বৈরাগ্যের নামে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। গৃহত্যাগ করে এসে মঠ মিশন ঐশ্বর্য প্রতিপত্তির পেছনে দৌড়ে, আসক্তি অন্যভাবে অন্যরূপে এসে গ্রাস করে। তফাৎ কেবল, একটার নাম - সাদা কাপড়ে কুটীরে আসক্তি, আর একটার নাম- গেরুয়া কাপড় পড়ে মঠ নামক অট্টালিকায় বাস করার আসক্তি। আসলে দুটোই আসক্তি। গেরুয়া কাপড়ে মুড়ে আসক্তির নাম বৈরাগ্য দিলেই তা বৈরাগ্য হয়ে যাবেনা। কবীর সাহেব একেই রহস্য করে বলেছেন - মুড় মুড় মায়া ঘেরি। গৃহে থেকেও নিজ প্রিয় পরিজনের মধ্যে থেকেও অনাসক্ত হওয়া যায়। কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ- এ হল অর্বাচীন ভারতবর্ষের কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা এধরণের কথা বলেননি। বেদ উপনিষদে এ ধরণের কথা কোথাও পড়িনি। তাঁরা পত্নী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি প্রিয় পরিজনের মধ্যে থেকেও কর্মের মধ্যে নৈষ্কর্মী, বিষয়ের মধ্যে নির্বিষয় ভাবের সাধনা করতে পেরেছিলেন, সেইভাবে অনাসক্ত চিত্তে সংসারে থেকেও ব্রহ্ম সাধনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে বিষয় ত্যাগ করে নির্বিষয় হওয়ার ভান করা পলায়নী মনোবৃত্তির (Escapism) পরিচায়ক। নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণ বিষয়ের মধ্যে থেকেও বীতরাগ হতে পেরেছিলেন এবং গৃহকেই তপোবনে পরিণত করেছিলেন।

আচার্য শংকর বৌদ্ধধর্মকে স্বক্ষীভূত করার জন্য হলদে কাপড় পরা বৌদ্ধভিক্ষুদের বদলে গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী - দশনামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে গেছেন, মায়াবাদ প্রচার করে গেছেন। তাঁর যুগে হয়ত এসবের প্রয়োজন ছিল। মায়াবাদের অর্থও গভীর। তাঁর সেই বৈদান্তিক গভীর ভাব অনেকেই বোঝেন না, তার বদলে 'মায়া মায়া' বলে তারস্বরে সবাই চিৎকার করেন। জলাতঙ্ক রোগের মত মায়াতঙ্ক রোগে সবাইকে পেয়ে বসেছে। সংস্কৃতে 'মা' শব্দের অর্থ না, যেমন মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বং, অর্থাৎ ধনজন যৌবনের গর্ব কোরোনা। কাজেই মায়া শব্দের অর্থ যাহা নাই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সংসারের কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই, জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য ক্ষয়শীল। কাজেই শংকরাচার্যের উপদেশ - এই রকম অনিত্য সংসার নিয়ে মাতামাতি করে লাভ নেই, অর্থাৎ যাহা নেই তাহার (মায়ার) পেছনে দৌড়িও না। নিত্য বস্তু ব্রহ্মে মনঃসংযোগ কর। তার মানে এই নয় যে তিনি নিষ্ঠুর হতে বলেছেন, কিংবা নিষ্ঠুরের মত স্ত্রী-পুত্র, মাতা, পিতাকে দূরে ফেলে দিতে বলেন নি।

"সাত ছেলে মোর সাত দিকে ছুটে করিছে ব্রহ্মোদ্ধার।
তাই ত ভিক্ষা ভাণ্ড হস্তে অন্ন জোটেনা মার ॥"

- এ ধরণের বৈরাগ্যসাধনা করতে আচার্য উপদেশ দিয়ে যাননি। গৃহে থেকে সাধনা হয়না, একথা কোথাও তিনি বলেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফল ভোগবিরাগ, শমদমাদি ষটসম্পত্তি লাভ পরিশেষে মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতির কথা যে বলেছেন তা গৃহে থেকেও সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার জন্য গৃহত্যাগ করে মঠ বা গুহাবাসী হওয়ার প্রয়োজন হয়না। প্রাচীন ভারতের ঋষিজীবন পর্যালোচনা করে দেখুন, তাঁরা কি গৃহত্যাগী, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগী ছিলেন? যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের একটি নয়, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী নামক দুই স্ত্রী ছিলেন। তাতে তাঁদের অমৃতত্ব লাভে কোন বাধা হয়নি। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, ভৃগু ও পুলোমা, অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, অঙ্গিরা ও শ্রদ্ধা, অত্রি ও অনসূয়া, মরীচি ও কলাদেবী, পুলহ ও ক্ষমা, পুলস্ত্য ও হবির্ভু, ক্রতু ও সন্নতি প্রভৃতি প্রত্যেকেই পত্নী পুত্রসহ বাস করেও কেউ ব্রহ্মর্ষি, কেউ মহর্ষি, কেউ শ্রুতর্ষি হতে পেরেছিলেন - তাঁরা কি এ যুগের কোন মঠাধীশ মোহান্ত, মহামণ্ডলেশ্বর, জগদগুরু শংকরাচার্য উপাধিধারী কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর চেয়ে কম ছিলেন! তুলনামূলকভাবে বিচার করলেই বোঝা যায় আজকাল মহাত্মা নামে প্রচারিত শেষোক্ত গেরুয়াধারীরা পূর্বোক্ত ঋষিবর্গের পদধূলির যোগ্য নন। বৈদিক ঋষিরাও সকলেই গৃহবাসী ছিলেন।

আমি এই নর্মদাতটেই অনেক উচ্চকোটির মহাত্মা এবং মহাযোগেশ্বরদের দর্শন পেয়েছি। তাঁদের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ রেখেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মায়াবাদের ভেল্কিতে পড়ে সম্প্রদায়ের চক্রে কত লোক যে সাধু সেজে ভেক্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের মধ্যে বৈরাগ্য ত দূরের কথা নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ডে তাঁদেরকে অনেক নিম্নকোটির লোক বলেই আমার মনে হয়েছে। একটু আগে তাঁদের সম্বন্ধেই মন্তব্য করেছি তাঁদের অবস্থা - 'না ঘরকা না ঘাটকা' আপনার জীবনে অনেক ক্ষত ও ক্ষতি হয়ে গেছে, তথাকথিত কোন সাধু বা বৈরাগীর কথার চরকিবাজিতে পড়ে আপনার জীবন একেবারে বরবাদ হয়ে যাক্ এ আমি চাইনা। সুস্থ স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এখনও আপনি আপনার গৃহকে তপোবন করে তুলতে পারেন।

পত্নীর সঙ্গে পুত্রকেও যাঁরা মায়ার বন্ধন বলেন, তাঁদের শাস্ত্রতত্ত্ব জানা নেই। শাস্ত্রের মর্মমূলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন নি। মহাতেজা মর্হর্ষি অগস্ত্যের কথাই ধরুন; তিনি সারাজীবন অকৃতদার থেকে তপস্যাতেই মগ্ন থাকবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু একদিন পরিক্রমা করতে করতে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতৃপুরুষরা এক গুহার ভিতর অধোমুখে লম্বমান অবস্থায় অতিকষ্টে ঝুলছেন। তাঁদের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা অগস্ত্যকে বলেন - বংশরক্ষা না করলে তাঁদের সদগতির কোন আশা নেই। এই শুনে অগস্ত্য বিদর্ভরাজের পালিতা কন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রের নাম হয় ইদ্মবাহ (মহাভারত, বনপর্ব), আবার কোন পুরাণের মতে দৃঢস্যু। যাইহোক সেই পুত্রের জন্মগ্রহণ করার পরেই পিতৃপুরুষরা মুক্ত হন, সদগতি লাভ করেন।

শুধু অগস্ত্য নন, আমরা যে এখানে বসে গল্প করছি, এখান থেকে কিছুটা দূরেই এরণ্ডী সংগম। আপনি এরণ্ডী সংগম দেখে এসেছেন কিনা জানিনা, আপনি রেবাখণ্ডম্ পড়লেই জানতে পারবেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় বর্ণনা করেছেন যে এই এরণ্ডী সংগমে বসে পুত্রলাভের জন্য তপোসিদ্ধ মহর্ষি অত্রি, অনসূয়াকে তপস্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুত্র হেলাফেলার জিনিষ নয়, তপস্যার বস্তু। একদিন অত্রি বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে অনসূয়ার কাছে দুঃখ করছিলেন যে - 'হায়! আমার পুত্র না থাকায় আমি পিতৃকার্য হতে বঞ্চিত হলাম। কল্যানি! পিতা মহাপাতকী হলেও পুত্র জন্মানো মাত্রই পুন্নাম নরকে পতনোন্মুখ পিতাকে উদ্ধার করে'। পুত্র পৌত্রাদির তপস্যায় পিতার সদগতি এমন কি পরমগতি লাভ হতে পারে। নাস্তি পুত্রসমো বন্ধুঃ ইহলোকে পরত্র চ, অর্থাৎ ইহলোক পরলোকে পুত্রের সমান বন্ধু নেই। স্বামীর মনোবেদনা জানতে পেরে সাধ্বী অনসূয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যথাক্রমে সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাশা নামে পুত্র রূপে লাভ করে কৃতার্থ হন।

এ যুগের বৈরাগী ও সন্ন্যাসীরা পুত্রকে মায়ার বন্ধনসূত্র হিসাবে চিত্রিত করেন, আর অগস্ত্য, অত্রি, অনসূয়া, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি জগৎপূজ্য যোগেশ্বর ও যোগেশ্বরীরা পুত্রের জন্য তপস্যা করাকে পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত করে গেছেন। তাঁদের মতে -

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তেন পুত্র ইতি প্রোক্তস্তুপ স্বয়মেব সবয়ম্ভুবা॥

পুত্র পিতাকে নরক হতে ত্রাণ করে; এইজন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু পুত্র শব্দটির সৃষ্টি করেছেন। পণ্ডিতগণ বলেন -

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যা অবান্ধবাঃ
মুর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্বং শূন্যং দরিদ্রতা॥

অর্থাৎ পুত্রহীনের গৃহশূন্য বন্ধুহীনের সকলদিক শূন্য, মুর্খের হৃদয় শূন্য আর দরিদ্র সর্বশূন্য।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় - গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে কত উচ্ছ্বসিতভাবে পুত্র সম্বন্ধে বলেছেন শ্রবণ করুন -

মৃষায় বদতে লোকশ্চন্দনং কিল শীতলম্।
পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গশ্চন্দনাদপি শীতলঃ॥

অহো! লোকে বলে - চন্দন শীতল, তাদের একথা মিথ্যা! আমার মনে হয়, পুত্রের আলিঙ্গন চন্দন হতেও অধিক সুশীতল।

শ্মশ্রুগ্রহেণ ক্রীড়ন্তং ধূলিধূসরিতাননম্,।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি নিজোৎসঙ্গসমাস্থিতম্॥

পুত্র ধূলিধূসরিত হয়ে যখন পিতার দাড়ি বা চুল ধরে যখন নাচতে থাকে তখন যে আনন্দকর দৃশ্য ফুটে ওঠে, একমাত্র পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছেই তা উপভোগ্য এবং পবিত্র হয়ে ওঠে।

দিগম্বরং গতব্রীড়ং জটিলং ধূলিধূসরম্।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি গঙ্গাধরামিবাত্মজম্॥

অর্থাৎ শিশু যখন উলঙ্গ হয়ে ধুলিকাদা মেখে তার ঝাঁপরঝোপড় চুল এলোমেলো করে দৌড়ে খেলে বেড়ায়, তখন একমাত্র পুণ্যশীল ব্যক্তিরাই তার মধ্যে দিগম্বর জটাধারী শিবরূপ প্রত্যক্ষ করেন।

শম্ভুভাই আপনি মার্কণ্ডেয় মুনির ভাষা লক্ষ্য করুন। তিনি বারবার বলেছেন পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি, কাজেই নীরস বিবস শুকনো যোগীরা 'মায়া' বললেও পুত্র মায়ার বন্ধন হিসাবে কখনই উপেক্ষার বস্তু হতে পারেনা। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার কিষেণ যখন ধুলো কাঁদা মেখে আপনাকে জড়িয়ে ধরত বা আপনার কাঁধে চেপে বেড়াত, তখন আপনি যে তৃপ্তি বা শান্তি পেতেন, তার তুলনা কোথায়? আপনি কোন প্রাণে সেই শিশুকে ফেলে পালিয়ে এসেছেন তা ভেবেও আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি আমার কথা শুনুন, অবিলম্বে আপনি ঘরে ফিরে যান, এখানে ওঁকারেশ্বরের প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ দেখে আপনার তৃপ্তি আসবেনা। দিগম্বর কিষেণের মধ্যে দিগম্বর শিবকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে আপনার চোখ মন দুই-ই ভরবে।

শম্ভুনাথ কাঁদছেন। এদিকে কথা বলতে বলতে বোধহয় রাত্রি ৯টা বেজে গেছে। ওঁকারেশ্বরের আরতি শেষ হয়েছে। প্রধান দরজা বন্ধ হয়েছে। কেউ কোথাও নেই, নির্জন নিশুতিতে আমরা দুজন কেবল ঘাটে বসে আছি। আমার ফিরতে দেরী হয়েছে দেখে রামদাসজী আমাকে খোঁজার জন্য মঙ্গলদাস এবং দীনদয়ালকে মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। তারা অন্ধকারের মধ্যে দুজনে নীরবে আমাদের পেছনেই বসেছিল। শম্ভুনাথের সঙ্গে কথা শেষ হতেই মঙ্গলদাস সাড়া দিলেন এবং এগিয়ে এসে শম্ভুনাথের হাত ধরলেন। শম্ভুনাথ তার সঙ্গে গিয়ে নর্মদাতে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে এল। এইবার আমরা উঠে পড়লাম। শম্ভুনাথ আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন - আপনার কথা আমার মনকে খুবই নাড়া দিয়েছে। আপনি আমার খুব উপকার করলেন। দু'একদিনের মধ্যেই আমি আমার কিষেণের কাছে ফিরে যাবো। মঙ্গলদাসজী তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন - কেবল কিষেণ নেহি, কহিয়ে কিষেণ ঔর বিন্নী। হম্ আচ্ছিতরেসে জানতা হুঁ কিষেণকা মা বেচারী ভি বহোৎ আচ্ছি হ্যায়।

শম্ভুনাথ তাঁর কুটীরের পথে এগিয়ে গেলেন, আমরা ভজন-আশ্রমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আশ্রমে পৌঁছে দেখি রামদাসজী আশ্রম-প্রাঙ্গণে পায়চারী করছেন, আমাকে দেখেই স্মিতহাস্যে বললেন - আপনে বহুৎ আচ্ছা প্রবচন কিয়া। আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম - আপনার আর কি কোন কাজ নেই! প্রভু রামচন্দ্রের লীলা-অনুধ্যান বাদ দিয়ে কে কোথায় কি করছে বা বলছে, তাই দেখে বেড়াচ্ছেন।

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন - হম্ ত হমারা কামমেঁই লগন থা, লেকিন বৈরাগীয়োঁ কো আপনে এ্যায়সা জোরসে ঝাপট্ মারা যো হম্ ভি চমকিত হো গয়া।

আমি মুখহাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে পেট ভরে জল খেলাম। ভাবতে লাগলাম এ সাধুটিও ত কম নন, গতকাল রাত্রে যখন ভাবছিলাম, কাল থেকে পিতৃ উপদিষ্ট পন্থায় ওঁকারতত্ত্ব মনন করব, তখন ইনি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন - 'কাল করে সো আজ করো', আর আজ দেখছি, কোটিতীর্থের ঘাটে বসে শম্ভুনাথের সঙ্গে যেসব আলোচনা করেছি আলোচনা প্রসঙ্গে বৈরাগী সাধুদের উপর যে কটাক্ষপাত করেছি তাও এঁর অজানা নেই।

শুয়ে পড়ে প্রলয়দাসজীর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এতক্ষণ নানা কথায় ভুলে ছিলাম তাঁর কথা, এখন একা হতেই পুনরায় তাঁর চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানা থেকে উঠে পড়ে ক্রিয়াতে বসার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পাশের ঘরে রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁর চোখে নবদূর্বাদল রামচন্দ্রের বনভ্রমণের দৃশ্য ভেসে উঠেছে। রাম-লক্ষ্মণ দুজনে পম্পা সরোবরের তীরে এসে পৌঁচেছেন, কিছুক্ষণ পরেই মাতঙ্গমুনির পালিতা কন্যা ও শিষ্যা শবরীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে। রামচন্দ্র পম্পাতীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন -

পম্পানাম সুভগ গম্ভীরা, সন্ত হৃদয় জৈসে নির্মল বারি।
বাঁধে ঘাট মনোহর চারী, জঁহ। তহ্, পিয়হি বিবিধ মৃগ নীরা,
জিনি উদার গৃহ যাচক ভীরা।
পুবইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইয়ে মর্ম
মায়াচ্ছন্ন ন দেখিয়ে জৈসে নির্গুণ ব্রহ্ম ॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র বলছেন - দেখ ভাই লক্ষ্মণ, এই সরোবরের নাম পম্পা - এর মনোরম গভীর জলরাশি সাধুর হৃদয়সম নির্মল। চারধারে দেখ কী সুন্দর বাঁধানো ঘাট, নানা জীবজন্তু নেমে জলপান করছে - ঠিক যেন উদার হৃদয় ব্যক্তির গৃহে যেমন সদাই যাচকের ভীড়। নিবিড় শৈবালদামে জলের কিছু অংশ আচ্ছন্ন। সেগুলি সরিয়ে জলের অন্তঃস্থল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ যেন মায়ার আবরণ সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে, তা ভেদ করে নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া সুকঠিন।

রামদাসজীর কণ্ঠমাধুর্য এবং ভক্তিমিশ্রিত আবেগের গুণে আমার মনের সব চঞ্চলতা দূর হল। মরমী সাধক ভাবের অন্তর্লোকে বিচরণ করছেন, তিনি করতে থাকুন; কিন্তু দোঁহার ভাষা যেভাবে রূপকের প্রয়োগে উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বল বহিরঙ্গই আমাকে মুগ্ধ করল। অরূপকে রূপায়িত করার জন্যই সাধারণতঃ রূপককে ব্যবহার করা হয়। তুলসীদাসজী পম্পা নামক একটি সামান্য সরোবরের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে যেভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় বিশ্বকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপমা দ্বারা প্রকাশ করেছেন - তা যেন জড়োয়া গহনার সোনার বাঁধনের মাঝে মনি মুক্তার দীপ্তির মত আলোকিত। তুলসীদাসজী রচিত 'রামচরিতমানস' যে জন্য লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণকে ভুলিয়ে দিয়ে হিন্দীভাষী জনসাধারণের মনকে অধিকার করে নিতে পেরেছে, তার কারণ যেন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে।

মনে মনে স্থির করলাম, যতদিন এখানে আছি, ততদিন নিয়মিতভাবে রামদাসজীর কাছে রামচরিতমানসের পাঠ নেব। শান্ত ও তৃপ্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে দৌড়োলাম কোটিতীর্থের ঘাটে। ঘাট ও মন্দির তন্নতন্ন করে খুঁজে আবার নিরাশ হলাম। আজও প্রলয়দাসজীর দেখা পেলাম না। স্নান সেরে মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। একে একে মন্দিরের পাঁচতলা পর্যন্ত ওঠানামা করে ওঁকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সিদ্ধনাথ, গুপ্তেশ্বর এবং ধ্বজাধারী, পঞ্চশিবের পূজা করে শান্ত হয়ে মন্দিরের একপ্রান্তে বসে ওঁকারেশ্বরজীর কাছে প্রার্থনা জানালাম - হে দয়াল! প্রলয়দাসজীর সঙ্গে আর একটি বারের জন্য দেখা করিয়ে দাও, অথবা ওনার জন্য মনের কাতরতার অবসান ঘটাও। মনকে দৃঢ় করার জন্য মনের মধ্যে বিপরীত চিন্তাস্রোত তৈরী করতে লাগলাম। প্রলয়দাসজী বলেছিলেন, মূর্ধ্বাদেশে কিভাবে ওঁকারের সাধনা করতে হয়, তা শিখিয়ে দেবেন। এই লোভই হয়ত আমাকে এত ছটফট করাচ্ছে, সাধুর প্রতি এ আমার কোন ভক্তি বা অনুরাগ নয়। দু'দিন দুবার মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। নিজের মনকে শাসন করতে বসলাম - ধিকধিক্, শতধিক্ আমাকে। আমার বাবা যদি বুঝতেন, ঐ পদ্ধতি আমার শেখা প্রয়োজন, তাহলে তিনিই তা আমাকে শিখিয়ে যেতেন। আমার মনের কি অধঃপতন। মনে পড়ল প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা। গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সহসা আবির্ভূত হয়ে মানস সরোবরের ব্রহ্মানন্দ পরমহংস যখন দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র এবং বৈদিক প্রাণায়ামের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে যান, সেই সাধনা নিষ্ঠাসহকারে অভ্যাস করে তিনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তিনি দাবানল এবং বহু সঙ্কটেই তাঁকে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে রক্ষা করেছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বারদীর ব্রহ্মচারীকে ত্রিকালদর্শী মহাযোগী বলে জানতেন এবং অসীম ভক্তি করতেন। তবুও কৈ, তিনি ত কোনদিন ব্রহ্মচারীর কাছে যোগের কোন সূক্ষ্ম ও সিদ্ধপথ জানতে চাননি। এমনকি একবার বিজয়কৃষ্ণ যখন পুরীতে তাঁর আশ্রমে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, সেই সময় সহসা একদিন গভীর রাত্রে দেখেন, জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন, সারা ঘর আলোতে ভরে গেছে। সেই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে এক অব্যর্থ ফলপ্রদ মহাসিদ্ধ বীজমন্ত্র দান করতে আগ্রহ দেখান। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন নি,বরং দৃঢ় কণ্ঠে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে - মেরা গুরুকা দরবারমেঁ কুছ্ কমি নেহি।

হায়রে, আমার সেই গুরুনিষ্ঠাও নেই। বাবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে মন শান্ত হল। আমি ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখি শম্ভুনাথজী শুকনো মুখে সিঁড়ির উপর বসে আছেন, তাঁর হাতে একটি হিন্দী বই। আমাকে দেখেই বললেন - আপনাকে নাটমন্দিরে উঁকি মেরে দেখে এসে এইখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

- আমি ত ভেবেছিলাম, এতক্ষণে আপনি নর্মদা পেরিয়ে খাণ্ডোয়াতে পৌঁছে গেছেন, সন্ধ্যা নাগাদ্ আপনার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে যাবেন।

- আপনার কথা আমি গোটা রাত ধরে চিন্তা করেছি। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। এই বইটি আপনি দেখুন, এই বইতে ভর্ত্তৃহরি, শংকরাচার্য, শিবাজীর গুরু রামদাসস্বামী প্রভৃতি আরও অনেক ভারতপ্রসিদ্ধ মহাত্মার বৈরাগ্যমূলক বাণী লিপিবদ্ধ আছে। সকলেই একবাক্যে বলেছেন - স্ত্রী-পুত্র মায়ার বন্ধন। কিছুতেই ফাঁদে আটকে থেকনা। বৈরাগ্য অবলম্বন কর। বৈরাগ্য অবলম্বন করলেই 'ততঃ শান্তিমনন্তরম'। এতগুলি মহাপুরুষ কি ভুল লিখেছেন ? যে কোনভাবে হোক, সংসার যখন ছেড়ে এসেছি, তখন সেখানে ফিরে যাওয়া কি সুখের হবে? এই অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। এই বইটা একবার পড়ে দেখুন।

- এ বই কার লেখা? প্রকাশক বা লেখক কে?

- মহারাষ্ট্রের সজ্জনগড়-স্থিত চাফল মঠ হতে বইটি প্রকাশিত। লেখক গোবিন্দ রামচন্দ্র নামক জনৈক রামদাসী মঠের মোহান্ত দ্বারা মূল মারাঠী ভাষায় লেখা, এই বই তারই হিন্দি অনুবাদ। এই বইখানি প্রায় তিন বছর আগে রামদাসজী দিয়েছিলেন আমাকে।

আমি শম্ভুনাথকে বললাম - এই বই পড়ার প্রয়োজন আমি অনুভব করছিনা। চলুন ঐদিকে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে বসি।

বসার পর আমি তাঁকে বলতে লাগলাম - একটি জিনিষ আপনি ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা করুন। সাধক হতে হলেই সংসারত্যাগী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের হাতেই চিরকাল লোকশিক্ষার ভার ছিল। সন্ন্যাসী মাত্রেই সংসার-বৈরাগী। কাজেই শাস্ত্র থেকে তারা কেবল বৈরাগ্যের বাণীগুলিই বের করে পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং লোকসমাজে তা প্রচার করতে অভ্যস্ত। বৈদিক যুগের পর হতে শত শত বৎসর ধরে তাঁরা বলে আসছেন - এ জগৎ মিথ্যা, সত্যের আভাস মাত্রও এখানে পাওয়া যাবেনা। পুত্র কলত্র মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, তাদের মায়া-রজ্জুতে আবদ্ধ হয়োনা, তারা যদি চোখের সামনে অনাহারে দুঃখ কষ্ট পায়, তোমার অনুপস্থিতিতে তারা অবর্ণনীয় দুঃখ শোকে মুহ্যমান হবে তা বুঝতে পারলেও কোনমতেই বিচলিত হয়োনা। চিত্তের শান্তি ক্ষুণ্ণ করোনা, শান্ত সমাহিত চিত্তে তুমি কেবল ভগবানের নাম কীর্তন করে যাও। অনাহারক্লিষ্ট বিরহ সন্তপ্ত পুত্র কলত্র বা মাতাপিতার ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবিয়ে দাও, মৃদঙ্গ করতাল না পাওয়া গেলে, পাথরের ত অভাব নেই, পাথর বাজিয়ে বাজিয়ে নামকীর্তন কর, নতুবা কুম্ভক অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে নামজপ করে যাও। উপবাসে ভয় পেয়োনা, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরী কিংবা বৈকুণ্ঠে গিয়ে পারিজাতের মালা গলায় পরে পেট ভরে অমৃত খাবে। আপনি আমাকে যে বইটি পরতে দিচ্ছিলেন, ঐ বইতে এসব ধরণের বৈরাগ্যমূলক কথা ছাড়া আর কি থাকবে! বৈরাগী সন্ন্যাসীর লেখা পুস্তকে ঐসব অসার বৈরাগ্যের কথা ছাড়া আর কি থাকতে পারে! ভারতজুড়ে যত সন্ন্যাসী দেখছেন, তাঁরা বৈরাগ্যের পরিপোষক কথাগুলি নির্বাচন করে লোকসমাজে প্রচার করে থাকেন, তা শুনে আপনার মত অনেকেই বৈরাগ্যের ভেক নিয়েছেন, ফলে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ যখন শোকতাপ পায়, তখন ঐসব সন্ন্যাসীদের বাণীবচন পড়ে কিংবা কোন বৈরাগীর সংস্পর্শে এসে গৃহত্যাগ করে থাকে। এও এক ধরণের মস্তিষ্ক ধোলাই। মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ফলে, মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্যের সাময়িক বিড়ম্বনায় কারও মনে প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মায়না। যে বৈরাগ্য সাধকের মনকে বিশেষ রঙে অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা করে দেয়, সে বৈরাগ্য অন্তর থেকে স্বতঃই জন্মে থাকে। তা গৃহে থেকেও হতে পারে, স্ত্রীপুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতি আপনজনকে ভালোবেসেও সকলের মধ্যে প্রেমিক ঠাকুরকে অনুভব করতে পারা যায়। ঈশ্বর প্রেমময়, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন। কাজেই আপনজন কি ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু! আপনার কি আপন স্ত্রী-পুত্রের বা মাতাপিতার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসায় কি করুণাময় ভগবান প্রতিভাসিত হন না?

আপনাকে আমি আগের দিন যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের কথা বলেছিলাম। তাঁদের ঋষিজীবনের কথা অনুধাবন করলেই জানতে পারবেন, আপনজনের ভালবাসা তাঁদের পায়ে মায়ার বেড়ি পরাতে পারেনি। প্রিয় পরিজনের ভালবাসাই বরং তাঁদের স্নেহভালবাসাময় হৃদয়কে পরিশেষে সেই বিশেষ রঙ (বি - রঞ্জ + ঘঞ = বৈরাগ্য) ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলেছিল। তাঁরা সুস্থ এবং স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে রসস্থ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা 'রসো বৈ সঃ' যিনি, তাঁর সন্ধান পেয়েছিলেন। একেই বলে খাঁটি বৈরাগ্য, স্বতোৎসারিত এবং স্বাভাবিক বৈরাগ্য। একটি বিশিষ্ট মতের পরিপোষক বাণী বচন পড়া প্রতিনিয়ত চেষ্টার ফলে মস্তিষ্ক ধোলাই প্রসূত যে বৈরাগ্য তাকে মেকী বৈরাগ্য বলাই সঙ্গত। আপনি বলছেন ঐ বইটি নাকি কোন রামদাসী মঠের মোহান্ত দ্বারা প্রকাশিত। রামদাসী বলতে সমর্থ রামদাসস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে বোঝায়। সমর্থ রামদাসস্বামী রাম নামে সিদ্ধ হয়েছিলেন। অসাধারণ রামভক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর এই রামভক্তি তাকে সংসার বিমুখ বিরাগী করে

তোলেনি। মারাঠি ভাষায় তাঁর লেখা 'দাসবোধ' এক অসাধারণ গ্রন্থ। শিখদের যেমন 'গ্রন্থসাহেব', সমগ্র মারাঠা জাতির কাছে তেমনিই 'দাসবোধ'। মারাঠীরা বেদ ও পুরাণের চেয়ে এই বইটিকে বেশী সম্মান করে এবং সংসার জীবনে কোন গুরুতর সমস্যার সন্মুখীন হলে তার মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। দাসবোধ পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, ঐ মহাগ্রন্থটি লোকসেবা এবং স্বদেশপ্রেমের বেদস্বরূপ। ছত্রপতি শিবাজীকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে লোকসেবার আদর্শ গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি শিবাজী বা আপন শিষ্যদেরকে একবারও বলেন নি যে কৌপীন পড়ে তিলক কেটে অহরহ রামনাম করতে লেগে পড়। পরিবর্তে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দেশের দুরবস্থার দিকে।

পদার্থ মাত্র তিতুকা গেলা।
নুস্তা দেশ চি উরলা।
মানসা খাবয়া ধান্য নাহি
অহরণ পাংঘরুণ তে হি নাহি
ঘর করায়া সামগ্রী নাহি॥ (দাসবোধ)

হায়! তোমরা চেয়ে দেখ, দেশের ধনসম্পদ সবই গেছে, কেবল দেশ মাত্র আছে। মানুষের ঘরে খাবার ধান নেই। বিছানায় পাতবার বা গায়ে দেবার কাপড় নেই, ঘর করবার সামগ্রীও নেই।

তোমরা কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়। সুখী এবং সমৃদ্ধ পরিবার আর শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলার ব্রত নাও। নিজেও যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা এবং প্রজাবাৎসল্যের আদর্শ প্রচার করতে করতে সারাদেশের সর্বত্র ঘুরে বেরিয়ে দেশাত্মবোধের চেতনায় সবাইকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তেমনি শিষ্যদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা এতকাল শুনে এসেছে সংসার অসার, তাদেরকে এখন বোঝাতে থাক যে প্রপঞ্চেই পরমার্থ মেলে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ মূর্খ জাতির কাছে ভগবানের মহিমা কথা, আর যে কানে শোনেনা তার সামনে বাঁশী বাজানো সমান। করতালের শব্দে পেট ভরেনা, তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হোক, তার কাঠে রান্না হয়না, আম কাঁঠাল কলা প্রভৃতির মত সুস্বাদু ফল তুলসীগাছে ফলেনা।

আমি শম্ভুনাথকে বললাম - মোটামুটি সমর্থ রামদাসস্বামীর মতামতের আভাস ত পেলেন! সেই অসাধারণ মহাত্মার নাম নিয়ে তাঁর নামাঙ্কিত মঠ হতে যদি কেবল বৈরাগ্যের বাণী নির্বাচন করে কেউ যদি সংসারকে অসার ও মিথ্যা বলে প্রচার করতে চায়, আপনিই বলুন সেই পুস্তকের মূল্য কতটুকু! আপনি বৈরাগীদের আখড়া এবং মঠগুলি যদি ঘুরে দেখেন, তাহলে তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং মন্দির দেখলে এবং বৈরাগ্যের বাণী প্রচারক মহারাজের রাজোচিত ভোগরাগ দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য লোকে তাদের প্রিয় পরিজন ত্যাগ করে এসে মঠের সেবা করুক এবং যথাসর্বস্ব মঠের কাজে ঢেলে দিক, মঠের ধনাগার বৃদ্ধি হোক।

সে শংকরপন্থী-ই হোক, ভর্তৃহরিপন্থী বা রামদাসপন্থী হোক, বেদান্তী বৈষ্ণব যে কোন সম্প্রদায়ের মোহান্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ বা শ্রী ১০০৮ বিশেষণযুক্ত সন্ন্যাসীদের তৈলঢালা, স্নিগ্ধতনু নিদ্রারসে ভরা এবং অন্যায়সলব্ধ অর্থে বিচিত্র ভোগরাগ দেখে সহজেই বুঝতে পারবেন, তাঁরা নিজেরা বৈরাগ্যের আচরণ না করে কিভাবে মিঠা মিঠা বৈরাগ্যের গালভরা বুলি প্রচার করে আপনাদের মত মানসিক বেদনায় ক্লিষ্ট, হতাশা জর্জরিত কিংবা সহজ বিশ্বাসী লোকেদের মতিভ্রম ঘটিয়ে চলেছেন। সমর্থ রামদাসস্বামীর আমলেও ঐরকম লোক ছিল। তিনি ঐসব তথাকথিত সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের লেখাপড়া জানা মূর্খ বলে শ্লেষ করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'দাসবোধ' মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম 'পঢ়ত মূর্খ লক্ষণ'; সেই অধ্যায়ের দুটি দোঁহা শুনুন -

১। জ্ঞান বোলোন করী স্বার্থ কৃপণা-ঐসী সংচী অর্থ।
অর্থসাধী লাবী পরমার্থ তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

জ্ঞানের বচন বলি' স্বার্থসিদ্ধি করে,
কৃপণের মত যে ধনসঞ্চয় করে,
পরমার্থ প্রয়োগ যার অর্থলাভ তরে,
লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ নাম ধরে।

২। বর্তল্যা বীণ সিকবী। ব্রহ্মজ্ঞান লাবনী লাবী॥
পরাধেন গোসাবী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

আপনার আচরণে যাহা নাহি আসে,
পরকে শিখাতে তা চায় অনায়াসে॥
ব্রহ্মজ্ঞান প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ,
লেখাপড়া জানা মূর্খ নাহি পায় সুখ॥

সমর্থ রামদাসজী স্পষ্টই বলে গেছেন -

আমচি প্রতিজ্ঞা ঐসী।
কাহি ন মাগাবে শিষ্যসী॥

অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, শিষ্যের নিকট কিছু চাইব না।

প্রবাদ আছে যে, ছত্রপতি তাঁর সমস্ত রাজ্য দান করতে চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যার্পণ করে বলেছিলেন - আজ হতে এ রাজ্য বৈরাগীর রাজ্য, তুমি রাজ্যের সেবক মাত্র। সেই হতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হয়েছিল। সেই পতাকার পতন ইংরেজদের কামানের গুলিতে হয়নি, তার পতন হয়েছিল মারাঠা জাতি শিবাজী এবং রামদাসের আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়েছিল বলে।

আপনি বর্তমানের প্রতিষ্ঠাপরায়ণ বুলি সর্বস্ব গেরুয়া-পরা বৈরাগীদের কথা উপেক্ষা করে ভারতের যথার্থতম বৈরাগী সমর্থ রামদাসজীর আদর্শ অনুসরণ করুন। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

- আমি এখান হতেই খাণ্ডোয়া যাত্রা করব। ভজন-আশ্রমে আমার একান্ত হিতৈষী বন্ধু মঙ্গলদাসজীর সঙ্গে যাবার পথে দেখা করে যাবো।

আমরা উভয়ে ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে একসঙ্গে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমে তখন ঠাকুরের ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। শম্ভুনাথের বাড়ী ফিরে যাবার সংকল্প শুনে মঙ্গলদাসজী আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। রামদাসজী বললেন - প্রসাদ পাকর যায়েগা। মঙ্গলদাস তুমকো বিষ্ণুপুরী ঘাট তক্ সাথমেঁ যাকে ছোড়কে আয়েগা। কিছু টাকা শম্ভুনাথের হাতে দিয়ে বললেন - সিধা শ্বশুরাল কুঠীমেঁ যাবেগা। ভগবান রামচন্দ্রজী আপকা ভালা করেঁ। ক্যা আপকো হম্ কহা হৈ কি নেহি - রাম নাম জপতে রহো। আপকো মঙ্গল হোগা। প্রভুকা কিরপা সে (আমাকে দেখিয়ে) ইনকা সাথ আপকা ভেট হুয়া থা। শৈলেন্দ্রনারায়ণজী আচ্ছাই কিয়া, বহুত আচ্ছা কাম কিয়া।

আমি তাঁকে হাসতে হাসতে বললাম - আমি মুণ্ডমহারণ্যে শোভানন্দজী নামে এক মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম। তাঁকে আপনি চেনেন কিনা জানিনা, তবে মহাত্মা সুমেরদাসজীকে ত আপনি ভালভাবেই চেনেন। ঐ দুজনেই আমার কাছে অত্যন্ত আদরণীয় এবং পুজনীয় মহাত্মা। আপনি যে বারবার আমাকে বলছেন - 'আচ্ছাই কিয়া, বহুত আচ্ছা কিয়া' এর উত্তরে আমি ঐ দুই মহাত্মার বাচনভঙ্গীতে যে মুদ্রাদোষ আছে তাকে একত্র করে উত্তর দিচ্ছি - 'ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ ... নর্মদামেঁ অ্যায়সা হোতাই হ্যায়'।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শম্ভুনাথ খাণ্ডোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। মঙ্গলদাসজী সঙ্গে গেলেন বিষ্ণুপুরী ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। আজ সবচেয়ে আনন্দ দেখছি তিনিই পেয়েছেন। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে শুয়ে কাটালাম। তারপরেই রওনা হলাম ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দিকে। মন্দিরে গিয়ে দেখি আরতির দেরী আছে, তবুও এরই মধ্যে কুড়ি-পঁচিশজন স্ত্রীপুরুষের ভীড় হয়েছে। দুজন নূতন সাধুকে দেখলাম, তাঁরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্তব পাঠ করছেন। স্তব পাঠের পরেই দুজনে প্রত্যেক হাতে একজোড়া করে কাঠের খঞ্জনী নিয়ে ভক্তি সহকারে গান ধরলেন -

অবগুন হারা গুণ নেহি মনকা বড়া কঠোর,
এ্যায়সা সমর্থ ওঁকারেশ্বর তুমহি লাগায়ো ঠোর।
তুম্ ত সমরথ সাঁইয়া, দৃঢ় কর পাকড়ো বাঁহে,
ধূর্ হিলে পৌঁছাইয়ো নেহি ছোড়ো মগ্ মাহেঁ।
সুরত্ করো মেরে সাঁইয়া হম্ হ্যায় ভওজল মায়,
আপহি বাহে জায়েঙ্গে যব তুম্ না পাকড়ো বাঁয়।
ঘট্ সমুন্দর লখ্ না পড়ে, উঠে লহর অপার,
তুম্ যব না পাকড়েঙ্গে তব্ কোন করেগা পার!
সব ধরিতি কাগদ্ করুঁ লেখন সব বনরায়,
সাত্ সিন্দুকো মসী করুঁ তব গুণ্ লেখা ন জায়।
মুঝে অবগুণ হ্যায় তুঝ্ গুণে, তঝ্ গুণ অবগুণ মুঝে,
যা ম্যায় বিসরুঁ তুঝকো, তুম্ মৎ বিসরোঁ মুঝে।
যো ম্যায় ভুল বিগড়িয়া না কর্ ময়লা চিত্,
সাহেব গেড়ুয়া লোরিয়ে নফর বিগাড়ে নিত্।
অবগুণ কিয়ে ত বহুৎ কিয়ে করতন্ মানে হার,
ভাবে গর্দন বখশিয়ে ভাবে গর্দন মার।
ম্যায় অপরাধী জনমকা নখ্ শিষ ভরা বিকার,
তুম্ দাতা দুঃখ ভঞ্জন মেরে করহো সমহার।
মন্ প্রতীত ন পরেম-রস, ন কুছ্ তনমেঁ ঢঙ্গ,
ন জানে উস্ পিউসে কেঁও কর্ রহসি রঙ্
ক্যা মুখলে ক্যা বিনতি করুঁ লাজ অবত মোহি,
তুম্ দেখতা অবগুণ করুঁ ক্যায়সে গউঁ তোহি
ভক্তিদান মোহে দিজিয়ে গুরুদেবন্ কি দেব,
ঔর কুছ্ ন চাহিয়ে নিশিদিন তেরি সেব।
অবকে যব সদগুরু মিলে সব দুঃখ আখুঁ রোয়ে,
চরণ উপর শিশ্ রাখুঁ, কহু জা কহনা কোহে॥

হে দীনদয়াল! আমার মন অবগুণে ভরে আছে, মলিনতার পর্দা পড়ে পড়ে মন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু হে ওঁকারেশ্বর। তুমি ত সমর্থ পুরুষ, তুমি দয়া করে আমার গতি করে দাও। হে সর্বশক্তিমান স্বামিন্ তুমি দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে সেই 'ধুরধামে' (স্বধামে) পৌঁছে দাও। আমি সংসার সমুদ্রের মাঝে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তুমি যদি আমার হাত না ধর, তাহলে ভেসে যাব, তলিয়ে যাব। আমার দেহরূপ ঘট যে অথৈ সমুদ্রে পড়েছে, সে সমুদ্রের কোন কূল কিনারা দেখতে পাচ্ছিনা, সেখানে অজস্র তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠছে, পড়ছে। তুমি আমার হাত না ধরলে কে আমাকে পারে নিয়ে যাবে! সমস্ত পৃথিবীকে কাগজ এবং সাত সমুদ্রের জলকে কালি করে বনের সমস্ত বৃক্ষকে যদি কলম করে তোমার মহিমা এবং দয়ার কথা লিখে যাই, তথাপি তোমার সমস্ত গুণের কথা লিখে শেষ করতে পারবনা। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে অবগুণ ছাড়া আর কিছু নেই, আর তোমার করুণার কথা ভাবতে গেলেই দেখছি, তোমার গুণ ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ছেনা; আমি গুণহীন আর তুমি গুণময়। আমি তোমাকে ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু হে গুণনিধি! তুমি আমাকে ভুলোনা। তোমার এই 'নফর' (দাসানুদাস) নিত্য ভুল করবে, নিত্য পাপের ধূলিকণা মেখে অপবিত্র পথে, পাপের পথে এগিয়ে যাবে, তুমি মজবুত করে শক্ত হাতে আমাকে ধরে থেকো প্রভু! আমি অনেক পাপ করছি, অপরাধের পাল্লায় সবাই আমার কাছে হেরে গেছে। ইচ্ছা হয় এই অধম বান্দাকে রক্ষা কর, নতুবা অধঃপাতে যেতে দাও - তবে তাতে তোমার অধমতারণ নামে কলঙ্ক পড়বে। আমি ত জন্ম অপরাধী, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত নানা বিকৃতিতে কালিমা-লিপ্ত। কিন্তু তোমার নাম ত দুঃখভঞ্জন, আমার দুঃখ দূর করে, আমাকে উদ্ধার করে তোমার সেই নামের মহিমা সার্থক কর। মনে প্রেমরস নেই, শরীরের সাত্ত্বিক ভাবের কোন সৌষ্ঠব নেই, তথাপি আমার এই বিকারগ্রস্ত দেহমনের মধ্যেও তুমি অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করছ; তুমি বসে বসে সব দেখছ, তোমার চোখের সামনেই অপরাধ করে চলেছি, এ তোমার কেমন রহস্য, বুঝিনা! কি করে তোমার এসব ভাল লাগছে ? হে সদগুরুদেরও সদগুরু, দেবাদিদেব মহাদেব! আমার হৃদয়ে ভক্তি দাও, আমি যেন দিন রাত্রি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, সেবা করতে পারি, এছাড়া আর কিছু আমি চাইনা। এখন তোমার মত সদগুরু যখন পেলাম, তখন আমার সমস্ত দুঃখ অশ্রুজল হয়ে তোমার চরণ কমলে ঝরে পড়ুক। তোমার চরণে মাথা রেখে আমার যা বলবার তা বললাম, এখন যা করবার তুমি কর।

প্রত্যেকটি গানের কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন আবেগ এবং আকূতি মিশিয়ে গাইলেন ঐ সাধু দুজন যে সবার চোখে জল। একটা করুণ সুরের লহরী নাটমন্দিরের মধ্যে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেক শ্রোতার বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে অব্যক্ত সেই হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা। সুরের মায়াজালে শরণাগতির ভাবরস প্রত্যেকের চোখে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে, সকলেই বিহ্বল সকলেই আচ্ছন্ন, গর্ভমন্দিরে দুবার বিদ্যুতের ঝিলিক ঝলসে উঠল। চোখ মুছে ভাল করে তাকাতেই দেখলাম ওঁকারেশ্বরের লিঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন।

গান শেষ হতে বোধ হয় দু'ঘন্টা সময় লাগল। পাণ্ডাদের চোখেও জল। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, আরতির সময় পার হয়ে গেছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলে উঠলেন - প্রভুজীকী আরতি কব শুরু হোগা ? চমকে তাকিয়ে দেখি মহাত্মা প্রলয়দাসজী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কন্ঠস্বর শুনে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জয়ানন্দ গোঁসাই ছলোছলো চোখে গর্ভগৃহে ঢুকে আরতি আরম্ভ করলেন। আমি উঠে গিয়ে প্রলয়দাসজীর পেছনে গিয়ে বসলাম, যাতে আর তিনি চোখের আড়াল হতে না পারেন। বাদ্যভাণ্ড সহকারে আরতি শেষ হল। প্রলয়দাসজী সেই একইভাবে সমকায় শিরোগ্রীব হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। রূপার দোলা টাঙিয়ে ওঁকারেশ্বরজীর শয়নের ব্যবস্থা হল। একে একে ভক্তরা বিদায় নিলেন। প্রলয়দাসজীর এবার ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি উঠে আমার হাত ধরলেন। এমনভাবে আমার হাত জাপটে ধরেছেন যেন আমি হাত ধরে তাঁকে মন্দিরের বাইরে না আনলে তিনি আর চলতে পারবেন না। মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ হল। তিনি আমাকে প্রথম সম্ভাষণেই বললেন - বেটা হমারা লিয়ে আপ্ বহোৎ তড়পাতে থে, উহ্ মুঝে মালুম হ্যায়। লেকিন্ হম্ বিচ্ বিচমে ঘুমনে যাতা, চারোঁ ধাম ঘুমকে আয়া। ইসী ওয়াস্তে থোড়া দের হো গঈ।

আমি বললাম - আপনার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছেনা। ২রা বৈশাখ আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আজ ৯ই বৈশাখ, এই সাতদিনের মধ্যে বদ্রীধাম থাকে দ্বারকা পর্যন্ত আপনার পক্ষে কিভাবে পরিক্রমা করা সম্ভব হল ?

আমার প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর দিলেন না। উলটে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - তোমার ওঁকারেশ্বর পরিক্রমা শেষ হয়েছে? কোথায় কোথায় তুমি ঘুরেছ আমাকে বল।

আমি একে একে এরণ্ডী সংগম, ভাণ্ডারী তীর্থ, শঙ্করাচার্য পূজিত ঋণমুক্তেশ্বর, সোমনাথ শিব, রাবণনালা, ভৈরবশিলা, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতির নাম করলাম।

– সিদ্ধেশ্বরজী আদি ওঁকারেশ্বর হ্যায়, উনকা পূজা কিয়া ? কৌন্ বিধিসে ?

– যেমন জল ঢেলে প্রণাম করি, তেমনভাবেই করেছি। অন্য কোন বিশেষ বিধি আমার জানা নেই।

– জিভ্ দিয়ে তালুতে চ্চুঃ চ্চুঃ করে একটা শব্দ করলেন প্রলয়দাসজী, তারপর বললেন - আদি ওঁকারেশ্বরজীকো পূজা করনেকে এক বিশেষ বিধি হ্যায়।

– কি সেই বিধি ?

– আমি তোমাকে যখন পূজা করাব, তখন দেখতে পাবে। শূলপাণি ঝাড়িতে যখন পরিক্রমা করবে তখন পাথর গিরি মহারাজের আশ্রম দেখতে পাবে। পাথর গিরিজীর দেহান্ত হয়েছে, এখন তাঁর গদীতে আছেন ভরত গিরি। দুর্দান্ত ভীলরা সবাই তাঁর অনুগত। পাথর গিরি প্রবর্তিত ধারায় তিনি পরিক্রমাবাসীদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন ও পরীক্ষা করেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকে - আপ্ আদি ওঁকারেশ্বরজীকো পূজা কিয়া? কৌন্ বিধিসে? যথাযথভাবে সেই বিধি না বলতে পারলে নাগা শিষ্যরা এসে চোটী কেটে দেন। আর তাঁরা এগোতে দেননা, পরিক্রমা ভঙ্গ করিয়ে দেন। আর সন্তোষজনক উত্তর পেলে ঐ আশ্রম থেকে পরিক্রমাবাসীকে একটি নারোটি (নারকেল মালা দিয়ে তৈরী) দেয়া হয়। এই নারোটি দেখালে তবেই রেবা-সংগমে যাবার ছাড়পত্র মেলে। তার পারিভাষিক নাম 'নৌকার চিঠি'। তুমি আজই ভজন আশ্রমে ফিরে গিয়ে রামদাসজীর কাছ হতে চারদিনের ছুটি নাও। কাল সকাল পাঁচটায় এসে নর্মদাতে স্নান করে এইখানে অপেক্ষা করবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে সিদ্ধেশ্বরজীকে বিধিপূর্বক পূজা এবং মহর্ষি পতঞ্জলি ও গোবিন্দপাদজীর সাধন গুহা দর্শন করাবো। এখন তুমি যাও। লাঠি আর কমণ্ডলু ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আনবে না।

- কাল সকালে আপনার দর্শন পাবো ত ?

- জরুর কাল আমাদের দেখা হবে।

অগত্যা তাঁকে প্রণাম করে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। এসে প্রথমেই রামদাসজীকে বললাম যে, প্রলয়দাসজী দিন চারেকের জন্য কোথাও নিয়ে যাবেন বলেছেন, কাল ভোরেই মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

- নিশ্চয়ই যাবে। মহাত্মার সঙ্গে যাবে, তাতে সব দিক দিয়েই মঙ্গল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া তুমি স্বাধীনভাবে পরিক্রমায় বেরিয়েছ! তোমাকে বাধা দেব কেন? বাধা দিলে তা শোনার মত লোক ত তুমি নও। আমি প্রসন্ন মনেই বলছি তুমি ঘুরে এস। তোমার না ফেরা পর্যন্ত আমি চিন্তায় থাকবো।

রাত্রিটা কোনমতে ছটফট করে কাটল। যদি সকালে মন্দিরে গিয়ে প্রলয়দাসজীকে না দেখতে পাই ? রহস্যময় সাধু যদি আমার কথা ভুলে যান, ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায়,আশা-নিরাশার দ্বন্দে পড়ে রাত্রে ভাল করে ঘুম হলনা। শেষরাত্রে আশ্রম দেবতার মঙ্গল আরতি শেষ হতেই রামদাসজীকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান সেরে ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করছি, দেখলাম, লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে প্রলয়দাসজী এসে পৌঁছে গেলেন। মৃদু হেসে আমাকে বললেন - মামনুসর চ, অর্থাৎ আমাকে অনুসরণ কর।

মন্দিরের দক্ষিণগাত্র দিয়ে তিনি হাঁটছেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অন্ধ সাধু কিভাবে যে দ্রুততালে পর্বতের ঢালু দিয়ে ওঠা নামা করছেন, অত্যন্ত সরুপথে ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে চলেছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন। নর্মদা পরিক্রমায় এসে কত কিছুই ত দেখলাম, সবজান্তা পণ্ডিতেরা যার একটা সস্তা নাম দিয়েছে Miracle, এই Miracle বললেই যাঁদের নাসিকা বেঁকে যায় তাদের বিকৃত মুখচন্দ্রমা নিয়ত স্মরণে রেখেও যা নিজের চোখে দেখছি, আর দেখছি বলেই জোরের সঙ্গে বর্ণনা দিতে আমার ক্লান্তি হচ্ছেনা। প্রলয়দাসজী আমাকে খেড়াপতি হনুমান মন্দিরে নিয়ে এলেন তারপর কেদারেশ্বর মন্দির হয়ে নিয়ে এলেন চণ্ডবেগা সংগমে। পথ চিনতে পারছি, বুঝতে পারছি ইনি বোধহয় আমাকে এরণ্ডি-সংগমে নিয়ে যাচ্ছেন, রামদাসজী ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসব স্থান পরিক্রমা করিয়েছেন। তবে পুনরায় এখানে তিনি নিয়ে এলেন কেন ? ভাবলাম এইখানেই হয়ত কোথাও তাঁর আস্তানা আছে। মন্মথেশ্বর শিবমন্দিরে যাওয়ার পথে সেগুন, বুনোনিম এবং বেলগাছের যে ছোট্ট জঙ্গলটি আছে তাও ধীরে ধীরে অতিক্রম করালেন। মন্মথেশ্বর শিবমন্দিরে আজও দেখছি দশবারজন স্ত্রীলোক পুত্র কামনায় হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। প্রলয়দাসজী মন্দিরস্থ এরণ্ডী মাতার বিগ্রহের সামনে হাতজোড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন -

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥

তুমি বিষ্ণুশক্তি, তব অনন্ত মহিমা,
তুমি বিশ্ববীজ, মায়া তুমিই পরমা।
তোমারি প্রভাবে দেবী। বিমোহিত সবে,
তোমারি প্রসাদে জীব মুক্তি পায় ভবে ॥

আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন - এই মন্ত্র উচ্চারণ করে মহামুনি মার্কণ্ডেয় এরণ্ডী দেবীর পূজা করেছিলেন। মন্ত্রটি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের নারায়ণী স্তুতির পাঁচ নম্বর মন্ত্র। শুম্ভবধের পর দেবতারা এই জাগ্রতা বৈষ্ণবীশক্তিকে এ মন্ত্রে স্তব করেছিলেন। তুমি মায়ের সামনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে আরাধনা কর। বেদমন্ত্র বলতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথমেই যে দেবীসুক্ত আছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সুক্তে অম্ভৃণ্ ঋষির কন্যা বাক্ অপরোক্ষানুভূতির পরমভূমিতে উঠে স্বরূপ দৃষ্টিতে অহংকারাদেশ বাক্যে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, যা তোমার বাবার অত্যন্ত প্রিয় মন্ত্র ছিল; পিতার আদেশে তুমি যার বঙ্গানুবাদ করেছিলে, সেইমন্ত্র অনুবাদসহ পাঠ কর। বৈষ্ণবী শক্তির পূজা করলে তবে আদি ওঁকারেশ্বরকে যথাবিধি পূজার অধিকার পাবে। ভাবানুবাদ বাংলায় বলতে কোন দ্বিধা কোরোনা, মা আমার সর্বেশ্বরী, তিনি সব ভাষাই বুঝতে পারেন।

বলা বাহুল্য, প্রলয়দাসজীর কথায় রীতিমত চমকে গেছি। আমার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাই এঁর জানা আছে দেখছি। রহস্যময় ঋষিতুল্য মহাত্মার আদেশে আমি আচমন করে দেবীসূক্ত পাঠ করতে লাগলাম -

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্ অহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহং ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

রুদ্রের সাথে চলেছি শ্বসিয়া, আমি যে মাটির বুকের শিখা,
অদিতিসুতের সঙ্গিনী আমি, আমিই বিশ্বচিতের লিখা;
মিত্র ও বরুণে, অশ্বিযুগলে আমার মাঝারে বলিয়া চলি -
ইন্দ্রের অশনি, অগ্নিদহন আমারই হিয়ায় উঠিছে জ্বলি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

পাষাণের ঘায় উথলে ইন্দু - আমিই বহাই তাহার ধারা,
ত্বষ্টার শিল্প-স্বপন রচি যে - ভগের মাধুরী, পূষার তারা।
ঢালি যে আগুন তাহারই শিরায়, সঁপেছে যে জন প্রাণের হবি,
দেবতারে বুকে রেখেছে জড়ায়ে , নিঙাড়ি হৃদয় দিয়েছে সবই।

অহংরাষ্ট্রী সংগমনী বসুনানগ চিকিতুষী প্রথমা যাজ্ঞিয়ানাম্।
ত্বাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়সন্তীম্ ॥ ৩

আমি ঈশ্বরী - বিশ্বে আমার বসিছে সদাই, জ্যোতির রেখা,
নিয়েছি প্রথম আরতি সবার - আমি যে চিতির অরুণ-লেখা।
তাই ত আমারে বিশ্বচেতনা রেখেছে ধরিয়া সকল ঠাঁই -
অখিল আধারে আসন পেতেছি - কোথাও আমার আবেশ নাই

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতি উক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

আমারই লীলায় অন্নাদ হল সে - আমি ফুটায়েছি আঁখির তারা,
আমার স্নেহ-চুম্বনে তার প্রাণ কন্দরে জেগেছে সাড়া।
আমারে মানেনি হেলায় যাহারা, ক্ষয় যে তাদের নেয় গো টানি।
শ্রদ্ধায় মোরে জানা যায় জেনে, শুনে রাখ মোর সত্যবাণী ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

আমারই এ-বাণী, আর কারও নহে - ধ্বনিয়া চলেছি গভীর রবে -
শুনেছে দেবতা, শুনেছে মানুষ - শিহরি পুলকে শুনেছে সবে;
ইচ্ছা আমার হয়েছে যাহারে, দীপ্ততেজেতে অহর্নিশি
দেবতা করেছি, সুমেধা করেছি, করেছি তাহারে আমার ঋষি ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

আরোপিয়া গুণ রুদ্রের তরে তুলিয়া ধরেছি পিণাকখানি,
অসুরের শর মহতে বিঁধিবে ? - ছুটুক ঈষিকা তাহারে হানি।
আপন যে-জন তাঁহারে বাঁচাতে রক্ত-সায়র উথলি তুলি -
চেয়েছি দ্যুলোক অলখ-আলোকে, সিঁচেছি সুধায় ধরার ধূলি।

অহং সুবে পিতরম্ অস্য মূর্ধন্ মম যোনিঃ অপ্সু অন্তঃ সমুদ্রে।
তত‌ো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭

পিতা বল যারে, প্রসবি তাহারে আমিই রেখেছি নিখিল শিরে,
মূলাধার মম রয়েছে আড়াল প্রাণেরই গভীর সাগর-নীরে;
সেথা হতে আমি রূপে রূপে ফুটি, ছড়াই বিশ্বভুবন ছেয়ে,
ঐ যে দ্যুলোক ছুঁয়ে আছি তারে - আলোর নিঝরে উঠেছে নেয়ে ॥

অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পরো এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

চলেছি বহিয়া দিক হতে দিকে - চলেছি বহিয়া ঝড়ের মত,
দুটি বাহুপাশে শিশু হেন যেন আগুলি চলেছি ভুবন যত;
ছাড়ানু দ্যুলোক - এই যে পৃথিবী, ছাড়ানু তাহার মাটির মায়া,
এমনই বিপুল মহিমা আমার নিখিল আমারই নিটোল কায়া ॥

এরণ্ডী মাতার পূজা শেষ হল। অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তির প্রতীককে প্রণাম করে তিনি আমাকে নিয়ে চললেন বৈদূর্য পর্বতের চূড়া লক্ষ্য করে। এবার সম্পূর্ণ চড়াই-এর পথ। এবড়ো খেবড়ো পথ, পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে কখনও সরিয়ে তিনি তরতর করে উঠতে লাগলেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি এই বুঝি পড়ে যান। আমি একবার সসম্ভ্রমে বললাম - আমাকে আগে আগে যেতে দিন, নয়ত আপনি আমার হাত ধরে চলুন। তিনি বললেন - তুমি কি পথ চেন ? পথপ্রদর্শক হবে কি করে? তুমি ভাবছ অন্ধা বুড়া গির যায়েগা, কিন্তু সেদিন তোমাকে বলেছি কিনা যে, জো অন্ধেকা নয়ন কা জ্যোতি বো সর্বত্র বিরাজমান্ হৈ, উনোনে আগে চলতা হৈ, হম্ উনকো অনুসরণ কর রহা হৈ, বেফিকর রহো। আমি আর কিছু বললাম না, নীরবে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। পূর্বেই বলেছি, এই পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালে স্পষ্টই দেখা যায় যে, দুটি পার্বত্যধারা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে গেছে। তার উত্তর দিকের ধারাটি কাবেরী নদীর দিকে গিয়েছে, আর দক্ষিণ দিকের ধারাটি গিয়েছে নর্মদা নদীর দিকে। এই দুই সুদীর্ঘ শৈলশিরার মাঝখানে গভীর গহ্বর দেখা যাচ্ছে। সেই গহ্বরের চারিদিকে সেগুন শাল বুনোনিম এবং বেলগাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের উঁচুতে উঠে ঋণমুক্তেশ্বর সোমনাথের মন্দির, মাহিষ্মতী নগরীর ধ্বংসাবশেষের অবস্থানগুলি, কোন্ দিকে কোনটি তা অনুমান করতে পারছি। রামদাসজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে গেছি এইসব। প্রলয়দাসজী আমাকে নিয়ে দুই পার্বত্যশিরার মধ্যবর্তী গহ্বরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন - নীচে গভীর ঢালের মধ্যে জঙ্গল দেখতে পারছো ? আমি 'হ্যা' বলতেই তিনি বললেন তুমি আমার হাত ধর, একেবারে ঢালু রাস্তা, রুক্ষ পার্বত্য ঢাল, গাছের শিকড় ধরে, গোড়া ধরে আমাদেরকে ঐ গহ্বরের মধ্যে নামতে হবে। মিনিট দশেক কষ্ট কর, পরে দেখবে পাহাড়ের উপর থেকে যা গভীর জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে, বিপজ্জনক মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এই গহ্বরের মধ্যস্থল তপোবনের মত মনোরম। এই তপস্যার স্থলকে সাধারণ লোকের স্পর্শ হতে বাঁচাবার জন্য যেন প্রকৃতি নিজের হাতে বাহ্যত গহ্বর ও জঙ্গলের বাধা রচনা করেছেন। মাঝে মাঝেই প্রলয়দাসজী নির্দেশ দিচ্ছেন - এহি পেড়কো পাকড়ো, উস্ শিকড় পাকড়ো, থোড়া ঠার যাইয়ে, পাকড়ো মেরে হাত।

পাহাড়ের খাড়া ঢাল অতিক্রম করে নেমে এলাম অপেক্ষাকৃত কম ঢাল অংশে, যেখানে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট চওড়া এমন ঢাল যা প্রায় সমতল ভূমির মত, স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। এই অংশে আর শাল-সেগুন-নিম-বেলগাছের ঘন জটলা নেই; লতাগুল্মে জড়াজড়ি কোন সংকটজনক ঝোপঝাড়ও নেই। অল্প দূরে দূরে গাছ আছে, তবে সে সব এমনভাবে যা এইস্থানের শোভাবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। অল্প দূরেই নর্মদার কাকচক্ষু জল টলটল করছে। জলের মধ্যে ঢেউয়ের খেলা চলছে, অর্থাৎ পাহাড় ঘেরা জল এখানে নিস্তরঙ্গ লেকের মত নয়। ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গাছের ডালে বসছে। সাত আটটা হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে জলের উপর, বাকী অংশ ছায়ায় ঢাকা। আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটছি, তা দেখতে চক্রাকারে পাহাড় ঘেরা আবেষ্টনীর মত। নেমেছিলাম পাহাড়ের পূর্ব দিক হতে, এখন চলছি দক্ষিণ ঢালের

পথ ধরে। আমাদের চলার পথের প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটি গাছের তলায় একটি কৃষ্ণসার মৃগ আর একটির সাথে খেলা করছে। মুণ্ডমহারণ্য বা এই ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি পথেও অনেক কৃষ্ণসার মৃগ দেখেছি; কিন্তু তারা সামান্য একটু শব্দেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে পালিয়ে যায়, কিন্তু এখানে একরকম তাদের পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছি, তারা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলনা। মনে পড়ে গেল মহাকবি কালিদাসের অঙ্কিত কুমারসম্ভবের একটি আশ্রম চিত্র, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন -

শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং -
মৃগীম কণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ।

প্রলয়দাসজী বলে উঠলেন - এ স্থান হিংসাশূন্য, এখানে বাঘ ভালুক প্রভৃতি কোন হিংস্র জন্তু নেই।

আমি বললাম - থাকলেই বা কি ক্ষতি ছিল। প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে বর্ণনা এতকাল শুনে এসেছি, এই স্থানটি ত অবিকল সেই রকম, আপনার দয়ায় এসব যে দেখতে পেলাম, তাতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাঘ থাকলে বাঘ-হরিণের সহাবস্থান পরস্পরের হিংসাশূন্য ব্যবহার দেখে বাংলার কবি নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা মনে পরে গেল -

এক পার্শ্বে বেদীমূলে 'সুশীলা' শার্দুল
নীরবে সেবক অঙ্গে করিছে লেহন
অর্ধনিমীলিত নেত্রে বসিয়া নীরবে
'সুলোচন' সুলোচনা কুরঙ্গ যুগল
আশ্রম পালিত মৃগ, নীরব সকল।

প্রলয়দাসজী কবিতাটি শুনে খুব তারিফ করলেন, বললেন - কবি লোগোনে ক্রান্তদর্শী হোতা হ্যায়। আভি দেখিয়ে উধর বড়া একঠো গুহা হৈ। ইধর পাহাড়কা চারো ঢালোমেঁ চারঠো গুহা হৈ। সবসে মহত্বপূর্ণ,সবসে বড়া গুহা এহি হ্যায়।

কথা বলতে বলতেই আমরা দক্ষিণ দিকস্থ পর্বতগাত্র হতে পশ্চিমদিকের ঢালে এসে পৌঁছে গেছি।

- সাষ্টাঙ্গে প্রণতি লাগাও। ইহ্ হ্যায় ভারতকী মুকুটমণি মহাযোগেশ্বর যোগদর্শন প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি মহারাজকী গুহা। চলিয়ে থোড়াসা অন্দরমেঁ ঘুসিয়ে, জ্যাদা নেহি। তাঁর কথা শুনে অব্যক্ত আনন্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আমি ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। গুহার কাছাকাছি হতেই মনে হতে লাগল, গুহাভ্যন্তর হতে যেন কোন জটাজুট সৌম্যদর্শন ঋষি তাঁর বিশাল জটাভার নিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করবেন -

কিং গোত্রো নু সৌম্যামীতি ?

অর্থাৎ - কুশল হউক, সৌম্য গোত্র কি তোমার ?

নাহ্ - অতখানি সুকৃতি আমার নেই। প্রলয়দাসজী ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা। গুহার মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতেই কানে এল জলোচ্ছাসের শব্দ। আমি কৌতুহলভরা দৃষ্টিতে প্রলয়দাসজীর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন - এর পাশের গুহাতে নর্মদার জল এসে ধাক্কা দিচ্ছে। এই পাহাড়ের একটি গুহা ভেদ করে নর্মদা এই পাহাড়বেষ্টিত স্থানে এসে পড়েছে, তারপর পূর্বদিকের আর একটি গুহা ভেদ করে এই জলের ধারা নর্মদার মূল ধারায় গিয়ে পড়েছে। আপত জানতা হ্যায়, ইয়েহি হমারা নর্মদামায়ীকি বৈশিষ্ট্য হ্যায় - ভিত্বা শৈলাংশ্চ বিপুলং - বিশাল বিশাল পাহাড় ভেদ করে মা আমার প্লাবয়ন্তি বিরাজন্তি অর্থাৎ বিন্ধ্য ও বৈদূর্য পর্বতের মধ্যস্থল প্লাবিত করে বিরাজমানা। তেন রেবা ইতিস্মৃতা - তাই ত মায়ের নাম রেবা।

এখনও যেমন অনেক প্রাচীন বাড়ীতে দেওয়ালের উপর দিকে কুলুঙ্গী দেখা যায়, তেমনি এই গুহার ভিতরে উপর দিকে একটা বড় কুলুঙ্গীর মত ছোট প্রকোষ্ঠ চোখে পড়ল। চোখে পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, এ যেন গুহার মধ্যে গুহা - অন্তর্গুহা। ভেতরে ঢুকতেই সহসা ফোঁস ফোঁস গর্জন শুনেই ওপরের দিকে চোখ গিয়েছিল, তাকিয়ে দেখলাম - এক বিরাট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঁকি মারছে।

সর্পরাজের কলেবর যে কত বড় তা আন্দাজ করতে পারলাম না। কেননা তাঁর বৃহত্তম অংশ সেই কুলুঙ্গীর অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে। তার বিশাল ফণার বিস্তৃত আয়তনই কুলুঙ্গীর প্রস্তরময় বহিরাবরণের মুখকে আচ্ছাদিত করেছে। চোখের মণি থেকে এমনই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে সমগ্র গুহা আবছা আলোর আভাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। মনে হল, সেখানে যেন সহসা প্রভাত সূর্যের কিরণচ্ছটা এসে পড়েছে। প্রলয়দাসজী চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সাষ্টাঙ্গ দিতে বলে নিজেও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন -

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোহনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাশির্বিষম-বিশধরোহনেক বক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞান-প্রসূতির্ভুজগ-পরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্
দেবোহহীশঃ যোহব্যাৎ সিতবিমল-তনুর্যোগদো যোগমুক্তঃ ॥

অর্থাৎ জগতের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য যিনি নিজের আদ্যরূপ ত্যাগ করে বহুধা অবতীর্ণ হন, যাঁর অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বিষম বিষধর, বহুবক্ত্র, সুভোগী এবং সর্বজ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ, ভুজঙ্গম সম্পর্ক যাঁকে নিত্যপ্রীতি প্রদান করে থাকে, সেই শ্বেতবিমলতনু যোগদাতা ও যোগমুক্ত অহীশ অর্থাৎ নাগদের অধিপতি আনন্দদেব আমাদেরকে রক্ষা করুন।

প্রণাম করে উঠে দেখলাম অন্তর্গুহা হতে সেই শ্বেতকায় সর্পরাজ অন্তর্হিত হয়েছেন। প্রলয়দাসজী তখনও নতজানু হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছেন, তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই, আমি তাঁর হাত ধরে গুহার বাইরে এনে বসিয়ে দিলাম। আমাকে বললেন - পাতঞ্জল যোগদর্শন ত পড়েছ। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র যোগদর্শনাচার্য পতঞ্জলিদেবের অবিস্মরণীয় অক্ষয়কীর্তি ঐ বইটি। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য এবং যোগবার্তিকও লিখে গেছেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভগবান পতঞ্জলিদেব গোণ্ডানগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তাঁর অপর নাম - গোনর্দীয়। বৃদ্ধ বয়সে ইনি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞে অধ্যক্ষতা করেছিলেন। তৎ প্রণীত মহাভাষ্যে তিনি একথা স্মরণ করে লিখেছেন - পুষ্যোমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকা যাজয়ন্তীতি (৩।১।২।২৬) মন্ত্রে উল্লেখিত এই পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশের শেষরাজা বৃহদ্রথের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি বৃহদ্রথকে হত্যা করে ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন।

তাঁর বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - এইমাত্র আপনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পাতঞ্জলিদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন এই মন্ত্র আমি পাতঞ্জলদর্শনের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যার গোড়ার দিকে আছে দেখেছি। বাচস্পতি মিশ্র এই মন্ত্রের উল্লেখ করেননি। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু এর ব্যাখ্যা করেছেন। তাই অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, বাচস্পতির পর এই মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভগবান পাতঞ্জলিকে তাঁরা মহাভাষ্যকার হিসেবে মহাপণ্ডিত এবং মহাচার্য বলে মনে করেন, তাই বলে মন্ত্রে যে অহীশ অর্থাৎ স্বয়ং অনন্তদেব বলে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে, তা অনেক পণ্ডিতই মানেন না।

- পণ্ডিতদের কথা বাদ দাও, তাঁরা ত আর যোগী নয়। শ্রেষ্ঠ যোগী যে কেউ ধ্যানে ইচ্ছা করলেই জানতে পারবেন যে ভগবান পতঞ্জলি স্বয়ং অনন্তদেবের শক্তি। এইজন্যই তাঁর মহাভাষ্যের অপর নাম - ফণিভাষ্য। সেইজন্যই নৈষধচরিতের দ্বিতীয় সর্গে শ্রীহর্ষ বলেছেন - ফণিভাষিত ভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডল নাম ব্যপিতা। মহাভাষ্য দুরূহ হলেও ব্যকরণ শাস্ত্রে এইরকম বিচারমূলক গ্রন্থ জগতের কোন স্থানে কখনও কোন ভাষায় রচিত হয়নি। একে ব্যাকরণের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাত্যায়ন মুনি বার্তিক লিখলেও অষ্টাধ্যায়ীকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করে যেতে পারেননি। অনন্তদেবের প্রতিভা-বীর্য বলেই পতঞ্জলিদেব অষ্টাধ্যায়ীর রহস্য উদঘাটন করে বার্তিকের দোষ স্খালন করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ পতঞ্জলিদেবকে বলতেন - চূর্ণীকৃৎ।

যোগসাধন ছাড়া দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটেনা। শরীর মন ও বাক্য ব্যধিশূন্য ও নির্মল না হলে পাছে উপাসনা নিষ্ফল হয়, সেইজন্য ভগবান অনন্তদেব কলিহত জীবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে তিনবার প্রকট হয়ে যোগসূত্রের দ্বারা মনের, মহাভাষ্যের দ্বারা বাক্যের এবং বৈদ্যরাজ চরক-রূপে শরীরের ব্যাধিনাশের উপায় বলে গেছেন। এই নিগূঢ় রহস্য মনে রেখে এইজন্য মহাভাষ্যের প্রণামাঞ্জলি শ্লোকে বলা হয়েছে -

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনানগ পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরাণতোঽস্মি॥

চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপানি দত্ত লিখেছেন -

পাতঞ্জল মহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাককায়দোষণাং হন্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥

চক্রপানি দত্ত এই শ্লোকে যাঁকে অহিপতি বলে প্রণাম নিবেদন করছে, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁকেই 'অহীশঃ' বলে বন্দনা করেছেন। দুটি শব্দের একই অর্থ - অনন্তদেব। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাযোগী ছিলেন, তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে মহামুনি পতঞ্জলি স্বয়ং অনন্তদেব। ভারত-গৌরব বাচস্পতি মিশ্র শারীরিক ভাষ্যের টীকা লিখে নাম দিয়েছিলেন তাঁর পত্নীর নামানুসারে ভামতী। তিনি পাতঞ্জলদর্শনের উপর তত্ত্ববৈশারদী ভাষ্য লিখে গেছেন। তিনি তাঁর ভাষ্যে পতঞ্জলিদেবকে অনন্তদেব বলেননি বলে যে তিনি অনন্তদেব নন এমন কোন কথা লেখা নেই। তিনি যোগদৃষ্টিতে অনন্তদেবকে বুঝলেও ভাষ্য আলোচনাকালে সে কথা হয়ত উল্লেখ করার অবকাশ পাননি। বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে। তাঁর অনেক পরে খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভাষ্যে যা লেখেননি, তিনি তা লিখে স্পষ্টভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। তাকে প্রক্ষেপ ভাবব কেন! উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন যোগী ভাবা গণেশ ছিলেন আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য। তাঁর অপর দাসানুদাস এই প্রলয়দাস। কাজেই আমার চেয়ে তাঁকে ইদানিংকালে অন্য কেউ ভালভাবে জানতে পারেনা। আমার গুরুদেব কেবল প্রবচন ভাষ্যই লেখেন নি। তাঁর লেখা সাংখ্যসার, যোগসার, যোগবার্তিক এবং ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যও বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতদের কথা আর কি বলব, তাঁদের অনেকেই আমার গুরুদেবের 'বিজ্ঞান' নাম এবং ভিক্ষু উপনাম দেখে তাঁকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন। এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। আমার গুরুদেব নিরতিশয় ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন। সাংখ্যসারের প্রথমেই তিনি লিখেছেন- 'সর্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে'। প্রবচন ভাষ্যের মঙ্গলাচরণেও তিনি বলে গেছেন - 'প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ'।

চল এবার পাহাড়ের পশ্চিমঢাল ধরেই উত্তরদিকে একটু এগিয়ে যাই, আমি তাঁর পিছনে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় পঞ্চাশফুট হাঁটার পরেই তিনি থামলেন। একটি ক্ষীণ পথরেখা দেখিয়ে বললেন, এই পথচিহ্ন পাহাড়ের উপর দিকে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে। ঐ পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠে গেলে মাত্র আধ মাইল দূরেই আদি ওঁকারেশ্বর সিদ্ধেশ্বর রূপে বিরাজ করছেন, সেখান থেকে সিকি মাইল দূরেই বিখ্যাত মাহিস্মতি নগরীর ধ্বংসস্তূপ। তুমি ত মাহিষ্মতীর ধ্বংসস্তূপ দেখেছ! আমার মাথায় তখন ভীষণ আলোড়ন চলছে। তাঁর কথার উত্তর দিতে দেরী হল। আমি ভাবছি এবার আমার মাথায় গোলমাল দেখা দেবে। নানাবিধ চিন্তা আমার মস্তিস্কের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে উঠছে, এই সাধু বলছেন কি ? ষোড়শ শতাব্দী হতে অর্থাৎ প্রায় চারশ বছর ধরে ইনি জীবিত আছেন। প্রলয়দাসজী এবার যেন একটু ধমকের সুরেই বললেন- বলি, আমার কথা কি তোমার কানে ঢুকছেনা ? তুমি মাহিষ্মতী দেখেছ ত !

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমি উত্তর দিলাম- হ্যা, রামদাসজীর সঙ্গে পরিক্রমা করতে গিয়ে দেখে এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি, যত দুর্গমই হোক, মাহিষ্মতীর ধ্বংসস্তূপ বা আদি ওঁকারেশ্বরের এত নিকটবর্তী এই মনোরম সিদ্ধ তপস্থলীর সন্ধান কি এখানকার মানুষ জানেন না! প্রতি বৎসর শত শত তীর্থযাত্রী এবং পরিক্রমাবাসীরা ওঁকারেশ্বরে আসেন, তাঁরা মাহিষ্মতী ও সিদ্ধেশ্বরকে দর্শন করে

যান। এখানে আসতে পারেন না কেন ? কিভাবে এই শান্তশ্রীমণ্ডিত তপোবন এতকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে !

- গৌরীকেদার এবং বদ্রীনারায়ণে ত প্রতি বছরই সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী যান। দেশী বিদেশী বহু অভিযাত্রীই ত দূরধিগম্য হিমালয়কে চষে বেড়াচ্ছে। তবু ঋষিসেবিত 'সিদ্ধাশ্রম' এবং 'শতোপন্থের' সন্ধান কজন পায় বলুন ? এর পেছনে রহস্য আছে।

- যাই বলুন, মাহিষ্মতী যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখন যদি আমি এই স্থানের সন্ধান জানতাম, তাহলে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে এই স্থানের শুচিশ্রীমণ্ডিত তপোবনকে স্মরণ করে কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারতাম -

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার
হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা। (প্রাচীন ভারত)

- তোমার কাব্যরস এখন বন্ধ কর। একটু দূরেই পাহাড়ের গায়ে দেখ আচার্য গোবিন্দপাদের গুহা। এই আধ্যাত্ম - পরশমণির ছোঁয়াতেই শংকরাচার্যের জীবন স্বর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। একটু আগেই জানতে চাইছিলে, শৈলদ্বীপের এই তপোবন এতকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিভাবে রয়েছে! অন্তরালে রয়েছে বটে কিন্তু যাঁর সুকৃতি থাকে তিনি এই সিদ্ধস্থানে এসে পৌঁছন। যেমনভাবে শংকরাচার্য এসেছিলেন যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের আকর্ষণে। একবার ভেবে দেখ, সুদূর দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরলের কালাডি গ্রামে জন্মেও এখনকার মত পথ ঘাটের সুবিধা, যানবাহনের সুবিধা না থাকলেও কিশোর বয়সেই শংকরাচার্য এসে এখানে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। সিদ্ধ মহাগুরু তাঁর জৈব আবরণের দৃশ্যপট উন্মোচন করে তাঁর মধ্যে শৈবচেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন। শিবকল্প মহাযোগীর দিব্যস্পর্শ পেয়ে আচার্য শংকরও শিবকল্প মহাযোগী এবং যুগন্ধর পুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। নির্বিশেষে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব তথা অদ্বৈতবাদের উদগাতা মহাত্মা শংকরাচার্যের তপস্যাস্থল এইটি। প্রণাম কর এই পবিত্র স্থানকে। বহুকাল থেকেই এই গুহামুখ বন্ধ আছে। ভগবান পতঞ্জলি অপ্রকট হওয়ার পর সিদ্ধযোগাচার্যরা ছিলেন। শংকরাচার্য প্রণীত শরীরক ভাষ্য এবং উপনিষদাদির ভাষ্য বা টীকাগ্রন্থের পঠন পাঠন সর্বত্র হয়। তঁর পুস্তক সুপ্রচলিত এবং সুলভ। আচার্য গোবিন্দপাদ 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' ছাড়া আর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি। আমি তোমাকে সেই দুস্প্রাপ্য পুঁথি পড়তে দেব। এখন আমার গুহায় চল। আমার ডেরা দেখার জন্য প্রথমদিন থেকেই তোমার বিষম কৌতুহল, এইবার তোমার সেই সাধ মিটবে।

পাহাড়ের পশ্চিমঢাল অতিক্রম করে উত্তরঢালে পৌঁছালাম। একটু উঁচুতে মনোরম গাছপালা শোভিত গুহা দেখিয়ে বললেন, উপরে উঠতে থাক। এই গুহাতেই আমি দীর্ঘকাল ধরে বাস করছি। সামনেই নর্মদার জল, যেন একটি গোলাকৃতি সরোবর, চক্রাকারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বিরাট গুহা, তার আবার দুটি ভাগ। সামনের দিকটা যেমন বহির্বাটি, আর ভেতর দিকটা যেন অন্দরমহল। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে তিনি গুহার ভেতর দিকে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটা বড় মৃগচর্ম এনে বললেন এতেই তোমার শয্যার কাজ হবে। এখন চল নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান করি, বেলা বোধহয় বারটা। দুজনে জলে নামলাম। জলে নেমেই বললেন কিছুতেই তুমি গুহার ভেতর দিকে আমি কি করছি তা দেখতে যাবে না। যদি দাবানল জ্বলে ওঠে কিংবা বাঘের হুঙ্কারও শুনতে পাও, তবুও ভেতর দিকে উঁকি মারবে না। এইটাই তোমার পরীক্ষা বলে জানবে।

আমি তাঁকে কথা দিলাম।

স্নান করতে করতেই দেখলাম, নর্মদার জলে দুটি নারকেল ভেসে আসছে। তিনি সাঁতার কেটে গিয়ে নারকেল দুটো তুলে আনলেন। আমি সূর্যার্ঘ্য এবং তর্পণাদি সেরে উঠে এলাম। আমাকে নারকেল দুটো ভেঙে দিয়ে বললেন - খেয়ে নাও।

আমি বললাম - আমি একটা খাই, আপনি একটা খান। হাসতে হাসতে প্রলয়দাসজী বললেন - এই শরীরে কোন স্থূল খাদ্যের প্রয়োজন হয়না। এই বলে তিনি গুহার ভেতর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি নারকেল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, দু'চার মিনিটের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা, হঠাৎ কর্কশ চীৎকারে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম, একজন ভীল একটা রক্তাক্ত খড়্গা নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আস্ফালন করতে করতে গুহার ভেতর দিকে ছুটে গেল। এর কিছু পরেই শুনতে পেলাম প্রলয়দাসজীর আর্তনাদ। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং আর্তনাদ শুনে হকচকিয়ে গেলাম। সহসা বুঝতে পারলাম না আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি জেগে আছি। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি গাছপালার উপর দিয়ে অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে ঝিকমিক করছে। আবার আর্তনাদ। বড় করুণ সেই ধ্বনি। প্রলয়দাসজীর সুস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি - বাঁচাও, মুঝে বাঁচাও।

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, হঠাৎ বাবা যেন আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে বললেন - বসে পড়, শান্ত হয়ে বসে থাক্ - সাধু তোকে পরীক্ষা করছেন। এই অলৌকিক সুস্পষ্ট নির্দেশে আমি বসে পড়লাম। বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম প্রাণপণে। আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিক নিঃস্তব্ধ। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে এই তপস্থলী। একটু পরেই একটি জলন্ত ঘি-এর প্রদীপ হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মহাত্মা প্রলয়দাসজী। প্রদীপটি পাথরের উপর রেখে বললেন - তুমহারা ইম্তেহান হো চুকা! তুম পাশ হো গিয়া। তুমহারা পিতাজী তুমকো বাঁচা দিয়া। আজ অমাবস্যা হ্যায়, ইস্ পুনীত লগ্নমে আপকো মূর্ধ্বা মে ওঁকার কী টঙ্কার বাজানে কা তরীকা শিখায়েগা।

আমি বিনম্র কণ্ঠে বললাম - মহারাজ, আজ ত ১০ই বৈশাখ, শুক্রবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। অমাবস্যা বলছেন কেন ? অমাবস্যা তিথি আসতে এখনও ত দশদিন বাকী।

- পাঁজি পুঁথিমে যো তিথি বার বগেরা লিখতা হৈ, উহ্ গৃহীয়োকে লিয়ে। যোগীয়োঁ কা পাঁজি দুসরা হৈ। আজ অমাবস্যা ইহ্ বাত ভি সহি হ্যায়।

এই বলে তিনি ভেতরে উঠে গেলেন। একটি জ্বলন্ত হোমকুণ্ড নিয়ে আমার সামনে বসলেন, আমাকে সিদ্ধাসনে বসে কমণ্ডলুর জলে আচমন করতে বললেন। আচমন হয়ে গেলেই বললেন - তোমার মহাগুরু পিতাঠাকুরকে প্রণাম কর, প্রণাম কর ভগবান পতঞ্জলি এবং যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদকে। এইবার যা বলছি মন দিয়ে শোন। জাবালদর্শন উপনিষদে (৪।৪০-৪৭) আছে -

পিঙ্গলায়াঃ ইড়ায়ান্ত বায়োঃ সংক্রমনং তু যৎ	দক্ষিণায়ানমিত্যুক্তং পিঙ্গলায়াং ইতি শ্রুতিঃ।
তদুত্তরায়ণং প্রোক্তং মুনে বেদান্তবাদিভিঃ।	ইড়া পিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ
ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াং তু প্রাণসংক্রমনং মুনে	অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাং বরঃ॥

অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী হতে যখন বায়ু ইড়ায় গমন করে, সেই সময়কে উত্তরায়ণ বলে, বিপরীত অবস্থানের নাম দক্ষিনায়ণ। আর যখন ঈড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে বায়ু অবস্থান করে, তখন তার নাম হয় অমাবস্যা।

এই তপোভূমির প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে অবস্থান করছে, শ্বাস - প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য কর, আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। স্থির হয়ে লক্ষ্য কর। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বললেন - এখন বুঝতে পারছ ত ? তাই তখন বলছিলাম যে এখন অমাবস্যা চলছে। ধর, কোন সময় যদি লক্ষ্য কর যে ঈড়া পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে প্রাণবায়ুর স্থিতি নেই, তাহলে এই ছোট ক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি (ক্রিয়াটি দেখালেন) - এই অনুষ্ঠান করলে সহজেই প্রাণবায়ু, ঈড়াপিঙ্গলার সন্ধিস্থলে পৌছে যাবে। সিদ্ধাসনে বসেই সমূহ ক্রিয়া আদ্যন্ত অনুষ্ঠান করতে হয়। মন্ত্র জপ বা যে কোন ক্রিয়ার সাধনা, প্রাণবায়ুকে এই যৌগিক অমাবস্যা ক্ষণে না এনে অনুষ্ঠান করতে নেই, করলে তাতে সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। এই গুহ্য যৌগিক কৌশল না জেনেও যদি কাউকে সিদ্ধ হতে দেখে থাক, তাহলে বুঝবে সেই ভাগ্যবান সাধক পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার ফলে অজ্ঞাতসারেই এই অমাবস্যার ক্ষণে দৈবাৎ জপ্-তপের অনুষ্ঠানে বসে গিয়েছিলেন।

প্রলয়দাসজী আমাকে বলে চলেছেন - আর একটি কথা ভাল করে বুঝে রাখ যে প্রাণবায়ু যখন মূলাধারে প্রবেশ করে তখন তাকে আদ্যবিষুব এবং যখন পুনরাবর্তন করে তখন তাকে অন্ত্যবিষুব বলা হয়। তদযথা -

মূলাধারে যদা প্রাণঃ প্রবিষ্টঃ পণ্ডিতোত্তম
তদাদ্যং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈঃ তাপসোত্তম।
প্রাণসংজ্ঞো মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্ধ্বানং প্রাবিশৎ যদা
তদন্ত্যনগ বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥

ঐ অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রেই অর্থাৎ প্রাণবায়ু যখন মূর্ধাদেশে প্রবেশ করে তখন ওঁকার সাধনা করলে বিশ্বব্যাপ্ত ওঁকাররূপী পরমব্রহ্মার দর্শন মেলে।

তাঁর ছোট একটি কমণ্ডলু আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন - তোমার সামনে যে হোমাগ্নি জ্বলছে, আমি মন্ত্র উচ্চারণ করে তাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছি, এই অনির্বাণ হোমাগ্নি মন্ত্রবলে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন আমার গুরুদেব আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু। তদবধি এই অগ্নি জ্বলে আসছে। আমার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘি ঢালতে থাক। বল -

১। ওঁ অগ্নিদূতং বৃনিমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্।
২। ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা মে শুদ্ধ্যন্তাম্
জ্যোতিরহং বিরজ্জা বিপাপমা ভূয়াসং স্বাহা॥
৩। ওঁ য আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশদন্তরো যমাকাশো ন বেদ,
যস্যাকাশঃ শরীরঃ য আকাশমন্তরো যময়তি এষ ত
আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা॥

আমি তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি দিলাম। উভয়ের সমস্বরে উচ্চারিত মন্ত্রের ব্যঞ্জনায় এক অদ্ভুত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হল। কোথা থেকে যে এত সুগন্ধি ভেসে আসছে বুঝতে পারলামনা, অথচ ধূপধুনাও জ্বালানো হয়নি। হোমাগ্নির প্রভাবে আমার সারা সত্ত্বা জুড়ে একটা মধুর আবেশের ঢল নেমেছে, আমার প্রাণবায়ু রসাবেশে উর্ধ্বপথে উঠছে, তা অনুভব করতে পারছি।

তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন - তোমার বাবা তোমাকে যে বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন তা তোমাকে উচ্চারণ করতে হবেনা, আমি বলছি শোন। তোমাকে এই অবস্থায় হাঁ বা না কিছুই বলতে হবে না, তুমি শুধু শুনে যাও। মনে ভালভাবে গেঁথে নাও যে আবির্ভাবের কারণকে 'বীজ' এবং প্রতিষ্ঠার কারণকে 'মূল' বলে। যে মন্ত্র জপ করলে বর্ণশক্তি প্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তাঁকে বীজমন্ত্র বলে এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ঐ স্থানে দেবতা স্থিতিলাভ করেন, তার নাম - মূলমন্ত্র। তোমার পিতৃদত্ত মহাবীজের মধ্যে এই বর্ণটি .... মূলমন্ত্র। আমার মাথাটাকে উল্টোদিকে চিৎ করিয়ে যেখানে ভাঁজ বা টোল খেল, সেখানে একটা টোকা দিয়ে বললেন - এই স্থানটি হল আজ্ঞাচক্র, যোগীর প্রকৃত হৃদয়, ইতর যোগীরা বুকের মধ্যস্থলকে ভুল করে হৃদয় বলে থাকেন। এইখান থেকে সুষুম্না নাড়ীর দুটি শাখা ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এর একটি শাখা কপালের মধ্যে গিয়ে আবার উর্ধ্বদিকে বাঁক নিয়েছে - তার নাম অপরা সুষুম্না, আর যে শাখাটি মস্তিষ্কদেশের তলায় গিয়ে বিভূতি দ্বারে ঠেকেছে, তার নাম উত্তরা সুষুম্না। এই উত্তরা সুষুম্নাতে মূলমন্ত্র জপ করতে থাক কিংবা এই যে আমি ক্রিয়াটি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করতে থাক, আপনা হতেই প্রাণবায়ু মূর্ধ্বাদেশে প্রবেশ করে অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রে ওঁকারের টঙ্কার তুলবে। আর একবার তিনি ক্রিয়াটি দেখিয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম, সত্তার গভীরে ডুবে গেলাম। মনে হল আমার শরীর হতে আমি পৃথক হয়ে পড়ছি এবং আমি ক্রমে বৃহৎ হতে বৃহত্তর হতে হতে আকাশব্যাপী হয়ে পড়লাম। যেন জ্যোতির সমুদ্রে ডুবে গেছি আমি, সর্বত্র ওঁকারের ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তিত হল অগ্নিতে। অদ্ভুত অগ্নি, স্নিগ্ধ, শান্ত, সমস্ত মনকে যেন অপূর্ব আবেশে ভরে দিয়েছে -

ওঁ অয়মগ্নি সর্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্য অগ্নে সর্বাণি ভূতানি মধু।
যশ্চায়মস্মিন্ অগ্নৌ তেজোময়হগ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ।
অয়মেব সঃ -
সোঽহয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম অমৃতমিদং সর্বং স্বাহা॥

যখন চেতনা এল, ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। সামনেই দেখলাম সেই হোমকুণ্ডের অগ্নি জ্বলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্যকিরণে সমগ্র তপস্থলী উদ্ভাসিত। নর্মদার জল, পাহাড়, গাছপালা, আমার সামনের হোমাগ্নি সর্বত্র যেন ওঁকারের বাজনা বাজছে, অসহ্য পুলকে মন ভরে আছে। আনন্দের নেশায় আবার চোখ বন্ধ করলাম। প্রলয়দাসজী সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন - ব্যস্ করোজী, ঔর উনকি রস লেনেকা জরুরৎ নেহি। উঠিয়ে, আপকা পাঁজিকো হিসাব মেঁ, আজ বৈশাখ মাহিনা কা ১২ তারিখ, এতোয়ার (রবিবার) হ্যায়, পরশোঁ শুক্রুবারমেঁ সামকা বখৎ আপ ক্রিয়া মেঁ বৈঠে থে। আভি চলিয়ে নর্মদামেঁ !

আমি হোমাগ্নি এবং তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি হোমকুণ্ডটি গুহার ভেতরে রেখে এলেন। নর্মদাতে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। আজও পাহাড়ের গুহা মুখ দিয়ে নর্মদার জলে দুটো নারকেল এবং চার পাঁচটা কলা ভেসে এসেছে। প্রলয়দাসজী সেগুলো হাতে নিয়ে জলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলেন, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন - বাচ্চা দো রোজ কুছ খায়া নেহি, মায়ী! আপকা কোঈ বিচার নেহি ? আজভি ক্যা ওহ্ নারিয়েল চিবাকর বীতায়েগা! তাঁর সঙ্গে স্নান করে উঠে ভগবান পতঞ্জলিদেব এবং যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদজীর গুহায় প্রণাম করে এলাম। আজ একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম উভয় গুহাভ্যন্তর হতে মেঘবিজড়িত ক্ষীণ সূর্যরশ্মির মত আলোর আভাস বাইরে এসে ঠিকরে পড়ছে।

প্রলয়দাসজীর গুহাতে পৌঁছে আমি বাইরে বসলাম। তিনি ভেতরে চলে গেলেন, একটু পরে বাইরে এসে আমার সামনে শালপাতায় ঢাকা একদলা চরু রেখে খলখল করে হাসতে লাগলেন, বললেন - নর্মদামায়ী আপকে লিয়ে খানা রাখকে গিয়া, মা নর্মদে, আপকা সদৈব জয় হো। খানা শুরু করো।

একখানা ছোট্ট পুঁথি আমার হাতে দিয়ে বললেন এই বই যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ লিখিত 'অদ্বৈতানুভূতিঃ'। খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। এই প্রদীপ থাকল, প্রদীপ সন্ধ্যা হতেই আপনা থেকেই জ্বলে উঠবে, রাতভোর জ্বলবে। সকালে সূর্যোদয় হলে আপনা থেকেই নিভে যাবে। এই উত্তরঢালের কোণে একটি এবং পূর্বঢালে জঙ্গলের মধ্যে আরও দুটি গুহা আছে। ওদিকে তুমি কোনমতেই যাবে না। এখান থেকে পশ্চিমঢালের পতঞ্জলির গুহা, এমনকি দক্ষিণঢালের শৈলতট পর্যন্ত পদচারণা করতে পার। কোঈ ডর নেহি। কাল সবেরে ফিন্ ভেট্ হোগা। এই কথা বলে তিনি গুহার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আমি খেতে বসলাম, শালপাতার ঢাকনা খুলে দেখি তাতে দুধ-চাল-কিসমিস্-ঘি দিয়ে তৈরি চরু, তখনও হাত দিলে গরম বোধ হচ্ছে। মুখে দিয়েই যেন চরুর স্বাদে হারিয়ে গেলাম, যেমন সুগন্ধ তেমনি সুস্বাদু। খেতে বেশি সময় লাগলনা। খাবার পর নর্মদার জলে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। মৃগচর্মে শুয়ে 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' পড়তে লাগলাম।

বইটিতে মোট পঁচাশীটি শ্লোক। প্রথমেই আছে দুই লাইনের একটি মন্ত্র -

বিজ্ঞেয়োহক্ষরঃ সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপিচঞ্চলং
বিহায় সর্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্। ১

অর্থাৎ সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষই একমাত্র বিজ্ঞেয়তত্ত্ব, নিত্যচঞ্চল এই অস্থির জীবনে সর্বশাস্ত্র পরিত্যাগ করে একমাত্র সেই সত্যেরই উপাসনা কর।

তার পরেই দু'নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে -

যস্য প্রসাদাৎ অহমেব বিষ্ণুঃ ময্যেব সর্বং পরিকল্পিতঞ্চ
ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং তস্যাঙ্ঘ্রিযুগ্মং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ২

যাহার প্রাসাদে আমি হই বিষ্ণুরূপ,
আমাতে কল্পিত সব বিশ্বনাম রূপ।
আত্মরূপী গুরুদেব জানিবে নিশ্চয়,
প্রণাম তাঁহার পাদপদ্মে সবিনয় ॥

অহমানন্দ সত্যাদি লক্ষণঃ কেবলঃ শিবঃ।
অনানন্দাদি রূপং যত্তন্নাহমত্তচলোঽদ্বয়ঃ ॥ ৩

আমি সদানন্দ স্বয়ং সত্যাদি লক্ষণ।
শিব শান্ত দ্বন্দ্বাতীত বিশ্ব বিলক্ষণ।
অনানন্দ নাহি মিথ্যা যেবা দৃশ্যময়।
অচল আনন্দ আমি অক্ষয় অদ্বয় ॥

অক্ষিদোষাদযথৈকো হপি দ্বয়ংবত্তাতি চন্দ্রমাঃ
একোহপ্যাত্মাতথা ভাতি দ্বয়বন্মায়য়া মৃষা ॥ ৪

একচন্দ্র চক্ষুদোষে দ্বৈতভান তায়।
তথা আত্মা এক দ্বৈত্য মায়াতে দেখায় ॥

অক্ষিদোষবিহীনানামেক এব যথা শশী।
মায়াদোষবিহীনানাম্ আত্মৈকৈবস্তথা সদা ॥ ৫

চক্ষুদোষ নাশে যথা এক চন্দ্রা ভাসে।
মায়ার বিলয়ে এক চৈতন্য প্রকাশে ॥

পুঁথিটির শেষে লেখা আছে - ইতি শ্রীমৎভগবৎ পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদাচার্য - পরিব্রাজক - পরমহংসস্বামিবিরচিতাদ্বৈতানুভূতিঃ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ। এই বুঝলাম, পুঁথিটি আচার্য গোবিন্দপাদের স্বহস্তে লিখিত নয়। মূল পুঁথি হতে এটা হয়ত ভূর্জপত্রে নকল করা হয়েছে। তাঁর নিজের হাতের লেখা হলে কখনই পুঁথির শেষে 'শ্রীমৎভগবৎ পূজ্যপাদ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতেন না। হয়ত প্রলয়দাসজীর নিজের হাতের লেখা। পুঁথির মর্ম অনুধ্যান করতে করতে আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে। বড় বড় গাছপালা এবং লতাবিতানে ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে নর্মদা বক্ষে।

আমি তট ধরে বেড়াতে লাগলাম। পাহাড়ের বায়ুকোণে আমাদের গুহা। আমি পশ্চিমঢালের শৈলতট ধরে যেখানে ভগবান পতঞ্জলিদেবের গুহা সেই নৈঋত কোণের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেই গুহা এবং গোবিন্দপাদজীর গুহাকে যুক্তকরে প্রনাম জানিয়ে এসে তট ধরে হাঁটতে লাগলাম উত্তরঢালের ঈশান কোণের দিকে। সেখানেও একটি গুহা দেখতে পাচ্ছি, গুহার কাছে পৌঁছতে আর হয়ত বিশ-পঁচিশ ফুট বাকী আছে, এমন সময় পূর্বঢালের প্রান্ত হতে বাঘের বিকট হুঙ্কার শুনতে পেলাম। সেই গর্জনে যেন সমগ্র তপস্থলী কেঁপে উঠলো। আমি ভয়ে পাথরের উপর বসে পড়লাম। আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে। মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতে লাখড়াকোটের জঙ্গলে আমি বাঘের ডাক অনেকবার শুনেছি, সন্ত পাতিরামকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল তাও নিজের চোখে দেখেছি, কিন্তু এত কাছ হতে বাঘের গগনভেদী হুঙ্কার এর আগে শুনিনি। আমি চোখ বন্ধ করে বাবাকে স্মরণ করছি, সহসা মনে পড়ল, আমাকে এদিকে আসতে প্রলয়দাসজী নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, হিংসাশূন্য এই তপোবনে কোন হিংস্র শ্বাপদ নেই। বুঝলাম তাঁর নিষেধবাক্য ভুলে গিয়েছিলাম বলেই এই ভয়ঙ্কর দৈবসংকেত আমাকে সাবধান করে দিল। আমি ঐ তিনটি গুহা এবং গুহাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নিজের গুহার দিকে ফিরে হাঁটতে লাগলাম। গুহাতে পৌঁছে দেখি প্রলয়দাসজীর সেই প্রদীপ সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই জ্বলে উঠেছে।

আমি এক কমণ্ডলু জল ঢকঢক করে গিলে ফেললাম। চুপ করে ঘন্টাখানেক শুয়ে থেকে উঠে বসলাম। সন্ধ্যা রাত্রিকেই মনে হচ্ছে নিশুতি রাত, কোথাও কোন শব্দ নেই, এই হাঁফধরা নির্জন পরিবেশও অপূর্ব শান্ত স্নিগ্ধ এবং সুরভিত হয়ে উঠেছে অলৌকিক দিব্য গন্ধে। মনে হচ্ছে যেন কাছাকাছি কোথাও হাজার হাজার গোলাপ, রজনীগন্ধা, শিউলী কিংবা কুন্দফুল ফুটে আছে। আমি নর্মদার ঘাটে সাবধানে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। প্রলয়দাসজীর নির্দেশিত পন্থায় মূর্ধাদেশে অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রে ওঁকারতত্ত্ব মননে উদ্যোগী হলাম। ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম ক্রিয়াতে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নায়ু শিরার মধ্যে মধুর আবেশ, রসাবেশের

স্ফুরণ হচ্ছে, বেশ অনুভব করতে পারছি। একটু পরেই মস্তিষ্ককোষে ওঁকারের টঙ্কার শুরু হয়ে গেল। শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের অনুরূপ আর এক শরীর বেরিয়ে এসে মূর্ধাদেশে ভেসে উঠল; জ্যোতির্ময় সেই শরীর আকাশ পথে উঠছে, তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে বজ্রগম্ভীর ওঁকারনাদ।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেছে আমার মনেও নেই। যখন চেতনা এল, তখন ধীরে ধীরে চোখ খুললাম, কিন্তু আনন্দের ঘোরে আবার চোখ বন্ধ করলাম। পুনরায় যখন চোখ খুললাম, তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সর্বত্র চিদাগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিখার মধ্যে ছন্দে ছন্দে বেজে চলেছে ওঁকারের বাজনা। বসে বসেই উঁকি দিয়ে দেখলাম পূর্ব ও পশ্চিমঢালের গুহামুখগুলো স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরে আছে। আবার জ্ঞান হারালাম।

ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ শব্দে জেগে উঠে দেখি প্রলয়দাসজী হাসতে হাসতে বলছেন - আটটা বেজে গেছে, কত বেলা হয়েছে, তুমি গুহামুখ ঘিরে এমনভাবে শুয়ে আছ যে, আধঘন্টা হল আমি গুহাতে ঢুকতে পারছিনা। তুমি ক্রিয়াটি ভালভাবে শিখে নিতে পেরেছ দেখে আমি খুব খুব খুশী হয়েছি। রাত্রি কেমন কাটল, বল। এই সিদ্ধস্থানে অলৌকিক কিছু চোখে পড়েছে কি ?

- শেষ রাত্রিতে ক্রিয়ার শেষে দেখেছিলাম পতঞ্জলিদেবের গুহা, গোবিন্দপাদজীর গুহা এবং পূর্বতটের গুহাতে জ্যোতির্ময় দীপ্তির প্রকাশ।

- ঠিকই দেখেছ। এখানকার সব গুহাতেই মহাতপা যোগেশ্বররা বিরাজিত আছেন।

- জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছাড়া তাঁদের কাউকে ত দেখতে পেলামনা ! দিনের বেলাতে ত গুহাগুলি লক্ষ্য করি, কোথাও ত কোন প্রাণের সাড়া পাইনা!

- তুমি কি ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা পড়েছ? তাতে একটি শ্লোক আছে -

অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোহনবস্থানাৎ সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাৎ
অভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ সৌক্ষ্মাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎকার্যতস্তদুপলব্ধে ॥

অর্থাৎ যা তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হচ্ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছনা, তা নেই একথা বলতে পারনা, কারণ - (ক) অতিদূরে থাকলে (খ) অতি নিকটে থাকলে (গ) কোন কারণে যেমন আধি-ব্যাধির কারণে ইন্দ্রিয় বিকল হলে (ঘ) মনঃসংযোগ না থাকলে (ঙ) দ্রষ্টব্য বস্তু বা ব্যক্তি বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম হলে (চ) দ্রব্যান্তরের ব্যবধান থাকলে (ছ) সূর্যালোকে গ্রহনক্ষত্রাদির মত অন্য বস্তুর দ্বারা অভিভূত হলে (জ) জলে জল মিশ্রনের মত সমান আকার পেলে কিংবা (ঝ) কেবলমাত্র সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টির গোচর হলে, সাধারণ মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফৎ তা বুঝতে পারেনা।

এখন চল আমরা স্নান করে আসি।

স্নান ও তর্পণাদি শেষ করার পর তিনি বললেন - স্নান, তর্পণ, ইষ্টমন্ত্রে জপ কিংবা বিশেষ কোন যোগাভ্যাসই নর্মদাতটে যথেষ্ট নয়। তুমি এই জলের ধারে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গীতে শুয়ে পড়ে ডান হাতটি জলে ডুবিয়ে রেবামন্ত্র ১০০৮ বার ভক্তিভরে জপ করতে থাক। আমি একটু পরেই আসছি।

তিনি কোথায় গেলেন জানিনা, আমি তাঁর নির্দেশ মত সাষ্টাঙ্গে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ১০০৮ বার রেবামন্ত্র জপ করলাম। জপ সেরে উঠে দেখি, তিনি পূর্বদিকের ঢাল, যেখানে গতকাল আমি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র গর্জন শুনেছিলাম, তিনি সেই জঙ্গলাকীর্ণ গুহার দিক হতে উত্তরদিকে শৈলতট ধরে আমার কাছে এলেন। আমাকে চোখের ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বলে নিজের গুহা ছাড়িয়ে পশ্চিমঢালের আচার্য গোবিন্দপাদজীর বন্ধ গুহার মুখে এসে বসলেন। আমাকে প্রণাম করতে বলে নিজেও প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠে বললেন - ভারত-ভাস্কর শংকরাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদের এটি সাধনগুহা, একথা তোমায় পূর্বেই বলেছি। যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ। আক্ষরিক অর্থে ঋষি বলতে যা বোঝায় গৌরপাদ ছিলেন সেইরকম ঋষি, ক্রান্তদর্শী। তাঁর দুজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন - একজন মালব দেশের এই যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ এবং অপরজন তোমাদের গৌড়দেশের শাক্ত বেদান্তী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর। আমরা গুরুপরম্পরা হতে জানি যে এঁরা উভয়েই শ্রী বিদ্যার উপাসক ছিলেন। তোমাকে যে এরণ্ডী সংগমে মন্মথেশ শিবমন্দিরে এরণ্ডী বিগ্রহ দর্শন করিয়েছি, সেই বিগ্রহ শ্রী বিদ্যার যন্ত্রের উপর অধিষ্ঠিতা আছেন। কাশীর অন্নপূর্ণা এবং জম্মুদেশস্থ বৈষ্ণোদেবীও শ্রী বিদ্যার যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিতা।

আচার্য শংকরও শৃঙ্গেরী মঠে শ্রী বিদ্যার যন্ত্র স্থাপন করে গেছেন। শ্রী বিদ্যার কৃপা ছাড়া শিবতত্ত্ব বা অদ্বৈত-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠার কথাই বল আর যে কোন যোগসম্পত্তি লাভ করাই বল, তা কদাপি কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বালক শংকরাচার্য গুরু অন্বেষণে বন পর্বত পেরিয়ে তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে সুদূর দাক্ষিনাত্যের কালাডি গ্রাম হতে যখন নর্মদাতটের ওঁকার দ্বীপের এই সাধনগুহাতে এসে পৌছলেন, তখন গোবিন্দপাদজী সমাধিমগ্ন ছিলেন। শংকরপন্থী সন্ন্যাসী বহু অদ্বৈত বেদান্তমূলক গ্রন্থের টীকাকার আনন্দগিরিজীর মতে তখন নাকি (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) এই স্থানের নাম ছিল ব্যাঘ্রপুর। যাইহোক আচার্য শংকর গুহামুখে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত শ্লোকে আচার্য গোবিন্দপাদের বন্দনা করতে লাগলেন এই বলে যে, পূর্বকালে আপনি অনন্তদেব ছিলেন, তারপর আপনি পতঞ্জলি হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং এখন যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদরূপে আপনাকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি আমাকে কৃপা করুন। এই স্তুতিবাক্যে তুষ্ট হয়ে গোবিন্দপাদজী তাঁকে প্রশ্ন করেন - কস্তম্ - তুমি কে ?

এর উত্তরে আচার্য শংকর দশটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করলেন পরমাত্মা অর্থাৎ পরম 'আমি'-র প্রকৃতি। এই দশটি শ্লোক 'দশশ্লোক' নামে বিখ্যাত। দশশ্লোকের সারমর্ম হল সংসারের সকল ক্রিয়ার পর যে সত্তা অবশিষ্ট থাকে তাই হল অদ্বৈতসত্তা। জাগ্রত অবস্থায় জগতের যে ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্নকালে তা তিরোহিত হয় আবার স্বপ্নাবস্থায় কল্পনাজগৎ গভীর নিদ্রাকালে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তন্ময় ও মন্ময় এই দুই জগতের অবর্তমানেও সেই সত্তা সিদ্ধচিৎ অবস্থায় প্রজ্জ্বল। যখন সব লুপ্ত হয় তখনও এই সিদ্ধচিৎ অবস্থা অর্থাৎ অহম্ সত্তা অনাহত থাকে। উপনিষদে এই চিরস্থিত অপরিবর্তনীয় সত্তাকেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা আত্মা।

অদ্বৈত-তত্ত্বের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে গোবিন্দপাদ শংকরকে পরমহংস সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দপাদজীর দীক্ষাবীর্য গুণে আচার্য শংকর নিজেই কেবল অদ্বৈততত্ত্বের উদ্ভাসিত চৈতন্য শিখরে উন্নীত হননি, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে তৎকালীন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে অদ্বৈতচিন্তার ঢল নামিয়েছিলেন। সেই অদ্ভুতকর্মা এবং অদ্ভুত মনীষার অধিকারী সন্ন্যাসীর অদ্বৈতচিন্তাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে প্রায় যাবতীয় প্রধান ভাষায় হাজার হাজার পুস্তক শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমেন লেখা হয়েছে। সে সম্বন্ধে আর নূতন করে কি পরিচয় দেব! সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, অদ্বৈতবেদান্ত বললে শংকরাচার্যকে বোঝায় এবং শংকরাচার্য বললে অদ্বৈতবেদান্তকে বোঝায়। তবুও সত্যের খাতিরে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, এই অদ্বৈতবেদান্তের পৃথক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শংকরের পরমগুরু ঋষি গৌড়পাদ। তাঁর রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা (খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দী) অদ্বৈতবেদান্তের সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং ভাবের গভীরতায় মাণ্ডুক্যকারিকা পরবর্তী সকল বৈদান্তিক আচার্যদের হৃদয় জয় করেছে। যে রকমভাবে উপস্থাপিত করলে বেদ ও শ্রুতি নিহিত অদ্বৈতবাদ তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন আচার্য গৌড়পাদ। মাণ্ডুক্য উপনিষদকে ভিত্তি করে মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদ যে সকল কথা বলে গেছেন, শংকরাচার্য তাকে বিশদরূপে সকলের নিকট উপাদেয় করে তুলেছেন। পরমগুরু রচিত মাণ্ডুক্যকারিকার এই অতুলনীয় ভাবসমৃদ্ধ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই আচার্য শংকর গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সর্বপ্রথম মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যের সমাপ্তি শ্লোকে তিনি পরমগুরুর উদ্দেশ্যে বলেছেন - আচার্য গৌড়পাদ প্রাণীজগৎকে জন্ম-মৃত্যু রূপ হিংস্র জীবজন্তু সমাকুল ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন দেখে তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বোধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে বেদবারিধি মন্থন করে দেবগণের দুর্লভ বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞানরূপ সুধা আহরণ করেছিলেন। সেইজন্য পূজ্যগণেরও পূজনীয় সেই পরমগুরুকে তাঁর চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করছি -

যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোহস্মি।

এস আমরাও আচার্য গৌড়পাদের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। উভয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠেই তিনি বললেন - আমি নিজে শিবাদ্বৈতবাদের সমর্থক বা শৈবাগমতত্ত্ব আমার প্রাণের বস্তু বলে বলছি না, আমি গুরুপরম্পরাক্রমে নিশ্চিন্তভাবেই জানি যে আচার্য গৌড়পাদও শ্রীবিদ্যার উপাসক

ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে পড়েছ ত - তস্মৈ মৃদিতকাষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ - অর্থাৎ ভগবান সনৎকুমার যেমন রাগাদিদোষ হতে বিমুক্ত দেবর্ষি নারদকে অন্ধকারের পার দেখিয়েছিলেন, তেমনি আদ্যাশক্তি শ্রীবিদ্যাও একইভাবে শংকরাচার্যের পরমগুরুকে তমসাচ্ছন্ন সংসারের পরপারস্থিত ব্রহ্মানন্দের চরম ও পরম অনুভূতি দান করেছিলেন তা যেকোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাণ্ডুক্যকারিকার এই শ্লোকটি পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন -

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

অর্থাৎ যা ব্রহ্মানন্দে অবস্থান (পরমার্থতা) বলে অনুভূত হয় তাকে নিরোধ বলা যায়না, কারণ নিরোধের সময় অবিদ্যাজনিত প্রতীতির সংস্কার বর্তমান থাকে। একে উৎপত্তি বলা যায়না অর্থাৎ এইবার ধর্মমেঘ সমাধি উদিত হচ্ছে এইরকম অবস্থান্তর প্রাপ্তিও নয়, এটি বদ্ধ অবস্থাও নয়; কারণ বদ্ধমাত্রেই আপেক্ষিক জ্ঞান বর্তমান থাকে এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞানে আপেক্ষিকতা কখনই থাকতে পারেনা। আমি যদি পৃথিবীতে বদ্ধ হই, পৃথিবী যদি সৌরজগতে গ্রথিত থাকেন এবং সৌরজগৎ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ হয়, তাহলে এই সমস্ত জ্ঞান কি আপেক্ষিক নয়! ব্রহ্মানন্দে স্থিত হলে সাধকের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভপর নয়, কারণ চরম ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য এবং উপাসকদের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারেনা। এটি মুমুক্ষুর অবস্থা নয়, কারণ দুঃখ সংস্কার না থাকলে জিহাসার (জয়ের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিই হতে পারেনা এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞান - কে? কোথায়? কিসের জন্য? কাকে পরিত্যাগ করবে ? এটি জীবন্মুক্তির অবস্থাও নয়, কারণ ব্যবহারিক দশায় জীবন্মুক্তের দ্বৈতভান অত্যন্ত বিগলিত নয়, অর্থাৎ কিছু না কিছু দ্বৈতভান থেকেই যায়।

মাণ্ডুক্যকারিকার এই শ্লোক আস্বাদন করে বুঝতে পারছ আচার্য গৌড়পাদের তত্ত্বজ্ঞান এবং যোগসম্পদ কত উচ্চকোটির, কিন্তু এও বাহ্য। তুমি শুনে আনন্দ পাবে এবং গর্ববোধ করবে যে এই গৌড়পাদ তোমাদের গৌড়দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি বাঙালী ছিলেন। তিনি যে বাঙালী ছিলেন তা শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যই স্বীকার করে গেছেন। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির চতুর্থ অধ্যায়ে অদ্বৈত বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন - এবং গৌড়ে দ্রাবিড়ৈর্ন পূর্বৈঃ অয়ম অর্থঃ প্রভাষিতঃ। অজ্ঞানমাত্রোপাধেঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ। অর্থাৎ ঈশ্বর পরমাত্মা হলেও তিনি যে অহংকারাদি অজ্ঞানোপাধির দ্রষ্টা, তা আমাদের পূর্বে গৌড় এবং দ্রাবিড় কর্তৃক সম্যকরূপে প্রকটিত হয়েছে। এই শ্লোক সম্বন্ধে 'চন্দ্রিকা' নামক টীকায় চিৎসুখাচার্যের গুরু জ্ঞানোত্তম আচার্য বলেছেন- 'গৌড় কর্তৃক অর্থাৎ গৌড়পাদ আচার্য কর্তৃক এবং দ্রাবির কর্তৃক অর্থাৎ শংকরাচার্য কর্তৃক'।

আচার্য শংকর জন্মেছিলেন কেরলে। কেরল দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত। একটি দেশের নামোল্লেখ করে তদ্দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ লোককে নির্দেশ করার প্রথা সর্বজনস্বীকৃত। যদি বলা হয় এই কথা কৈলাস কর্তৃক সমর্থিত, তাহলে বুঝতে হবে তা কৈলাসপতি দেবাদিদেব কর্তৃক সমর্থিত, এই কথাই বক্তা বলতে চাচ্ছেন। কাজেই সুরেশ্বরাচার্য 'দ্রাবিড়ৈ' শব্দ ব্যবহার করে লক্ষণাতে শংকরাচার্যকেই উদ্দেশ্য করছেন, একথা বোঝা যায়।

টীকাকার জ্ঞনোত্তম আচার্যের এই সমীক্ষা যুক্তিপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি একই শ্লোকের 'দ্রাবিড়ৈঃ' শব্দে অর্থ করলেন দ্রাবিড় দেশীয় শংকরাচার্য। কিন্তু একই বাক্যের 'গৌড়েঃ' শব্দে দেশ না বুঝিয়ে গৌড়দেশবাসী বলতে কোন অজ্ঞাতকারণে তাঁর আপত্তি ছিল। টীকাকারের আপত্তি থাকলেও আমি তাঁরই সূত্র ধরে দেশের উল্লেখ করে সেই দেশের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানুষকে সূচিত করার রীতি অনুযায়ী সুরেশ্বরাচার্য কর্তৃক মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্করের মতই গৌড়পাদও বাঙালী ছিলেন, মহাজ্ঞানী ছিলেন।

এখন চল আমরা নিজেদের গুহায় ফিরে যাই। গুহায় পৌঁছে আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম, এটি যেন গুহার বহির্বাটি; তিনি গুহার ভেতরে চলে গেলেন; মিনিট দশেক পরেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমার জন্য শালপাতায় ঢাকা খাবার রাখলেন। বললেন - লে লেও বেটা, ইসকো পা লেও। বলেই এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, ভেতরে চলে গেলেন। উপরের শালপাতা খুলে দেখি, পাতায় লাড্ডু এবং পায়েস

আছে। খাওয়া শেষ করে, পাতাগুলো ফেলে এলাম গুহার পেছনে একটি খাদে। হাতমুখ ধুয়ে বসেছি, প্রলয়দাসজী গুহার মধ্য থেকে পুনরায় বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক হাতে কয়েকখানা বালি-কাগজ, অন্য হাতে পাথরের দোয়াত ভর্তি কালি এবং একটা খাগের কলম।

- ইসমে গোবিন্দপাদজীকা 'অদ্বৈতানুভূতি' লিখ্ লো। ফিন্ সামকা বখৎ ভেট হোগা।

এই বলে তিনি আবার ভেতরে চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ মৃগচর্মের উপর গড়িয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখি দুটি হরিণ গুহার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ভগবানের সৃষ্ট এই দুটি নিরীহ সুন্দর প্রাণীর দিকে। উঠে বসতে ইচ্ছা হচ্ছেনা, পাছে তারা পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তারা আপনা হতেই পূর্বদিকে চলে গেল। আমি উঠে বসে 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' টুকতে লাগলাম। আদ্যন্ত যখন টোকা হল, তখন মনে হল পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে তট ধরে বেড়াতে লাগলাম। গতকালকের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তে আজ আর পূর্ব-ঢালের দিকে গেলামনা, ভগবান পতঞ্জলির গুহার দিকে হাঁটিতে লাগলাম, দক্ষিণ-ঢালেও গেলাম। মনে মনে ভাবছি, রামদাসজী আমাকে বারবার বলেছিলেন সাবধানে থাকবে, 'লু' না লেগে যায়। কিন্তু এখানে গরম কোথায়, পাহাড়ঘেরা জঙ্গলাবৃত এই তপস্থলীতে মনে হচ্ছে চিরবসন্ত বিরাজমান।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে প্রলয়দাসজীর গুহার দিকে ফিরলাম। গুহাতে এসে দেখি, মহাত্মা তাঁর সেই অদ্ভুত প্রদীপটি রেখে গেছেন, প্রদীপটি জ্বলছে। নর্মদাতে গিয়ে সান্ধ্য স্নান সেরে এসে চুপচাপ বসে থাকলাম। আজ বাবারকথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। মেদিনীপুর জেলার এক পল্লীতে বসে তিনি কি করে বুঝেছিলেন যে তপোভূমি নর্মদার তটে তটে এত রোমাঞ্চকর রহস্য লুকিয়ে আছে। তাঁর দয়াতেই আমি আজ এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পায়ের শব্দে সম্বিৎ ফিরে এল। প্রলয়দাসজী সামনে এসে বসেছেন।

- পিতাজীকো আচ্ছিতরেসে স্মরণ মনন করিয়ে। অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রমেঁ ওঁকারতত্ত্ব মনন করনেসে হি পিতাজীকো দর্শন মিলেগা। হরবখৎ আপ্ উনকা নজরমেঁ হ্যায়। পিতৃচিন্তাসেই শিবচিন্তা হোতা হৈ। পিতা ঔর শিব দোনো বরাবর একই তত্ত্ব হ্যায়। আপ্ ত হরবখৎ পিতাজীকে লিয়ে রোতে হ্যায়। হর আদমীকা জন্মদাতা পিতা সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ হ্যায়। যব উনিকা দর্শনকা চাহ্ জ্যাদা হোগা, হম্, জো তরিক্বা দিখা দিয়া, উসি তরিক্বাসে উত্তরা সুষুম্নাকী তটপর চলা যাইয়ে, উত্তরা সুষুম্নাকী মহাতটকো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণসে নর্মদামায়ীকা ধারা সমঝো। উধর আপকা মহাগুরুকা দর্শন মিলেগা।

- আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পিতাজীর দর্শন পাই।

- হাঁ, হাঁ, মূর্ধামেঁ ওঁকারতত্ত্ব স্মরণ করো। দর্শন মিলেগা।

অনেক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তিনিও নীরবে বসে থেকে আমাকে কাঁদতে দিলেন। কিছুটা ধাতস্থ হতেই পুনরায় বলে উঠলেন - মূর্ধামেঁ যব ওঁকারতত্ত্ব মনন করেগা বিচবিচমে পিতাজী ছোড়কে দুসরী কিসীকো দর্শনকী লালচ মৎ করো। ইহ্ বাৎ হরবখৎ ইয়াদ রাখিয়েগা। হম্ আশীর্বাদ দেতা হুঁ।

আবার তিনি নীরব হলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - শংকরাচার্য যে নির্বিশেষে পরব্রহ্মসম তত্ত্বের ওপর এত জোর দিয়ে গেছেন, তাঁর মতবাদ হতে উদ্ভূত বিবর্তবাদ তথা মায়াবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবেদান্তীদের গ্রন্থ বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীদের শিরোমণি অসাধারণ বিচারমল্ল ব্যাসরাজের 'ন্যায়ামৃত' পড়েছি, তাঁর মিথ্যাত্ব লক্ষণ-খণ্ডন, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা সাধন বইগুলো আমার কাছে খুবই উঁচুদরের বলে মনে হয়েছে। শান্তশ্রীমণ্ডিত পবিত্র তপোবনে বসে আমি কোন বিচার বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাইনা। সে প্রবৃত্তিই আমার জাগছেনা। আমি কেবল আপনার চরণতলে বসে জানতে চাই, অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব যতই চরম পরম হোক না কেন, সাধারণ লোকে এই শুষ্ক তত্ত্বের চুলচেরা 'নেতি নেতি' বিচারে কতটুকু রস পাবে ? আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভক্তিপথের কি কোন অবদান নেই ?

- কে বললে যে নেই ? আচার্য শংকর ত নিজেই বলে গেছেন -

ভক্তি প্রসিদ্ধা ভব মোক্ষনায়
নাত্র ততো সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥ (বিবেকচূড়ামণিঃ)

সাধনার শুরু ভক্তি দিয়ে, শেষও হয় ভক্তিতে। পরাভক্তি এবং পরাজ্ঞান একই মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ। এ সম্বন্ধে আচার্যের জীবনের একটি ঘটনা বলছি শোন - কাশীতে শংকরাচার্য যখন বাস করছিলেন, তখন একদিন সশিষ্যে পথ চলতে চলতে দেখলেন, একজন প্রবীণ পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদেরকে পাণিনি ব্যকরণের একটি কঠিন সূত্র ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। আচার্য সেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বললেন, ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করার জন্য জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট না করে তাঁর উচিৎ ভগবৎ সেবা এবং শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করা। এই বলে তৎক্ষণাৎ আচার্য সেই বৈয়াকরণকে গোবিন্দ স্তোত্র রচনা করে শোনাতে লাগলেন। বারটি শ্লোকের ভক্তি সুরভিত বারটি পুষ্পে অর্থাৎ বারটি শ্লোকে আচার্য এই মালাটি গাঁথলেন। এই মাধুর সংস্কৃত গান 'দ্বাদশ মাঞ্জরিক স্তোত্র' নামে প্রসিদ্ধ। এই গানের ধুয়া - 'ভজ গোবিন্দ'। স্তোত্রটি অদ্বৈতবেদান্তের দর্পণ স্বরূপ। শ্রুতিমধুর এই স্তোত্রে তিনি বৈয়াকরণকে বোঝালেন- প্রভুর প্রতি ভক্তিমান হও। নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি মুক্তির পথে বাধা; নিত্যবস্তুর প্রতি ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। সসীম পৃথিবীর উপকরণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই চিন্তা ভ্রান্তিমূলক! এই রকম মানুষ প্রকৃতপক্ষে মূঢ়মতি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ভগবৎ চিন্তা করব, এ চিন্তাও বিভ্রান্তিকর। যদি সারাজীবন ধরে অবিরাম ধ্যান ও ভক্তির রসসিঞ্চনে মনকে প্রস্তুত করে তোলা না যায়, তাহলে মানুষ মৃত্যু আসন্ন দেখে শেষ সময়ে তার মনকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত করতে পারেনা।

বৈয়াকরণ তাঁকে মুক্তির সঠিক পথ কি জিজ্ঞাসা করাতে আচার্য শংকর বললেন - মঙ্গলের সংসর্গে মঙ্গল হয়। মঙ্গলস্বরূপ শিবচিন্তায় সাংসারিক অনিত্য বস্তুর প্রতি নিরাসক্তি জন্মে। নিরাসক্তি থেকেই মোহমুক্তি। মোহমুক্তি থেকে অনন্যচিত্ততা এবং অনন্যচিত্ততাই জীবন্মুক্তি।

'প্রভুর প্রতি ভক্তিমান হও' - বৈয়াকরণের প্রতি এই উক্তিই কি প্রমাণ করেনা যে, আচার্য ভক্তিপথকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি ! মুমুক্ষু সন্ন্যাসীকে তিনি নিষ্ফল ব্রহ্মবাদের দীক্ষা দিলেও গৃহীদের বেলায় 'সবকুছ্ ঝুট্ হ্যায়; সব মায়া হ্যায়' - একথা বলে যাননি। তাই ত এই নিষ্ফল নিরুপাধিক অদ্বৈতবাদীর কণ্ঠেও শোনা গেছে অন্নপূর্ণা প্রশস্তি শিবাষ্টক, শোনা গেছে - ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।

শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যরা, তাঁর যে একাধিক জীবনীগ্রন্থ লিখে গেছেন, তা থেকেই তোমাকে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। শিষ্যরা কল্পনার রং মিশিয়ে অনেক অলৌকিক কথা লিখে ফেলতে পারেন, তবে গুরু পরম্পরা যে ঘটনাটি শুনে আসছি এবং আমি নিজেও যে ঘটনাকে সত্য বলে জেনেছি, তা তোমাকে বলছি শোন - একবার বারাণসীতে বসন্তকালে আচার্য শংকর অতি প্রত্যুষে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পেলেন এক যুবতী তার মৃত পতির মাথাটি কোলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে করতে শব সৎকারের জন্য সকলের কাছেই অর্থভিক্ষা করছেন। শবটি আড়াআড়িভাবে পথ জুড়ে থাকায় আচার্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সদ্যবিধবা সেই তরুণীকে তিনি বললেন - 'মা শবটি যদি একটু সরিয়ে নেন তাহলে আমি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নামতে পারি'। কিন্তু স্ত্রীলোকটি শোকে এতই আত্মহারা যে শংকরের কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি সমানে রোদন করে চলেছেন। বিপন্ন শংকর তাঁকে বারবার অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন। অনেক্ষণ পরে সহসা স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন - 'আপনিই শবটিকে সরে যেতে বলুন না কেন ! আপনার অনুরোধ শুনে তার অভিরুচি হলে নিজে সে একপাশে সরে গিয়ে আপনাকে পথ করে দিতে পারে।

আচার্য তখন বললেন- মা শোকে কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল ? শব নিজে কখনো সরে যেতে পারে? তার আর কি কোন শক্তি আছে যে সরে যাবে!

- কেন সন্ন্যাসী ! আপনিই ত সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন যে শক্তিনিরপেক্ষ একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব ! নিষ্ফল নিরুপাধিক নির্গুণ এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কেউই নেই, কিছু নেই, সবই মায়া !

সামান্যা রমণীর মুখে এইরকম কথা শুনে আচার্য স্তম্ভিত হলেন। মুহূর্তকাল পরেই দেখলেন, সেই রমণী আর শব সবই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বিস্ময় বিমূঢ় শংকর এই দৈবীলীলার রহস্য বোঝাবার জন্য ধ্যানস্থ হতেই বুঝতে পারলেন, এই অলৌকিক লীলার মূলে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীবিদ্যারূপিনী অন্নপূর্ণা। তিনি অনুভব করলেন যে বিশ্বজুড়ে সেই অদ্যাশক্তি মহামায়ার চিৎশক্তি সবকিছুর মূলে। ভূলোক দ্যুলোক তাঁর কটাক্ষেই স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি দরবিগলিত অশ্রু হয়ে সেই ভবগেহিনী শ্রীবিদ্যার স্তব করতে লাগলেন -

ইষৎ স্বভাব কলুষা কতি নাম সন্তি ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ।
এক স এব জননি স্থিরসিদ্ধিরাস্তে যঃ পাদয়ো স্তব সকৃৎ প্রণতিং করোতি॥

সমস্ত দেবদেবীর স্বরূপ চিন্তা করলে তাঁদের কিছু না কিছু অপূর্ণতা চোখে পড়বে। এমনকি স্বয়ং ব্রহ্মাও প্রলয়কালে অভিভূত হয়ে পড়েন। চিন্ময়ী মাগো, একমাত্র তুমিই নিত্যজাগ্রতা নিত্যপূর্ণা। যদি একটিবার কেউ তোমার এই মহিমা স্মরণ করে চরণকমলে প্রণত হয় এবং শরণাগত হয়, তাহলে তোমার কৃপা কটাক্ষে সে সকল সিদ্ধিই লাভ করে থাকে।

এইবার মহাত্মা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন - এবার ক্রিয়ায় বস। আমি গুহাতেই থাকলাম, সকালে যথাসময়ে দেখা হবে।

তিনি গুহার অভ্যন্তরে ঢুকে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, গাছপালা কিছু দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু আজও গত দুদিনের মত সুগন্ধ ভেসে আসছে। হয়ত এই পর্বতকন্দরে কোথাও কোন অজানা ফুল ফুটেছে, আর তারই সৌরভ ভেসে আসছে, আবার এও হতে পারে যে, এই সিদ্ধ তপস্থলীতে যদি কোন মহাত্মা আমার অজ্ঞাতসারে তপোমগ্ন থাকেন, এ তাঁর বা তাঁদের অঙ্গনির্গত সৌরভ। যদি বাস্তবিক কোন ফুলই হয়ে থাকে, তাহলে অন্ধকারের মধ্যে নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্মনিবেদন নিশ্চয়ই ব্যর্থ নয়। আমি গুহার বাইরে এসে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় সাবধানে পা ফেলে নর্মদার ঘাটে নামলাম। নর্মদা স্পর্শ করে এসে প্রণাম করলাম তপোবনস্থ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে তাকিয়ে এই নির্জন অরণ্যানির স্থির গম্ভীর শোভা দৃষ্টির প্রদীপে অনুভবও করতে লাগলাম। মাথার ওপরে ঝকমকে তারা ছিটানো আকাশ, চার ধারেই পাহাড়ের প্রাচীর, বড় বড় গাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা রাতজাগা পাখীর ডাক; সর্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। এমন রাত্রি ঘুমিয়ে নষ্ট করার জন্য নয়, ভাবুক কবি বা নিছক প্রকৃতি পূজারীর মত শুধুই সৌন্দর্য উপভোগের জন্যও নয়, তপোবন তপস্যার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিয়াতেই বসার উপযুক্ত সময়। গুহামুখে ঢোকার পূর্বে অভ্যাস বশে ভগবান পাতঞ্জলির গুহার দিকে তাকাতেই রোমাঞ্চিত হলাম, একি.. একি দেখছি আমি! বাবা নামাবলি গায়ে জড়িয়ে যেমন ভাবে ঠাকুর ঘর থেকে পূজা ও চণ্ডীপাঠ সেরে বেরিয়ে আসতেন , সেইভাবেই সেই একইভাবে বাবা পশ্চিমঢাল ধরে হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। যে শরীর একদিন আমার চোখের সামনে চিতানলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, সেই শরীর এখন থাকবে কি করে! একি আমার দৃষ্টিভ্রম! চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলাম, কিন্তু না বাবাই এগিয়ে আসছেন, তাঁর সেই চিরপরিচিত তপোক্লিষ্ট দেহ, সেই প্রশস্থ ললাট, দীপ্তময় আয়ত চোক্ষু, কাঁধে লম্বা পৈতা.. আমি জ্ঞান হারালাম, আমি এখন আলোর রাজ্যে, মনে হচ্ছে চারিদিকে জ্যোতির ঢল নেমেছে। ক্রমেই সেই জ্যোতি ঘনীভূত হয়ে বাবার অবয়ব ধারণ করল।

গায়ে যেন কার স্পর্শ অনুভব করছি, আঠা দিয়ে কেউ যেন আমার চোখ দুটোকে এঁটে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলতে পারছিনা। কানে শুনতে পাচ্ছি, কেউ যেন আমার পিঠে হাত দিয়ে বলছেন - আরে তুম্ ইধর ক্যায়সে আ গিয়া ? আমার গা থেকে জ্যোতির ধারা ধীরে ধীরে যেন ভাঁটার টানে তরতর করে নেমে যাচ্ছে। জ্যোতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সেই আঁটোসাটো জমাট ভাব আর নেই। প্রলয়দাসজী আমাকে ধরে সোজা করে তুলে বসিয়ে দিলেন। চোখ খুলে দেখি, সন্মুখের শৈলচূড়ার আড়াল হতে বালসূর্য নিজের মহিমায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে, পর্বতের বড় বড় শিখরগুলোতে কেউ যেন সিঁদুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিয়েছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোখে পড়ছে অজানা কোন আকাশপরীর অদৃশ্য হাতের যাদু। বড় সুন্দর বড় সার্থক এই তপোবনের স্নিগ্ধ প্রভাত। প্রলয়দাসজী আমার হাত ধরে গুহার মধ্যে এনে মৃগচর্মের উপর বসিয়ে দিলেন। আমার শরীর খুব হাল্কা মনে হল, মনে হল আমার শরীর যেন তুলার মত হয়ে গেছে, মহাত্মা যে হাত ধরে আমাকে গুহার মধ্যে আনলেন, আমার পা যেন পাথরের উপর পড়েনি

বলেই মনে হল। আমি বাবাকে দেখেছি, তাঁর স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় শরীর প্রত্যক্ষ করেছি, এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্রোত বইছে শরীরে। প্রলয়দাসজী বললেন চুপচাপ বৈঠো, আনন্দকী রস লেতে রহো। আমি একটা গাছের পাতা আনছি। রাত্রি ৯টা নাগাদ তোমার পিতাঠাকুরকে দর্শন করে তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিলে পাথরের উপর। তোমার মুখে আঘাত লেগেছে; চাপ চাপ রক্ত জমে মুখ, নাক ও কপাল ঢেকে গেছে। তোমার এই পিতৃদর্শন সম্বন্ধে লৌকিক অলৌকিকের কোন প্রশ্ন তুলোনা। সাধারণ লৌকিক শক্তি ও বুদ্ধির বাইরে যা তাকেই অলৌকিক বলা হয়। লৌকিক জগৎ যেমন সত্য, অলৌকিক জগৎও তেমনি বাস্তব সত্য। তোমার পিতাঠাকুর দেহধারণ করেও বিদেহ ছিলেন, লোকবাসী হয়েও লোকোত্তর ছিলেন। জীবন্মুক্ত পুরুষরা বিদেহ হয়েও দেহধারণ করতে পারেন, লোকোত্তর হয়েও লোকবাসীরূপে নিজেকে প্রকট করতে পারেন। এই যোগবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম রহস্য পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তোমার মনের ব্যাকুলতার জন্য তিনি তোমাকে স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়ে গেলেন। তুমি স্থির হয়ে বসে থাক, আমি গাছের পাতা আনতে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরেই কয়েকটা পাতা হাতে নিয়ে এসে বললেন, তোমার মুখে নাকে হাত দিয়ে দেখ। হাত বোলাতেই দেখলাম, কালো রক্ত হাতে লাগলো, নাকটা খুব ব্যাথা মনে হল। তিনি আমারই কমণ্ডলুর জলে পাতাগুলো ধুয়ে থেঁতো করে তার রস মুখে নাকে লাগিয়ে দিয়ে বললেন - এইবার আর একবার হাত বুলিয়ে দেখ! দেখলাম হাতে আর রক্তও লাগল না, ব্যাথাও নেই। তিনি বললেন এখন শুয়ে থাক। পারলে ঘুমিয়ে পড়। এই বলে গুহার ভিতরে চলে গেলেন।

ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম হলনা, গুহার মুখে বসে আমি পতঞ্জলির গুহার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, কাল রাতে ঐ পথ দিয়েই বাবাকে আসতে দেখেছিলাম, আমার এই অপার সৌভাগ্যের তুলনা কোথায় যেখানে আমার বাবার পদরজঃ পড়েছে সে পথে গোড়ালুটি খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আমি দণ্ড দিতে দিতে পশ্চিমঢালের দিকে এগোতে লাগলাম। দণ্ড কাটিতে কাটিতেই মনে হল কারও দিব্যপ্রকাশ যখন ঘটে সেখানে পদরজঃ পড়বে কি করে! চুলোয় যাক এই জ্ঞানবিচার, আমি আবার দণ্ড কাটিতে কাটিতে গোবিন্দপাদজীর গুহা পেরিয়ে ভগবান পতঞ্জলির গুহাদ্বারে গিয়ে মাথা ঠুকতে লাগলাম। প্রণাম করে দাঁড়াতেই সূর্যের প্রসন্ন কিরণ আমার মুখে চোখে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিল।

আমি হাতজোড় করে সূর্যবন্দনা আরম্ভ করলাম -

ওঁ হিরণ্যপাণিমূর্তয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ওঁ॥ (ঋ ১/২২/৫)

আজকে এস মোদের মাঝে স্বর্ণপানি হে সবিতা।
রক্ষা কর মোদের তুমি পরমপদের জ্ঞাপয়িতা॥

আমার মন্ত্রধ্বনি শেষ হতে না হতেই দেখি প্রলয়দাসজী তাঁর গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত আমার দিকে আসতে আসতে বলছেন - ঔর ভি বোলো। হম্ ছে নম্বর ঋক্ বোলতা হুঁ, মেরে সাথ কণ্ঠ মিলাও, ইহ্ হ্যায় মেধাতিথি দৃষ্ট মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দমেঁ ইহ্ বেদমন্ত্রকো স্ফূর্তি ঘটেগা। তুমহারা কণ্ঠস্বরমে থোরা দোষ হ্যায়। বলো হম্ যিস্ ঢংসে বোলরহা হুঁ -

ওঁ অপাংনপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ওঁ॥

স্তুতি করি আমরা আজি অপাংনপাৎ (জলের শোষক, চঞ্চলবৃত্তির নাশকারী) সবিতারি
ব্রত তাঁহার ভিক্ষা করি তিনি মোদের রক্ষাকারী॥

ওঁ বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ওঁ॥

হবন করি সবিতারি নরলোকের চক্ষু যিনি।
বিচিত্র ও রমণীয় বিভাগ করেন ধন যে তিনি॥

ওঁ সখায় আ নিষীদিত সবিতা স্তোম্যো নু নং। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ওঁ॥

ঐ যে শোভেন সবিতৃদেব অভীষ্ঠ ধন দেবার লাগি
শীঘ্র এস হে সখাগণ স্তোত্রে তাঁহার কৃপা মাগি॥

প্রলয়দাসজীর কণ্ঠ স্তব্ধ হল, আমি সূর্যপ্রণাম করে পাশেই তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর শরীরের চারদিকে একটি জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যকিরণকে ছাপিয়ে একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রামদাসজী বলেছিলেন প্রথম যেদিন আমি একে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে ওঁকার মাহাত্ম্য পড়ে শোনাচ্ছিলাম সেদিন তিনিও নাকি এঁর সিদ্ধ অঙ্গের চারপাশে আভার বিচ্ছুরণ দেখেছিলেন। এই দেব মানবকে আমি যতই দেখছি ততই আমি অবাক হচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে তাঁর শরীরে স্পন্দন দেখা গেল। আমি তাঁর হাত ধরে গুহায় নিয়ে এলাম।

একটুখানি আমার কাছে বসে তিনি গুহার ভিতরে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, আমরা মুখে বলি বেদমন্ত্র চিন্ময়, কিন্তু তার অমোঘ কার্যকারিতা অনেক সময়ই উপলব্ধি করতে পারিনা। আমরা বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করি মাত্র, কিন্তু তা কেবলই উচ্চারণ মাত্র। নির্দিষ্ট ছন্দে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে তবেই বোঝা যায়, প্রত্যেকটি বেদমন্ত্রই গান - মহাসঙ্গীত। সেই সঙ্গীত আজ শুনে আমি ধন্য হলাম। দু'একদিনের মধ্যেই হয়ত এই রহস্যময় মানুষটির কাছ হতে চলে যেতে হবে, জীবনে হয়ত আর দেখা হবেনা। আর আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লোককে ইনি স্মরণ করবেন এ চিন্তা করাও আমার বাতুলতা মাত্র।

- কেঁও আপ্ 'বাতুল আতুল' শোচতে হো! চমকে উঠেছি তাঁর কথায়, গুহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখিয়ে আপকা ভাওনা কী জবাব হম্ বেদমন্ত্রসে দেতা হু, আপ সমঝ্ লো।

'নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছাংসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোম্যাপামিতি' ॥ (ঋ১০/১১৯/৬)

অর্থাৎ পঞ্চ জনপদের যত মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনা। আমি অনেকবার সোমপান করেছি।

আমি তাঁর কথার কি উত্তর দেব! তাঁর বক্তব্য অনুধ্যানের বস্তু। আমি কেবল এইভেবে স্বস্তি পেলাম যে আমি এই অন্তর্যামী পুরুষের চোখে চোখে থাকব।

- চলিয়ে, আভি আস্নান করেঙ্গে। সাড়ে দশ বাজ গিয়া হোঙ্গে।

অনেক্ষণ ধরে উভয়ে স্নান করলাম। স্নান করতে করতে দেখি একটি বড় বেল নর্মদার জলে ভাসছে। অন্ধ সেজে থাকা এই মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে নিয়ে আমাকে বললেন - দেখিয়ে আজ নর্মদামায়ী তুমহারে লিয়ে এহি বরাদ্দ কিয়া। হম্ গুঁফামেঁ যাতা হৈ। তুম্ পিতৃপুরুষয়োঁকো তর্পণ করলো। ঋষি তর্পণ ভি করিয়েগা।

তর্পণাদি সেরে আসার পরেই তিনি বেলটি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন - বেল খেয়ে ঘুমিয়ে নেবে। আজ রাত্রে তোমাকে দিয়ে আদি ওঁকারেশ্বরজীর পূজা করাবো, রাত্রে হয়ত ঘুমোতেই পাবেনা। আমি বেলটি ভেঙে খেতে আরম্ভ করলাম, এত সুস্বাদু বেল আমি জীবনে খাইনি। তিনি কাছে বসে রইলেন। তাঁর ত আর খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন - কুছ পুছনা হ্যায় ত আভি পুছ লিজিয়ে।

আমি বললাম - আপনি আমাকে পিতৃদর্শন করিয়েছেন, ইচ্ছামত যাতে আমার সেই ঠাকুরের দর্শন পাই, তার নিয়মও বলে দিয়েছেন। আমি আপনাকে আমৃত্যু স্মরণ করব; এ ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারবনা। আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। একটাই মাত্র জিজ্ঞাসা আছে, আপনি যে মুর্দ্ধাতে ওঁকার-মননের রহস্য বলে দিয়েছিলেন তা কি আজীবন করে যেতে হবে ? যদি কোন কারণে তার ছেদ ঘটে, তাহলে তখন কি করব?

- সাময়িক ছেদে কোন হানি নেই। আজীবনও তা করবার দরকার হয়না। ওঁকার রহস্যের অন্তর্নিহিত মর্ম এবং তা উপলব্ধি করার পন্থা সম্বন্ধে যা বলছি, তা ভালভাবে মনে গেঁথে নেবে। যোগেশ্বর যাজ্ঞবাক্য বলেছেন -

যথাপর্ণ পলাশস্য শঙ্কুনৈকেন ধার্যতে।
তথা জগদিদং সর্বমোঙ্করে নৈব ধার্যতে ॥
জপেন দহেত পাপং প্রাণায়মৈস্তথা সমম্।
ধ্যানেন জন্মনির্জ্জাত ধারনা শক্তিরুচ্যতে ॥

অর্থাৎ যেমন পলাশফুলের দলসমূহ একটি মাত্র শঙ্কুমধ্যে ধরা থাকে তেমনি সমগ্র জগৎ ওঁকারের দ্বারা ধৃত। ওঁ জপ করলে সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে যায়, ওঁ এর প্রাণায়াম করলে অন্তরে সমতা আসে, চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়, ধ্যান করলে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি ঘটে এবং ধারণা করতে পারলে শক্তিলাভ করা যায়, সমূহ যোগ সম্পত্তি আয়ত্ত হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য হল -

ওঁকারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাতু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ॥ (অমৃতবিন্দু, উপনিষদ)

অর্থাৎ যারা ব্রহ্মলোকের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করতে ইচ্ছা করবেন, তাঁরা ওঁকাররূপ রথে আরোহন পূর্বক বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্বব্যাপী তত্ত্বকে সারথি করে রুদ্রদেবের অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ মহাদেবের আরাধনায় তৎপর থাকবেন। ওঁকারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান উপায়গুলির মধ্যে একটি।

কিন্তু কতদিন এই উপায় অবলম্বন করে চলতে হবে ! তোমার এই প্রশ্নের উত্তরও অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য হল -

তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ - পথিস্থিতঃ।
স্থিত্বা রথপথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি॥

অর্থাৎ যতক্ষণ গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ যেমন রথে চড়ে ক্রমে ক্রমে পথ অতিক্রম করতে হয়, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে যেমন রথের প্রয়োজন হয় না, তেমনি যতদিন না ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে; ততকাল ওঁকারতত্ত্বের সাধনা করে যেতেই হবে। ব্রহ্মানুভূতি হওয়ার পর আর উপাসনার আবশ্যকতা নেই। আশাকরি আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ। আভি লেট্ যাইয়ে। পাঁচ বাজে হমলোগ আদি ওঁকারেশ্বরজিকো তরফ যাত্রা করেঙ্গে। শিবং ভূয়াৎ।

আমি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। বোধহয় পাঁচটাতেই তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। বললেন - যাও, নর্মদা স্পর্শ করে এস। এই তপোবনের এবং তপোবনবাসী দৃষ্ট ও অদৃষ্ট তপোসিদ্ধ ঋষিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এস। তাঁকে দেখলাম, একহাতে লাঠি, একহাতে কমণ্ডলু কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কপালের চামড়া ঝুলে চোখকে ঢেকে রেখেছে বলে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্রে চামড়াকে টেনে কপাল ও মাথার চারপাশে বেঁধেছেন। আমি তাড়াতাড়ি নর্মদা স্পর্শ ও প্রণামাদি করে এসে কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে তুলে নিলাম। তাঁর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ ও ভগবান পাতঞ্জলিদেবের গুহার মধ্যবর্তী স্থানে একটা সরু পায়ে চলার দাগ ধরে চড়াই-এর পথে নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এবড়ো খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছি। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হল, এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিনি, যা দেখেছিলাম তা বাইরে থেকে, তপোবনের শৈলতটে দাঁড়িয়ে। এ যেন একটি ভিন্ন জগৎ - সুউচ্চ সোজা খাড়া সেগুন, শাল, বেল, কেঁদ এবং বারম প্রভৃতি বড় বড় গাছের ঘন সন্নিবেশে মনে হয় মধ্যাহ্নেও এইস্থানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারেনা। এইজন্য এই পার্বত্যপথ আর্দ্র এবং বেশী শীতল, গাছের গোড়ায় লতাগুল্মের অভাব নেই। কোথা থেকে ঝর্ণার জলও চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তার ফলে পথ বেশ পিচ্ছিল। প্রলয়দাসজী আমার কমণ্ডলুসহ বাঁ হাতটা জাপটে ধরে অতি সন্তর্পণে চড়াই এর পথে উঠতে লাগলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে পাহাড়ী জঙ্গলের এমন একটা জায়গায় এলাম, যেখানে লম্বা লম্বা ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। প্রলয়দাসজী বললেন - আমরা সেই আর্দ্র ও পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে এসেছি। যেখানে পাহাড়ের অংশ খুব শুকনো হয় সেইখানেই এইরকম লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ওঠে। ঔর পাঁচ মিনট চড়াই করনেসে হমলোগ অধিত্যকামেঁ আ জাবেগা। লাঠি দিয়ে চার পাঁচ হাত লম্বা লম্বা সেইসব ঘাস ঠেলে ক্রমাগত চড়াইয়ের পথে হাঁটার ফলে আমি হাঁপিয়ে গেছি, কিন্তু এই লোলচর্ম বৃদ্ধের কোন ক্লান্তি দেখছিনা। ঘাসবন পেরিয়ে সত্যই পাঁচ মিনিট উঠতেই আমরা পর্বতের শীর্ষদেশে উঠে এলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের লাল আভা পর্বতশীর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। পেছন ফিরে

একবার তপোবনের দিকে তাকালাম, যাবার সময় পর্বতের শিরা ধরে নামতে নামতে দেখেছিলাম পাহাড় বেষ্টিত বড় বড় বনস্পতি পাহাড়ের গায়ে যেন থরে থরে উঠে এসেছে। সূর্যের লাল আভা সেইসব বনস্পতির শিরোদেশে পড়ায় মনে হচ্ছে পাহাড় বেষ্টিত এই খাদে যেন হোমকুণ্ড জ্বেলে প্রকৃতি দেবী যজ্ঞ করতে বসেছেন! যজ্ঞাদির অজস্র শিখাই যেন দেখছি! প্রলয়দাসজী বললেন - ঔর একদফে ইস তপোবনকো প্রণাম করলেও বেটা। ইস্ তপোবনকা বারেমেঁ ইধর কিসিকো কুছ মৎ বোলনা।

– তুমি ত আরও একমাস থাকবে, নিজে থেকে এদিকে কখনো আসতে চেষ্টা করবেনা। শিব রক্ষিত স্থান এটি। ভুল করে যদি এদিকে চলে আসো তবে সেদিন আমার অনুপস্থিতি কালে তপঃস্থলীর পূর্বঢালে যাবার উপক্রম করতেই বাঘের বিকট গর্জন যেমন শুনেছিলে, সেইরকম চতুর্দিক হতে ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পাবে। আরো নানা দৈব বিপত্তি দেখা দেবে। অন্ধকার হয়ে গেছে, চল এবার আদি ওঁকারেশ্বরের চরণতলে পৌঁছই গিয়ে।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে, পা টিপে টিপে, উৎরাই এর পথে তাঁকে অনুসরন করতে লাগলাম। তিনি মাঝে মাঝে বলে চলেছেন - হুঁশিয়ার, পথল হ্যায়। আমি দু'একবার হোঁচট খেতেই তিনি তাঁর লাঠিটা বগলদাবা করে লাঠির শেষভাগটা ধরে হাঁটতে বললেন। আমি যেন চক্ষু থেকেও অন্ধ, আর উনি বাহ্যতঃ অন্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি, তা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে মিনিট কুড়ি পঁচিশ হাঁটার পরেই অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। অগ্নিকোণের দিকে তাকিয়ে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের চূড়ায় বৈদ্যুতিক আলোর অত্যুজ্জ্বল শিখা চোখে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে কোন্ পথে যে মহাত্মা আমাকে নিয়ে এলেন তা বুঝতে পারলামনা, হঠাৎ দেখি মোটা মোটা পাথরের চওড়া একটা সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন - আদি ওঁকারেশ্বরজীকী চরণমেঁ হমলোগ আগিয়া। পহেলে ত একদফে তুম্ আয়েথে ! তাঁর সঙ্গে উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম মন্দির চত্বরে। দেখলাম, একটি প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপের ক্ষীণ শিখায় লাল পাথরের পূর্বদৃষ্ট স্তম্ভগুলি চোখে পড়ল। দেখলাম স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে ঘিরে চারদিকে চারজন অতিবৃদ্ধ জটাজুট সাধু পূজা করছেন। প্রলয়দাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, আমিও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম সিদ্ধেশ্বর নামে বন্দিত আদি ওঁকারেশ্বরকে। সেই সাধুরা একে একে পূজা করলেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁদের প্রদত্ত চন্দনসিক্ত বিল্বপত্র একটি একটি শিবলিঙ্গের মাথায় দেওয়া মাত্রই ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল একহাত দূরে। তাঁরা প্রণামাদি সেরে চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে তাঁরা 'হর নর্মদে হর' বলে প্রলয়দাসজীকে অভিবাদন করে গেলেন। বুঝলাম, এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত।

সেই মহাত্মারা চলে যেতেই প্রলয়দাসজী নিজের কমণ্ডলুর জল দিয়ে আদি ওঁকারেশ্বরের গাত্র মার্জনা করলেন বেদমন্ত্র পড়তে পড়তে -

তমীশ্বরাণাং পরমং ত্বং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতীং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বর। তুমি নিয়ন্তাদের পরম নিয়ন্তা, দেবগণের পরম দেবতা এবং প্রভুগণের পরম প্রভু। তুমি বিদ্যা অবিদ্যার অতীত, পরমপূজ্য, স্বয়ংজ্যোতি। তোমাকে আমরা যেন জানতে পারি।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - এই যে সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের চারদিকে একটি অস্পষ্ট রেখা বেষ্টন করে আছে, একটু আগে মহাত্মাদের পূজাকালে যেমন দেখলে তাঁদের প্রদত্ত প্রত্যেকটি বিল্বপত্র রেখার বাইরে ঠিকরে পড়ল, তেমনি তোমার দেওয়া বিল্বপত্রও যদি ঐভাবে ঠিকরে আসে তাহলে বুঝবে আদি ওঁকারেশ্বর তোমার পূজা গ্রহণ করলেন, নতুবা বুঝবে মহাদেব তোমার পূজা গ্রহণ করলেন না।

ঝোলা হতে প্রচুর বিল্বপত্র, বনফুল বের করে একটা শালপাতায় রাখলেন, একটা তামার কৌটায় চন্দন ভর্তি করে এনেছিলেন। সেগুলি এবং নিজের কমণ্ডলুটি আমার সামনে রেখে বললেন - যে কোন স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পূজার একটি বিশেষ বিধি আছে, মনে হয় তোমার বাবার কাছে তা শেখনি। তাঁর অজানাও থাকতে পারে। এখন তুমি ঠিক কর, তোমার বাবার কাছে যেমন শিখেছ তেমনভাবেই পূজা করবে, নাকি আমি শিখিয়ে দেব!

তাঁর এই কথায় আত্মাভিমানে লাগল। বিশেষ করে তাঁর কথায় বাবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ থাকায় হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আচমন করে নিজেই শিবপূজায় উদ্যোগী হলাম। পিতৃদত্ত সপ্তাক্ষর শিববীজ কিছুক্ষণ জপ করে আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম -

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তঃ প্রলীনে প্রকটিত বিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শংকরং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ শিবঃ শিবঃ শিবঃ ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবেশন করে প্রণব উচ্চারণ করতে করতে প্রথমে প্রাণবায়ুকে সুষুম্নাপথে নিরুদ্ধ করে, অন্তঃকরণকে শান্ত করার ফলে প্রণব যখন স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মরূপী সাক্ষীচৈতন্যে প্রলীন করে, হে মহাদেব, প্রত্যেক শরীরে যে তুমি অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত, সমাধিস্থ হয়ে তা কোনদিন উপলব্ধি করার চেষ্টা করিনি। হে শিবশম্ভু, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জনা কর। কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের উপর মনে মনে ইষ্টবীজ স্মরণ করে একটি চন্দনলিপ্ত বেলপাতা দিলাম। অনেক্ষণ ধরে জপ করলাম। বেলপাতা ঠিকরে এলোনা।

তারপর ওঁ ঈশানং সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোহধিপতি - ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে ক্রমে ক্রমে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত প্রভৃতি রুদ্ররূপেরও অর্চনা করলাম, কিন্তু বেলপাতা লিঙ্গের মাথায় পূর্ববৎ থেকেই গেল।

ত্র্যম্বকং যজা মহে.... ইত্যাদি যত বেদমন্ত্র আমার জানা আছে সে সবই উচ্চারণ করে কাঁদতে লাগলাম। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৪নং সূক্তে ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট রুদ্রদেবতার যে এগারটি মন্ত্র আছে, তাও পাঠ করে করে ফুলচন্দন সিদ্ধেশ্বরের মাথায় উঁচু করে চাপিয়ে দিলাম। এমনভাবে যত্ন করে ফুল ও বেলপাতা চূড়ো করে সাজিয়ে দিলাম যে আশা করেছিলাম, আশুতোষ আমার চোখের জলে করুণার্দ্র হবেন, অন্ততঃ একটি ফুল ঠিকরে আসবে। কিন্তু না তবুও ফুল পড়লনা। গায়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে, বুকের ভেতরটা খুব ফাঁকা লাগছে। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। উন্মুক্ত আকাশতলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ জ্বলজ্বল করছেন, উর্ধ্বাকাশে ঝিকমিক করছে অগুনতি তারা। নির্জন গম্ভীর গভীর রাত্রিতে একা আমি বসে আছি প্রভু তোমার চরণতলে। হে পতিতপাবন, দীনদয়াল, তুমি দয়া করে আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি নতজানু হয়ে শিবলিঙ্গের কাছে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলাম -

ওঁ ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।
রাস্বা নো অমৃত মর্ত্যভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃড়। (ঋ ৬/১ম/১১৪সূ)

মধুর চেয়ে মধুমাখা স্তোত্র জানাই রুদ্র লাগি।
মরুৎগণের পিতা প্রভু তোমার নিকট বৃদ্ধি মাগি।
মৃত্যুবিহীন রুদ্র তুমি অমৃত দাও মর্ত্যজনে,
সুখী কর আমায় প্রভু, ঋদ্ধি এবং সিদ্ধিদানে॥

ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রও ব্যর্থ হল। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে, ঘেমে নেয়ে গেছি আমি। সমানে ইষ্টমন্ত্র জপ করে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, আরও দুজন মহাত্মা এলেন। তাঁদের দুজনেই দিব্যকান্তি তরুণ, সম্পূর্ণ দিগম্বর। আমি তাঁদেরকে পূজা করার সুযোগ দেবার জন্য একটু সরে বসব কিনা ভাবছি, তাঁদের দুজন এক সঙ্গেই বলে উঠলেন - বাচ্চা আপ্ আসন মৎ ছোড়িয়ে, হমলোগ ইধরই বৈঠকে পূজা করেঙ্গে, মধ্যাহ্নক্ষণ বীত গয়া, অভিতক্ আপকা পূজা নেহি হুয়া! তাঁদের বাচ্চা সম্বোধন আমার কানে বেসুরে ঠেকল, কারণ তাঁদেরকে আমার সমবয়সী এমনকি আমার চেয়ে বরং কিছুটা কম বয়সীই বলে মনে হল। তাঁদের কারও দাড়ি চুল এখনও গজায়নি। তাঁরা আমার বিপরীত দিকে অর্থাৎ যোনিপীঠের সামনে বসে সিদ্ধেশ্বরের মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢালতে ঢালতে, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের কুৎস ঋষি দৃষ্ট যে যে এগারতি মন্ত্রে রুদ্র দেবতার স্তুতি আছে, যা আমি দরবিগলিত অশ্রু হয়ে এখানে বারবার বলেও ওঁকারেশ্বরের করুণা পেলামনা, তাঁরা সেই একই সূক্তের একাদশতম মন্ত্রটি পড়তে লাগলেন -

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যব শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধু পৃথিবী উত্ দ্যৌ॥
শরণ যাচি তোমায় রুদ্র ডাকছি প্রাণের নমস্কারে,
মরুৎসহ ডাকছি তোমায় আহ্বান করি বারে বারে।
পালন করুন মিত্রবরুণ, পালন করুন মা অদিতি,
পালন করুন সিন্ধুসাগর, পালন করুন মা অদিতি॥

শিবকে স্নান করিয়েই যে যার কমণ্ডলুর ভেতর হতে একটি করে বেল পাতা বের করে আমারই ইষ্টমন্ত্র সপ্তাক্ষর মহাবীজ স্পষ্ট উচ্চারণ করে আদি ওঁকারেশ্বরের মাথায় অর্পণ করলেন। মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হলনা, উভয়েরই বেলপাতা ঠিকরে গিয়ে পড়ল। তাঁরা যে যার বেলপাতা কুড়িয়ে নিয়ে 'বম্-বম্-ববম্-বম্' শব্দে গালবাদ্য করতে করতে তিনবার স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। আমি তাঁদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন বুঝতে পারলামনা, শুধু দেখলাম দুটো জোনাকীর আলো জ্বলছে আর নিভছে। আমি এই ভেবে স্বস্তি পেলাম যে আমার পিতৃদত্ত সপ্তাক্ষরী নিশ্চয়ই মহাসিদ্ধবীজ। এই মাত্র সাধু দুজনও ত ঐ বীজেই পূজা করে সিদ্ধ মনোরথ হলেন। ওঁকারেশ্বরই যেন ঐ দুজন দিব্যকান্তি তরুণ সাধুকে পাঠিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, নিজ ইষ্টবীজের ওপর অবিচলিত নিষ্ঠা রাখ। পরক্ষণেই আমার মনে এই চিন্তা জাগল যে, যে কোন দেবপূজায় আসন শুদ্ধির প্রয়োজন। এইমাত্র যাঁরা পূজা করে গেলেন, তাঁদের উপবেশন স্থলই হয়ত কোন কল্পান্তস্থায়ী মহাযোগীর সিদ্ধাসন হতে পারে। আমি পুষ্পপাত্র চন্দনের কৌটো এবং প্রলয়দাসজীর কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে যোনিপীঠের সামনে বসলাম। নিজের কমণ্ডলুর জল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। পুনরায় আচমনাদি করে ইষ্টমন্ত্র জপ করলাম। ঐ তরুণ সাধুদের মতই আমি কুৎস ঋষি দৃষ্ট একাদশ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম, সপ্তাক্ষর বীজে চন্দনলিপ্ত বিল্বপত্র ভক্তিভরে অর্পণ করলাম, বম্-বম্-ববম্-বম্ ধ্বনিতে গালবাদ্য করতে করতে তিনবার প্রদক্ষিণও করলাম। কিন্তু হায়! বেলপাতা ঠিকরে এসে পড়ল না।

আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্তব পাঠ করতে করতে উন্মাদের মত প্রলাপ বকতে শুরু করলাম। বলতে লাগলাম, এই মুহূর্তে তোমাকে আশুতোষ বলে আদর করতে ইচ্ছা করছে না। জটার জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন জটিল 'কপর্দী' নামই তোমার উপযুক্ত নাম হওয়া উচিৎ। তোমার হৃদয় পাষাণ, তাই ত এই পাষাণলিঙ্গই তোমার যথোপযুক্ত বিগ্রহ। বুঝতে পারছিনা কোন গুণে মহাপুরুষরা তোমাকে বলে গেছেন -

ওঁ শান্ত পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং ব্রজঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘন্টাং ডমরুকসহিতম্ চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্বতীশং ভজামি॥

অর্থাৎ তুমি নাকি স্বরূপতহগ শান্ত, পদ্মাসনে নিয়ত ধ্যানমগ্ন, চন্দ্রমুকুটধারী, পঞ্চানন ও ত্রিনয়ন, তোমার দক্ষিণহস্ত সমূহে নাকি শূল বজ্র, খড়্গ, কুঠার ও বর ধারণ করে থাক আর বামহস্ত সমূহে নাগপাশ, ঘন্টা ও ডম্বরু সহিত অঙ্কুশ ধারণ কর। মহাপুরুষরা তোমার দ্বারা বিড়ম্বিত এবং প্রতারিত হয়েছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন - 'এ হেন নানালঙ্কারে ভূষিত, স্ফটিকমণিসদৃশ পার্বতীপতিকে ভজনা করি।' মিথ্যা! মিথ্যা! এসব রোচক বাক্যমাত্র! আমি হাঃ হাঃ করতে করতে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম। উত্তেজনার ঘোরে মনে হচ্ছে আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে। আমি দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছি শিবলিঙ্গের দিকে, গর্জাতে গর্জাতে বলছি, কি করব আমার সাধন ভজন নেই, যদি ভৃগু দুর্বাশার মত শক্তি থাকত তাহলে ওঁকারেশ্বর তোমাকে অভিসম্পাত দিতাম! নতুবা তোমার এই বিগ্রহকে সমূলে উৎপাটিত করে নর্মদার জলে নিক্ষেপ করতাম। ক্রোধে আমার দাঁত কিড়মিড় করছে। সহসা মনে হল, সেই বিশাল চত্বরসহ শিবলিঙ্গ কাঁপছেন। আমার প্রদত্ত ফুল ও বিল্বপত্র ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, একখণ্ড সাদা মেঘ যেন কুণ্ডলীকৃত হয়ে আমার মাথার উপরে নেমে এসেছে। সেই সাদা মেঘের মধ্যে বাবার জ্যোতির্ময় শরীর ভেসে উঠল, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি যুক্তকরে উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন -

ওঁ বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎ কারণং
বন্দে পন্নগভূষং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শংকরম্ ॥

অর্থাৎ বাবা বলছেন - হে স্বপ্রকাশ উমাপতি, তুমি দেবতাদেরও গুরু, তোমাকে বন্দনা করি, সর্পভূষণ মৃগধরকে বন্দনা করি; হে পশুপতি, তুমি চন্দ্রসূর্য ও বহ্নিরূপ ত্রিনয়নধারী এবং মুকুন্দপ্রিয়, তোমাকে বন্দনা করি; ভক্তজনের আশ্রয়, বরদাতা হে মঙ্গলময় মহাদেব তোমাকে বন্দনা করি।

আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে পড়েছিলাম জানিনা, প্রলয়দাসজীর কণ্ঠস্বরে আমি চোখ মেলে তাকালাম। তিনি আমার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। ভোর হয়ে গেছে, এখনও অরুণোদয় হয়নি। সর্বাঙ্গে ব্যথায় কোনমতে মহাত্মার হাত ধরে উঠে বসলাম। লেও, থোড়া পানি পি লেও। আপ্ পূজা কিয়ে থে, ন পাগলপণ কিয়ে থে? তকদীরকা খেলমেঁ এ্যায়সা পিতাজী আপকো মিল গয়ে থে, উনোনে তুরন্ত আকর আপকো বাঁচা দিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন - এদিকে ষোল আনা পণ্ডিতি আছে। বই দেখে দেখে কোন্ শিবলিঙ্গের কি লক্ষণ তার স্বরূপ নির্ণয়ে তৎপরতা অনেক দেখিয়েছ। যখন প্রথমবারে এসেই কৃতনিশ্চয় হয়েছিলে যে আদি ওঁকারেশ্বর স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, তখন স্বয়ম্ভুলিঙ্গের সামনে এইরকম পাগলামি কেউ করে? শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই কি সব জানা যায়? এইজন্য মহাপুরুষরা বলে গেছেন -

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রান্যেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বীঃ পাকরসংযথা ॥

অর্থাৎ চারিবেদ এবং অনেক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও ব্রহ্মতত্ত্ব শিবতত্ত্ব জানা যায় না। বহু অধীতী পণ্ডিতদের দশা দর্বী অর্থাৎ পায়েস রান্নার হাতা বা খুন্তীর মত। হাতা বা খুন্তী পায়েসের মধ্যে বারবার ওঠানামা করলে তা যেমন পায়েসের আস্বাদন পায়না, তেমনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও কেউ কখনো শিবতত্ত্বের আস্বাদ পায়না। মহাদেব আশুতোষ বলেই ত তোমার উন্মাদের মত আচরণ সত্ত্বেও তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন, তোমার ফুল বেলপাতা রেখা অতিক্রম করে ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে। তুমি মুখে বল বেদমন্ত্র চিন্ময় ও নিত্যসিদ্ধ। এটা তোমার অন্তরের কথা নয়, তা যদি হত, তবে তুমি বুঝতে পারতে ভগবান কুৎস দৃষ্ট বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৎসল রুদ্রদেব জাগ্রত হয়েছিলেন। কর্মমল, মায়িকমল এবং আণবমল পরিশুদ্ধ না হলে সর্বব্যাপ্ত ঠাকুরের ঠাকুরালি, তাঁর আশুতোষ বরদ রূপ ইচ্ছামাত্রই অনুভব করবে কি করে? এখন বীরপুরুষ, উঠে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এস। আমার সঙ্গে নর্মদায় চল, স্নান করে এসে আমার নির্দেশ মত পূজায় বসবে। তোমার বাবা আমাকে অনুরোধ করে গেছেন।

নতমস্তকে আমি তাঁর ভর্ৎসনা বাক্য এবং শ্লেষ নীরবে হজম করলাম। গতরাত্রে আমার উদ্ভট প্রলাপ বাক্য স্মরণ করে মন অনুশোচনায় ভরে গেল। আমি আদি ওঁকারেশ্বরের (সিদ্ধনাথ) কাছে গিয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে এলাম।

সূর্য উঠে গেছে। প্রলয়দাসজী আমাকে নর্মদার ঘাটে নিয়ে চললেন। আমি দূর থেকে সেই ভৈরবশিলা এবং মান্ধাতা গ্রামের রাজবাড়ী দেখতে পাচ্ছি। ঘাটে পৌঁছে তিনিও আমার সঙ্গে স্নান করতে নামলেন। আমি তাঁকে বললাম - আপনার দয়ায় দু'বার আমার পিতৃদর্শন ঘটল।

- নেহিজী, সবকুছ নর্মদামায়ীকা কিরপাসে হোতা হ্যায়। আচ্ছিতরেসে নাহা লিজিয়ে। তুমহারা দিমাগ্ ঠাণ্ডা হোগা। তর্পণাদি করিয়ে, হম্ থোড়া বিল্বপত্র চন্দন বগেরাকে লিয়ে যাতা হুঁ। তুরন্ত্ আ জাবেগা।

কিছুক্ষণ পরেই প্রলয়দাসজী পাতায় মুড়ে কিছু বিল্বপত্র নিয়ে হাজির হলেন। আমি তাঁর সঙ্গে আদি ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দিকে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে তিনি বললেন - যে কোন দেবায়তনে জাগ্রত দেববিগ্রহ থাকলে বুঝবে তৎ তৎ দেবতার পূজার নির্দিষ্ট কোন বিধি আছে। যাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতা প্রকট হন, দেবতা তাঁরই কাছে পূজা রহস্য প্রকট করে থাকেন। তারপর বংশ পরম্পরা সেই বিধি প্রচলিত থাকে। এজন্য মন্দিরের পুরোহিত ও পাণ্ডাদের ধারাও পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। নবাগত পূজক যত

বিদ্বান ও তপস্বী হোন না কেন, মন্দিরের পুরোহিত বা পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে তাঁর পূজা করা উচিৎ। তবেই পূজা সিদ্ধ হয়। তেমনি আদি ওঁকারেশ্বরেরও একটি প্রকৃষ্ট পূজাবিধি আছে। যেকোন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এবং সদা জাগ্রত বাণলিঙ্গেরও এই বিধিতে পূজা করলে দেবাদিদেব মহাদেব নিজে কৃপা করে এই পূজা গ্রহণ করেন। তাঁর কখন যে কার ওপর কৃপা হবে, তা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। কৃপার কোন কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা যায়না।

কথা বলতে বলতে আমরা আদি ওঁকারেশ্বরের পাদপীঠে পৌঁছে গেলাম। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পুষ্পপাত্র সাজিয়ে নিলাম। প্রলয়দাসজী তাঁর ঝোলা হতে একখণ্ড চন্দনকাঠ বের করে পাথরের উপর চন্দন ঘষে নিতে বললেন। নিজের কমণ্ডলুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন - এতে পঞ্চামৃত আছে, আগে আচমন করে আমি যা বলব তা মন দিয়ে শুনবে, তারপর আমি ইঙ্গিত করলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে 'ত্র্যাম্বকং যজামহে' মন্ত্রে স্নান করাবে। আমি তখন ভাবছি, মিনিট দশেকের মত তিনি আমার কাছ হতে বিল্বপত্র চয়নের জন্য কোথায় গেলেন। এরিমধ্যে তিনি কিভাবে পঞ্চামৃত সংগ্রহ করলেন! দেখছি, এই অদ্ভুতকর্মী সাধুর পক্ষে সবই সম্ভব।

যাইহোক, আমি আচমন করতেই তিনি বললেন - আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। সত্যযুগে তণ্ডি নামক এক মহর্ষি কঠোর শিব তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দর্শন দেন। তণ্ডি তার চরণে প্রণত হয়ে বলেন, সাংখ্যচার্যেরা যাঁকে একমাত্র ধ্যেয় বলে থাকেন, যোগীরা অনন্ত প্রধান পুরুষ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বরের ধ্যান করেন, পণ্ডিতরা যাঁকে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলে উল্লেখ করেন এবং দেবতা অসুর এবং মুনিগণের যাঁর অপেক্ষা কেউ প্রধান নয়, জন্মবিহীন, অনাদি নিধন আনন্দময় নিষ্পাপ ও প্রভাবশালী সেই মহাদেবের আমি শরণাপন্ন হলাম -

অত্যন্ত সুখিনং দেমনঘং শরণং ব্রজে।

মহাদেবের কৃপাকটাক্ষে মুহূর্তকালের মধ্যে মহর্ষি তণ্ডির বোধিক্ষেত্রে জ্যোতিষ্মতী ও মধুমতী প্রজ্ঞার উদয় হল। সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে তাঁর কাছে শিবতত্ত্ব উদঘাটিত হয়, তখন তিনি যেভাবে সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, ভগবান বেদব্যাস তাঁর মহাভারতের অনুশাসন পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তা লিপিবদ্ধ করেন। তুমি কার কাছে পূজার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছ তা অনুভব করার জন্য তাঁর দু'চারটি মন্ত্র শোনাচ্ছি, ভক্তি সহকারে শোন।

তণ্ডি বলছেন -

যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং চাপি বিদ্যতে।
যং বিদিত্বা পরং বেদ্যং বেদিতব্যং ন বিদ্যতে ॥ ৪১
যং লব্ধা পরমং লাভং নাধিকং মন্যতে বুধঃ।
যাং সূক্ষ্মাং পরমাং প্রাপ্তিং গচ্ছন্নব্যয়মক্ষয়ম্ ॥ ৪২
যং সাংখ্যা গুণতত্ত্বজ্ঞাঃ সাংখ্যশাস্ত্র বিশারদাঃ।
সুক্ষ্মজ্ঞানতরা সূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তি বন্ধনৈঃ ॥ ৪৩
যঞ্চ বেদবিদো বেদ্যং বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতম্।
প্রাণায়াম পরা নিত্যং যং বিশন্তি জপন্তি চ ॥ ৪৪
ওঁকাররথমারুহ্য তে বিশন্তি মহেশ্বরম্।
অয়ং স দেবযানামাদিত্যো দ্বারমুচ্যতে ॥ ৪৫

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ যাঁকে জেনে আর জন্ম মৃত্যু হয়না এবং যাঁকে পেলে আর কোন জ্ঞেয় পদার্থ জানতে হয় না, জ্ঞানীলোক যাঁকে লাভ করে অধিকতর আর কিছু জানবার আছে বলে মনে করেন না এবং যে সূক্ষ্ম পরম পদার্থ প্রাপ্তির পর হ্রাস ও নাশহীন পরমব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে, সত্ত্বাদিগুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বে অভিজ্ঞ, বেদজ্ঞ এবং বেদান্তজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত মহাত্মারা যাঁর মন্ত্র জপ করে অন্তিমে যাঁতে গিয়ে প্রবিষ্ট হন, তপোসিদ্ধগণ ওঁকাররূপ রথে আরোহণ করে সেই মহেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ইনিই সেই শিব যিনি সূর্যরূপে দেবযানের দ্বার স্বরূপ হয়ে থাকেন।